ওঁ তৎ সৎ

নবজীবনোপনিষদ্

(শ্রুতি-স্মৃতি, দর্শন, সাধন ও ব্রহ্মবাদ)

প্রথম পর্ব্ব।

(প্রথম সংস্করণ)

শ্রীসংগ্রাম সিংহ দেবশর্ম্মন (তালুকদার)

প্রথম সংস্করণ—
মুদ্রণ সংখ্যা—১০০০
১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
প্রকাশক—
শ্রীঅধীর চন্দ্র শূর
১২/১, হরিপাল লেন
কলিকাতা-৬
মুদ্রক :—
শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ
ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস,
৫২/৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান—
১। নবজীবনোপনিষদ্ কার্য্যালয়
৫ নং কমার্সিয়াল বিল্ডিং
২৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১
২। ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস
৫২/৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-১২

মূল্য—৬৲ (ছয় টাকা)

প্রকাশকের নিবেদন

উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নব জাগরণ এল তাতে অন্যান্য বিষয়ের ত গতানুগতিক আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় ও আচার অনুষ্ঠানে একটা বিপ্লব দেখা দিল। এর ফলে ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি, ধর্ম্ম-সংস্কার ও প্রগতি বাংলার সমাজ জীবনে এক বিরাট বিবর্ত্তনের সূচনা করল। এই বিবর্ত্তিত সমাজের অনেক মহামানবের অবদান বাংলা তথা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম ক'রে সারা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে অনেক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল। সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

বন্ধুবর শ্রীসংগ্রাম সিংহ তালুকদারের—"নবজীবনোপনিষদ্" পড়লে ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তা-ধারায় যে মৌলিক বিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা অনেকের নিকট হয়ত হেঁয়ালী মনে হোতে পারে কিন্তু সংস্কার মুক্ত মনের যে গভীর অনুভূতি এতে পাওয়া যায়, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে মানবের চিরন্তন জিজ্ঞাসার যে উত্তর দর্শন ও অনুভূতির মিশ্রযুক্তিতে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এতে, তাহা শুধু যে অতীতের আধিভৌতিক অধ্যাত্ম-চিন্তার স্থূলতাকে অস্বীকার করেছে তা নয়, বর্ত্তমান ও ভাবীকালের অধ্যাত্মবাদিগণের সম্মুখে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ এক বিচিত্র চিন্তার দ্বারাও উন্মুক্ত করেছে। এদিক্ দিয়ে বন্ধুবর একক চিন্তানায়ক,—বাংলা তথা ভারতের অধ্যাত্ম জগতে প্রগতি ও বিবর্ত্তনের এক মহান সংস্কারক।

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে যে জ্ঞান ও অনুভূতি প্রজ্ঞার দ্বারা আহরিত হয় তাহাই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানী যিনি, প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষুদ্র বৃহৎ, সূক্ষ্ম স্থূল, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, পার্থিব অপার্থিব নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের মানসিক প্রস্তুতি ও উপলব্ধি লাভ করে থাকেন। তাই

প্রথম সংস্করণ—
মুদ্রণ সংখ্যা—১০০০
১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
প্রকাশক—
শ্রীঅধীর চন্দ্র শূর
১২/১, হরিপাল লেন
কলিকাতা-৬
মুদ্রক :—
শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ
ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস,
৫২/৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান—
১। নবজীবনোপনিষদ্ কার্য্যালয়
৫ নং কমার্সিয়াল বিল্ডিং
২৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১
২। ইষ্ট বেঙ্গল প্রেস
৫২/৯, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মূল্য—৬৲ (ছয় টাকা)

প্রকাশকের নিবেদন

উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নব জাগরণ এল তাতে অন্যান্য বিষয়ের মত গতানুগতিক আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় ও আচার অনুষ্ঠানে একটা বিপ্লব দেখা দিল। এর ফলে ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি, ধর্ম্ম-সংস্কার ও প্রগতি বাংলার সমাজ জীবনে এক বিরাট বিবর্ত্তনের সূচনা করল। এই বিবর্ত্তিত সমাজের অনেক মহামানবের অবদান বাংলা তথা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম ক'রে সারা জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে অনেক স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেল। সেই ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

বন্ধুবর শ্রীসংগ্রাম সিংহ তালুকদারের—"নবজীবনোপনিষদ্" পড়লে ভারতীয় অধ্যাত্ম-চিন্তা-ধারায় যে মৌলিক বিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় তাহা অনেকের নিকট হয়ত হেঁয়ালী মনে হোতে পারে কিন্তু সংস্কার মুক্ত মনের যে গভীর অনুভূতি এতে পাওয়া যায়, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে মানবের চিরন্তন জিজ্ঞাসার যে উত্তর দর্শন ও অনুভূতির মিশ্রযুক্তিতে যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে এতে, তাহা শুধু যে অতীতের আধিভৌতিক অধ্যাত্ম-চিন্তার স্থূলতাকে অস্বীকার করেছে তা নয়, বর্ত্তমান ও ভাবীকালের অধ্যাত্মবাদিগণের সম্মুখে বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ এক বিচিত্র চিন্তার দ্বারাও উন্মুক্ত করেছে। এদিক্ দিয়ে বন্ধুবর একক চিন্তানায়ক,—বাংলা তথা ভারতের অধ্যাত্ম জগতে প্রগতি ও বিবর্ত্তনের এক মহান সংস্কারক।

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে যে জ্ঞান ও অনুভূতি প্রজ্ঞার দ্বারা আহরিত হয় তাহাই আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানী যিনি, প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষুদ্র বৃহৎ, সূক্ষ্ম স্থূল, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, পার্থিব অপার্থিব নানা বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে নিজের মানসিক প্রস্তুতি ও উপলব্ধি লাভ করে থাকেন। তাই

এই আত্মজ্ঞানী আত্মবিজ্ঞানীও বটেন। আত্মবিজ্ঞানীর চিন্তার গতি স্বতঃই অনন্তপ্রসারী, দেশ ও কালের সীমায় এঁরা সীমায়িত নন। কবি, দার্শনিক ও চিন্তানায়ক যাঁরা মানবতাবাদ, মহামানবতাবাদ অথবা অতিমানসবাদ প্রভৃতি জ্ঞান ও চিন্তা, অনুভূতি ও উপলব্ধির উৎকর্ষতা রেখে গেছেন, তাঁরাও প্রাত্যহিক জীবনে ছিলেন আত্মবিজ্ঞানের পূজারী। আত্মবিজ্ঞানীর জ্ঞান সাধনাই তাঁর কর্ম্ম সাধনা। জ্ঞান ও কর্ম্মের এই অঙ্গাঙ্গী অনুশীলন পার্থিব জীবনের বাহিরে কখনও সম্ভব নয়; আর জীবন-ধর্ম্মের এটাই নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রম চিন্তা অলৌকিক ও চমকপ্রদ কিছু হোতে পারে কিন্তু পার্থিব জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি হারায়। এই সঙ্গতি বিহীন অপার্থিব অধ্যাত্ম চিন্তার ব্যতিক্রম এবং যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারা ও জীবন-বোধ অতি ব্যাপক ভাবে দেখতে পাই নবজীবনোপনিষদ্" গ্রন্থে। "সংসার অসার", "সবই মায়া-জাল" প্রভৃতি গুরুবাদ-ধর্ম্মী চিন্তাধারা আর যাহাই করুক মানুষের মনের প্রশ্নের স্থায়ী মীমাংসা আন্‌তে পারেনি। জগৎ ও জীবনকে বাদ দিয়ে অপার্থিব অলৌকিক সত্য বলে কিছু থাকতে পারে না এই বৈজ্ঞানিক মূল সত্য স্বীকার করে নিলে বন্ধুবরের গ্রন্থোল্লিখিত জীবন বিজ্ঞানের ধারাবাহিক উত্তরগুলি অনেকটা বাস্তবানুগ বলে মেনে নিতে কষ্ট হয় না। তা ছাড়া জীবধর্ম্মের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে যে তথ্য এতে পাওয়া যায় ব্যক্তি-পূজারী গুরুবাদীরা ছাড়া কেহই বিরূপ সমালোচনা করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। গ্রন্থখানি ব্যক্তিগত পরিণত চিন্তাধারা ও চরম জ্ঞানের অভিব্যক্তি হলেও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানীর এক পরম সত্যাশ্রয়ী আখ্যায়িকা এবং সেই কারণে অনেক অনুসন্ধিৎসু মনের খোরাক যোগাবে এতে সন্দেহ নেই।

ভারতে ধর্ম্ম-জগতে মানুষকে দেবতার আসনে বসান হয়েছে অনেক; তাছাড়া অনেককে আবার ভগবান বলেও মেনে নিয়েছে। এই মানুষ-ভগবানরা পূজা পেয়েছেন, শ্রদ্ধা পেয়েছেন, পেয়েছেন অসংখ্য লোকের অসংখ্য প্রণতি। তাঁরা বলেছেন, জীবন মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা; বলেছেন চিন্তা ও কর্ম্মে জীবন ও

জগতকে অনিত্য অসার বলে মানতে হবে, নইলে সেই সর্ব্বসার পরম সত্যকে উপলব্ধি করা যাবে না। এ-হেন চিন্তার বহু যুগের সংস্কার মানুষকে শুধু মানসিক দুর্ব্বল করেনি, অন্য প্রকার চিন্তানুশীলনেও বাধা দিয়েছে, বাধ্য করেছে গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণে। এই ধর্ম্মের সংস্কারাশ্রয়ী বাধ্যবাধকতার বেষ্টনী ডিঙ্গিয়ে বন্ধুবর যে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করছেন সংসার-জীবনের মাধ্যমে, তারই ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী এই "নবজীবনোপনিষদ্"। আত্ম-জিজ্ঞাসার এমন ব্যাপক ও বিজ্ঞান-ধর্ম্মী মীমাংসা অন্য কোন গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত দেখবার আমার সৌভাগ্য হয় নি। এমন কোন প্রশ্ন ও উত্তরের পরিপূরক গ্রন্থ আছে কিনা তাও আমার জানা নেই। কর্ম্ম ও চিন্তার সংমিশ্রণে মনও ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যা আর কেউ এমনভাবে করেছেন কিনা সন্দেহ। শাস্ত্র-প্রভাব-মুক্ত মনের এমন দুঃসাহসিক অধ্যাত্ম-অভিযান অদ্যাপি কোথাও দৃষ্টি গোচর হয়নি।

আনবিক যুগের বহু ব্যাপক চিন্তাধারা যখন মানুষকে উত্তরোত্তর নানা সাফল্যের সন্ধান দিচ্ছে, মানুষ আত্ম-শক্তি সম্বন্ধে নূতন করে ভাবতে সুরু করছে, বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন করে জানবার উদ্দাম আগ্রহ মানুষকে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যেতে প্ররোচিত করছে, এই আধুনিক জীবন ধারায় সংস্কারগত ধর্ম্মানুভূতি কতদূর মানুষকে গতানুগতিক ধর্ম্মাচরণে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে পারে, কতদূর মানুষের মানসিক স্থৈর্য্য আনতে পারে প্রাত্যহিক জীবনে চিরাচরিত ধর্ম্মোপলব্ধি, সে দিকে ভাববার সময় এসেছে নিশ্চয়ই। এ হেন অনুকূল পরিবেশে "নবজীনোপনিষদ্" এর আবির্ভাব সত্যই মহাসাগরে আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় বহু সত্যানুসন্ধিৎসুর পরম অবলম্বন হবে সন্দেহ নেই। সংস্কার বিমুক্ত মন নিয়ে বিচার করলে এই আত্ম-বিজ্ঞানীর অকপট আত্ম-ধর্ম্ম-কাহিনী যে কেবল সাধারণ ধর্ম্ম-পিপাসুর জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাবে, জ্ঞান পিপাসুকে প্রকৃত ধর্ম্মোপলব্ধিতে সহায়তা করবে। কিন্তু যাঁর আত্ম-চিন্তার ও আত্ম-জ্ঞানের জীবনালেক্ষ্য এই গ্রন্থ, দৈনন্দিন পরম-সত্যোপলব্ধিতে গড়া তাঁর এই নব জীবন উপনিষদ আরো বহু অধ্যায়ে লিখিত হবে নূতন নূতন ভাব ও চিন্তার বৈজ্ঞানিক

বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে, যুগ-ধর্ম্মের ও যুগ-চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের অপগত দ্বন্দ্ব এবং সংসার ও জীবনের উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও মীমাংসা দিয়ে। তাঁর এই জীবন-বেদ সম্পূর্ণ হোক এবং তাঁর জীবন-সাধনা সার্থক হোক সেই কামনাই করছি।

নবজীবনোপনিষদ্ গ্রন্থখানি দৈনন্দিন ধারাবাহিক অধ্যাত্ম জীবনের এক অভূতপূর্ব্ব কাহিনী। সাধন, শ্রবন ও দর্শনের ভেতর দিয়ে অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর অবচেতন মনের যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিব্যক্তি তাহাই গ্রথিত হয়েছে এই গ্রন্থে। স্থান, কাল ও বিষয়ের পারম্পর্য্য এই অবস্থায় গৌণ, একই বিষয়ের পুনর্ব্বার অবতারণা অপরিহার্য্য। এই প্রকার বৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যথাযথভাবে দেখা ও বিষয়বস্তু সুবিন্যস্ত করা অতীব কঠিন ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাই এই সংস্করণে অনেক অশুদ্ধি রয়ে গেছে বহু আয়াস সত্বেও, গ্রন্থের ব্যাপকত্ব ও বিষয় বস্তুর অভিনবত্ব বিচার করলে এই ত্রুটি অবশ্যই মার্জ্জনীয়।

প্রকাশক—

শ্রীঅধীর চন্দ্র শূর

এই পুস্তক সম্বন্ধে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী মহাশয়ের নিরপেক্ষ মতামত।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ সংগ্রামসিংহ আমার ভ্রাতৃস্থানীয়। তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেব, স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদার মহাশয় এবং আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব, স্বর্গীয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয়, অন্তরঙ্গ সহসাধক ছিলেন। নববিধানের অভিনব আধ্যাত্মিক সাধনা তাঁহাদের দুইজনকে অতি নিকট আধ্যাত্মিক সখ্যতায় আবদ্ধ করিয়াছিল। সুতরাং স্নেহাস্পদ সংগ্রামসিংহের "নবজীবনোপনিষদ্" আমার নিকট বিশেষ আদরের বস্তু এবং অর্থপূর্ণ।

এই গ্রন্থখানিকে স্নেহাস্পদ ভ্রাতার "জীবন-বেদ" বলা যাইতে পারে, কারণ অতি শৈশবকাল হইতে তাঁহার যে-সকল অনুভূতি লাভ হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহার অতি স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "বংশপরিচয়" এবং আত্মজীবনী ভিন্ন ইহা একাধারে সংগ্রামসিংহের কয়েক বৎসরের "দিন-পঞ্জি" বা Diary, আত্মচিন্তা, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, তত্ত্বানুসন্ধান এবং সাধনে অগ্রগতির ইতিহাস। সর্ব্বোপরি ইহা তাঁহার "মাতৃ-সাধনার" ক্রমিক গভীরতার পরিচায়ক একটি সুন্দর আলেখ্য। যাঁহারা আধ্যাত্মিক সাধনার আস্বাদন লাভ করিয়াছেন এবং তাহাতে অধিকতর মগ্ন হইবার পিপাসায় পিপাসিত, তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে নিজেদের অন্তরে সায় লাভ করিবেন।

"নবজীবনোপনিষদ্" তিন ভাগে বিভক্ত—"সাধন—শ্রুতি—দর্শন"। এই শ্রেণীবিভাগ অতি সঙ্গত হইয়াছে। সাধন পথের এই পথিক যে-ভাবে সাধনের ইঙ্গিত্ প্রধানতঃ ধ্যানযোগে লাভ করিয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে সাধনে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাই এই গ্রন্থের একটি বিশিষ্ট অংশ। ইহা ইহার সাধন" পর্য্যায়। কিন্তু এই রহস্তপূর্ণ, নিভৃত পরিবেশে তিনি বারে বারে বাণী শ্রবণ করিয়াছেন—ইহা "শ্রুতি" পর্য্যায়। পুনশ্চ,

বাণী শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সাধন পথের এই পথিক যে সকল অলৌকিক এবং অভিনব দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাহা ইহার "দর্শন" পর্যায়। গ্রন্থভুক্ত বিষয়গুলি এ-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে এ-তিন বিভাগই গ্রন্থে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

স্নেহাস্পদ সংগ্রামসিংহের "সাধনা" প্রধানতঃ "মাতৃ-সাধনা"। দেখিতেছি যে তাঁহার সাধনার বিশেষত্ব যে ইহা কেবল "মাতৃরূপদর্শন" বা "মাতার পূজা বা অর্চনা বা স্তবগান" নহে—ইহা পরমজননীকে একটি অতি সত্য, জীবন্ত এবং উজ্জ্বল ব্যক্তিরূপে দর্শন করিয়া, তাঁহার সহিত সন্তানের সাক্ষাৎ কথোপকথন। কখনও সন্তান মাতাকে তাঁহার কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন নিবেদন করিয়া মাতার নিকট হইতে মীমাংসা বা নির্দেশ লাভ করিতেছেন; কখনও বা মাতা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া সন্তানকে নির্দেশ-দান করিতেছেন। সুতরাং ইহাকে "মাতা-সন্তানের" আলাপ বা প্রসঙ্গ বলা যাইতে পারে।

"নবজীবনোপনিষদের" দ্বিতীয় অংশ "শ্রুতি"। মাতৃসাধনায় ব্যাপৃত হইয়া সাধক বারে বারে যে বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাহাই অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহার নিজস্ব বা কল্পিত কিছু নাই—যাহা তিনি "শ্রবণ" করিয়াছেন, যন্ত্ররূপে তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। "বাণীশ্রবণ" সকল ধর্মসমাজেই স্বীকৃত এবং কোনো সাধক যদি তাঁহার উপাস্যের বাণী শ্রবণ করেন, তাহা অন্য সাধকগণ স্বতঃই স্বীকার করিবেন। কিন্তু "বাণীশ্রবণ" যে-অর্থে গ্রহণীয়, তাহা সাধকের "অন্তরে" উপাস্য দেবতার স্পর্শ, অনুপ্রেরণা কিম্বা ইঙ্গিতের প্রকাশ, বাহিরের কোনো "বাক্য" বা "ধ্বনি" নয়। সাধকেরা এবং ভক্তেরা এই "অন্তরের অনুভূতিকে" মানবীয় ভাষায় প্রকাশ করেন মাত্র।

কিন্তু "নবজীবনোপনিষদের" একটি প্রধান অংশ "দর্শন"। এস্থলে "দর্শন" Philosophy অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, ইংরাজিতে ইহাকে

Visions বলা যাইতে পারে। দেখা যায় যে সংগ্রামসিংহ নানা স্থানে, নানা সময়ে, নানা ঘটনাসূত্রে এই Vision-গুলি দেখিয়াছেন। এই "দর্শনের" মধ্যে পরিচিতদের, অপরিচিতদের এবং মহাপুরুষদের অনেককে তিনি "দেখিয়াছেন" এবং তাঁহাদের সহিত কথোপকথনও করিয়াছেন; কেবল তাহা নহে, "কালীমূর্তিও" তিনি দর্শন করিয়াছেন। আবার কেবল যে দেখিয়াছেন, তাহা নয়—সাক্ষাৎভাবে বাক্যালাপও করিয়াছেন। এমন কি, অনেক সময়ে উপাসনার মধ্যেও এই প্রকারের Visions তাঁহার মানসচক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে।

এরূপ Visions যাহাদের মানসচক্ষে উদিত হয়, তাঁহারা নিজেরা ইহা অবিশ্বাস করিতে পারেন না, কারণ এগুলি তাঁহাদের নিকট অতি সত্য এবং সংশয়হীন—সাধারণ লোকের নিকট বাহিরের জগৎ যেমন সত্য, এ সকল Vision তাঁহাদের নিকট তেমনই সত্য—অন্যেরা বিশ্বাস করুক বা না-করুক। দেখা যায় যে পাশ্চাত্যদেশের দার্শনিক Sweden দেশের Emmanuel Swedenborg পরলোক সম্বন্ধে এই রূপ Visions দেখিতেন এবং তাহাতে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের জগতে যেমন নানা বস্তু, ব্যক্তি এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ আমরা দেখিতে পাই, ইন্দ্রিয়াতীত জগতেও অবিকল সেই প্রকার বস্তু, ব্যক্তি এবং পরিবেশ আছে। অন্য কোনো দার্শনিক এরূপ Vision-এর সাক্ষ্য দিয়াছেন কি না, কিম্বা তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, আমার জানা নাই। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে যিনি এইরূপ দৃশ্য দর্শন করেন তাহা তাঁহার অন্তরের সুপ্ত এবং অলক্ষিত চিন্তা এবং অনুভূতি যাহা তাঁহার অবচেতন বা Sub-Conscious স্তরে রহিয়াছে, তাহার একটি মানসিক চিত্র বা Projection বলিয়াই অনুমান করা যায়। যাহা হউক, এ-বিষয়ে আমার বলিবার কিছু নাই, কিম্বা আমার মতামত প্রকাশ করা অনুচিত।

অনেক বিষয়ে স্নেহের সংগ্রামসিংহের অনুভূতি এবং মতবাদের সহিত আমার মতভেদ আছে। তাঁহার সাধনের মধ্যে Traditional সাধনার বা প্রচলিত সংস্কারের প্রাধান্য সহজেই লক্ষিত হয়। সে-সকল আলোচনা করিবার স্থান ইহা নয়, কিন্তু সাধন বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত আমার পূর্ণ যোগ আছে এবং তাহা সকলেরই সাধন-সহায় হইবে বলিয়া আমি মনে করি। "নবজীবনোপনিষদে" কেবল যে উপরিউক্ত তিনটি উপাদান আছে, তাহা নয়—সাধন পথের এই পথিকের নিষ্ঠা, আগ্রহ, ঐকান্তিকতা এবং সাধনপিপাসা পাঠককে আকৃষ্ট করিবে। উপরন্তু, তাঁহার গভীর চিন্তা, নিরপেক্ষ এবং ক্ষমাহীন আত্মবিশ্লেষণ (Self-Examination), উপাস্য দেবতায় দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি উচ্ছল ভক্তি—এ-সকলই লক্ষ্যের এবং প্রনিধানের বিষয়। সুতরাং পুনরায় বলা যাইতে পারে যে গ্রন্থখানি সত্যই স্নেহের ভ্রাতার "জীবন বেদ"। এই কারণে মনে হয়, প্রকৃত সাধনার্থীদিগের নিকট ইহা উপাদেয় হইবে। বিশেষ করিয়া যে সাধনার ইতিহাস এখানে আমরা পাই, তাহাতে একটি সুস্পষ্ট ধারা দেখা যায়—ইহা ক্রমশঃ অধিকতর সত্য, উজ্জ্বল এবং গভীর হইতেছে। এই গ্রন্থখানি এই ইতিহাসের "প্রথম পর্ব" সুতরাং এ ধারা এখনও শেষ হয় নাই। একটি বিষয়ে আমি আশা এবং আনন্দ লাভ করিয়াছি যে এই গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায় যে সংগ্রামসিংহ ক্রমেই গভীরতর অনুভূতি লাভ করিতেছেন, উন্নততর আধ্যাত্মিক স্তরে উপস্থিত হইতেছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে পরমজননী কোনো একটি মহান্ উদ্দেশ্যের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিতেছেন। এই মহান্ উদ্দেশ্য তাঁহার জীবনে সাধিত হউক এই আমার একান্ত কামনা। দেবতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কলিকাতা

১-৩-৬২

নিরঞ্জন নিয়োগী।

বংশ পরিচয়

ক

বঙ্গের প্রাচীন নৃপতি মহাত্মা আদিশূর কান্যকুব্জ হ'তে যে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে এনেছিলেন তার মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয় মহামতি সুষেণাচার্য্য মহাশয়ের বংশে আমার পিতা শ্রীমদ্ শশিভূষণ দেবশর্ম্মন (তালুকদার) মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সুষেণাচার্য্য থেকে ভক্তিভাজন পিতৃদেব পর্য্যন্ত ৩৭ পুরুষ অতিবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এই বংশের উপাধি এবং অবস্থিতি স্থানের বহু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এঁর বংশধরগণ আচার্য্য, মৈত্রেয়, ওঝা, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন। পিতৃদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ পূর্ব্ববঙ্গের সিরাজগঞ্জ জিলার দোগাছী গ্রামে স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করার পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার অধীন টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত তেঘরী গ্রামে বাস করেন। সেখানে তাঁরা ভট্টাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তারপর এঁর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতা মহাত্মা রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় দোগাছী গ্রামে আসেন। এঁর পুত্র মহাত্মা কালিকা প্রসাদ তালুকদার (দোগাছী গ্রামে ভূসম্পত্তি লাভ করে ইনি তালুকদার উপাধিতে ভূষিত হন)। মহাত্মা কালিকা প্রসাদের পুত্র শ্রীমৎ কৃষ্ণকুমার ও কৃষ্ণকুমারের পুত্রগণ—শ্রীমদ্ দ্বারকানাথ, সীতানাথ, দীননাথ, দুর্গানাথ ও মাধবচন্দ্র ও তিন কন্যা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দ্বারকানাথ পরবর্ত্তীকালে তন্ত্রবাগীশ উপাধিতে ভূষিত হ'য়েছিলেন। এঁর লিখিত "তত্ত্বজ্ঞান তরঙ্গিণী" একটি উচ্চ তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। শ্রীমৎ কৃষ্ণকুমার একজন অতি উদার প্রকৃতি সম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পত্নী শ্রীমতী দয়াময়ী দেবী অতি তেজস্বিনী, অতিথি পরায়ণা ও পরমা সতী রমণী ছিলেন।

শ্রীমদ্ দ্বারকানাথ তন্ত্রবাগীশ একজন অতি উচ্চস্তরের তান্ত্রিক ছিলেন। এই মহাত্মার জন্ম হয় ১২২৯ সনের অগ্রহায়ণ মাসে ময়মনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর উপবিভাগের অধীন শ্যামপুর গ্রামে। এঁর মাতামহ শ্রীমৎ কালীচরণ ভট্টাচার্য্য একজন সুবিখ্যাত গৃহী তপস্বী ছিলেন। তিনি তন্ত্রানুসারে দীর্ঘকাল শবসাধনাদি কঠোর সাধন করেছিলেন। ইঁহার প্রতি মা জগজ্জননীর আদেশ হ'য়েছিল "তোর সন্তানের সন্তান আমার দর্শন পাবে"। এই আদেশ তাঁর দৌহিত্র পরিবারে বিশেষভাবে ধর্ম্মভাব ও সাধন প্রবৃত্তি সঞ্চার করেছিল। শ্রীমদ্ দ্বারকানাথ আনুমানিক ১২৫৭ সনে জেলা সিরাজগঞ্জ অধীন এড়াগুহ নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীমদ্ পদ্মলোচন তালুকদার মহাশয়ের কন্যা পূজনীয়া ইচ্ছাময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। দ্বারকানাথ দুর্গা নামের বিশেষ প্রিয় ছিলেন। তাঁর সত্যে নিষ্ঠা, আত্মসম্মান বোধ ও ধর্ম্মভাব আদর্শ স্থানীয় ছিল। ইনি অনেক অলৌকিক গুণের অধিকারীও ছিলেন। দ্বারকানাথ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাএকাদশী তিথিতে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। দ্বারকানাথের চার পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তার মধ্যে দুইজনের অতি শৈশবেই মৃত্যু হয়। ত্রৈলক্য ভূষণের ১৬।১৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব শ্রীমদ্ শশিভূষণ তালুকদার ও আমার পিসিমাতা বিন্দুবাসিনী দেবী পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন। বিন্দুবাসিনী দেবীর বিবাহ হয় শ্রীমদ্ শ্যামসুন্দর বাগচী মহাশয়ের সহিত। শ্যামসুন্দর ১৯২৪ খৃঃ টাঙ্গাইলে আমাদের বাড়ী "আশাকুটিরে" সজ্ঞানে ইষ্ট আরাধনা করতে করতে দেহত্যাগ করেন। বিন্দুবাসিনী ১৯৩৭ খৃঃ কাশীতে দেহ রক্ষা করেন।

আমার পিতা শ্রীমদ্ শশিভূষণ একজন উচ্চস্তরের সাধক ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। এঁর জীবনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, সাধনা ও ন্যায় নিষ্ঠার পর্য্যালোচনা করবার ক্ষমতা আমার নাই। ব্রহ্মর্ষি ও সাধু বলতে যা বুঝায় শশিভূষণ সেই জীবন অবলম্বন ক'রে সংসার ধর্ম্ম পালন করে গেছেন। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলিত হ'লে তখনকার কালে ঐরূপ

বিবাহ সমাজে অনুষ্ঠিত করা এক মহাদুরূহ ব্যাপার ছিল। শশিভূষণ নিজ জীবন বিপন্ন ক'রে আত্মীয় পরিজনের বহু প্রকার বাধা নিষেধ উপেক্ষা ক'রে কয়েকটি বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শুধু বিবাহ সম্পন্ন করেই ক্ষান্ত থাকেন নাই অধিকন্তু ওই সব বিবাহিত পরিবারের অর্থ সংস্থান ও পুত্র কন্যাদের শিক্ষা দীক্ষার সকল ভার নিজে বহন করে গেছেন। গোঁড়া সনাতন শাক্ত পরিবারে ও পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেও নিজে একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। নয় বৎসর বয়সে উপনয়নের পর আমিষ ভোজন ত্যাগ করেন। শাক্ত ধর্ম্ম অনুযায়ী পূজা পার্ব্বণে ছাগ বলীতে তিনি কোনও দিন উপস্থিত থাকতেন না। এইরূপ অনুপস্থিতির জন্যে তাঁকে পিতৃব্য শ্রীমদ্ দীননাথের নিকট ও অন্যান্য গুরুজন দিগের নিকট বহুতর লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'য়েছে। তিনি ১৬ বৎসর বয়সে তাঁর পিতৃদেবকে হারাণ। একান্নবর্ত্তী পরিবারে পিতৃব্য দীননাথের তত্ত্বাবধানে ওকালতি পাশ করে ২১ বৎসর বয়সে কৃতদার হন। আমার মাতৃ-দেবীর বয়স তখন ৯ বৎসর মাত্র। দীননাথ ছিলেন আদর্শ গৃহস্থ ও ধর্ম্মপ্রাণ। তিনি অতিশয় তেজস্বী ও দক্ষ জমিদার ছিলেন। জীবনে কখনও কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই। একাধিকবার নানা কারণে ইংরেজ মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধেও দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন। প্রতি বৎসর দুর্গা পূজা উপলক্ষে কর্ম্মস্থল টাঙ্গাইলের বাসা বাড়ী থেকে সগ্রামে (দোগাছী গ্রাম, সিরাজগঞ্জের অধীন) পূজার সামগ্রী নিয়ে বজরা নৌকায় যাতায়াত করতেন। তিন তিন বার ঝড়ে নৌকাডুবি হ'য়ে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ যমুনা নদীতে দুর্গা নামের গুণে তাঁর প্রাণ রক্ষা হ'য়েছে। তিনি দুর্গার উপাসক ছিলেন ও গভীর ভক্তি সহকারে দুর্গানাম জপ করতেন। টাঙ্গাইলে মোক্তারী ব্যবসায়ে যশ ও অর্থ সমভাবে লাভ করে গেছেন। ,বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে তখন আত্মীয় অনাত্মীয় মিলে প্রায় ৫০।৬০ জন লোক দীননাথের বাসায় আহার করতেন। কিন্তু আহারের উপকরণ সকলের জন্য একই প্রকার ছিল।

আমার মাতৃদেবীর নিকট শুনেছি যে তাঁর বিবাহের কিছুদিন পরে এই

বৃহৎ পরিবারের রন্ধনের দায়িত্ব তাঁর উপরে পড়ে। ভাত রাঁধিবার হাঁড়ি এত বৃহৎ ছিল যে সে হাঁড়ি সামাল দেওয়া তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল। অথচ নূতন বৌ বলে বাড়ীর অন্য কারুর সঙ্গে তাঁর কথা বলাও নিষেধ ছিল। কিন্তু দীননাথের দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে তিনিই বধূমাতার এই সঙ্কটে বাড়ীর অন্য মহিলাদের আদেশ করতেন "যাওতো দেখগে, বৌমা বোধ হয় ভাতের হাঁড়ি ধরে বসে আছেন"। আমার পিতা টাঙ্গাইলেই পিতৃব্যের বাসায় থেকে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রায় ৪।৫ বৎসর তিনি সেখানেই থাকেন। তারপর নিকটেই একটি বাড়ী ক্রয় করে পিতৃব্যের সম্পূর্ণ অনুমতিতে পৃথক থাকবার ব্যবস্থা করেন। এই বাড়ীতে চলে আসবার পর থেকে আমার পিতার ব্যবসায়ে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি হয়। অজস্র অর্থাগম হতে থাকে। কিন্তু চির বৈরাগীর মনে অর্থ কোনও রূপ বিকার আনতে সমর্থ হয় নাই। অর্থ তিনি স্পর্শ করতেন না। বাড়ীতে মাংস প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নয় বৎসর বয়সে আমিষ ভোজন ত্যাগ করে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সকল প্রকার হিংসা পরিত্যাগ করে পবিত্র জীবন, প্রগাঢ় ঈশ্বর বিশ্বাস ও নির্ভরের দ্বারা অতিবাহিত করে গেছেন। ওকালতি ব্যবসায়ে কখনও মিথ্যা মামলা গ্রহণ করেন নাই। যে পক্ষ অবলম্বন করতেন সেই পক্ষের জয় সুনিশ্চিত ছিল। ব্রহ্মদর্শন লাভ করে ব্রহ্ম সমর্পিত জীবন ন্যায়, নীতি ও নিষ্ঠার দ্বারা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যাপন করে গেছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রবর্ত্তিত নববিধান ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অনুরক্ত হ'য়ে যখন সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তখন তিনি ভীষণ বাধা ও বিপর্য্যয়ের ভিতরে পতিত হন। তাঁর পিতৃব্য এই ব্যাপারে তাঁর প্রতি এত ক্ষিপ্ত হন যে সকল প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে আমার পিতার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তারপর জীবনে বহুতর পরীক্ষার ভিতরে পতিত হয়েছেন। একমাত্র ভগবৎ বিশ্বাসেই সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। এমন বিশ্বাসের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও তিতিক্ষা আর কারুর জীবনে দেখেছি বলে মনে হয় না। তাঁর রচিত "শ্রীশ্রীহরিলীলা রসামৃত সিন্ধু" (১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত ও তৃতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত) পৃথিবীর

সকল সাধু ও ভক্তদের জীবন, আদর্শ, প্রচার ও বিশ্বাস সরল কবিতায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপ, সাধনের বিভিন্ন পন্থা, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বিশ্বাস, নির্ভর, দয়া, প্রেম ও বৈরাগ্য দ্বারা জীবনে ঈশ্বর সাধনের নানা পথের সন্ধান ও নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁর সংস্কৃত গ্রন্থ "নবতত্ত্বামৃতম্" ঈশ্বর প্রমুখাৎ শ্রবণে লিখিত। এই গ্রন্থখানি একটি উচ্চস্তরের ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক সংস্কৃত কবিতায় লিখিত। এ ছাড়াও অনেক সাধু ভক্তদের জীবন, ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ, কবিতা, ব্রহ্ম উপাসনার পদ্ধতি ইত্যাদি যন্ত্রস্থ করার অভাবে রয়ে গেছে। আমার পিতা ১৮৫৮ খৃঃ আষাঢ় মাসে তাঁর মাতুলালয়ে সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত এড়াগুহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৯২৮ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর টাঙ্গাইলে নিজ বাড়ী ''আশা-কুটীরে" সজ্ঞানে ব্রহ্ম নাম শুনতে শুনতে দেহত্যাগ করেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন মৃত্যু আসন্ন তখন তাঁকে এই কবিতাটি উচ্চারণ করতে শুনেছি :

"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,
ওভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।"

তাঁর মৃত্যুর সময় আমরা ভ্রাতা ভগ্নিগণ সকলেই ছিলাম। একমাত্র আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস তালুকদার মহাশয় বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়তে গিয়েছিলেন। আমার পিতার স্বাস্থ্যের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা জানিয়ে তাঁকে তার করা হয়। তখন তাঁর পরীক্ষা সমাপ্ত হ'য়েছে। কিন্তু তখনকার সময় বিমানে যাতায়াতের সুবিধা ছিল না। সেই জন্যে তাঁকে জাহাজে দেশে ফিরতে হয়। পিতার মৃত্যুর প্রায় একমাস পরে তিনি দেশে পৌছান। তাঁকে দেখবার জন্য আমার পিতার সেই সময়কার প্রতীক্ষা ও আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। অলৌকিক শক্তির দ্বারা প্রায় সাত দিন তিনি মৃত্যুকে বাধা দিয়েছিলেন। ৬ই ডিসেম্বর সকালে বললেন, "আর আমি মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না, তোমরা সব প্রস্তুত হও।" পাঁচ টাকার রসগোল্লা আনতে বললেন ও সকলকে বিতরণ করতে বললেন। সকলকে নানা উপদেশ

দিয়ে সন্ধ্যা ঠিক ৬টার সময় হরিনাম গান ও মাতৃস্তোত্র শুনতে শুনতে মহাপ্রয়াণ করলেন।

আমার জননী সাধ্বী ও আদর্শ ব্রহ্ম কন্যা শ্রদ্ধেয়া শরৎ কামিনী দেবীর ১৮৭০ খৃঃ চৈত্র মাসে ঘোড়াচড়া গ্রামে (জিঃ সিরাজগঞ্জ) জন্ম হয়। এঁর মাতা সতী সাধ্বী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী ও পিতা শ্রীমদ্ মহেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দেবী মনোমোহিনীর পিতা স্বর্গীয় লোকনাথ মুস্তকী ও মাতা সতী সাধ্বী শ্রীমতী দুর্গা সুন্দরী দেবী। স্বর্গীয় লোকনাথ বগুড়া জেলার বর্দ্ধন কুটীর রাজার দেওয়ান ছিলেন ও সেইখানেই তাঁর বসবাস ছিল। লোকনাথ ও দুর্গাসুন্দরী উভয়েই ছিলেন আদর্শ গৃহস্থ, ধর্ম্মপ্রাণ ও সত্যনিষ্ঠ। দুর্গাসুন্দরী পরমা সুন্দরী ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন। তাঁর কোনও পুত্র সন্তান ছিল না। দেবী মনোমোহিনীই একমাত্র কন্যা। দুর্গা সুন্দরী স্বামীর মৃত্যুর পর কন্যা মনোমোহিনীর গৃহে ঘোড়াচড়ায় এসে বাস করেন। এই মহিলার সত্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতা ও নির্ভিকতা একপ্রকার ওই অঞ্চলে জনপ্রবাদের মত হ'য়েছিল। জামাতা মহেশচন্দ্র সুপুরুষ, সঙ্গীতজ্ঞ ও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। মহেশচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শ চরিত্র সুবিদিত ছিল। মহেশচন্দ্র অকালে পরলোক গমন করেন। দেবী মনোমোহিনী মাত্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে দুইটি অপগণ্ড শিশু কন্যা সম্বল করে বিধবা হন। জ্যেষ্ঠা দেবী হেমাঙ্গিনী (৪ বৎসর) ও কনিষ্ঠা দেবী শরৎ কামিনী (২ বৎসর)। মহেশচন্দ্র মৃত্যুর সময় পত্নীকে আদেশ করে যান "তুমি আমার এই ভিটা ধরে থাকবে, না হ'লে কষ্ট পাবে। আমার দুই কন্যা রইল, এদের সৎপাত্রে বিবাহ দেবে। কোনও রূপ কন্যাপণ নেবে না। প্রতিবেশী দেবর পলাশ লোচন ভৌমিকের সহিত বিবাদ করিওনা।" দেবী মনোমোহিনী স্বামীর এই নির্দ্দেশ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করে গেছেন। পল্লীগ্রামে একজন অষ্টাদশ বর্ষীয়া পরমা সুন্দরী যুবতী বিধবার পক্ষে আজীবন পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন ও জীবনের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে শেষ পর্য্যন্ত নিষ্কলঙ্ক জীবন

অতিবাহিত করা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। হিন্দু নারীগণের এই ধর্মনিষ্ঠা পতিভক্তি ও সতীত্ব জগতে অতুলনীয়। দেবী মনোমোহিনী সর্ব্বদা সংসারের কাজে নিযুক্ত থাকতেন ও অন্যদিকে ব্রত, সন্ধ্যাজপ, ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়মিত পালন করতেন। দেবী মনোমোহিনী জীবনে অনেক শোকের আঘাত পেয়েছেন। প্রথম তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার পুত্র বিজয়চন্দ্রের মৃত্যু হয়। তারপর জামাতা শ্রীমদ্ রাজকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, তারপর দৌহিত্রী দুইটি এবং সর্ব্বশেষে তাঁর স্নেহের কন্যা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী পরলোক গমন করেন। দেবী হেমাঙ্গিনী মৃত্যুর সময় দুই পুত্র রেখে যান। জ্যেষ্ঠ শ্রীবিনোদকৃষ্ণ ও কনিষ্ঠ বিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। বিনয়কৃষ্ণ প্রায় ২৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। শ্রীযুক্ত বিনোদকৃষ্ণ ভগবানের কৃপায় সুস্থ আছেন। দেবী মনোমোহিনী ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ৮ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে পরলোক গমন করেন। শ্রীযুক্ত বিনোদকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র ও তিন কন্যা। এঁর স্ত্রী পরলোকগতা।

আমার জননী শ্রীমতী শরৎকামিনী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণা। আমার পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সকল আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়কার সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির ভিতরে সকল বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনের তীব্র বাধা ও সমালোচনা উপেক্ষা ক'রে একা স্বামীর সঙ্গে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশ গ্রহণ করাতে অসম্ভব মনোবলের ও ধর্ম্মের প্রতি একান্ত নিষ্ঠার উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন। এর পরে বহুদিন আমাদের পরিবার নানা সামাজিক নির্যাতন সহ্য করেছে। এঁর জীবনে এক অদ্ভূতপূর্ব্ব চুম্বক শক্তি আছে। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকেই ইনি নানা পরিচর্য্যার ভিতর দিয়ে এমন সম্মোহিত করেন যে, যে একবার এঁর সংস্পর্শে এসেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে ও তাঁকে ভুলতে পারে নাই। আমার পিতার জীবনে গভীর ঈশ্বর সাধনার শক্তি ও প্রেরণা আমার মাতার জীবনে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। আমার মাতা আদর্শ গৃহিনী ও আদর্শ সাধিকা। চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, সত্যে নিষ্ঠা, কর্ম্মে আনন্দ, ভগবানে ভক্তি, নিয়মিত দেহচর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্য পালন,

সংসারে প্রতিটি কর্ত্তব্য সম্পাদন করবার ঐকান্তিকতা, নিয়মিত উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীত ইত্যাদি সকলের সমন্বয়ে আমার জননীর জীবন এক মহিমাময়ী আদর্শ চরিত্রে রূপান্তরিত হ'য়েছে। নবম বৎসর বয়সে এই সংসারে প্রবেশ করেছেন, এখন প্রায় ৮৮ বৎসর। এই দীর্ঘ ৭৯ বৎসর একভাবে সংসার ও ধর্ম্ম সাধন একযোগে করে চলেছেন। অভ্যাগত এলে এখনও পঞ্চ ব্যঞ্জন দিয়ে আহারে যেমন তাঁকে তৃপ্ত করেন, তেমনি সুমিষ্ট সঙ্গীত ও মধুর ভক্তিভাবে আপ্লুত ঈশ্বরোপসনায়ও তাঁকে তৃপ্ত করেন। সুন্দর সুন্দর গল্প, হাসি ইত্যাদিতেও সকলের সঙ্গে সমভাবে মিশে মহানন্দ পরিবেশ করেন। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ মন ও সম্পূর্ণ নিরলস। কর্ম্মে অত্যন্ত ক্ষিপ্র অথচ প্রত্যেকটি কাজ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। কোনও কাজ ফেলে রাখা তাঁর জীবনে কোনও দিন দেখি নাই। অপরকে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়ে নিজে এত তৃপ্তি লাভ করেন যে এরকম দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল। আমার পিতার জীবিতকালে আমাদের বাড়ীতে আত্মীয় ও অনাত্মীয় মিলে প্রায় ১২।১৪ জন ছাত্র স্কুল ও কলেজে পড়তেন। এঁদের সঙ্গে নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতি ব্যবহারের কোন পার্থক্য ছিল না। সকলে একসঙ্গে বসে সমভাবে একই অন্নব্যঞ্জন আহার করতে হ'য়েছে। এঁদের ভিতরে অনেকে এখনও জীবিত আছেন ও আমার মাতৃদেবীকে দর্শন করতে মাঝে মাঝে এসে থাকেন। আমার সেজ দাদা শ্রীব্রহ্মদাস তালুকদার মহাশয়ের কাঁচড়া পাড়ার নিকটবর্ত্তী চাড়াপুলের বাড়ীতে আজ প্রায় ৭।৮ বৎসর আছেন। টাঙ্গাইলের বাড়ী ছেড়ে আসবার সময় তাঁর মন অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়ে। অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়াতে ও কলিকাতার বদ্ধ আবহাওয়ায় শরীর সুস্থ না থাকাতে ওই খানেই থাকতে ভালবাসেন। পুত্রদের ও নাতি নাতনীদের দেখবার জন্য মাঝে মাঝে অত্যন্ত অধীর হ'য়ে পড়েন। আমরা সকলে একসঙ্গে গেলে এত আনন্দিত হন যে আমাদের নানা সুস্বাদু খাদ্যে পরিতৃপ্ত করেন। সব কিছু নিজের হাতে প্রস্তুত করে নিজে পরিবেশন করেন। দেবী শরৎকামিনীর

স্মৃতি শক্তি আশ্চর্য্য। এখনও অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত, মাতৃস্তোত্র, সঙ্কটবারিণী স্তোত্র, ব্রহ্মস্তোত্র ইত্যাদি নিখুত ভাবে নিয়মিত জপ করেন। উপাসনা শেষ না করে কোনও দিন জল স্পর্শ করেন না। ইদানীং শরীর অসক্ত হওয়াতে আমরা অনুরোধ করাতে বেলা ১২ টার পূর্ব্বে উপাসনা শেষ করে আহার করেন। আমার জননীর কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ও যখন সঙ্গীত করেন তখন মনে হয় কোনও কিশোরীর কণ্ঠে সঙ্গীত শুনছি। সঙ্গীতের সুর ভাব সম্পূর্ণ অবিকৃত কণ্ঠে গাহিবার ক্ষমতা অসাধারণ। আমাদের ভ্রাতা ভগ্নিদের যে সঙ্গীতের সামান্য ব্যুৎপত্তি হ'য়েছে সে আমাদের মাতার নিকটেই। অন্যায়, মিথ্যা, অলসতা কখনও সহ্য করতে পারেন না। নিজে যা ভাল বোঝেন সেই ভাবেই চলা তাঁর চিরদিনের অভ্যাস। আমার পিতা নববিধান ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করবার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার জননীকে তিনি স্বমতে আনয়ন করতে পারেন নাই। কিন্তু যখন তিনি এই ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন তখনই দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। চরিত্রের দৃঢ়তা ও অন্যায়ের শাসন তাঁর জীবনকে সমুন্নত করেছে। অতি সামান্য বিদ্যা শিক্ষা করেছেন বলতে গেলে বলা যায় শুধু অক্ষর জ্ঞান। কিন্তু অসাধারণ উৎসাহে বিবাহের পরে নানা ভাবের বহু পুস্তক পাঠ করে সত্যিকারের জ্ঞানের অধিকারিণী হ'য়েছেন। মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদি, বঙ্কিমচন্দ্রের ও সমসাময়িক লেখকদের পুস্তক প্রায় সব তাঁর পড়া আছে। কেবল তাই নয় এখনও সেই সব পুস্তকের সকল ঘটনার বর্ণনা করা তাঁর পক্ষে অতি স্বাভাবিক। আমার জননীই আমার দীক্ষা গুরু। তাঁর জীবনের আদর্শই এই অধমের জীবনে সামান্য কিছুটা হয়ত সঞ্চারিত হ'য়ে থাকবে।

আমরা ভ্রাতাভগ্নী মিলে আটটি। জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিদাস তালুকদার, পত্নী শ্রীযুক্তা সুষমা তালুকদার। এঁদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। শ্রীমান্ অমিতাভ তালুকদার, শ্রীমতী মঞ্জুষা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসঞ্জয় তালুকদার ও শ্রীমতী জয়ন্তী সিংহ রায়। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাতে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবনের প্রভাব অনেক খানি আছে। নানা ভাবে ও নানা অবস্থাতে তাঁর পরিবারে আমি বহুদিন বাস করেছি। রেঙ্গুনে আমার ব্যবসায় জীবন তাঁর বাড়ী থেকেই আরম্ভ হয়। ইনি অত্যন্ত কর্ম্মঠ ও নিরলস। ভগবৎ বিশ্বাস ও নির্ভরের দ্বারা এঁর জীবন পরিপূর্ণ। তাঁর ভক্তিভাবে মধুর কণ্ঠে সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মোপাসনা এক মহা আকর্ষণের বস্তু। আমার সঙ্গীতের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রধানতঃ এঁর নিকট থেকেই হ'য়েছে। এঁর সঙ্গীতের ভিতর দিয়েই আমার জীবনে ক্রমে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়। ইনি অতি মিষ্ট-ভাষী সদালাপী ও সদাচার সম্পন্ন ভক্ত গৃহস্থ। এঁর পত্নী অতি স্নেহপ্রবণ, সদালাপী, নিরলস, অত্যন্ত কর্ম্মা ও আদর্শস্থানীয়া গৃহিণী।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী ভক্তিসুধা উকীল। এঁর বিবাহ হয় বিখ্যাত শিল্পী স্বর্গীয় সারদাচরণ উকীলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ উকীলের সহিত। ইনি একজন শুচীশুদ্ধা রমণী। ইনি অতি শৈশব থেকেই মাংস আহার পরিত্যাগ করেন। সংসারে ধন, সম্পত্তি যা কিছু ছিল সব পরকে দান করে সন্ন্যাসিনীর ন্যায় বাস করছেন। ভগবৎ ভক্তি ও অচলা নির্ভর এঁর জীবনকে ধন্য করেছে। এঁর এক পুত্র ও দুই কন্যা এখন জীবিত আছে। সাংসারিক সুখ বলতে যা বুঝায় তা তিনি এ জীবনে লাভ করতে পারেন নাই। সংসারে আর্থিক দুর্গতির ভিতরেও ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস এঁর জীবনকে এক মহিমাময়ী নারী চরিত্রে রূপান্তরিত করেছে। পুত্র শ্রীমান্ তারিণী চরণ উকিল, কন্যা শ্রীমতী মায়াদাস ও শ্রীমতী অঞ্জলী উকিল।

আমার মেজ দাদা শ্রীযুক্ত কালীদাস তালুকদার। এঁর জীবনেও আমার পিতা ও মাতার ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত হ'য়েছে। ইনিও অত্যন্ত কর্ম্মঠ স্বাস্থ্যবান ও সদাচার সম্পন্ন। এঁর পত্নী শ্রীমতী কল্যাণী তালুকদার একজন আদর্শ স্থানীয়া গৃহিণী। এঁদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। শ্রীমান্ আশীষ ভূষণ ও শ্রীমান্ সন্তোষ ভূষণ। কন্যা শ্রীমতী সান্ত্বনা মৈত্র ও শ্রীমতী বন্দনা তালুকদার।

আমার সেজ দাদা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মদাস তালুকদার। ইনি সদাচার সম্পন্ন, নিষ্ঠাবান্ ও কর্ম্মী। ইনি বহু বৎসর রাজনৈতিক কর্ম্মী হিসাবে বৃটিশ শাসন কালে কারাগারে ছিলেন। ইনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন আদর্শকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। অতি স্বল্প ভাষী ও সৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত। এঁর পত্নী শ্রীমতী সুপ্রিয়া বিখ্যাত দার্শনিক স্বর্গীয় শ্রীমদ্ শ্রীশ্ চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা। সেন মহাশয় লক্ষ্ণৌ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি একজন পরম ভক্ত ও দার্শনিক ছিলেন। এঁর লিখিত পুস্তক বিদ্বৎ সমাজে বিশেষ আদৃত। সুপ্রিয়া দেবী অতি সরলা, স্নেহশীলা ও সুনিপুণা গৃহিণী। এঁরা নিঃসন্তান।

আমার ছোট দিদি শ্রীমতী বিধান সুধা বাগচী। এঁর বিবাহ হয় ভক্ত স্বর্গীয় কৈলাস চন্দ্র বাগচী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সহিত। অতুল চন্দ্র সরকারের কার্য্য-ব্যপদেশে উত্তর প্রদেশেই বসবাস করছেন। বিধান সুধার জীবন অতি সুশৃঙ্খল, ভগবৎ বিশ্বাসে ও নির্ভরে পরিপূর্ণ। এঁর কণ্ঠ অতি সুমিষ্ট ও সঙ্গীতে ইনি বিশেষ পারদর্শিনী। এঁদের দুই পুত্র ও চার কন্যা। কন্যা শ্রীমতী গীতা ভট্ট, বিনীতা চৌধুরী, গায়ত্রী সেন ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বাগচী। পুত্র শ্রীমান্ জয়ন্ত বাগচী ও সুবীর বাগচী।

এই অধমের জন্ম হয় ১৩ই আষাঢ় (২৭শে জুন ১৯০৮ খৃঃ) টাঙ্গাইলে। ১৯৪৩ খৃঃ ভাগলপুর নিবাসী স্বর্গীয় সাধু শ্রীমদ্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কল্যাণীর

সহিত আমার বিবাহ হয়। শ্রীমতী কল্যাণী অতি সুনিপুণা গৃহিণী। ভগবৎ বিশ্বাস ও নির্ভর এর জীবনকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। ইনি অত্যন্ত কর্ম্মঠা ও নিরলস। এঁর মাতা শ্রীমতী হৈমবতী চট্টোপাধ্যায় একজন উচ্চস্তরের সাধিকা। উপযুক্ত দুই পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে যে গভীর ধৈর্য্য, ভগবৎ বিশ্বাস ও নির্ভরের পরিচয় ইনি দিয়েছেন তা অভূতপূর্ব্ব। এঁর জীবন ঈশ্বর সমর্পিত। আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুমন্ত্র ১৯৪৪ খৃঃ ৩রা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করে। কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রিমা ১৯৪৬ খৃঃ ৪টা আগষ্ট ও কনিষ্ঠ শ্রীমান্ রাহুল ১৯৫০ খৃঃ ২০শে এপ্রিল জন্ম গ্রহণ করে। আমার জীবনে এদের অবির্ভাব ভগবানের মহান্ করুণা।

আমাদের কনিষ্ঠা সহোদরা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী চট্টোপাধ্যায় অতি আদর্শ গৃহিনী। এঁর বিবাহ হয় আমার শ্যালক শ্রীযুক্ত সুশান্ত কুমারের সহিত। কিন্তু গত ২৭শে অক্টোবর ১৯৫৯ খৃঃ এক বাস দুর্ঘটনায় এঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। সুশান্ত কুমার একজন আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। এঁর সরল ও অনাড়ম্বর জীবন দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিল। এঁর মৃত্যুতে আমার শ্বশুর বাড়ীতে এক মহাশোকের আঁধার নেমে আসে। এঁর মৃত্যুর প্রায় ৬ বৎসর পূর্ব্বে আমার মধ্যম শ্যালক শ্রীমান শ্রীশান্ত হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে পরলোক গমন করেন। আমার অনুজা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ীর জীবন এক মহা পরীক্ষার জীবন। বিবাহের পরে শ্বশুর বাড়ীর অনেক দায়িত্ব তাঁর উপর বর্ত্তায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নিরলসভাবে সকলের সেবা করে চলেছেন। অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্রের নারী হয়েও স্নেহশীলা ও কর্ম্মা। ভগবৎ বিশ্বাস, নির্ভর ও ভক্তি এর জীবনকে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। এর একমাত্র সন্তান কন্যা শ্রীমতী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের এক ভগ্নী শ্রীমতী পুণ্যসুধা অকালে পরলোক গমন করেন।

ভগবান শশিভূষণের পরিবারকে রক্ষা করুন এই প্রার্থনা।

জীবন সূত্র

আমার আধ্যাত্মিক জীবনের মূল সূত্র আমার পিতা ও মাতার ধর্ম্ম জীবন, ঈশ্বর বিশ্বাস, ন্যায় ও নীতির প্রতি নিষ্ঠা। আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষদিগের সাধনলব্ধ বীজ আমার জীবনে অঙ্কুরিত হ'য়েছে। অনেক অনেক বিদেহী আত্মাগণ সময় সময় আমার চারিদিকে সমবেত হ'য়ে আমার সাধন লক্ষ্য করেন। আমার যখন ১৯ বৎসর বয়স তখন আমার পিতা পরলোক গমন করেন। এই সময় পর্য্যন্ত যদিও নিত্য উপাসনা, সঙ্গীত ও নানা ধর্ম্ম চর্চ্চার ভিতর দিয়ে আমার জীবন অতিবাহিত হ'য়েছে, তবুও আমার জীবনে ধর্ম্মে নিষ্ঠা ও ন্যায়ের পথ লাভ হয়নি। পিতা মৎস ও মাংস আহার করিতেন না। কিন্তু পরিবারে মৎস আহারে তাঁর সম্মতি ছিল। কিন্তু মাংস আহার আমাদের নিষিদ্ধ ছিল। আমি প্রায় ১৯।২০ বৎসর পর্য্যন্ত লুকিয়ে মৎস্য শিকার করেছি। একবার ১৯২৪ খৃঃ আমাদের বাড়ীর নিকটে কুস্তির আখড়ায় কয়েকজন বন্ধু মিলে ভোজনের ব্যবস্থা হয়। একটি ছাগ শিশুকে আমরা নিজ হস্তে বলি দিয়ে সেই মাংস দ্বারা সকলে ভোজনে প্রবৃত্ত হই। হঠাৎ আমার পিতা সেখানে এসে উপস্থিত হন ও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আমরা কি আহার করছি। আমরা ভয়ে কিছুক্ষণ কোনও উত্তর দিতে পারি নি। কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করি ও মৎস্য আহার করছি এই উত্তর দিই। এতে আমার পিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হন ও বলেন যে একটা পাপের কার্য্য ঢাকবার জন্যে আর একটা জঘন্যতম অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করছি। পিতার নিকট মিথ্যা বলা অতীব অন্যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করেন। সন্ধ্যা বেলায় পারিবারিক উপাসনার সময় আমাকে নির্দ্দেশ দিলেন, ঈশ্বরের কাছে এই অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করতে। আমারও মনে ততক্ষণ অত্যন্ত অনুশোচনা হয়েছে এবং আমি চোখের জলে প্রার্থনা করলাম। এতে পিতা খুব প্রীত হ'লেন। একবার একটি পক্ষীকে তীর দ্বারা হত্যা করি।

আমার মাতা দেখতে পান এবং এর জন্যে অত্যন্ত তিরস্কার করেন এবং পিতাকে এ বিষয়ে জানান। সন্ধ্যা বেলায় পারিবারিক উপাসনায় আমাকে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়। কিন্তু জীবনে ধর্মের উন্মেষ যাকে বলে তা' আমার জীবনে তখন পর্য্যন্ত হয় নি। পিতাকে আমি সত্যিকারের ভয় করতাম এবং তাঁকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতাম। আমার মাতার সঙ্গে আমার যোগ অতি সরল ও গভীর ছিল। মা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, আমার অনেক অন্যায় কার্য্যের জন্যে পিতার বিরুদ্ধতা করে আমার পক্ষ অবলম্বন করতেন। মাতার সঙ্গে আমার এই যে যোগ এ ক্রমে অতি গভীর হ'তে থাকে। আমার ১১ বৎসর বয়সে অতি কঠিন রোগ হয়। রৌদ্র বৃষ্টিতে মৎস্য শিকার করেই এই ব্যাধির উৎপত্তি হয়। সেই সময় আমার মাতা আমাকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে শিক্ষা দেন ও নিয়মিত সেই মন্ত্র জপ করতে নির্দ্দেশ দেন। অষ্টম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অঙ্কতে অকৃতকার্য্য হই। নবম শ্রেণীতে উঠবার কোনই আশা রইল না। পিতা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বললেন যদি তিনি বিবেচনা করেন যে আমি উক্ত বিষয়ে পরিশ্রম করলে উন্নতি করতে পারব তবে যেন আমার বিষয় বিবেচনা করেন। আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রীমৎ প্রিয়নাথ বিশ্বাস একজন অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ, সদাচার সম্পন্ন নীতিবান্ আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। আমার পিতাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমাকেও অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমাদের পরিবারের প্রতি তাঁর একটা অহেতুক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ ছিল। তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি ওই বিষয়ে উপযুক্ত পরিশ্রম করবার প্রতিজ্ঞা করতে রাজি আছি কিনা। আমি তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করি। এর পর আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র দাস আমাকে অঙ্কে অনেক সাহায্য করেন ও টাঙ্গাইলের ব্রহ্ম মন্দিরে নির্জ্জনে প্রার্থনা করতে আরম্ভ করি। অতি আশ্চর্য্যের কথা নবম শ্রেণীতে প্রথম পরীক্ষায় অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয়ে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি করি এবং চতুর্থ স্থান অধিকার করি। এতে

প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও আমার পিতা অত্যন্ত সুখী হন। এর পর থেকে প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার অন্যান্য সমপাঠীদের আমার আদর্শ গ্রহণ করতে বলতেন। এর পর থেকে প্রতিদিন রাত্রে নিদ্রা যাবার পূর্ব্বে শুয়ে গায়ত্রী মন্ত্র ১৬ বার ও আমার নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী নানারূপ ধ্যানের মন্ত্র ও জগতের সকলের মঙ্গল কামনা করে নিদ্রা যেতাম। এ সব পদ্ধতি বা উপাসনা হ'তে অনেক সময় বিচ্যুত হ'য়েছি সত্য কিন্তু এ ভাবে প্রতিদিন করতে চেষ্টা করতাম। আমার পদ্ধতি ছিল এইরূপ—গায়ত্রী জপ ১৬ বার। তারপর বলি তোমায় যেন কখনও অবিশ্বাস অভক্তি না করি ৩ বার, আত্মীয় স্বজন ও বৈষয়িক জিনিষ পত্র গুলি শ্রীহরির দোহাই দিয়ে বাঁধিতাম, তারপর জয় দুর্গা দুর্গতি নাশিনী ১০ বার; বিপদ ভঞ্জন ও দারিদ্র ভঞ্জন দয়াল হরি ১০ বার; জয় দয়াময় হরি ১০ বার; তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি দাও, জীবন্ত জ্বলন্ত বিশ্বাস দাও ও গভীর নির্ভর দাও—৩ বার, তুমি আমায় কৃতকার্য্য কর—প্রেমে, পুণ্যে, জ্ঞানে, ধনে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে, ব্যবসায় বানিজ্যে, স্বাস্থ্যে, বিত্তে, সহায় সম্পত্তিতে, মানে, সম্ভ্রমে বিদ্যায় বুদ্ধিতে শুদ্ধতায় পবিত্রতায় আমার জীবনকে কৃত কার্য্য কর; তারপর ধ্যানের মন্ত্র, শুদ্ধ, সত্য, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক, পুণ্যময়ী জ্ঞানময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী, মহাশক্তিময়ী মহাচৈতন্যময়ী মা দুর্গা মা ব্রহ্মময়ী তুমি আমার ভিতরে আছ—৩ বার; আমাকে শুদ্ধ কর, সুখী কর, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক কর, স্বাস্থ্যবান কর অর্থবান কর, জ্ঞানবান্ কর ও ব্যক্তিত্ববান্ কর—৩ বার তারপর আত্মীয় স্বজন, রোগী, শোকী, শত্রু মিত্র ইহলোক পরলোকবাসী সকলের মঙ্গল কামনা করে মার সহায় নিয়ে নিদ্রা যেতাম। সকালে নিদ্রা ভঙ্গে কখনও দুর্গা নাম জপ করতাম কখনও বা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতাম। বহুদিন এইভাবে করেছি ও করছি। রেঙ্গুনে থাকতে বোমা পড়বার সময় রাত্রে স্বপ্নে দেখতাম যেন বোমা পড়ছে। লোকজন সকলে ভয়ে পালাচ্ছে ও বহুলোক হতাহত হ'য়েছে'। যা স্বপ্নে দেখেছি তাই পরে প্রত্যক্ষ করেছি। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪১ খৃঃ সকাল ১০টায় বোমা বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। আফিস থেকে সকলে আমরা আমাদের ৪৯

ষ্ট্রীটের বাসাতে এসে আশ্রয় নিয়েছি। এ বাড়ীটি নূতন হওয়াতে পাড়ার অনেক মহিলা ও ভদ্রলোক এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। একএকটা বোমা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ী ভীষণ কম্পিত হ'তে লাগল; ঘরের দেওয়ালের ছবি-গুলি পড়ে সব ভেঙ্গে যেতে লাগল এবং সকলে ভয় পেয়ে সিড়ি দিয়ে নীচে নামতে চেষ্টা করলেন। আমি পথ আগলিয়ে সিড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। কাউকে রাস্তায় নামতে দিলাম না। সকলে আমাকে অত্যন্ত অনুযোগ করতে লাগলেন যে আমিই তাঁদের মৃত্যুর কারণ হব। আমি পথ ছেড়ে দিলে তাঁরা সকলে দৌড়ে নিকটে একটি পাঁচতলা বাড়ীতে আশ্রয় নিতে পারেন। অনেক অনুনয়ের পর আমি তাঁদের বললাম যে আপনারা কেউ নামতে চেষ্টা করবেন না। আমি নিজে দেখে আসি যদি সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় তা'হলে আপনাদের সকলকে সেখানে নিয়ে যাব। আমি রাস্তায় নেমে ডালহৌসি ষ্ট্রীটের সামনে গিয়ে অবস্থাটা দেখতে যেই অগ্রসর হ'য়েছি অমনি সেই সময় কতগুলো টেলিফোনের বিক্ষিপ্ত তারে আমার ডান পা খানি এমনি ভাবে জড়িয়ে গেল যে আমার আর সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া হলোনা। সেই মুহূর্ত্তে কে যেন আমার অন্তরে স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "আর অগ্রসর হ'য়োনা"। আমি দ্রুতপদে ফিরে আমাদের বাসা বাড়ীর সিড়িতে উঠতে না উঠতেই যেখানে আমার পা তারে জড়িয়ে গিয়েছিল ঠিক সেখানে একটি বোমা পড়ল। সেই পাঁচতলা বাড়ীর উপরেও অনেক বোমা পড়ে সে বাড়ী প্রায় ধ্বংশ হ'য়ে গেল। সেখানে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের ভিতরে অনেকে হতাহত হ'লেন। চারিদিকে আগুন আর আগুন। বাহিরে যাবার রাস্তা প্রায় বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দয়াল নাম স্মরণ করলাম ও দেখলাম আবর্জ্জনা ফেলবার যে গলি আছে সেই গলির মুখে দরজাটা খোলা। সকলকে বললাম আমাকে অনুসরণ করতে। আমার বন্ধু প্রবর শ্রীযুক্ত সুশীল বন্ধু মজুমদারের স্ত্রী ও কন্যা (তখন মাত্র দুই বৎসরের) আমার বাসা বাড়ীর সামনের বাড়ীতে থাকতেন। তাঁরাও আমার বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মজুমদার মহাশয় তখন আপিসে।

কন্যা খুকুকে কাঁধে নিয়ে মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রীকে বললাম আমার অনুসরণ করতে। এভাবে সকলে স্পার্ক ষ্ট্রীটে এলাম। অন্যান্য সকলে যে যার মতন নিজ নিজ নিরাপদ স্থানে চলে গেলেন। আমরা দুর্গাবাড়ীর সামনে একটি মোটর ট্রাক পেলাম। কিন্তু সেটা বিকল হয়ে পড়ায় দ্রুত সামনের দিকে চলতে লাগলাম। কিছুদূর গিয়ে একটি রিক্সা গাড়ী পাওয়া গেল। সেই রিক্সাওয়ালাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করে তাতে উঠে দাদার বাড়ী লেক এভেনিউতে গেলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহরের উপকণ্ঠে এই গৃহ স্থাপন করেছিলেন। এই সময় সর্ব্বক্ষণ মাথার উপর দিয়ে বিমানগুলি মেশিনগান চালাতে চালাতে প্রায় ৫০০ শত ফুট নিম্ন দিয়ে ভীষণ বেগে উড়ে যাচ্ছিল। বহু লোক এই মেসিনগানের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে। দয়াময় রক্ষা করলেন। রেঙ্গুন হ'তে আসবার পথে বহুবিধ বিপদ হ'তে তিনি আমাদের সকলকে পরম জননীর ন্যায় স্নেহাঞ্চল দিয়ে রক্ষা করেছেন। তাঁর দয়ার শেষ নাই। ভক্ত শশিভূষণের পরিবারকে নিরাপদে টাঙ্গাইলে নিয়ে এলেন। সেবার টাঙ্গাইলের ব্রহ্ম মন্দিরে বার্ষিক উৎসব খুব জমাট হল। শ্রীমদ্ খড়্গ সিংহ ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রেমাদিত্য ঘোষ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমদ্ বিধুভূষণ বসু, দাদা, মেজদাদা, ছোট দাদা, দিদি, জামাইবাবু (শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ উকীল) মা, জ্যোতির্ম্ময়ী সুশান্ত ইত্যাদি সকলে মিলে উৎসব করলাম। এত বিপদের পরে মনে অপার আনন্দ ও শান্তি পেলাম। এরপর কলিকাতায় আমার অবস্থান। জাগ্রত অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করলে কে যেন আমাকে নানা মনোরম স্থানে নিয়ে যেতেন। কখনও মনোরম উদ্যান, সুন্দর বন, সুদৃশ্য গৃহ ইত্যাদি দেখা যেন আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ব্যাপার হ'ল। স্বপ্নে উপাসনা, উৎসব, কীর্ত্তন হচ্ছে দেখতাম। আমার পিতাকে ও অনেক মৃত ভক্তদের উপাসনারত অবস্থায় দেখতাম। কীর্ত্তনে আমার নিজেকে প্রায়ই দাদার সঙ্গে দেখতাম। এইভাবে দিন চলতে লাগল। এসব দর্শনকে খুব বেশী বিশেষত্ব দিতাম না। মনে একটু একটু ভাব হ'ত বটে কিন্তু তেমন কিছু বুঝতে

পারতাম না। ১৯৫২ খৃঃ একদিন রাত্রে আমার নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী জপ ও প্রার্থনা শেষ করে নিদ্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় আমি অনুভব করলাম যে একটি বিরাট ছায়া মূর্ত্তি আমাকে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। ঘোর অন্ধকারে চারিদিক ব্যাপ্ত, নিম্নে ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল মহাসমুদ্র, আমি মহাশূন্যে উড়ে চলেছি একলা। নিকটে সেই ছায়া মূর্ত্তিটি আছেন কিন্তু তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। আমার সঙ্গে যে তিনি আছেন এ প্রত্যয়ে মন কিন্তু নির্ভয়। তিনিও আমার সঙ্গেই উড়ে চলেছেন। দূরে দেখলাম সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বাভাসের মত আলোকিত হ'য়েছে। হঠাৎ সেইখানে এসে অবতরণ করলাম। স্থানটি অতি মনোরম, পুষ্পোদ্যানের মত। চারিদিকে শান্ত ও মধুর পরিবেশ। দক্ষিণ দিকে একটি শ্বেত পর্ব্বত অতি উচ্চ ও তার কোলে অতি-সুন্দর একটি স্থান। সেখানে মধ্যস্থলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র একটি পরিষ্কার শ্বেত ধুতি ও একটি চাদর পরে বসে আছেন। তাঁর চারিদিকে অনেক ভক্তবৃন্দ বসে আছেন। আমার পিতা চক্ষু মুদ্রিত করে বসে আছেন। একটু দূরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আছেন। ব্রহ্মানন্দের অনেক ভক্তবৃন্দ যাঁদের আমি কখনও দেখিনি, তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। কে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পেলাম না। কিন্তু সেই বিরাট ছায়ামূর্ত্তি যে পরোক্ষে থেকে আমাকে চালিত করছেন ও তাঁর সাহায্যেই যে এখানে এসেছি সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত। প্রশ্ন করলাম, এ আমি কোথায় এলাম? উত্তর হোল "এ স্বর্গ কিন্তু উত্তম স্তর নয় নিম্ন স্তর।" আমি প্রশ্ন করলাম, কেশবচন্দ্র এত বড় জীবন্মুক্ত ভক্ত ছিলেন, তিনি কেন স্বর্গের নিম্ন স্তরে আছেন? উত্তর পেলাম "হ্যাঁ, সত্যি, তিনি আমার দর্শন পেয়েছেন, কিন্তু যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর উপর নির্ভর করেছিলেন, তাঁরা তাঁর কোনও কার্য্যের জন্যে অন্তরে আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর জন্যে ব্রহ্মানন্দ আংশিক দায়ী এবং সেই জন্যে এখনও স্বর্গের নিম্ন স্তরে আছেন।" আবার প্রশ্ন করলাম,

পরমহংসদেব তবে এখানে কেন? "হ্যাঁ সত্য, তিনি মহাযোগী ছিলেন, আমাকে নানা ভাবে সাধন করে পেয়েছিলেন। তিনি একজন মহা উন্নত সাধু। কিন্তু তিনি সংসারে থেকে বিবাহিত জীবনকে উপেক্ষা করেছিলেন। সাধ্বী পত্নীর অন্তরের আন্তরিক কামনাকে উপেক্ষা করেছিলেন, সেই জন্য স্বর্গের নিম্নস্তরে আছেন"। আবার প্রশ্ন করলাম, শ্রীরবীন্দ্রনাথ এত মহান্ প্রেমিক ও বিশ্বরূপে তোমাকে দর্শন করেছিলেন, তিনি কেন এখানে? উত্তর এল, "তাঁর সত্যি আমার দর্শন লাভ হয়েছিল, তিনি মহাসাধু ছিলেন। কিন্তু তাঁর জমিদারী কার্য্যব্যপদেশে অন্যায়ভাবে অনেক সরল মানবের প্রাণে ব্যথা দিয়েছিলেন তার জন্য তাঁর এখানে অবস্থান।" তারপর কি ভাবে আমি সেখান থেকে চলে আসি তার কিছুই জানিনা।

তারপর একদিন ২৩৬ এ, রাসবিহারী এভিনিউয়ের বাসা বাড়ীতে ছাদের ঘরে সন্ধ্যা বেলায় বসে ধ্যান ও জপ করছি হঠাৎ দেখতে পেলাম যে আমার সামনে বিরাট্ কালীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। অতি হাস্যময়ী মূর্ত্তি, কণ্ঠে শ্বেত পুষ্পের মালা। চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় সে মূর্ত্তি দেখে আমি আত্ম বিস্মৃত হ'য়ে 'মা মা' বলে ডেকে উঠ্‌লাম। কিন্তু পরক্ষণেই বললাম, আমি নিরাকার বাদী, সাকার কালী মূর্ত্তি আমার সামনে কেন? আমি বিশ্বাস করি না। সেইক্ষণে সেই মূর্ত্তি যেন আমার উপলব্ধিকে তীব্রভাবে জাগ্রত করলেন এবং যেন তীব্র ভাষায় বললেন, "বিশ্বাস করিস না? এই দেখ,"। এই বলে সেই মূর্ত্তি আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেলেন। আমি যেন মন্ত্রাবিষ্টের মত সেই অন্ধকারের দিকে অন্তরের দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলাম। আমি যেন সম্মোহিত ও আবিষ্ট। অল্পক্ষণ পরে দেখি সেই অন্ধকার আস্তে আস্তে জমাট্ বেঁধে আবার সেই মূর্ত্তিতে আমার সামনে আবির্ভূতা হ'লেন। আবার বললেন "চেয়ে দেখ্" তখন আমাকে দিব্য নেত্র দান করেছেন। সেই নেত্রে দেখছি সেই মূর্ত্তি যেন অতিশয় স্বচ্ছ, সেই মূর্ত্তির ভিতর দিয়ে আমি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অগণিত নক্ষত্র খচিত মহাকাশ অবলোকন করলাম। তারপর বললেন, "দেহী

আমাকে দেখতে হ'লে দেহের রূপেই দেখতে পায়, তা না হ'লে দেহীর পক্ষে আমাকে দেখা সম্ভব নয়। তোমার জীবনে পর পর আসছে সাধন, পরিপূর্ত্তি ও বিকাশ, প্রস্তুত হও।" এই বলে মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে অন্তর্হীতা হ'লেন। বুঝলাম সাকার নিরাকার সব একাকার।

তারপর স্বর্গীয় সাধু শ্রীমদ্ বেণীমাধব দাস মহাশয়ের নাতি স্নেহের শ্যামল মাত্র অষ্টম বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর শ্রাদ্ধের উপাসনায় যোগ দিচ্ছি। বুড়োদা (শ্রীমদ্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) সঙ্গীত করছেন ও শ্রীমদ্ সাধু দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় উপাসনা করছেন। আমি উপাসনায় প্রথম দিক থেকেই গভীর ভাবে মগ্ন হয়েছি। হঠাৎ দেখি শ্যামল একটি শ্বেত পর্ব্বতের উপরে উঠছে। তাঁর সঙ্গে একজন কেউ আছেন তাঁকে সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছিনা। অনুভবে শ্রদ্ধেয় বেণী বাবুর মত মনে হ'ল। সেই শ্বেত পর্ব্বতটি যেন সেই পর্ব্বত যার কোলের উদ্যানে ব্রহ্মানন্দ, পরমহংসদেব, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি সকলে বসে ছিলেন। আজ কিন্তু আমার দৃষ্টি ব্রহ্মানন্দদিগের উপরে নিবদ্ধ ছিলনা। আমার একাগ্র দৃষ্টি শ্যামলের চলার উপর নিবদ্ধ। সে চলতে চলতে পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে এসে আর যেতে চাইল না। তাঁর সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁর হাত ছাড়িয়ে সে সেই শিখর দেশে পা দুটি ঝুলিয়ে বসে পড়ল ও বলল "আমি উপাসনা দেখব"। আমি দেখলাম আমরা সকলে উপাসনায় বসে আছি। ঠিক আমাদের উর্দ্ধে আর শ্যামল যেখানে বসে আছে তার জায়গাটা যেন সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে যেমন শ্বেত আভা হয় তার চাইতেও অনেক বেশী আভাযুক্ত একটি শ্বেত পর্ব্বত। সে যেন সঙ্গীত ও উপাসনা উপভোগ করছে। সে তার পা দুটো দুলিয়ে, হাত তালি দিয়ে উপাসনা সম্ভোগ করল। আমি সম্পূর্ণ উপাসনায় এই দেখলাম। উপাসনার দু' একটি কথা আমার কানে এসেছে মাত্র।

এর প্রায় এক বৎসর পরে আমার বন্ধুপ্রবর ও শ্যালক শ্রীশ্রীশান্তর ১৬ই সেপ্টেম্বর ১০৫৩ খৃঃ সকাল পৌনে নয় টায় মৃত্যু ঘটে। ১৫ই অর্থাৎ তার আগের

দিন সকলেই ভাল আছেন জেনে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গিয়েছি। হঠাৎ প্রায় রাত্রি ৩॥০ টার সময় শ্রীশান্তর ঠাকুর দাদা স্বর্গীয় সাধু হরিনাথ বাবুকে আমার বাসার ছাদের উপরে একটি ডোরা কাটা আলোয়ান গায়ে পায়চারী করছেন এই স্বপ্ন দেখলাম। আমার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। আর নিদ্রা হোল না। আমার মনের ভিতরে একটা অস্বস্তি হ'তে লাগল। আমি ভাবলাম যে সব ভাইরা এক সঙ্গে আছে সেই অবস্থায় শ্রীশান্ত আলাদা বাড়ী ভাড়া করে আলাদা হ'তে চলেছে, তা' হয়ত তার পিতা অর্থাৎ আমার শ্বশুর মহাশয়ের অন্তরের ইচ্ছা নয়। সেটা যাতে না হয় তার জন্য এ-স্বপ্ন একটা আভাস মাত্র। কিন্তু মন উদ্বেগ শূন্য হ'লো না। আমি বিছানা ছেড়ে দাঁত মাজবার একটা উপযুক্ত নিমের ডাল নিয়ে ছাদে গিয়ে "মা জগতজননী, বিশ্বজন বন্দিনী," এই গানটি খুব ভাবের সঙ্গে গাইতে লাগলাম। প্রায় ছয়টা আন্দাজ আমার ছোট শ্যালক শ্রীদেবব্রত এসে ছল ছল চোখে আমাকে জানাল যে শ্রীশান্তর থম্বসিস্-আক্রমন হ'য়েছে, গত কাল রাত্র প্রায় নয়টায়। ডাক্তার তাকে atrophine-morphine দিয়ে রেখেছে। তার জীবন সংশয় অবস্থা। আমি তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে কিছু জলযোগ করে আমার শ্বশুর বাড়ী গিয়ে দেখি শ্রীশান্ত ঘুমাচ্ছে। আমার শাশুড়ী ঠাকরুন তার শিয়রে বসে আছেন। তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আমার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হ'ল না। এ-কথা শাশুড়ী ঠাকুরুনকে বললাম তাতে তিনি বললেন "ও ঘুমালে ওরকম নাক ডাকে, অস্বাভাবিক নয়—"। সেই সময় ডাঃ জীতেন বসু মহাশয় এলেন এবং পরীক্ষা করে বললেন "He is 75%. out of the wood" তবে Immediately Cardeograph করা দরকার। আমরা সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লাম। শ্রীশান্তের স্ত্রী কল্যাণীয়া সুচিত্রা আমাকে বললেন "ঘরে Cash টাকা নাই আপনি শিগ্‌গির প্রস্তুত হ'য়ে Lloyds Bank থেকে Cheque ভাঙ্গিয়ে ৫০০৲ টাকা নিয়ে ডাঃ পি, কে, সেনকে সঙ্গে নিয়ে আসুন Cardeograph করবার জন্য।" আমি নীচে গিয়ে গ্যারেজে আমার গাড়ীর তেল ও জল পরীক্ষা করে বাড়ী গিয়ে দাড়ি কামিয়ে

স্নান করে যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল পরিপাটি করছি তখন নীচতলা থেকে আমার স্ত্রীর চিৎকারে বুঝতে পারলাম যে শ্রীশান্ত চলে গেল। আমি সেই অবস্থায় দৌড়ে গেলাম। গায়ত্রী জপ করতে করতে দৌড়াচ্ছি। সেই সময় সর্ব্বক্ষণ আমার মনে Ferrum Phos দিলে হতো এই ভাব আসতে লাগল। কিন্তু যখন আমি পৌছলাম তখন সব শেষ। আমি তাকে কোলে জাপটিয়ে ধরে তার বুকে ও মাথায় হাত বুলাতে লাগলাম। সকলকে ঘর হ'তে বাইরে যেতে বললাম ও গায়ত্রী মন্ত্র বলতে লাগলাম। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা এইভাবে করবার পর আমার শরীর অবসন্ন হ'তে লাগল এবং আমি নিজে ভয় পেলাম। মনে হলো শুনলাম "আর কোনও আশা নাই"। আমি বাইরে এলাম। এর পর ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীশান্তের বিবাহের বাৎসরিক দিনে তার শ্বশুর মহাশয় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তার ঘরে উপাসনা করছেন। আমরা অনেকে তার ঘরের সামনের বারাণ্ডায় বসে উপাসনায় যোগ দিচ্ছি। তার ঘরের দরজার কাছে বারাণ্ডায় একটা আসন কে যেন পেতে রেখেছিলেন। আমি গভীর ভাবে উপাসনায় যোগ দিচ্ছি। কিন্তু আমার হঠাৎ যেন কি হলো। আমি দেখলাম শ্রীশান্ত সেই আসনে সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবী পরে আমার সামনে বসে উপাসনায় যোগ দিচ্ছে। উপাসনা শেষ হ'য়ে গেলেও আমি চক্ষু মুদ্রিত করে এই দৃশ্য দেখছি। হঠাৎ সে উঠে পড়ল। আমি মনে মনে জিজ্ঞাসা করলাম কেন সে উঠল। সে বলল "বসেছিলাম কিন্তু (শ্রীশান্ত অনেক সময় তার মাকে হৈমদি বলে ডাকত) হৈমদির সহ্য হোল না, আসনটা দেখলে না উঠিয়ে নিয়ে গেল। "আমি আর থাকব না, ওই খানে উপাসনা আছে।" এই বলে দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডার খোলা জায়গাটা দিয়ে উর্দ্ধদিকে চলে গেল। যেখানে গেল সে জায়গাটা একটা বিরাট্ পাহাড়ের উচ্চ শিখরের একটু নীচে একটা Platau। এ বারের পাহাড়টা কিন্তু কালো। কিন্তু যেখানে উপাসনা হ'চ্ছে সেখানটা আলোকিত ও আশে পাশে কালো। সেখানে শ্রীশান্তর দিদি মা ও ঠাকুর দাদা তাকে নিয়ে উপাসনায় বসলেন। "চির নবীন শিব সুন্দর হে,

প্রাণেশ থেক প্রাণে" এই গানটি তার দিদিমা গাইছিলেন। তারপর আমি যেন আমাতে ফিরে এলাম। চক্ষু মেলে দেখি যে আসনটি সেখানে নাই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আসনটা কে নিয়ে গেল। আমার শাশুড়ী ঠাকরুন বললেন তিনি নিয়ে গেছেন। এর দু'তিন দিন পরে আমার মনে গভীর ক্ষোভ হ'ল। কেন এমন অসময়ে লোকের মৃত্যু হয়? প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেলাম। "তাম্র শাসন দেখেছিস্?" আমি বললাম না। বললেন "তাম্র শাসন হ'ল তাম্রের পাতের উপরে লেখা। সে লেখা বহু বৎসর মাটির নীচে থাকলেও বের করে ঘষলে তার লেখা জ্বল জ্বল করে ও স্পষ্ট দেখা যায়। স্বর্গেও আত্মার মালিন্য জন্মে, অর্থাৎ বিষয়ের স্পৃহা হয়। সেই বিষয় স্পৃহাতে আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয় সংসারে। যে মুহূর্ত্তে আত্মার মালিন্য ক্ষালন হয় সেই মুহূর্ত্তে তাকে স্বস্থানে ফিরে যেতে হয়।"

আমার মনে আছে সে দিন ভাদ্র মাসের চতুর্দ্দশী তিথি, ছিরুর শ্রাদ্ধের দু'দিন আগে। জ্ঞানাঞ্জনদা অতি সুন্দর উপাসনা করছিলেন ও আমার উপর সঙ্গীতের ভার। আরাধনার সময় আমি মগ্ন হয়েছি। দেখি সেই শ্বেত পর্ব্বত, সেখানে ব্রহ্মানন্দ তাঁর ভক্তবৃন্দদের নিয়ে বসে আছেন। সেই পর্ব্বতের দক্ষিণ দিক দিয়ে যেন একটা রাস্তা (গেরুয়া রংএর রাস্তা) বহুদূর পর্ব্বতটিকে ঘিরে চলে গেছে। সেই রাস্তা দিয়ে বহুলোক খোল কর্ত্তাল সহকারে কীর্ত্তন করতে করতে এই দিকে আসছে। যখন প্রায় কেশবচন্দ্র যেখানে বসে আছেন সেখানে আসল তখন ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর সকল ভক্তবৃন্দ উঠে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কীর্ত্তনে মেতে গেলেন। অদ্ভুত কীর্ত্তন। হরিনামের কীর্ত্তন। আমার কানে কীর্ত্তনের সুর ভেসে আসতে লাগল। যেন খুব নিকটে জমাট্ কীর্ত্তন শুনছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি ব্যাপার? উত্তর এল "আজ চৈতন্য দেবের মহা-সন্ন্যাস।" পরে আমি দু'একজন বৈষ্ণবদের জিজ্ঞাসা করেছি যে চৈতন্যদেবের মহাসন্ন্যাস গ্রহণের দিন ও তারিখ কি? তাঁরা বলেছেন, "মাঘ মাসে"। কিন্তু আমি যা শুনেছি তা' নিশ্চয়ই সত্য। হয়ত সেই দিন ভাদ্র মাসের

চতুর্দ্দশী তিথিতেই তাঁর মনের ভিতর মহাসন্ন্যাসের ভাব প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল।

প্রায়ই আমি দেখতাম একটা বিরাট্ চক্ষু আমার দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অন্ধকার মন্থন করে সেই চক্ষুর উজ্জ্বলতা আমাকে বিস্মিত করত। একদিন রাত্রে নিয়মিত উপাসনার পরে ঘুমাবার পূর্ব্বে দেখি একটি প্রকাণ্ড অগ্নিময় মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি উপবেশন করে আছেন। সকল শরীর যেন অগ্নিময়। গেরুয়া কাপড় জামা পরা যেন বৌদ্ধ ভিক্ষুর মত। জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? উত্তর হ'ল "মহাত্মা বুদ্ধদেব।" "ইনি সকল শ্রেষ্ঠ ভক্তদের ভিতরে একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত।" জিজ্ঞাসা করলাম আজ পর্য্যন্ত যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের ভিতরে শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে এবং কে স্বর্গের সর্ব্বোচ্চস্তরে আছেন? উত্তর হোল "শিব, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও চৈতন্য। ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও এঁদের স্থান স্বর্গের সর্ব্বোচ্চ স্তরে।"

একদিন দেখি একটি সমুদ্রবেলা দিগন্ত বিস্তৃত। উষার শ্বেত আলোকে উদ্ভাসিত দিগন্ত দেখা যাচ্ছে। সেই সমুদ্রবেলায় একটি যোগী ধ্যানে বসে আছেন। তাঁর শ্মশ্রু-বিলম্বিত মুখমণ্ডল, জটাজুটধারী। জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি বাল্মীকি। সেখান হ'তে অনেকটা বামে একটি সুন্দর পর্ণ কুটির। সেই কুটিরের এক পাশে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ অতিশয় পল্লব বেষ্টিত ও সুন্দর। সেই বৃক্ষের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে শ্রীরবীন্দ্রনাথ দু'বাহু বিস্তার করে পশ্চিম গগনের দিকে উর্দ্ধ নেত্রে সঙ্গীত করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কোথায়?" উত্তর হ'ল "স্বর্গের চতুর্থ স্তর—।" সেকি? সেদিন রবীন্দ্রনাথকে নিম্নস্তরে দেখলাম আজ আবার চতুর্থ স্তরে দেখছি কেন? উত্তর হ'ল, "হাঁ, উন্নতি হ'য়েছে।"

একদিন দেখি একটি উন্মুক্ত জায়গা। সেখানে অনেক বৃক্ষ আছে। চারি-দিকে শ্বেত পর্ব্বত শ্রেণী আছে। লোকে লোকারণ্য। একটি শ্বেত পাথরের বেদীতে উপবেশন করে আছেন একজন উজ্জ্বল দর্শন বৃদ্ধ। কেশ ও শুশ্রু

সকল সম্পূর্ণ পক্ক। সামনে একটি শ্বেত পাথরের বেদী। জিজ্ঞাসা করলাম, "একি?" উত্তর হ'ল, "গুরু নানকের জন্মদিন।" উপাসনা করছেন গুরু নানক নিজে। বহু সাধু সমাগম হয়েছে। পাশে একটা ছোট গাছে হেলান দিয়ে খালি গায়ে এক জাঙ্গিয়া পরে ছিরু (শ্রীশান্ত) দাঁড়িয়ে আছে। আমি ছিরুকে জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি এখানে কেন?" সে বলল "দিদিমা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন।"

আর একদিন আমার চরম বিস্ময়ের দিন। সেদিন দেখি আমি একটি জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করে এমন একটি জ্যোতির্ম্ময় লোকে এসেছি যে সেখানে আমাকে ঘিরে শতশত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কি একটা উৎসব করছেন। তাঁরা সকলে মিলে আমাকে একটা শ্বেত উচ্চ বেদীর উপরে বসিয়ে দিয়ে আমার গলায় শ্বেত পুষ্পের মালা পরিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, "এই তোমার দীক্ষা হোল, এইবার পৃথিবীতে যাও"। তারপর আমার আর কিছু মনে নাই। পরে অন্ধকার দেখেছি।

একদিন দেখি রাত্রে উপাসনার পরে কে যেন আমাকে একটি গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে এল। একটা বড় মেটো রাস্তা। সেই রাস্তা থেকে একটি ছোট রাস্তা, তার দুই পাশে বাঁশ ঝাড়, আম গাছ ইত্যাদি অনেক গাছ থাকাতে রাস্তাটি অত্যন্ত ছায়াযুক্ত। গাছের পাতা পড়ে ও বর্ষার জলে-কাদায় রাস্তাটি বেশ বিশ্রী রকমের। এই রাস্তার পাশে যে বাড়িটি সেটি আধুনিক কালের নয়। তিনখানি আলাদা আলাদা ঘর। একখানি দক্ষিণদ্বারী, একখানি পূর্ব্বদ্বারী ও একখানি পশ্চিমদ্বারী। একটা ছোট উঠান এই তিন খানি ঘরের মাঝখানে আছে। ঘরের কোনায় কোনায় তুলসীর ও অন্যান্য ছোট ছোট গাছের গুচ্ছে ভরা। ঘরগুলির ভিত্ খুব উচু ও সামনের বারান্দার মোটা মোটা পাকা থাম, দেখে অন্তত দু'শ বছরের আগের আমলে যেমন ঘর তৈরী করা হোত তেমনি বলে মনে হ'ল। পূর্ব্বদ্বারী ঘরে একটি পূজারী বসে পূজা করছেন বলে মনে হ'ল। পূজারীটির পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাচ্ছি।

লম্বা, বর্ণ গৌর, গলায় পৈতা আছে। তিনি পশ্চিম দিকে মুখ করে পূজা করছেন। সামনে তার একটা চতুর্দ্দোলায় একটি বিগ্রহ, কি বিগ্রহ তা দেখতে পাচ্ছি না। খুব নিবিষ্ট মনে পূজা করছেন। চতুর্দ্দোলার সামনে দুই দিকে দু'টো পিতলের পিলসূজ-এর উপরে তৈল মল্লিকায় বাতি জ্বলছে। অনেক রকমের ফুল আছে চতুর্দ্দোলার সামনে। পূজার সমস্ত উপকরণ সাজানো আছে সামনে। একটি ভদ্রলোক বাঁ পাশে বসে আছেন। তাঁর গায়ের বর্ণ কালো, খালি গা। একটা সাদা ধুতি পরে আছেন। বুকে কাঁচা পাকা চুল, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, বেশ স্থূল দেহ। একটি উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের মহিলা লাল পেড়ে সাড়ী পরে এসে গলায় আঁচল দিয়ে ডান দিক থেকে হাটু গেড়ে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কোন জায়গা? উত্তর হোল, "ওই পূজারী তুমি ছিলে পূর্ব্ব জন্মে, নিঃসন্তান, ওটি তোমার পূর্ব্ব জন্মের স্ত্রী আর ওটি পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী।" একটি বৃদ্ধা ঝি উঠানে দাঁড়িয়েছিল। এর কিছুদিন পরে হালিসহরে ভক্ত-রাম-প্রসাদের ভিটে দেখতে যাই। ভক্ত-রামপ্রসাদের ভিটের পিছনে যে বাড়ীটা আছে তার সঙ্গে আমার ওই দেখা বাড়ীর আশ্চর্য্য মিল দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হই। Photograph তুলে নিয়ে আসি। সেই বাড়ীতে যাঁরা এখন থাকেন তাঁদের একজনের সঙ্গে একটু কথা হোল। আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে জানলাম শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে পূর্ব্বদ্বারী ঘরটি এখনও পূজার ঘর ও তাঁদের গৃহ দেবতার সেখানে নিত্য পূজা হয়। প্রতিদিন রাত্রে উপাসনা পর আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ত। আমি বিগ্রহের মুখ দেখতে অত্যন্ত ব্যাকুল হই। কিন্তু কিছুতেই দেখতে পাই না। ১৯৫৪ খৃঃ ছিরুর মৃত্যু বাৎসরিকের দিন শ্রদ্ধেয় নিরঞ্জন দা উপাসনা করছেন আর বাণীদিরা সঙ্গীত করছেন। আমি মগ্ন এবং সেই খানে নীত হয়েছি। অনেক চেষ্টা করছি বিগ্রহের মুখ দেখতে কিন্তু কিছুতেই দেখতে পাই না। হঠাৎ আমার বাঁ দিকে একটি বিগ্রহ দেখা দিলেন বালক বেশে। গায়ের বর্ণ ঘন

শ্যাম ; নীলবাস পরিধানে। আজানুলম্বিত শ্বেত পুষ্পের মালা গলায়। হাতের তালু ও পা দু'খানি রক্তিম রংয়ে রঞ্জিত। প্রায় ৩।৪ সেকেণ্ড তাঁকে দেখলাম।

তারপর কিছুদিন আমি একটি জায়গায় নীত হ'তাম। সে জায়গাটি খানিকটা ছোট ছোট কাঁশ ক্ষেত পার হ'য়ে একটা বটগাছের নীচে। সারা জায়গাটি চেঁছে ঘাস পরিষ্কার করা হ'য়েছে। পশ্চিম দিকে একটা নদী, উত্তর দিকে একটা বড় বটগাছ আরও অনেক গাছ আছে। জায়গাটি ছায়াযুক্ত ও সুশীতল। এখানে একটি ছোট ঘর আছে। তার ভিত্ খুব নীচু ও মাটির। ঘরটি বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। ঘরটির পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিকেই খোলা বারাণ্ডা আছে। ছোট মাটির এক ধাপ সিড়ি। এই ঘরে দক্ষিণ মুখে দাঁড়িয়ে এক কালী মূর্ত্তি। তাঁর যে নিত্য পূজা হয় তার নিদর্শন তাঁর পদতলে অনেক ফুল বেলপাতা ইত্যাদি জমা আছে। মূর্ত্তিটির গলায় শ্বেত পুষ্পের মালা আজানুলম্বিত। প্রায়ই আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ জায়গাটি যে কোথায় অনেক প্রশ্ন করেও জানতে পারিনি। আমার কিন্তু মনে হয় দক্ষিণেশ্বরের প্রাচীন কালের বিগ্রহ ও স্থানটি দক্ষিণেশ্বর। একদিন ব্রহ্ম মন্দিরে উপসনায় বসে নিমগ্ন হয়েছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটি উচ্চ পর্ব্বত পূর্ব্ব দিগন্তে। সেই পর্ব্বতের শিখরে একটি অভূত পূর্ব্ব সুন্দরী জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি। অমন ভুবন ভোলানো রূপ আমি জীবনে কখনও কল্পনা করতে পারিনি। মাতৃমূর্ত্তির শুধু অর্দ্ধেকটা দেখতে পাচ্ছি। আর অর্দ্ধেকটা যেন সেই পর্ব্বত, কটি দেশ থেকে। সেই পর্ব্বতের পাদদেশে মায়ের কৃষ্ণপদ যুগল আলতা মাখানো অতি সুন্দর। সেই পদতলে বসে উত্তর পূর্ব্ব দিকে মুখ করে এক ব্রাহ্মণ আমার দিকে পিছন ফিরে বসে পূজায় ও ধ্যানে মগ্ন। তাঁর কৃষ্ণবর্ণ দেহ। সেই মাতৃমূর্ত্তি আমি প্রায় ৩।৪ মিনিট্ দেখেছি। অনেক সাধনা করেছি আবার দেখতে, আর মা দেখা দেননি। আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেলছেন। কোথায় যাবেন ? কাঁদলে দেখা দিতেই হবে। এ আমার প্রথম থেকে তৃতীয় জন্ম ও এখন থেকে তৃতীয় জন্ম।

এর পরে কিছুদিন হোল দেখছি যে আমি একটি উলঙ্গ ছোট শিশু। আমার গায়ের বর্ণ কালো। একটা প্রকাণ্ড শ্বেত প্রান্তরে খেলা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কাঁদছি আর মাকে ডাকছি। এই প্রান্তরটি জন মানব শূন্য যেন একটি প্রকাণ্ড পর্ব্বতের উপরে তুষারাবৃত সমতলভূমি। আমি অনেকক্ষণ কাঁদবার পর একটি নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব হ'ল। তাঁর কেশদাম শিখার চূড়ার মত উপরের দিকে বাঁধা। পরিধানে একটি গরদের রংয়ের শাড়ী। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ সদা হাস্যময়ী; দেহের গড়ন যেন তন্বীতরুণী পূর্ণ যৌবনা। এসে আমাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি অমনি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর কাঁধে মুখ লুকালাম। আমাকে সস্নেহে নিয়ে গেলেন। কোথায় নিয়ে গেলেন জানিনা। প্রায়ই এই দেখি। মা মা বলে ডাকি যেন মনে হয় তাঁর কোলে বসে আছি আর আমাকে সস্নেহে আদর করছেন। পাপীর প্রতি একি ভালবাসা। এত সব সাধু ভক্ত ছেড়ে আমাকে কেন। আমার কি যোগ্যতা আছে? মাগো তোমায় ছেড়ে কোথায়ও যাব না। তুমি আমার মা যে। এ আমার দ্বিতীয় জন্ম।

বুড়োদার মৃত্যুর পর (শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত) একদিন দেখি তিনি সেই ব্রহ্মানন্দের স্থানে গেছেন। তাঁকে সকলে আদর করছেন। বুড়োদার সদা হাস্যময় মুখ। সাধু ত্রৈলক্য নাথ তাঁকে বলছেন "বুড়ো তুমি একটি গান কর"। সকলে আনন্দিত।

জ্ঞানাঞ্জন দার (শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী) মৃত্যুর পর দেখেছি যে তিনি যেন সব সময় আমার কাছে কাছে ঘুরছেন ও সদা হাসছেন। কি যেন আমাকে বলতে চাইছেন। ব্রহ্মানন্দের কাছে গিয়ে তাঁকে আনন্দ গদ্ গদ্ ভাবে প্রণাম করছেন খুব বিনীত ভাবে। ব্রহ্মানন্দ তাঁর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

একদিন দেখি আমার ঠিক উর্দ্ধে একটি জ্যোতির্ম্ময় রাস্তা। রাস্তাটির সামনের দিক অগ্নির আভাযুক্ত ও অতি দূরে শ্বেত আভাযুক্ত। রাস্তার দুই

পাশে রঙ্গমঞ্চের মতো কালো পর্দা আছে। সেই পথ দিয়ে চক্ষের পলকে বহুলোক জ্যোতির্ম্ময় দেহ নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কেহ রাস্তার মুখে ঢুকে ডান দিকে ও বাম দিকে পর্দার আড়ালে যাচ্ছেন। আর কেউ কেউ সোজা রাস্তায় চলে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের রাস্তার মুখে যেতে দেখছি। পরে কোথায় যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছিনা। সাইকেলে লোক খুব জোরে পাশ দিয়ে যেমন করে যায় এ যেন তেমনি করে চলে যাচ্ছেন উর্দ্ধে। ব্রহ্মানন্দের "পরলোকের সন্ধান" পড়লাম। তিনি বলেছেন "আত্মার একটি ছিদ্রপথ আছে তাহা দিয়ে পরলোক দেখা যায়।" তাঁর প্রায় সব কথা আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করছি। নিরঞ্জন দার উপদেশে (শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন নিয়োগী) ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্ম গীতোপনিষৎ পড়লাম। এমন সরল যোগ ও ভক্তির সূত্র আর কোথাও আছে বলে জানি না।

একদিন দেখলাম একটি খুব উচ্চ শ্বেত পর্ব্বতের উপরে একজন খুব লম্বা ব্যক্তি সাদা আলখাল্লা পরে অনন্ত দিগন্তের দিকে দু'বাহু প্রসারিত করে উচ্চ স্বরে কি বলছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "ইনি কে?" উত্তর হোল "ইনি ভক্ত সাধু মহম্মদ"।

যীশু খৃষ্টকে দেখেছি দু'তিন বার। তাঁর শান্ত ও প্রশান্ত মূর্ত্তিতে। অত্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় দেহ। তাঁর সেই মূর্ত্তির কোনও ছবি আমি কোথায়ও দেখিনি।

আমার এ সব দর্শন যে কল্পনা নয় তা আমি ব্রহ্মানন্দের "পরলোকের সন্ধান" পড়ে বুঝতে পারলাম?

আমি এখন প্রায় সব সময় যখন আত্মস্থ হই তখনই গায়ত্রী মন্ত্র জপ করি। গায়ত্রী মন্ত্রের আগে আমি একটু নিজে যোজনা করেছি "ওঁ হরি ওঁ ভু ভব স্বঃ ইত্যাদি ও পরে "মা দুর্গা ব্রহ্মময়ী"।

একদিন গান্ধিজীকে (মহাত্মা গান্ধী) দেখলাম। তিনি তাঁর সাদা খদ্দরের" ধুতি ও চাদর পরে একটি অতি উজ্জ্বল রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি যেন পৃথিবীর দিকে।

একদিন অরবিন্দকে দেখলাম। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে ধ্যানস্থ অবস্থায় বসে আছেন। তাঁর দেহ জ্যোতির্ম্ময়।

আমার মা সহায় —।

অনেক সময় বিকট দর্শন অনেক কিছু দেখতে পাই। গায়ত্রী জপের সঙ্গে সঙ্গে তারা চলে যায়।

একদিন দেখি একটা আবছা প্রান্তরে কতগুলি ছায়া মূর্ত্তি আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে আমার অনুভূতিতে বুঝতে পারলাম তারা প্রেত। গায়ত্রী জপ করতে আরম্ভ করলাম আর অমনি তারা যেন ভীত হ'য়ে পালিয়ে গেল। কিছু ভয়ের জিনিষ দেখলে যেমন লোকে পালায় তেমনি যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

আমার মা সহায় —।

আমার সাত বৎসর বয়সের সময় যখন আমরা সকলে গিরিডিতে উস্রি ভিলাতে ছিলাম তখন একদিন রাত্রি প্রায় ৩টার সময় হঠাৎ আমি শুনতে পেলাম "হরি বল, হরি বল, হরি বল"। এই হরির নাম যেন কেউ বজ্রের মতন ভীষণ শব্দে সমস্ত দিগন্ত কম্পিত করে বলতে বলতে চলে গেলেন। এই শব্দটি যেন আসছিল পশ্চিম দিগন্ত থেকে এবং চলে গেল উত্তর দিক পরিক্রমা করে পূর্ব্ব দিকে। আকাশ, বাতাস ও সকল পৃথিবী যেন এই শব্দে কম্পিত হয়ে গেল এবং সেই শব্দ যেন দূর দূরান্তরে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আস্তে আস্তে ক্ষীণ হ'তে হ'তে মিলিয়ে গেল। মার কাছে শুয়ে ছিলাম। মাকে ডেকে সব কথা বললাম। মা সেই কথা তখনি বাবাকে বললেন। আমার পিতা বললেন "ও বিশেষ ভাগ্যবান্ যে ও শুনেছে। অধিক রাত্রে দেবতাগণ আকাশ মার্গে বিচরণ করেন ও হরিনাম গান করেন। ভাগ্যবান্ ভিন্ন কেউ সেই গান শুনতে পায় না।"

এখন প্রায়ই আমার পিতার মুখখানা ধ্যানের ভিতরে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে আমার সামনে।

আমি চাই খুব সাধন করতে। এত যে গায়ত্রী জপ করছি তবুও আমার মনের বিকার যায় না। মিথ্যা কথা বলি, পরনারী কামনা করি ও অনেক অন্যায় আচরণ করি। কিন্তু সব যেন মনে হয় কাদা মাটির ময়লা। মা ধুয়ে মুছে নেবেন।

আমার একান্ত ইচ্ছা খুব সাধন করে মাকে খুব একান্তে পাই ও সব সময় ডাকলেই তাঁকে পাই। সময়ে অসময়ে যখনই ডাকব তখনই তিনি আমাকে দেখা দেবেন। আর সকলকে ডেকে ডেকে বলব—এই দেখ আমার 'মা' তোদেরও 'মা'। তারা যদি দেখতে না পায় এমন বিদ্যা অর্জ্জন করব যাতে যাকে স্পর্শ করব সেই আমার মাকে দেখতে পাবে জীবন্ত রূপে। এই সাধনা করতে চাই। মা কি আমার এই বাসনা পূর্ণ করবেন? নিশ্চয়ই করবেন।

একদিন মা বললেন "বেশী কথা বলিস না। বাক্ সংযম কর। তোর কিন্তু সাধন হ'চ্ছে। সাধনের ফল ফলতে আরম্ভ করলেই যা বলবি তাই ফলবে। আজে বাজে কথা বললে পরের অনিষ্ট হ'তে পারে"।

আমার যে মনে থাকে না মা, কি করি। বেশী কথা বলে ফেলি।

আমার মা সহায় —।

একদিন বন্ধুবর কালীচরণ মজুমদার আমাকে বললেন "তোমার যখন এইসব অভিজ্ঞতা হ'চ্ছে তখন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে বসে ধ্যান কর তবে তোমার উন্নতি হবে। তাই একদিন মশারীর ভিতরে বসে রাত্রে ধ্যান করতে আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণ ধ্যান করবার পর পায় ঝিঁঝিঁ ধরল। আর পারি না। মা বললেন "বোকা বসে বসে ধ্যান করলেই বুঝি সব হয়? ওতে কিছু হবে না। সব সময় কাজে অকাজে আমাকে ধ্যান করবি তাতেই সাধনে সিদ্ধি লাভ করবি।" মা আমাকে বেশী পরিশ্রম করতে দেন না। বলেন "বেশী পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জ্জনের কোনও প্রয়োজন নাই। তোমার অনেক কাজ আছে। যা চাও আমি দেব।"

আমার মাতৃ আশীর্ব্বাদ ভরসা।

মা আমাকে হাতে ধরে গুরুর মত শিক্ষা দিচ্ছেন সাধনে। আমার পরম সৌভাগ্য।

আমার পৃথিবীর মা ও আমার পরম জননীর মধ্যে পার্থক্য পাই না। এঁরা দুই জনেই আমার গুরু।

আমি মায়ের ছেলে।

আমার গর্ভধারিণী জননী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বোধ হয় তাঁর সকল সন্তানের চাইতেও আমাকে বেশী ভালবাসেন।

নবজীবনোপনিষদ

প্রথম পর্ব

(সাধন, শ্রুতি ও দর্শন)

দিন পঞ্জি

সোমবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ।

আমার জীবনে একটা অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আসছে সেটা আমি বুঝতে পারছি। দিনের পর দিন আমি যেন ক্রমেই সারাক্ষণ মাতৃসান্নিধ্য অনুভব করছি। মা যেন সারাক্ষণ আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন। আর আমি ক্রমেই যেন আমার সকল সত্ত্বা নিয়ে আস্তে আস্তে মার প্রেম সাগরে ডুবতে আরম্ভ করছি। জপ করতে ভুলে গেলে মা আমাকে মনে করিয়ে দেন। চরিত্রের ক্রটি অনেক সময় আসে কিন্তু আমি সজাগ। দেহাত্ম বিকারে জ্ঞান শূন্য হ'য়ে পাপ করি। কিন্তু জানি এ আমার অন্যায় হচ্ছে। মিথ্যা বলা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন মিথ্যা বলতে যাবার ঠিক আগে মনে হয় মিথ্যা বলছি কেন! একটা সজাগ ভাব।

আমার মা ভরসা।

বুধবার, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ।

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা, মহাভক্ত শিবের গলায় যে বিষধর সর্প থাকত সেটা কি সত্য? মা বললেন "হ্যাঁ, সত্য,। শিব ছিলেন মহা ভক্ত, মহা যোগী, ও মহাসাধক। আমার আরাধনা করতে করতে তাঁর স্থূল দেহে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির বিকাশ হয়। সে জ্যোতিতে তিনি যেখানে থাকতেন সেই জায়গাই আলোকিত হ'ত। সে আলোক এমন সম্মোহন শক্তির আধার যে [illegible] আকৃষ্ট হ'য়ে আলোক লোভাতুর অনেক জীব তাঁর কাছে আসত। [illegible]টা সহজাত ধর্ম্ম হচ্ছে যে সে আপনার মণির আলো অন্বেষণ করে।

যার মণি নাই সেও মণির আলো চায়—। এই আলোতে তার স্বভাব ধর্ম্মে তার আপন খাদ্যের সংস্থান হয়। তাই শিবদেহে আলোকের ধারায় মুগ্ধ হয়ে সর্প তাঁর দেহ আশ্রয় করে থাকত। পরম ব্রহ্মজ্ঞানী বলে তিনি কাউকে হিংসা করতেন না বলে সর্পও তাঁকে হিংসা না করে আপন খাদ্যের প্রয়োজনে তাঁর দেহ আশ্রয় করে থাকত।" তবে কি মানুষের দেহে সেই দিব্যজ্যোতির বিকাশ হতে পারে যে জ্যোতি চর্ম্ম চক্ষে দেখা যায়? "হ্যাঁ, মানবের দেহ ভাগবতী তনু হ'য়ে যায় আমার সাধনায়। সেই দেহ থেকে অপূর্ব্ব আলোক নির্গত হ'য়ে থাকে এবং মহা সুগন্ধ বিকিরণ করে। মৃগ যেমন জানেনা যে কখন ও কোথায় তার নাভি কস্তুরীর বিকাশ হয়েছে, কিন্তু সে নিজেও যেমন সেই গন্ধে আকুল হ'য়ে পড়ে তার পারিপার্শ্বিক জীবও সেই গন্ধে আকুল হ'য়ে পড়ে, তেমনি সাধন করতে করতে সাধকের দেহে জ্যোতি ও অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ জাত হয়। সাধক নিজেও মোহিত হয় আর সকলেও মোহিত হয়।"

মা আমার অপার করুণাময়ী।

শুক্রবার, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ।

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলাম মা মহাভাব কি রকম বুঝিয়ে দাও। মা বললেন "আত্ম-সৃষ্ট স্বভাবজাত যে ভাব সেই ভাবের চরম উৎকর্ষই মহাভাব। জীব সকল ব্রহ্মময়। সেই ব্রহ্ম সত্ত্বা জীবে বর্ত্তমান। স্থূলদেহের বিকারে দেহ-জাত ধর্ম্মের উৎপত্তি হয় ও তাই "মায়া" বলে বর্ণিত হ'য়ে থাকে। আত্ম-ধর্ম্ম যখন সাধনের দ্বারা জীবদেহে সঞ্চারিত হয় তখন তার সকল মোহ, মায়া ও দেহবুদ্ধি বিলুপ্ত হয় এবং সে আত্মদর্শন লাভ করে। এই আত্মদর্শনই মহাদৃষ্টি যোগ এনে দেয় জীবের ভিতর এবং সে চরাচর ব্রহ্মরূপে দর্শন করে ও সেই "মহা-ভাব"।

মাগো এত জ্ঞান আমাকে দিচ্ছ কেন? মাগো তুমি এত ভাল গো উঠে আমার মা।

শনিবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ।

আজ সন্ধ্যায় ভাই কৈলাস চন্দ্র দত্তের গৃহে উপাসনা ছিল। কীর্ত্তন করলেন শ্রীযুক্ত মানিক দে মহাশয়। কীর্ত্তনের সময় চক্ষু মুদ্রিত করে যোগে দেখতে পেলাম স্বয়ং শ্রীহরি আজানুলম্বিত শ্বেত পুষ্পের মালা গলায় পরে অপরূপ নীল বেশে সেজে নৃত্য করছেন। পাশে তাঁর অগণিত ভক্তবৃন্দ। জায়গাটি অপরূপ নীল ও শ্বেত আলোকে উদ্ভাসিত। কীর্ত্তন যেন করছেন চৈতন্যদেবের ভক্ত শিষ্য জগদানন্দ। তাঁর গলায় কণ্ঠির মালা। ভাবে বিভোর হ'য়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কীর্ত্তন করছেন। জিজ্ঞাসাতে জানতে পারলাম মানিকবাবুই সেই ভক্ত জগদানন্দ। জগদানন্দ অকৃতদার ছিলেন। তাঁর অন্তরের গোপন নিভৃতে সংসারের ভোগের প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তার জন্যই এই জন্ম। মানিক বাবুকে নিভৃতে এই কথা বললাম। তিনি বললেন যে তাঁর একজন বন্ধু তাঁকে বলেছেন যে যখন তিনি (মানিকবাবু) কীর্ত্তন করেন তখন সেই বন্ধুটি তাঁর (মানিকবাবুর) দুই পাশে গৌর নিতাইকে দেখতে পান। আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা। সব সময় সেই আধ্যাত্মিক কীর্ত্তন মানস চক্ষের সামনে ভেসে উঠছে। মা, তোমার কি ইচ্ছা জানিনা। এই অধম পাপীকে এমন ক'রে কেন দয়া করছ? আমার দ্বারা কি কার্য্য সাধিত হবে জানিনা। আমাকে দিয়ে তোমার সব কাজ করিয়ে নাও। মা আমার ভরসা।

রবিবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ।

আজকে সারাদিন বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলাম। সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হ'ল। অবনীদা (শ্রীযুক্ত অবনী মোহন গুহ) উপাসনা করলেন। উপাসনার সব কথা কানে আসেনি। গান করলাম প্রথম, "সাধ মনে হরি ধনে" দ্বিতীয় "তোরা কে যাবি রে আয় রে ভাই," তৃতীয় "কত ভালবাসা গো মা মানব সনে" চতুর্থ "কাতরে কর নাথ দয়া"। মন সব সময় মাকে কেবল খুঁজেছে। দেখা পেলাম না। মনটা নরম ছিল, ভাব পুরো হ'লো না। তবুও ক'রে "সাধ মনে হরি ধনে" গানটি বারে বারে করতে লাগলাম।

সুধীন্দ্রিয় (শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই ফিরল। গাড়ীতে তার সঙ্গে সমাজের কথা হচ্ছিল। সে বলল দাদার বাড়ীতে গিয়েছিলো। দাদা (শ্রীযুক্ত হরিদাস তালুকদার) অনেক গান শুনিয়ে তাদের আপ্যায়িত করেছেন। দাদাকে মন্দিরে এক রবিবার গাইতে দেবার ব্যবস্থা করতে বলল। এপ্রিল মাস থেকে যাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে বললাম। কমলাদি (শ্রীযুক্তা কমলা ঘোষ) সুধীন্দ্রিয়কে বলেছেন যে সমাজে আগেকার দিনে ভক্তদের ঝগড়া ছিল অন্য প্রকার; কারণ তাঁদের ভক্ত-জীবন ছিল। আর এখন ঝগড়া হচ্ছে অন্য প্রকার; কারণ এখন তেমন জীবন নাই। সুধীন্দ্রিয় বলেছে এখন যে নাই, তার প্রমান তিনি কি জানেন? ব্যক্তিগত জীবন জানেন না বলেই তিনি এই কথা বলছেন। আমি বললাম শত সাংসারিক কাজ করেও আজকাল যে আমরা ভগবানকে ডাকি ও তাঁর সান্নিধ্য পাই সেটা আমাদের পক্ষে কিছু কম লাভের কথা নয়। আমার মা ভরসা।

সোমবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজকে ভোরে উঠে মনটা একটু চঞ্চল হোল। ময়না চারদিন হোল ভাগলপুর গেছে এখনও চিঠি পেলাম না। মনে নানা বিপদ চিন্তা করলাম। নির্দ্দেশ পেলাম, "কোনও চিন্তা নাই আজকেই খবর আসবে"। ভাবলাম দুঃখ দিয়ে কি আমাকে তোমার দিকে নিয়ে যাবে? শুনি দুঃখ দিয়েই তুমি ভক্তকে তোমার নিকট কর। মা বললেন, "তুই দুঃখ পাবি না। তোকে দুঃখ দেব না। সুখেও যারা আমাকে চায় দুঃখ তাদের জন্যে নয়। আমার জন্যে ও জগতের কল্যাণের জন্যে দুঃখ যারা আনন্দ মনে বরণ করে তাদের দুঃখই মহানন্দ। তাই তাদের দুঃখ দিই।"

চারটার সময় নীলু (শ্রীসুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়) টেলিফোন করল যে ময়না চিঠি দিয়েছে কাল ১১টায় আসবে।

এ বেলা আফিস থেকে এসে দেখি বাবুল অসুস্থ, বমি করল। রাহুলের পেট খারাপ হয়েছে। আমার শাশুড়ী ঠাকরুন আজ এখানে থাকলেন।

মনের ভিতর গান হচ্ছে ও করছি অনেকবার "কত ভালবাস গো মা।" "কাতরে কর নাথ দয়া।" শ্রীযুক্ত কালীচরণ মজুমদারের সঙ্গে গাড়ীতে অনেক আধ্যাত্মিক কথা হোল। সে বলল যে আত্মার শক্তি অসীম। আমরা যখন নিদ্রিত থাকি আত্মা দেহের সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম সূত্র রেখে বহুস্থানে বিচরণ করেন। একটু আকাঙ্ক্ষা যা একটুকুর জন্যে অবচেতন মনে স্থান পেয়েছে, আমরা নিদ্রিত হ'লে আত্মা সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত করবার জন্যে ধাবিত হন ও করেন। জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার।

মঙ্গলবার, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত কালীচরণ মজুমদার আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। নানা সদ্‌ গ্রন্থ তাঁর পাঠ করা আছে। তাঁর সঙ্গে আফিস ফিরবার পথে গাড়ীতে অনেক আধ্যাত্মিক আলোচনা হয়। তাঁর অনেক বিষয়ে গভীর জ্ঞান আছে দেখলাম। গীতার সকল শ্লোক তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ। অতি শুদ্ধ অন্তর। যোগাভ্যাসও আছে। একদিন তাঁকে বললাম "মাকে যে দেখলাম দক্ষিণ মুখে পর্ব্বতের উপরে বসে মৃণাল সমেত পদ্ম হাতে নিয়ে দক্ষিণ আকাশের দিকে অঞ্জলি তুলে অঞ্জলি দিচ্ছেন। তবে কি মা আমার পরব্রহ্ম নন? সে বলল তা নয় "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শেখায়।" আমার সংশয় দূর হোল। এমন বন্ধু পাওয়া জন্মান্তরের সুকৃতি।

বৃহস্পতিবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

এখন প্রায়ই রাস্তায় সকল নারীর মুখে যেন আমি সেই পরম জননীর মুখাবয়বের খানিকটা আভাস পাই। আশ্চর্য্য। আজ সকাল থেকে মার প্রতি মন ব্যাকুল। মাকে ডাকলাম। গান করলাম "মা মা বলে ডাকছি কত ভোরে। আসলে কোথা আসন দেব সেই ভয়ে মরি কাঁপরে। হৃদয় মন্দির মোর বসিবার আসন তোর, তাও তো মা গেছে ভেঙ্গে চুরে। দারুণ মোহের ঝড়ে কখন যে তা যাবে পড়ে, আছি কেবল তারা নামের জোরে।" বিকালের দিকে আফিস থেকে ফিরে ময়নাকে বললাম খুব স্নেহশীলা হতে। কি ছেলে

মেয়ে, কি দাস দাসী সকলের সঙ্গে খুব স্নেহের সঙ্গে কথা বলতে। নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখ তোমার কথায় কারুর মনে আঘাত লাগে কিনা। বাক্য সংযম কর ও ছেলে মেয়েদের স্বাধীনতা দাও। যখন অন্যায় করবে তখন শাসন কর। সব সময় তাদের তাড়না করবে না। তা'হলে তাদের স্বাস্থ্য ও মন দুইই খারাপ হবে। সে এসব কথা গ্রহণ করবে বলে আশা করি।

আমার মা সহায়।

শুক্রবার; ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ হরতালের দিন রাহুলকে নিয়ে সকালে ৯টায় সুধীন্দ্রিয়দের বাড়ী গেলাম। ১০টায় রাহুলকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আবার তাদের বাড়ী ফিরে গেলাম। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিষয় অনেক কথা হোল। বাদল (শ্রীযুক্ত দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, আমার শ্যালক) শ্রীযুক্ত নিখিল রায়, সুধীন্দ্রিয় ও আমি এই সব কথা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত আলোচনা করি। নিখিল বাবু বললেন তাঁরও এইরূপ কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তার একটা প্রশ্ন আছে সেটার আলোচনা দরকার। সেটা হচ্ছে "বায়ু"। তিনি পরে এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে কথা হলো। সুধীন্দ্রিয় বলল ব্রাহ্ম ধর্ম্মে জন্মান্তর বাদে বিশ্বাস নাই। নিখিল বাবু বললেন যে পাটনায় এক ভদ্রলোকের গৃহে তিনি এক ছোট মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। সে মেয়েটি নিখিল বাবুকে দেখে "নিখিল এসেছিস্, আয়, তোর দাদা মা সবাই কেমন আছে? এখানে এলে আমার সঙ্গে দেখা করবি ইত্যাদি''। সেই মেয়েটির তখন ৩।৪ বৎসর বয়স। সে তার বাবাকে বলেছে "ভাগলপুরে আমার ছেলেরা আছে, তাদের বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে। নিখিল বাবুরা ভাগলপুরের স্থায়ী বাসিন্দা। নিখিল বাবুর পিতা মৃত্যুর পুর্ব্বে একটা পায়ে চোট্ লেগে যাওয়ায় একটু খুঁড়িয়ে হাঁট্তেন। উক্ত মেয়েটিও একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে—ঠিক যে ভাবে তাঁর বাবা খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। জন্মান্তর বাদ আমরা সকলেই বিশ্বাস করলাম। তার অনেক নিদর্শন আছে। আমার মা সহায়।

রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ কলিকাতা।

আজ সকালে মনে কোনও ভাব নাই। প্রস্তুত হ'য়ে মন্দিরে গেলাম। ময়না, টুনি, বুবলা ও আমার শাশুড়ী ঠাকুরুন আমার গাড়ীতে গেলেন। সকাল ৮॥৹টায় জ্ঞানদার শ্রাদ্ধ ব্রহ্ম মন্দিরে। পৌঁছুতে প্রায় ৯টা হোল। ভিতরে গিয়ে মেঝেতে সবার সঙ্গে বসলাম। গান করলেন শ্রীযুক্ত সমীর দত্ত ও উপাসনা করলেন শ্রদ্ধেয় ভাই অক্ষয় কুমার লোদ্। বসে ধ্যানে মগ্ন হলাম। কিছুক্ষণ আরাধনার কথা কানে আসছিল। তারপর আর কিছু কানে আসে নাই। গভীর ভাবে মগ্ন হলাম। কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। মনে ক্ষোভ হোল। নির্দ্দেশ হ'ল "গায়ত্রী জপ কর"। তাই করতে লাগলাম। আস্তে আস্তে আমি উর্দ্ধদিকে উঠতে লাগলাম। একটি শ্বেত আভাযুক্ত বর্ত্ম দিয়ে চলেছি। দূরে দেখলাম একটি মন্দিরের চূড়া—যেন ব্রহ্ম মন্দিরের চূড়ার মত। ক্রমে নিকটে যেতে লাগলাম। সমস্ত মন্দির দেখতে পেলাম। একটি প্রকাণ্ড বুদ্ধ মন্দিরের মত। দুইদিকে দর দালান মাঝখানে খোলা। খোলা জাগার উপর হ'তে বিরাট্ গম্বুজ উঠেছে। গোড়ার দিকে বিরাট্ গোল ও থাক্ থাক্, ক্রমে গম্বুজের ব্যাস সরু হ'তে হ'তে বহু উর্দ্ধ দিকে উঠে গেছে। একেবারে চূড়ার কাছে আমাদের ব্রহ্ম মন্দিরের মত নববিধানের নিশান উড়ছে। মন্দিরে ঢোকবার মুখে একটি আঙ্গিনা অতি পরিষ্কার। মন্দিরের কোনও দরজা নাই। ঢুকলেই অতি সুন্দর সাদা কালো পাথরের খানিকটা জায়গা। পশ্চিম দিক দিয়ে মন্দিরের প্রবেশ পথ। একই ভাবে পূর্ব্বদিকও খোলা ও পূর্ব্ব দিকে মন্দির হ'তে বের হ'য়ে একটি শ্বেত পাথরের রাস্তা। উপরে ঢাকা কিন্তু দুই পাশে খোলা। সেই রাস্তার সামনে আর একটি ছোট মন্দিরে একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এই ছোট মন্দিরের কোনও গম্বুজ নাই। বড় মন্দিরের চত্বরের বাঁ দিকে ও ডান দিকে সুন্দর গেরুয়া রংয়ের পাথরের সিঁড়ি। বাঁ দিকে হিন্দু বিগ্রহ ও ডান দিকে খৃষ্টানদিগের যীশু খৃষ্ট ও মেডোনার মত, আমার চোখে খুব স্পষ্ট নয় তবে আধা দেখা ও আধা অনুভূতিতে বুঝতে পারছি।

মন্দিরের পশ্চিম দিকে ঢোকবার জায়গার বাঁ দিকে ও ডান দিকে বাইরে মন্দিরের গায়ে একটি একটি করে দুটি বারাণ্ডা প্রায় বার ফুট্ উঁচুতে আছে। ডান দিকের বারাণ্ডায় একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁদের উপযুক্ত গেরুয়া বসন পরে বসে আছেন। তাঁর মস্তক মুণ্ডিত কেবল পশ্চাৎভাগে খানিকটা কালো কেশ আর মস্ত বড় একটি শিখা সুন্দর ভাবে বেনী করে জড়ানো। তাঁর দেহ জ্যোতির্ম্ময়। সেইখানে জ্ঞানদা এসে তাঁর পাশে বসলেন। তাঁর পরিধানে গেরুয়া ও দেহ অগ্নিময়। কিছুক্ষণ পরে তিনি যেন পাশের (জাগ্রত অনুভূতিতে বুঝতে পারলাম যে জ্ঞানদা পূর্ব্বজন্মে সেই বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন) বৌদ্ধভিক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করে একাকার হ'য়ে গেলেন। পরক্ষণেই আবার বের হ'য়ে এসে দাঁড়িয়ে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করতে লাগলেন। সামনে নীচে সেই মন্দিরের আঙ্গিনায় অগণিত জনতা। সকলের দেহই জ্যোতির্ম্ময়। জ্ঞানদা বলছেন "আজ পৃথিবীর অত্যন্ত দুর্দ্দিন, পাপে, অনাচারে দেশের নরনারী বিপথগামী। ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই। আমাদের সকলকে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। ওই দেখ বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক"। তিনি বলবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মন্দিরের উপরের দিকে দৃষ্টি দিলেন। আমিও দেখলাম। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক এক একজন এক এক দিকে আছেন। মন্দিরের চূড়ার সঙ্গে মাঝ খানে খৃষ্ট আছেন, বাঁ দিকে নানক ও ডান দিকে মহম্মদ আর এক দিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি আছেন। জ্ঞানদা বলছেন "আবার আমাদের সকলকে পৃথিবীতে যেতে হবে পৃথিবীর মুক্তির জন্য। সেখানে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—এ আমাদের গুরু দায়িত্ব। এ দায়িত্বের জন্যে আমাদের আবার কষ্ট স্বীকার করতে হবে। তোমরা কে কে প্রস্তুত আছ।" যাঁরা আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনছিলেন তাঁরা সকলে নিজ নিজ হস্ত উর্দ্ধে উঠিয়ে বলিলেন যে তাঁরা সকলেই প্রস্তুত আছেন। জ্ঞানদা বললেন "এই দশ বৎসরের ভিতরে পৃথিবীর সকল দেশে জন্ম নিতে হবে" আরও অনেক কথা বললেন। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন। যাঁরা আঙ্গিনায় ছিলেন তাঁদের ভিতরে

বুড়োদা (শ্রীমদ্ সত্যেন্দ্র দত্ত) ছিরু ইত্যাদি তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তিনি সকলের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করতে লাগলেন। ছিরুকে বললেন "কি যাবিতো?' ছিরু বলল "না, আর নয়, একবার ছিলাম, অর্দ্ধেক থাকতে না থাকতেই কান ধরে নিয়ে এল, আবার যাব আবার কখন ধরে নিয়ে আসবে। ও আমার পোষাবে না। আমি যাব না, তোমরাই যাও।" তারপর জ্ঞানদা বললেন "যাই ওরা আমার স্তুতিবাদ করছে"। এই বলে এসে মন্দিরের একটা bench-এ বসে চোখ বুজে রইলেন। জীবনী পাঠ হ'য়ে গেলে চলে গেলেন। কোথায় গেলেন আর দেখতে পেলাম না।

তারপর দেখি দিগন্ত বিস্তৃত একটা সমতল ভূমি অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেখানে কোটি কোটি ছায়া মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে উর্দ্ধ বাহু হ'য়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। তাদের উর্দ্ধে কিছুটা দূরে একটু আলো। কিন্তু আকাশের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৪৫° মেরিডিয়ানে একটি জ্যোতিষ্ক ও সেখান থেকে শ্বেত আলোর একটা focus এসে পড়েছে সকলের মস্তকে। সে আলোকে কিন্তু অন্ধকার দূর হ'চ্ছে না। কাউকে চেনা বা দেখা যাচ্ছে না। মনে হ'চ্ছে মহা মোহান্ধকারে জীবসকল একই প্রকারের দুঃখে সকলেই অতিশয় ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হ'য়ে তা নিরাকরণের জন্যে ভগবৎ করুণা ও প্রসাদ সর্ব্বান্তকরণে কামনা করছে। ভগবানও তাঁদের দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা যেন সে করুণা গ্রহণ করতে পারছে না। যেন মনে হ'চ্ছে পৃথিবীর উপর পাপ মোহের এক নির্ম্মম অভিশাপ এসেছে। এই অভিশাপ নিবারণের একমাত্র পন্থা—দয়া, ক্ষমা ও অহিংসার ব্রত প্রত্যেক জীবনে গ্রহণ করে ভগবৎ চরণে আত্ম নিবেদন। এ যতদিন না হবে ততদিন মহা বিপর্য্যয় ও মহা অনিষ্ট জগত জনকে দলিত ও মথিত করবে।

জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার।

রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সন্ধ্যায় সরোজের (শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র নাথ সেন) উপাসনা ও মৃণাল ভূষণের সঙ্গীত ছিল। বসিয়াই ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছি। দেখছি উর্দ্ধে উঠ্‌ছি।

একটি শ্বেত পাহাড়িয়া রাস্তা দিয়ে আমি ছোট একটি উলঙ্গ শিশু কাঁদতে কাঁদতে চলেছি। মাকে হারিয়েছি। দেখি দূরে একটা ত্রিভূজের আকার কালো আবছা। (কেশ দাম দিয়ে ত্রিভুজ তৈরী করলে যেমন হয় তেমনি)। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে চলেছি। অনেক আঁকা বাঁকা পথ পার হ'য়ে দেখি একটা পাহাড়ের শীর্ষ দেশে একটি নারী ধ্যানে বসে আছেন। আমি যেন বুঝলাম তিনি আমার হারানো মা। আমি পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। যখন তাঁর কাছে গেছি তখন দেখি একটা সুন্দর সমতল জায়গা ঠিক পাহাড়ের শীর্ষদেশে। আশে পাশে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষের সমাবেশ ও কাছে একটা কুঞ্জ কুটির আছে। আমি মার বাঁ পাশে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তিনি নিমিলিত নেত্রেই আমাকে ধরে তাঁর বাঁ দিকের কোলের উপর শুইয়ে দিয়ে বাঁ দিকের স্তন আমার মুখে দিলেন। আমি ছোট শিশুর মত তাঁর স্তন্য দুগ্ধ পান করছি ও মার মুখের দিকে চেয়ে আছি। মা নিমিলিত নেত্রে একটি ঈষৎ খয়েরী রংএর জলপদ্ম যুক্ত করে নিয়ে দক্ষিণ আকাশের দিকে অঞ্জলি তুলে ধরলেন। আমি সেই সময় মাকে বিরক্ত করলাম। মা অঞ্জলি রেখে তাঁর ঘন কৃষ্ণ কেশদামের জটা দিয়ে আমার কোমর বেঁধে আবার ধ্যানে বসলেন। আমি মার পিছন দিকে গিয়ে তার পিঠে পিঠ লাগিয়ে পা ছড়িয়ে বসে অভিমান করলাম। তখন তিনি আমাকে আবার তাঁর দক্ষিণ পাশে এনে দক্ষিণ হাত দিয়ে আমাকে কোলের উপর চেপে রেখে আবার ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। আমি মার মুখের নিম্ন-ভাগ দেখতে পাচ্ছিনা। তার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, শ্বেত পুষ্পের মালা, হাতে রুদ্রাক্ষের বালা ও শাঁখা এবং হাতের উপরিভাগে রুদ্রাক্ষের বলয় দেখতে পাচ্ছি। কপালে কেশদাম স্বর্ণাভ, অবিন্যস্ত, মাথায় কেশের চূড়ায় অর্দ্ধ চন্দ্র, একখানা গরদের মত শাড়ী পরিধানে। এর আগে যে মাকে দেখেছি তিনিই তবে বেশের কিছু পরিবর্ত্তন। অনুভবে চিনতে পারছি। আমি উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণের একটি দুই বৎসরের শিশু, খুব স্বাস্থ্যবান্, কোমরে আমার রূপার গোট্ আছে। আমি মার ডান দিকের উরুতে মাথা দিয়ে চিৎ হ'য়ে

ভয়ে মার মুখের দিকে চেয়ে আছি। সন্তান ও মার ভিতরে একটা অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। দুজনেই দুজনের প্রতি সজাগ। কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছি না। মার আমার মুদ্রিত নয়ন। যতক্ষণ উপাসনা হয়েছে ততক্ষণ এই দৃশ্য দেখেছি। এ সব যে কি আমাকে কে বলে দেবে। এ ত আমার কল্পনা নয়। এমন কল্পনা আমি কখন স্বপ্নেও করি নাই।

আমার মা সহায়।

আমি যেন পূর্ব্বজন্মে কার্ত্তিকেয় ছিলাম এই অনুভূতি তীব্র হয়েছে। মা আমার দুর্গা। এ কি ভাব?

শনিবার, ১০ই মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সন্ধ্যায় মানিক দত্ত মহাশয়ের গৃহে পল্লী সমাজের উৎসব ছিল। উপাসনা করলেন ননীবাবু (শ্রীযুক্ত ননী দাসগুপ্ত)। শ্রীযুক্ত সুধীর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে একটি কীর্ত্তন করলেন। উপাসনায় অঞ্জলী গাঙ্গুলী গান করলেন। অতি সুন্দর ভাবের সঙ্গে গান করলেন। তারপর উপাসনা শেষে সরকার মহাশয় একটি গান করলেন। এতক্ষণ আমার চক্ষু মুদ্রিত ছিল এবং আমি ধ্যানে ছিলাম। বিশেষ কিছু আত্ম দৃষ্টিতে দেখতে পাই নাই। তারপর শ্রীযুক্ত মানিক দে মহাশয় কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। তাঁর কীর্ত্তন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমি গভীরে নিমগ্ন হলাম। দেখলাম একটি জায়গা যা অতি নীলাভ আলোতে দীপ্যমান। তার মাঝখানে একটা অতি সুন্দর স্বর্ণ সিংহাসনে নীল বাসে সুশোভিত একটা দেব মূর্ত্তি। মূর্ত্তির মুখখানি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সকল অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। তিনি জীবন্ত। তিনি সিংহাসনে পশ্চিম মুখে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা কীর্ত্তনীয়া হাফ হাতা ফতুয়া (সাদা) গলায় কণ্ঠির মালা, সেই দেব মূর্ত্তির কাছে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন করছেন। মানিক দে মহাশয়ের কীর্ত্তনের পদ্ দে মহাশয় গাইবার আগেই সেই কীর্ত্তনীয়া গাইছেন। কীর্ত্তনের যে ভাবে ও অংশে ভগবানকে সম্বোধন করা হয়েছে, সে সব যেন তাঁর দ্বারা হাতের সঙ্কেতে সেই কীর্ত্তনীয়া গেয়ে চলেছেন।

যেখানে কীর্ত্তন খুব জমাট্ হ'চ্ছে সেই সেই সময় এক একবার সেই দেবমূর্ত্তি সিংহাসন থেকে উঠে এসে সেই কীর্ত্তনীয়াকে আলিঙ্গন করছেন। সেই কীর্ত্তনীয়াও হাঁটু গেড়ে তাঁর পদতলে বসে পড়ছেন এবং আবার উঠে কীর্ত্তন করছেন। ওই জায়গাটির চারপাশে বনের মত নিস্তব্ধ ও রাত্রিকাল। কীর্ত্তনীয়ার ও সেই দেবমূর্ত্তির চার পাশে অনেক জন সমাগম হয়েছে। কিন্তু তাদের আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিনা। এই কীর্ত্তনীয়া যে সেই জগদানন্দ তা বুঝতে আমার একটুকু কষ্ট হোল না। আজ শুধু মানিক দে মহাশয়কে প্রণাম করে বললাম। "আপনি মহাভাগ্যবান্ পুরুষ"। তিনি আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। তিনি ভক্ত ও তাঁর করুণা তাঁর উপর আছে জানলাম। একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। সকলে মুক্ত অঙ্গনে খিচুরায় খেতে বসলাম। সকলে ভাবলেন খাওয়ার ভিতরে বর্ষণ হ'য়ে খাওয়া নষ্ট করে দেবে। আমি দেখলাম বর্ষণ নয় পুষ্পবৃষ্টি এবং স্বর্গের আঙ্গিনায় আমরা সকলে প্রসাদ খাচ্ছি। বৃষ্টি হোল না।

আমার মা সহায়।

সোমবার, ১২ই মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে ব্রজবিদেহী বাবাজীর গুরুশিষ্য সংবাদ প্রায় ১১-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত পড়লাম। পড়া শেষ করে ভাবলাম যে বৈদবেদান্তের বহুবিধ উক্তি বহুধা বিভক্ত। যদিও ব্রজবিদেহী বাবাজী অতি সরল ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তবুও অনেক সময় নানা ভাষ্যের গতিতে মন বিক্ষিপ্ত হয়। পড়া শেষ করে উঠলাম। হঠাৎ কে যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন, যেন জোর ক'রে আমাকে বলছেন "কত কত যুগে বহু যোগী ঋষি জ্ঞান দ্বারা আমাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেহই সম্পূর্ণরূপে আত্মজ্ঞান দ্বারা আমাকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হতে পারেন নাই। মানব জ্ঞান সীমবদ্ধ। তার যে টুকু পরিধি সেই পরিধির যে জ্ঞান তার দ্বারা যে যেটুকু পেয়েছে আমাকে জেনেছে। হস্তী দেখেছিস্ ত? হস্তীর চক্ষু নিজের সর্ব্ব অবয়ব দেখতে পায়

না। সে শুধু তার নিজের সামান্য অংশটুকু দেখতে পায়। তেমনি মানবের জ্ঞান চক্ষু দ্বারা আমাকে সম্পূর্ণ দেখতে পায় না। যে টুকু দেখে তাই বিশ্লেষণ করে। শুধু আমার ভক্তই আমাকে সম্পূর্ণরূপে পায়। শ্রদ্ধা-ভক্তিই আমাকে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়। মাহুত যেমন হস্তীকে চালিত করে এবং হস্তী মাহুতের সকল বাক্য যন্ত্রবৎ শুনে—মাহুত যেমন হস্তীর সকল অবয়ব দেখতে পায় তেমনি ভক্তির দ্বারা ভক্ত আমার সব দেখতে পায় এবং আমি ভক্তের সকল নির্দ্দেশ পালন করি। শুধু ভক্তিতেই আমি ভোগ্য। ভক্তির দ্বারা ভক্ত আমাকে সম্পূর্ণ ভোজন করে —”।

আমার মা সহায়। কোথায়? তেমন ভক্তি তো আমার নাই। আমি যে ভক্তিহীন। শিশু যেমন মা গত প্রাণ, সরল মনে মাকে ডাকে ও এক মাত্র সম্বল বলে জানে আমি যেন তেমনি তোমার কাছে থাকতে পারি। তোমাকে মা মা মা বলে ডাকতে পারি—কাঁদতে পারি ও আনন্দে নৃত্য করতে পারি। আমাকে তুমি কোলে নিয়েছ কতবার সে ত ভুলব না। মা গো আমার মা।

বুধবার, ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

একদিন স্বপ্নে দেখলাম টাঙ্গাইলে গেছি। টাঙ্গাইলের কালী বাড়ীর অর্থাৎ কালী মন্দিরের পশ্চিম দিকে যে ঘরটায় পুরোহিত থাকেন সেখানে একটি স্বর্ণ দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেই দেবী মূর্ত্তির সকল দেহে এক স্বর্গীয় জ্যোতি। আমি এত স্পষ্ট দেখলাম যে সে স্বপ্ন আমার চিরদিন মনে থাকবে। অপরূপ দেবী মূর্ত্তি। সহস্র হস্ত প্রসারিত।

আমার মা সহায় —।

শুক্রবার, ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

ক'দিন দেখছি যে নারীর দিকে চেয়ে দেখি তাঁর মুখের কোনও না কোনও অংশ আমার ভুবন মোহিনী মার মুখের আদল আসে। এ এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। এটা মাঝে মাঝে হয়। আবার মাঝে মাঝে কাম ভাব হয়। যখন কাম ভাব

হয় তখন আর নারীতে মায়ের মুখের আদল দেখিনা। বিশেষতঃ সকাল বেলায় মাতৃভাবে বেশী বিভোর করে।

মা আমার নিত্য লীলাময়ী।

শনিবার, ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ থেকে দেখছি প্রত্যেক পুরুষের মুখে যেন একটা স্বর্গীয় জ্যোতি আছে। যেন যে যে ভাবে চলেছে সকলেই যেন তাঁর উপাসনাতে বিভোর হ'য়ে চলেছে। প্রত্যেক পুরুষ যেন ব্রহ্মের স্বকীয় অংশ। একটা দেব ভাব যেন সকলের ভিতরেই আছে।

আমার কেবল মা ভরসা

সোমবার, ১৯শে মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আধ্যাত্মিক জগত একটি অতি অভাবনীয় মনোরম স্থান। সেটি আত্মার জগৎ। জড় জগতে যেমন বৃক্ষ, ফল, ফুল, পাখী, মানব ও জীব সকল আছে সেখানেও সব আছে। কিন্তু আত্মীক রূপে। সংসারে এখানে আত্মনিষ্ঠ, জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক ও বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ অনেকে জড় চোখে আধ্যাত্মিক জগত দেখতে পান। অনেক আত্মার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন। উচ্চস্তরের সাধকগণ ব্রহ্ম দর্শন করেন। এ জগতে দেহীর পক্ষে এ সব দর্শন দেহের আকারে হ'য়ে থাকে। আমাদের স্থূল দেহের বাইরে একটা সূক্ষ্ম দেহ আছে। আত্মা অবস্থান করেন এই দেহের ভিতরে। জড় দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম দেহ আত্মাগত হ'য়ে উর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করেন। সংসারে এখানে যে সাধক যত উচ্চ তার সূক্ষ্মদেহ তত উজ্জ্বল হয়। তাই সেই স্তরের একজন সাধক আর একজন সাধককে দেখে বুঝতে পারেন যে তিনি সাধনায় কতদূর অগ্রসর হয়েছেন। সাধকের দেহের বাইরে সূক্ষ্মদেহের জ্যোতি নির্গত হয়। প্রত্যেক মানুষের দেহের বাইরে সাধন বা কর্ম্ম অনুসারে কম বেশী সূক্ষ্মদেহের জ্যোতি আছে, যা দেখে পূর্ণজ্ঞানী সাধকগণ সকলকে চিনতে পারেন। এখানে যেমন মনের চিন্তায় বা মনের নির্দ্দেশে স্থূল কার্য্য সকল সম্পাদিত হয় আধ্যাত্মিক

লোকেও মনের সাধনায় বা চিন্তায় সূক্ষ্মদেহের কার্য্য সম্পাদিত হয়। দেহ সূক্ষ্ম বলে স্থূল আহার ও স্থূল আবাসের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম আহার অর্থাৎ জ্যোতিই একমাত্র আত্মার আহার সেখানে। এই জ্যোতিতেই আত্মার পরিপুষ্টি হয়। আমাদের জগতে সর্ব্বমূলে আনন্দ। কাম ভোগে ক্ষণিক আনন্দ, আহারে আনন্দ ও সর্ব্ব কার্য্যে আনন্দ। আনন্দ ছাড়া জীব অন্য কিছু চায় না। যে ভাবেই হোক্ সুখ সমৃদ্ধি সকলই আনন্দের জন্য। মানুষ যা করে আনন্দ পাবার উদ্দেশ্যে। এই আনন্দের আকর্ষণই এই মরজগতে জীবকে সর্ব্বাংশে সঞ্জীবিত রাখে। আনন্দ না থাকলে জীবের জড় দেহও ভেঙ্গে পড়ে। আধ্যাত্মিক লোকে যে জ্যোতি সেটা আনন্দের প্রস্রবণ ও সেই আনন্দই আত্মার খাদ্য ও তাতেই আত্মা সঞ্জীবিত থাকেন। এখানে যেমন আমরা কিছু রচনা ও গড়বার আগে মনে মনে অঙ্কিত করে নিয়ে তারপর জড়রূপ দেই; আত্মীক জগতে আত্মা মনের সাহায্যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সেখানে বাস করেন। এটা অনেকটা সংস্কারগত। সংসারে পাপ বা হীন কার্য্যেরত মানুষের আত্মা হীন চিন্তায় হীন বা বিশ্রী পরিবেশে অবস্থান করেন। সাধক ও উন্নত মানব স্ব স্ব কর্ম্ম, সাধন ও মানসিক উৎকর্ষ অনুসারে আপন আপন পরিবেশে অবস্থান করেন। এ পরিবেশ পরব্রহ্মেরই সৃষ্ট কারণ তিনি মনের গতি সেই ভাবে সৃষ্টি করে, তেমনি পরিবেশে আত্মাকে অবস্থিত রাখেন। সংসারের কর্ম্মের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল আছে। সংসারে মনে, প্রাণে, কার্য্যে, কথায়, চিন্তায় যে সকল কর্ম্ম আমরা করি সেই সেই কর্ম্মের গতি আমাদের সেই সেই রূপ ফল প্রদান করে। আত্মীক লোকেই আমরা এই সব কর্ম্মের ফল ভোগ করি; কিছুটা এ লোকেও করে থাকি। দেহ পাত বা দেহ ধারণ স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে যদি মনের গতি জড় সংসার মুখীন হয় তবে আবার সংসারে জন্ম হয়। মনের গতি বা আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বাধিক দায়ী সংসার বন্ধনে বা মুক্তিতে। সূক্ষ্ম দেহ বলে আত্মার বিচরণ ক্ষমতা অত্যন্ত প্রসারিত। সাধক আত্মার পক্ষে উর্দ্ধে ও নিম্নে সকল স্থানে বিচরণ করবার শক্তি আছে।

হীন আত্মা ঊর্দ্ধে বিচরণ করতে পারে না। মোহগ্রস্থ হ'য়ে আত্মা জড় জগতের ভিতরেই আপনার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ভোগের জন্যে লালায়িত হ'য়ে বিচরণ করে। আধ্যাত্মিক লোকের সমাজ আছে, সংসার আছে, আইন ও শৃঙ্খলা আছে। এ জগত আমাদের এই জড় জগত থেকে কিছুই স্বতন্ত্র নয়। কেবল জড়ের স্থানে সূক্ষ্ম। বৃক্ষ আছে সূক্ষ্ম দেহে, নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত সব আছে কিন্তু সূক্ষ্ম দেহে। অর্থাৎ বায়বীয় দেহে।

আমার গভীর বিশ্বাস যে এমন সময় নিকটবর্ত্তী যখন আত্মীক লোকের সঙ্গে জড় লোকের গভীর ও সাক্ষাৎ যোগসূত্র বা যোগাযোগ স্থাপন করা কিছুই অসম্ভব হবে না। মানুষ জড় দেহ সন্তুষ্টির ভাব ও জড় দেহ সঞ্জাত বুদ্ধিকে যদি ঐশ্বরীকভাবে অপনোদন ক'রে আত্মস্থ হয় ও ধ্যানে মনঃসংযম করে এবং নিজ আত্মাকে উপলব্ধি করবার প্রয়াস করে তবে সকল মানুষই আত্মিক লোকের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে ও টেলিপেথির মত স্বর্গে ও মর্ত্তে আদান প্রদান হবে।

রবিবার, ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ নির্দ্দেশ এল "তোমার জন্মের পূর্ব্বের দিন যে বজ্রপাত হ'য়ে একটি মুসলমান কর্ম্মীর মৃত্যু হ'ল ও একটি চিরকালের জন্য অকর্ম্মণ্য হ'য়ে রইল, তারা পূর্ব্ব জন্মে তোমার প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। তাই তোমার জন্মে তাদের নিষ্কৃতি। স্বর্গের শঙ্খধ্বনিতে তোমার জন্ম। তোমার জীবনে বিশেষ কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। তোমার জীবন ধারণ আমার বিশেষ নির্দ্দেশে। প্রস্তুত হও।" আমার মা সহায়।

শুক্রবার, ২৩শে মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "সব সময় বিষয় বিষয় বলে চিন্তা করলেও বিষয় লাভ হয় না। কিন্তু আমাকে চিন্তা করলে বিষয় ও আমাকে লাভ হয়। সাধনে যোগই হ'ল শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই যোগ হয় ধ্যানে। ধ্যান হবে মননে। এই মনন হবে শ্রবণে ও শ্রবণ হবে স্মরণে। আগে স্মরণ তারপর মনন তারপর শ্রবণ তারপর

ধ্যান ও তারপর যোগ। এই যোগে অন্তর-লোকে আত্মা অনন্ত ব্রহ্ম-ভূমা দর্শন করেন।" আমার মা সহায়।

রবিবার, ২৫শে মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

মা বললেন "চেতন বা অচেতন সর্ব্বভূতেই স্বয়ং পরমাশক্তি বা পরব্রহ্ম বর্ত্তমান। বায়ু মণ্ডলের চেয়েও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে তিনি সর্ব্বত্র শক্তির প্রকাশে স্বপ্রকাশ। এ জগত ব্রহ্মস্বরূপ ও সত্য। পরব্রহ্মকে যদি সত্য বলে জান, তাঁর প্রকাশ পরম সত্য। মিথ্যা কিছুই নাই। ধারক যে সে যতটুকু শক্তি অধিকার করতে পারে তাতে সেইটুকু শক্তিই বর্ত্তমান থাকে। ইষ্টক মাটি হ'তে প্রস্তুত হ'য়ে অগ্নি, জল, বায়ু ইত্যাদি শক্তি আহরণ ক'রে শক্ত ইষ্টকে পরিণত হোল। তার যতটুকু শক্তি গ্রহণ করবার ক্ষমতা সে সেই টুকুই গ্রহণ ক'রে সেই শক্তির উপযোগী হ'ল। ইষ্টক থেকে পাথর আরও শক্তিশালী, পাথর থেকে লোহা, লোহা থেকে ইস্পাত ও ইস্পাত থেকে আরও শক্তিশালী ধাতু আছে। ইষ্টকে প্রস্তুত অট্টালিকার যে টুকু শক্তি ধারণ করবার ক্ষমতা আছে সে সেইটুকু ক্ষমতা আহরণ করে দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা অর্জ্জন করে। এই যে শক্তি এ সেই পরম আধার পরমাশক্তির প্রকাশ। মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডন করতে হবে। বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন স্বভাব বা প্রকৃতি ও-সেই পরব্রহ্মের প্রকাশ। অনন্ত পরিবর্ত্তনে তোমরা সেই পরব্রহ্মের দিকে ধাবিত হ'চ্ছ। তিনি ছাড়া গতি নাই। সকল ব্রহ্মাণ্ড সেই সারাৎসার পরব্রহ্মে অবলিপ্ত অথবা তিনি ওতপ্রোত ভাবে সকল বস্তু ও জীবের ভিতরে শক্তি ও প্রাণরূপে বিদ্যমান। চাই বিশ্বাস দৃষ্টি আর অহৈতুকী ভক্তি। জীবের জীবন-গতি মধ্যাহ্ন গতির ন্যায় প্রখর। মধ্যাহ্নে যেমন দেহের ছায়া অতি ক্ষুদ্র আকারে দেহকে অনুগমন করে তেমনি জীবের জীবন-গতি ব্রহ্ম অনুভূতি লাভ করলে প্রখর জ্ঞানে দেহাত্ম অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম হয় তখন সে আত্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়—"।

আমার কেবল মা ভরসা। আমার শুধু মাতৃ আশীর্ব্বাদ।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "সংসারে জন্ম সোপান মার্গ। বিগ্রহের কাছে পৌছিতে হ'লে যেমন মন্দিরের সোপান শ্রেণী পর পর পার হ'য়ে বিগ্রহের কাছে যেতে হয় তেমনি ব্রহ্মময়ীর কাছে যেতে হ'লে জন্ম জন্মান্তররূপ সোপান শ্রেণী পার হ'য়ে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠে ব্রহ্মময়ীর কাছে সকল জীব আশ্রয় গ্রহণ করে। ঊর্দ্ধই গতি ও গতিই ঊর্দ্ধ। জীবের জন্মের ভিতরে মানব জন্ম শ্রেষ্ঠ ও মহাজন্ম। সকল জীব জন্মের পরিপূর্ণতা নিয়ে মানব জন্ম লাভ হয়। আবার সকল জীবের হীনতাও মানব জীবনে বর্ত্তায়। দেহাত্ম রিপুই হীনতা। প্রেম, ভক্তি বিশ্বাস এ সব পরিপূর্ণতা এবং এরা সক্রিয়। দেহাত্ম হীনতা নিষ্ক্রিয়। মানব পরিপূর্ণতার ক্ষমতায় হীনতাকে জয় করে। মানব সেখানেই পূর্ণ মানব যেখানে তার পরিপূর্ণতার প্রভাব হীনতাকে জয় করেছে"

আমার মা জ্ঞান দায়িনী জননী।

শুক্রবার, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "প্রেম পূর্ণতায় পরিপূরক। প্রেমেই সকল পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়। তাই রাধিকা জীবাত্মা আর কৃষ্ণ পরমাত্মা। কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। যখন আত্মা মহাপ্রেমে বিশ্ব চরাচর উপেক্ষা ক'রে পরমাত্মার প্রেমে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পন করে তখন প্রেম বন্ধনে আত্মা ও পরমাত্মা একাকার হ'য়ে যায়। মানব মনে যে প্রেম উহা সেই শ্রেষ্ঠ প্রেমের এক কণা। প্রেম উপেক্ষণীয় নয়। প্রেম সর্ব্বদাই প্রেম এবং তাতে প্রেম-স্বরূপের আবির্ভাব। জল যেমন দেহের পানীয় প্রেমও তেমনি আত্মার পানীয়। প্রেমে আত্মা সুশীতল হয়। প্রেমে আত্মাকে শান্ত ও স্থিত করে। পরমাত্মার যোগে একাকার ক'রে দেয়"।

আমায় একবিন্দু প্রেম দে মা। আমি যেন প্রতি জীবকে প্রেম দিতে পারি মা।

শনিবার, ৩১শে মার্চ্চ, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "প্রেম ও ভক্তি সহোদরা। প্রেমে টেনে আনে আর ভক্তিতে দর্শন দেয়। প্রেম না থাকলে টেনে কাছে আনা যায় না। আর ভক্তি না থাকলে দর্শন হয় না। প্রেমাস্পদকে পেতে হ'লে প্রেমে আকর্ষণ ক'রে ভক্তিতে দেখতে হয়। প্রেম এলেই ভক্তি আসবে। আর ভক্তি এলে প্রেম ঘনতম হ'বে। একবার দর্শন হ'লে প্রেম উপচিয়া পড়ে। প্রেম তখন তার প্রিয়তমাকে আর ছাড়তে চায় না। অদর্শন যত বেশী প্রেম তত গাঢ়। বিরহ প্রেমের পরিপূরক আর মিলন ভক্তির পরিপূরক। অথবা প্রেম বিরহের পরিপূরক ভক্তি মিলনের পরিপূরক। দুইয়ে এক, একে দুই। বিরহের পরে মিলন আর আর মিলনের পরে বিরহ। প্রেম ও ভক্তির খেলা। চিত্ত চকোর আর চন্দ্রের জ্যোৎস্না। দু' জনে দুজনকে পান করছে। মহানন্দ"।

আমার মা গো।

রবিবার, ১লা এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "আত্মানন্দই পরমানন্দ। পরমানন্দই আত্মানন্দ। আত্মানন্দ হ'লেই পরমানন্দ লাভ হয়। আবার পরমানন্দ হ'লেই আত্মানন্দ হয়। আনন্দে আত্মপর অভেদ। পরাত্ম ও আত্ম সবই আত্মজ। আনন্দ আত্মজ হ'য়ে পরমানন্দ লাভ করে। আবার পরমানন্দের এককণা আত্মাজ হ'য়ে পরমানন্দ সুখ উপভোগ করে। মহাভূমায় মহানন্দ। আত্মারূপ পক্ষী মহাভূমায় মহানন্দের বিচরণ করে। মহানন্দই আত্মার শ্রেষ্ঠতম গুণ। সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা আনন্দ। নিরানন্দ মৃত্যু। আনন্দই উৎসব মূল। আনন্দই ব্রহ্মভূমা। আনন্দই ব্রহ্ম স্পর্শ"।

আমায় আনন্দ দে মা।

সোমবার, ২রা এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "জ্ঞান অনন্ত কিন্তু এক। যেমন ব্রহ্মময়ী অনন্ত কিন্তু এক। যেমন আকাশ অনন্ত কিন্তু এক। অনন্ত আকাশে যেমন বহু গ্রহ

নক্ষত্র অনন্ত আকাশেরই বুকে জাগ্রত হ'য়ে অনন্ত আকাশেরই মহিমা ঘোষণা করছে তেমনি বিভিন্ন জ্ঞানখণ্ড একই জ্ঞানের আধার। সকল জ্ঞানই এক মহাজ্ঞানের মহিমা ঘোষণা করছে। জ্ঞানখণ্ড অনন্ত কিন্তু এক ব্রহ্মজ্ঞানের ধারা। উৎস সেই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম যেমন অনন্ত কিন্তু এক মহাপূর্ণতা জ্ঞানও তেমনি অনন্ত কিন্তু একই তার ভাণ্ডার। দিব্য দৃষ্টি লাভ হ'লে দিব্য জ্ঞান লাভ হয় ও তাই হ'ল ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদৃষ্টি। জ্ঞানে বিচার আর ভক্তিতে সমর্পণ। জ্ঞান যখন আত্ম বিচার ক'রে শ্রেয়তম উপলব্ধিতে নিশ্চিত সত্তায় স্থিত হয় তখন ভক্তিই একমাত্র পথ যে জ্ঞানকে ব্রহ্মময়ীর সঙ্গে মধুর শুভদৃষ্টি করায়। এ দৃষ্টিতে বিশ্বাস ও নির্ভর আসে। মানব ব্রহ্মস্থিত হ'য়ে পরা-ভক্তি ও পর-জ্ঞান লাভ ক'রে জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্ত উপেক্ষা করে।"

মা আমায় তেমন জ্ঞান দে মা।

মঙ্গলবার, ৩রা এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো একটা কথাও আমার না। তুই যে কি করছিস্ জানিনা মা। সএব তুই কি আমাকে দিয়ে লেখাচ্ছিস্ মা? আমার ভাষা নাই। শব্দের যোজনা নাই। অক্ষর জ্ঞান নাই। বানান্ জানিনা। কত ভুল হ'চ্ছে। যে বানান্ জানি তাও ভুল করছি। কিন্তু তোর জ্ঞান যে এ সবের বাইরে মা। তোর ভাষায় ত ভুল শুদ্ধ নেই মা। তুই যে মা আপন ভাষায় কথা বলিস্ মা। তোর ভাষায় লিখতে পারি না বলেই ত ভুল হয় মা। কবে তোর ভাষায় লিখতে শিখব মা? তুই মা আমায় তোর ভাষায় লিখতে শেখা মা। আমি যে গো মা তোর ভাষার কাঙ্গাল। তুই শুধু মা একটা ভাষা, একটা কথা, একটা ডাক শেখা মা। ভাল ক'রে যেন শুধু এক অক্ষরে সকল অক্ষর পরিচয় হয় মা—খালি "মা" অক্ষর প্রাণে লিখে দে মা। মাগো তুই যার সব সেকি শূন্য হাতে থাকে মা? তুই আমার পূর্ণ ঘট মা। শূন্য যে আমার সব পূর্ণ হ'য়ে আছে মা তোর অমৃতে। তোর অমৃত আছে বলেই ত মা আমি অমর হ'য়েছি। কি দেখিয়ে

কোথায় নিয়ে এলি মা। কি হাতে দিয়ে সরে দাঁড়ালি মা—এ যে আমার বিষয় ফল মা—এ যে মাকাল ফল। দে মা আমায় আম্র ফল যার ভিতর অমৃত আছে। খাব আর তোর কথা ভাবব মা। দিবি দিবি ক'রেও দিচ্ছিস না কেন মা? আমায় আর কাঁদাস্ নি মা। আমি যে তোর কচি ছেলে মা—অবোধ শিশু।

মা মাগো আমায় দেখা দে মা।

বৃহস্পতিবার, ৫ই এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আমি জ্ঞান, বিচার, বিদ্যা, শাস্ত্র বিচার দিয়ে কি করব মা? যা চাই তাই যদি না পেলাম মা তবে আমার জ্ঞান, বিদ্যা, শাস্ত্র অধ্যয়নে কি হবে মা? সব ভাসিয়ে নে মা তোর প্রেম স্রোতে। একেবারে তোর অনন্ত বক্ষে গিয়ে পড়ি। সেখানে আমি আর তুই মা—আর বিশ্বে কিছু নাই মা। জ্ঞান, বিজ্ঞান বিদ্যা, অবিদ্যা, শাস্ত্র, পাপ, পুণ্য সব মুছে দে মা। কিছুই চাই না। চাই তোর কোল, তোর আদর আর তোকে জড়িয়ে ধরে থাকতে। ভয় কোথায়? আমি যে মা তোর কোলে চ'ড়ে আছি মা। আমার ব্রহ্মময়ী আজ গৃহময়ী, দেহময়ী। আমার জগত জননী আজ আমার হাঁড়ি ঠেলছে আর আমার চিন্তা কোথায় মা?

মাগো আমায় ছাড়িস্ না মা। কত যে অন্যায় করছি মাগো। দেখা দে মা।

শুক্রবার, ৬ই এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

দিবি বলে দিস্ না কেন মা? নাই যদি দিবি তবে "দেব" বলিস্ কেন মা? এমনি করে আর কতদিন ঘুরাবি? দিনে দিনে সংসারের দিন যায় মা। তোর ঘরে যে আমার দিন জমছে মা। তুই যে মা আমার জমা মা। সংসার আমার খরচ মা। তোর ঘরে আমি যা জমাই সংসারে এসে সব খরচ করে ফেলি। কতবার কত ধনরত্ন তোর ঘরে জমালাম আর সংসারে এনে সব খরচ করালি মা। একি করলি? এবার তোকে ফাঁকী দেব মা। এবার সংসারে জমাব

আর তোর ঘরে গিয়ে খরচ করব। এত ধন রত্ন জমাব মা এবার সংসারে, যে ধন রত্ন দিয়ে তোকে আমার মনমত করে গয়না দিয়ে, হীরে মণি দিয়ে সাজাব মা। আর আবার সংসারে খরচের জন্যে পাঠাবি না মা। তাই এবার থেকে তুই মা আমার জমা।

মাগো। মাগো। মাগো।

শনিবার, ৭ই এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

শাস্ত্রে বলে যে মা তুই শুধু জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস দিস্। তোর কাছে ভক্তি, বিশ্বাস, জ্ঞান, বিবেক এই সব চাইতে হয়। অর্থ বিত্ত সহায় সুখ তোর কাছে চাইতে নাই। সে সব চাইলে নাকি সকাম চাওয়া হয়। এ যে মহাভুল মা। যে মা জ্ঞান, ভক্তি দেয় সে মা কি অর্থ বিত্ত দেয় না? যার কাছে বিশ্বাস, বিবেক চাইব তার কাছে সহায় সুখ চাইব না ত কার কাছে চাইব? আমার শরীর দিয়েছিস্, সংসার দিয়েছিস্, পুত্র কন্যা দিয়েছিস্, স্ত্রী, ভ্রাতা ভগ্নী দিয়েছিস্। এ সকলের জন্যে যদি আমার প্রয়োজন হয় তবে কার কাছে চাইব? সংসারে, এ ব্রহ্মাণ্ডে দেবার মালিক তুই ছাড়া কে আছে মা আমাকে বল? বল না? আর কেউ নাই মা। তুই ভিন্ন যদি গতি না থাকে তবে তুই ভিন্ন আর কে দেবে মা? তোর কাছে চাইব না ত, আর কার কাছে চাইব মা! আমার যে মার ঘর। ঘরের দোর খোলা। যা ইচ্ছা তাই নিচ্ছি। মা তুই ত হাসি মুখে সব দিচ্ছিস্ মা। অর্থ চাইলেও হাসি মুখে দিচ্ছিস্। আবার ভক্তি চাইলেও হাসি মুখে দিচ্ছিস্। তোর কাছে সব যে সমান মা। অর্থ চাওয়া যে চাওয়া ভক্তি চাওয়াও সেই চাওয়া। কেবল মা তোর কাছে চাইতে জানলে হয়। তুই শুধু দেখিস্ কতটা তোর প্রতি টান্ আছে মা। আমি ফাঁকী দিয়ে তোর কাছ থেকে নিতে চাইছি কিনা। দে মা আমায় সব দে। অর্থ দে, ভক্তি দে, বিশ্বাস দে, বিত্ত দে। সুখ দে, সম্পদ দে, বিবেক দে মা। দে মা তোর সংসারে আমায় হাতে তোর চাবী কাঠি। মা গো আমার সব দাতা তুই মা।

মঙ্গলবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে ৮॥ আরও একটু পরে গায়ত্রী জপ করতে করতে দেখি কোথায় যেন চলে যাচ্ছি। একটা পার্ব্বত্য রাস্তা শ্বেত বরফে ঢাকা। অনেক উঁচুতে উঠে সমতল ও সামনে একটা পর্ব্বত। আমি পর্ব্বতের দিকে চলেছি। নিকটে গিয়ে দেখি পর্ব্বত কেটে একটা মন্দির তৈরী করা হ'য়েছে। খুব প্রশস্ত পথ। দরজা নাই। খিলানের পর খিলান। প্রতিটি খিলানে সারা দেওয়ালে মূল্যবান্ মনি মুক্তা প্রোথিত। প্রায় সপ্তম খিলান পার হ'য়ে একটি বিগ্রহ মূর্ত্তির কাছে এলাম। একটি বিরাটকায় সর্প সর্ব্বদেহ কুণ্ডলীকৃত করে ছত্রাকৃতি ফনা বিস্তার করে পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে পশ্চিম দিকে মুখ করে। (আমি যে দিক দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম সেটা পশ্চিম দিক)। স্থির শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তার নাসিকার রন্ধ্র ও অতি উজ্জল চক্ষু আমি অতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তার মস্তকে একটি ত্রিকোন গেরুয়া রংয়ের মণি ও সেই মণি থেকে এমন তীব্র আলোক বের হ'চ্ছে যে সে দিকে চাওয়া যায় না। সর্পটি আমার দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেই বিরাট ফনার নীচে একটি বিগ্রহ দাঁড়িয়ে আছেন। কি বিগ্রহ অনেক চেষ্টা করেও দেখতে পেলাম না। এ দৃশ্য প্রায় এক ঘণ্টার মত দেখেছি।

আমার মা সহায়।

বুধবার, ২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে গায়ত্রী জপ করবার পর শুতে যাই। শুয়ে চোখ বুজেছি দেখি একটা বিরাট্ নাট্ মন্দির। অতি সুন্দর মসৃন পাথর দিয়ে তৈরী। কালো ও গেরুয়া পাথর দিয়ে তৈরী। এবার উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক দিয়ে নাট্ মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দিরের ভিতরে মাথার উপরের খিলানও পাথরের তৈরী; কোথায়ও জোড়া নাই। একটা যেন বিরাট্ কালো মসৃণ পাথর দিয়ে তৈরী ও প্রকাণ্ড। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে একটা চতুর্দ্দোলায় একটি বিগ্রহ। কিন্তু কি বিগ্রহ দেখতে পেলাম না। আজ প্রায় ২/৩ সপ্তাহ হোল মা আমাকে

দর্শন দিচ্ছেন না। আমার উপরে অভিমান করেছেন। বলেছিলেন "সাধনের প্রথম দিকে এসব কথা কাউকে বলবি না"। সে কথা শুনি নাই। বলেছি, তোমাকে দেখেছি, আমার সব ভাইকে জানাব তাতে দোষ কি? বললেন "এখন না, বলবার সময় এলে তখন আর তোকে বলতে হবে না। তোকে সকলে চিনে নেবে আমার ছেলে বলে।"

আমার মা সহায়

বৃহস্পতিবার, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ক'দিন থেকে মা বলছেন "মিথ্যা কথা বলবি না, পর নিন্দা করবি না আর বাক্ সংযম করবি।" মিথ্যা কথা যাতে বলতে না হয় তার চেষ্টা করছি। কিন্তু পারছি কই? অনেক সময় বলে ফেলি অভ্যাসের দোষে। পরনিন্দা করব না ভাবি। কিন্তু যেই সকলে পরনিন্দা আরম্ভ করেন অমনি তাদের সাথে যোগ দেই। আর বাক্ সংযমও কিছুতেই হবে না। অফিসে নানা কাজে কথা না বললে চলে না। মার কোনও কথাই রাখতে পারছি না। আমার দ্বারা সাধন কি করে হবে? আমি একেবারে অবাধ্য। মার কোনও কথাই রাখতে পারছি না। অবাধ্য সন্তানকে মা যতই না শাস্তি দিন্ বা কঠোর শাসন করুন মা কি সন্তানকে ভাল না বেসে থাকতে পারেন? এ যে নাভির টান; আমি যে মায়ের দুষ্ট ছেলে। মা আমার সঙ্গে কেবল লুকোচুরি খেলেন। একবার দেখা দেন্ আবার লুকান।

মা আমার সহায়।

রবিবার, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

টালিগঞ্জে লতিফ সাধুর কাছে আজ প্রায় ১০টায় শীতল মিস্ত্রির সঙ্গে যাই। বাড়ীর কাছে যেতে দেখি তিনি একজন লোকের সঙ্গে একটা জায়গা দেখতে যাচ্ছেন। আমাদের ঘরে বসতে বলে চলে গেলেন ও ১০।১৫ মিনিটের ভিতরে ফিরে এলেন। লতিফের সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভালো লাগল। তাঁর গুরু ছিলেন ধীরেন গোঁসাই—একজন উচ্চস্তরের সাধু, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের

ব্যক্তি। লতিফের গ্রামের কাছাকাছি একটি গ্রামে পাগলের বেশে থাকতেন ও লোকে তাঁকে পাগল বলে জানত। তিনি যে এত উচুস্তরের সাধু সেটা কেউ বুঝতে পারেনি। লতিফের বাড়ীতে আহার গ্রহণ করার পর আসে পাশের সব হিন্দু অধিবাসিগণ তাঁর আখড়া চড়াও করে তাঁকে অত্যাচার করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু কেউ আখড়ার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। সকলে যে যে অবস্থায় ছিল তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তখন তিনি লতিফকে চার পয়সার চা ও চার পয়সার চিনি আনতে দেন এবং বলেন যে এত সব অভ্যাগত তাঁর দুয়ারে এসেছেন দয়া করে তাদের আপ্যায়িত করা তাঁর বিশেষ কর্ত্তব্য। সেই চার পয়সার চা ও চার পয়সার চিনি দিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করা হয় এবং আরও চা চিনি বেঁচে যায়।

লতিফ একজন সাধক ও সাধনায় সিদ্ধ। তাঁর দেহ থেকে একটা জ্যোতি নির্গত হয়। তিনি কোরাণ সরিফ সর্ব্বদা পাঠ করেন। তাঁর কাছে আল্লা ও কালী একই মহাশক্তি। নিজের গর্ভধারিণী জননীকে লতিফ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীর মাতা ও সারাৎসারা ব্রহ্মময়ীর ভিতরে পার্থক্য নাই। ভালবাসার স্নেহ প্রস্রবণ একরূপতা গ্রহণ করেছে এই দুইয়ের মধ্যে। তারতম্য শুধু মহানত্বে। আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা। আমার মনের সঙ্গে মিলে গেল। বড় ভাল লাগল সরল উদাসী লতিফের ব্যবহার। মিষ্টি মুখ করালেন অতি যত্নে। মা যে কোথায় কোন্ রত্ন রেখে দেন তা কে জানে। এ অমূল্য রত্ন তার অমূল্য সংগ্রহ।

আমার মা সহায়।

রবিবার, ১৩ই মে, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্ম মন্দিরে উপাসনা করলেন শ্রদ্ধেয় মনি সেন মহাশয়। সঙ্গীত করলেন হরি-সুধন্য। মনি বাবুর উপাসনা গভীর ভাবের। এঁর জীবনে মায়ের স্পর্শ আছে। সাধক লোক। উপাসনায় বসে ধ্যানস্থ হ'য়েছি।

গভীর ভাবের ভিতরে ডুবে গিয়েছি। অতি দূর দূরান্তরে চলে গিয়েছি। চোখ বুঝলেই এখন এইরূপ হয় —। যেন উর্দ্ধে অতিদূরে কোথায় কোন আলোর রাজ্যে চলে যাই। অনেকক্ষণ এই ভাবে নিমগ্ন আছি। হঠাৎ যেন সেই দূরান্তর থেকে কে যেন আমাকে একটা আলোকময় পর্দ্দার সামনে আমার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে দিলেন। আমার মেরুদণ্ড থেকে একটা উত্তাপ প্রবাহিত হ'য়ে আমার মস্তকে এসে আমার শরীর, কর্ণ, মস্তক ভীষণ উত্তপ্ত করে দিল। আমি ক্ষণিক ভয় পেলাম। এ অভিজ্ঞতা আমার কয়েক সেকেণ্ড ছিল। ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীতের জায়গায় যে চৌকি পাতা আছে ও তার উপরে যে জাজিম পাতা আছে তাতে একটি শক্তি আছে। কারণ তার উপরে বসে ধ্যান করলেই অলৌকিক সব দৃশ্য দেখতে পাই। আমার মা ভরসা। মা বললেন "আজ অক্ষয় তৃতীয়া। আজ রাত্রে ১২ টার পর থেকে ৩ টার ভিতরে একটি জলপদ্ম নিয়ে অঞ্জলীকৃত হ'য়ে আমার আরাধনা করলে যা অভিলাষ করবি তাই পাবি"। মন্দিরের পরে একটি জল পদ্ম /১০ পয়সায় কিনে আনলাম। এনে ভাল করে রেখে দিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম। ঠিক ১২-১০ মিনিটে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। হাত পা ভাল করে ধুয়ে কাপড় ছেড়ে, আসনে দক্ষিণ মুখে বসে পদ্মটিকে অঞ্জলীকৃত করে ধ্যানে বসলাম। কিছুক্ষণ কেটে গেল। পায় ঝিঁ ঝিঁ ধরে যায় এমনি করে কিছুক্ষণ কাটল। কিছুক্ষণ পরে মনে হোল দূরে আলোর পরদা ফাঁক ক'রে একটি অতি সুন্দরী মেয়ে আমার সব লক্ষ্য করছে ও খুব আনন্দ অনুভব করছে। মনে হ'চ্ছে যেন সেইখানে অনেক লোকজনের আনা গোনা চলছে। আমি আমার যা যা চাইবার ছিল সব চাইলাম। অর্থ, বিত্ত, চরিত্র, প্রেম, ভক্তি, শক্তি, দর্শন, সিদ্ধি আরও অনেক। এ যেন পেটুকের অভুক্ত অবস্থায় থাকবার কয়েকদিন পর উপাদেয় খাদ্য সামনে আসলে সব কিছু —সে এক সঙ্গেই খেতে আরম্ভ করে

আমার মা ভরসা।

মঙ্গলবার, ১৫ই মে, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ শরীর অসুস্থ্য। সর্দ্দিজ্বরের মত হ'য়েছে। সকালে Salt খেয়েছি ও এক কাপ চা খেয়েছি। সারাদিন লেবুর জল ও গরম জল খেয়ে পেট পরিষ্কার করছি। উপবাস করছি। যতটা পারছি গায়ত্রী জপ করছি। তিন কোটি গায়ত্রী জপ করলে তবে সিদ্ধি হবে। আমি জপ কতবার করলাম সেটা গোনা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ হ'য়েছে। যখন সিদ্ধি লাভ করব তখনই জানতে পারব তিন কোটি জপ হ'য়ে গেছে। আমি যে মাকে ডাকি তার সংখ্যা গুনে রাখবার কোনও দরকার নাই। মা যদি আমার ডাকে খুসী হন তবেত তিনি নিজেই দেখা দেবেন। আজ কিছুদিন হোল আমার মা আমায় দেখা দিচ্ছেন না। সকলকে এ-সব সাধনার কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি অনেককে বলেছি। বোধ হয় সেই জন্যে আমার উপর রাগ করেছেন। ছেলের উপরে মা রাগ করে কতক্ষণ থাকতে পারে? দেখা দিতেই হবে।

আমার মা ভরসা।

বুধবার, ১৬ই মে, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে ১২ টার পর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল ও আর ঘুম এলনা। ভাবলাম কি করি। আর কি করব মাকে ডাকছি অর্থাৎ গায়ত্রী জপ করছি। জপ করতে করতে দেখছি পুষ্করিণীতে নাইতে নামলে যেমন জল পরদার পর পরদা সরে যায় ও ডুব দিয়ে জলের ভিতর তাকালে যেমন হয় আমার চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় তেমনি হ'চ্ছে। একটার পর একটা পরদা সরে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। চোখের সামনে আস্তে আস্তে আলোক মণ্ডল ভেসে উঠছে। ক্রমে উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি। বহুদূরে চলে গেছি। একটা জায়গায় এলাম। জায়গাটা স্বর্ণ আভায় আভাযুক্ত। নানা রকম মন্দির—সবই প্রায় মন্দির আর সবই স্বর্ণ আভাযুক্ত বা স্বর্ণাভ। এমন মনোরম পরিবেশ ও এত শান্তিপ্রদ যে অভাবনীয়। আমি যেন অপরিমেয় আনন্দে পরিতৃপ্ত। সেখানে নানা রকম বৃক্ষ, ফুল ও সবই স্বর্ণাভ। একটি স্বর্ণ দোলনায় একটি স্বর্ণ প্রতিমা সম্রাজ্ঞীর সাজে সেজে

দোল খাচ্ছেন। বললাম এ কোথায় এলাম? "মা বললেন" এ গোলক, এখানেও আমি থাকি, এর নীচে চেয়ে দেখ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড"। সত্যি দেখি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নীচে একটা আলোকের বন্যার ভিতরে ভেসে রয়েছে। অগণিত নক্ষত্র রাজি। আমাকে নিয়ে চললেন, দেখালেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। কত লক্ষ লক্ষ সূর্য্য ও তাদের নিজ নিজ মণ্ডল। কত লক্ষ লক্ষ চন্দ্র ও তাদের-মণ্ডল। অনন্তে আমি ভেসে চলেছি। আমার সঙ্গে আমার মা আছেন। কিন্তু তাঁকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু স্থির জানছি আমার সঙ্গে আমার মা। মা আমায় অনেক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর বললেন "আজ থেকে পাঁচ বৎসরে তোর অর্থ বিত্ত ইত্যাদি সব হবে। তারপর প্রস্তুত হও, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তোমাকে আমি মহাশক্তি দেব। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত মানব জন্ম গ্রহণ করেছে সকলের চাইতে তোমাকে অনেক বেশী দেব। তোমার শক্তি মহাশক্তি হবে। তুমি যা চেয়েছ তাই তোমাকে দেব।" আমি চাই যাকে স্পর্শ করব সেই মাকে দেখতে পাবে ও পবিত্র হবে। যার যা রোগ ব্যাধি আছে তাদের স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে তারা রোগ মুক্ত হবে। আমি সর্ব্বক্ষণ মাকে দেখব আমার কাছে রক্ত মাংসের শরীরে। পৃথিবীতে সকল বৈরীতা দূর হ'য়ে যাবে। যার যা বিশ্বাস সে সেই ভাবে আমার মাকে দেখবে ও তার জীবনের মহা পরিবর্ত্তন হবে। এমনি ক'রে দেশে দেশে মার নামের সাড়া পড়ে যাবে। সকলে সকল পাপ অন্যায় ভুলে মার ছেলে মেয়ে হ'য়ে সুখে সংসার করবে। পৃথিবীতে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আমি চাই। এ আমি আমার মার কাছ থেকে আদায় করে তবে ছাড়ব। মাকে আমায় এ শক্তি দিতেই হবে।

আমার কেবল মা ভরসা।

মঙ্গলবার, ২৯শে মে, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ আফিস থেকে এসে প্রায় ৭॥০ টার সময় বসে বসে চোখ বুজে গায়ত্রী জপ করছি। দেখি এক পদ্মবন। পদ্ম ফুল নাই। একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ে

আছে শুধু বড় বড় পদ্ম পাতা। সেখানে দুটি শ্বেত হস্তী সেই পদ্ম পাতা ও মৃণাল ভক্ষণ করছে। ওপারে একটি অতি মনোরম পরিবেশ। সেখানে একটি আশ্রম আছে বলে মনে হোল। একটি মুণ্ডিত মস্তক যোগীর বাস। স্থানটি অতি মনোরম। চারিদিক বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ ও এক স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত।

আমার মা সহায় —।

বুধবার, ৩০শে মে, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ থেকে মনের ভিতরে নিদারুণ কামভাব জেগেছে। মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। কেবল কাম চিন্তায় শরীর মন উন্মাদ হয়েছে। কিছুতেই মনকে সংযত করতে পারছি না। গায়ত্রী মন্ত্রও করতে ভুলে যাচ্ছি। কখন কখন করি কিন্তু বেশীর ভাগ সময় কামের দাস হ'য়ে যাই। মা বলছেন "এতে সাধন ফল নষ্ট হয় সত্যি, কিন্তু ভোগই বল আর উপভোগই বল সেই সেই আকাঙ্ক্ষার চরম নিবৃত্তি না হ'লে সাধনার ব্যাঘাত হবে এবং মুক্তি নাই। মনের কোনও সামান্যতম গোপনে কাম চিন্তা থাকলে যোগে বসে উপযুক্ত ফল লাভ হবে না। যে আকাঙ্ক্ষাটুকু আছে তার ভোগের দ্বারা চরিতার্থ হওয়া প্রয়োজন। তা না হ'লে জোর করে মনকে সংযত করলে বা ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে মনকে নিবৃত্ত করলে মনের সেই ময়লা নিঃশেষ হ'য়ে যায় না। মনের গভীরতম দেশে আপাতে সেই সামান্যতম ময়লা তপস্যার সকল ফল সমূলে বিনাশ করে দেবে। জ্ঞানী ব্যক্তির বিষয় আকাঙ্ক্ষা হওয়াও স্বাভাবিক। দৃঢ়ভাবে মনকে অনুশাসন করলে মন চুপ করে থাকে বটে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা ভোগের দ্বারা নিবৃত্তির ক্ষণপরেই আন্তরিক অনুশোচনা হ'য়ে থাকে, সেই অনুশোচনাই জ্ঞানী ব্যক্তিকে সাধন পথে আরও অগ্রসর করে দেয়। ভোগের পর যার আন্তরিক অনুশোচনা নাই সে জ্ঞানী বা সাধক নয়। নীতি বিগর্হিত কার্য্য জেনেও যখন জ্ঞানী ব্যক্তি ভোগের স্পৃহায় কাতর হন তখন তাঁর ভোগই কাম্য। এই ভোগের পর মুহূর্ত্তেই তাঁর মনে যে মহা পরিতাপ উপলব্ধি

হয় তাতে ভোগের দ্বারা যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হ'ল তার শতগুণ সুফল হয় তাঁকে সাধন পথে অগ্রসর করিয়ে দেবার। দেহ থাকলে দেহাত্মজ বৃত্তি নিরোধ দেহের ক্ষতিকর। যদি একবার নারী গমনে উদগ্র কামের কথঞ্চিত শান্তি হয় তাই শ্রেয়। কিন্তু নিরোধে শান্তি নাই। শুধু আছে আপেক্ষিক অনুশাসন। এক জন্মে যদি কাম ভোগের দ্বারা চরিতার্থ হয় পর জন্মে কামের গতি অতিশয় মন্দিভূত হবে। আর এক জন্মে যদি অনুশাসনে কাম আবদ্ধ থাকে তবে পর জন্মে সে শুধু কামের সেবাই করবে। জন্ম জন্মান্তরের অগ্রসরের পথে এক একটি রিপুর সন্তুষ্টি হ'লে সপ্তম জন্মে মানব-আত্মা সম্পূর্ণ ব্রহ্ম মুখীন হন। ইহা দেখা যায় যে কেউ বা ভীষণ কামুক, কেউ বা ভীষণ অর্থলোলুপ, কেউ বা ভীষণ হিংসা পরায়ণ, কেউ বা ভীষণ ক্রোধী, কেউ বা ভীষণ লোভী। ইহা পূর্ব্ব জন্মাকৃত ফল। ইহা স্বভাব জাত নিরোধে সংযত হয়, কিন্তু তার লয় হয় না। লয় না হ'লে সাধন হবে না।" আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এ যে মহা সমস্যা। আমার কেবল মা ভরসা। আজকে একলাই শুক্রবারের উপাসনা করলাম। ময়নারা কাঁচড়াপাড়ায় গেছে। উপসনায় যেন দেখতে পেলাম মা আমার সামনে বসে আছেন। খুব কাঁদলাম।

আমার মা ভরসা।

শনিবার, ২রা জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। বললেন "ভ্রূ যুগলের মধ্যে যে স্থান আছে সেখানে মনকে স্থির করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। মন একাগ্র করে "মধ্যমণি" দেখতে হবে।" জিজ্ঞাসা করলাম, মধ্যমণি কি? বললেন "আমিই মধ্যমণি সারাৎসার পরব্রহ্ম"। রাত্রে প্রায় দেড় ঘণ্টা একাসনে বসে যোগে মধ্যমণি দেখবার অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন চঞ্চল থাকাতে দর্শন হোল না। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে মনকে সংযত করতে না পেরে শুয়ে পড়লাম।

আমার মা ভরসা।

রবিবার, ৩রা জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মন্দিরে বিভূতিদার সঙ্গীত ও শচীদার উপাসনা। গানের চৌকিতে বসে ধ্যানস্থ হ'য়েছি। আশ্চর্য্য ওই জায়গাটির একটি গুণ আছে। ওখানে যতবার বসেছি মন স্থির ও একাগ্র হ'য়েছে এবং নানা ভাবে আধ্যাত্ম লোক দর্শন করেছি। প্রায় সত্যং জ্ঞানং এর পর থেকে আমার বাহিরের চেতনা প্রায় অবলুপ্ত তবে আরাধনার দু' একটি কথা মাঝে মাঝে কানে আসছে। কিন্তু আমি যেন উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি। আমার চোখের সামনে পরদার পর পরদা সরে সরে যাচ্ছে। একটি জায়গায় এলাম। সেটি অতিশয় রমণীয় শ্বেত আলোকে উদ্ভাসিত যেন কোনও গিরি কন্দর। চারিদিকে সব শ্বেত। গাছপালা কিছু নাই যেন বরফে ঢাকা। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় রাজ্য। মন প্রাণ আমার আনন্দে ভ'রে গেল। বললাম কোথায় এলাম? উত্তর এল "এ যে পরব্রহ্ম—লোক-দৃষ্টি মেলে থাক"। দৃষ্টি মেলে আছি, আস্তে আস্তে সেই আলোকের ভিতরে আকাশের রংএর একটি গোলাকার ছিদ্র দেখা দিল। সেই ছিদ্রের দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলে আছি ও উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি। সেখানে একটি চক্ষু দেখতে পেলাম।

আমার দৃষ্টি সেই চক্ষুর দিকে নিবদ্ধ হোল। ক্রমে সেই চক্ষুর মণির ভিতর দিয়ে উর্দ্ধে উঠতে লাগলাম। একটি শ্বেত পর্ব্বতের সম্মুখে একমাত্র অত্যুচ্চ গিরি শৃঙ্গে একটি রাস্তা একটি গুহার দ্বার দেশে এসে ভিতরে চলে গেছে। সেই গুহার ভিতরে মৃত্যুসম অন্ধকার। যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল অন্ধকার এক জায়গায় ছোট আকারে এসে জমেছে। কিন্তু মহা আশ্চর্য্য যে সেই অন্ধকার থেকে একটি তীব্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে জ্যোতি এত উজ্জল ও উগ্র যে তার দিকে দৃষ্টি যেন দেওয়া চলে না। কিন্তু আমি সেই জ্যোতি অবলোকন করলাম স্থির দৃষ্টিতে, তাতে আমার কোনও অসুবিধা হোল না। সেই জ্যোতি থেকে আলোক বিকীর্ণ হয়ে তা অসীম ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হ'চ্ছে। নীচে যে আলোক রাজ্য দেখেছিলাম তার উপরেও পতিত

হয়ে তাকে আরও বিচিত্রভাবে উদ্‌ভাসিত করছে। সকল নভমণ্ডলে চন্দ্র-সূর্য্য আমার দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। মনে হচ্ছে তাদের আলোকের উপরেও এ আলোক পড়ে যেন তাদেরও উদ্‌ভাসিত করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এ কি? উত্তর হোল "এই মধ্য মণি" "এই আমি শাশ্বত সারাৎসার পরব্রহ্ম"। জিজ্ঞাসা করলাম জীব তোমাকে কি করে পাবে? বললেন, "আমি মহা চুম্বক আকর্ষণ, জীব আমার অংশ আমি জীবের অংশী। আমি জীবময় জগতময়। সকল জীব আমাকে পাবেই। এই যে আকর্ষণ—এ আকর্ষণে জীব আমার প্রতি ধাবিত হচ্ছে। স্থূল দেহের আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে লক্ষ কোটি জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে জীব আমার সঙ্গ পাবেই। এ পরম সত্য। আমি নিয়ত আকর্ষণ করছি। দেহাত্ম বোধের বিকার যতই সঞ্জাত হোক না কেন, জীবের আমার আকর্ষণ ভিন্ন গতি নাই। এই পরম গতি। বিশ্ব ভুবন কিছুই মিথ্যা নয়। সকলই ধ্রুব সত্য। শুধু আকারের পরিবর্ত্তন। আকার পরিবর্ত্তন ছাড়া কিছুই সঞ্জাত হ'তে পারে না। জীবের দেহ ও জ্ঞান যেমন দেহ ও বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় তেমনি জন্ম জন্মান্তরের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে আমার প্রতি আকুল আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় ও যখন সকল দেহাত্ম বুদ্ধি জন্মান্তরে বিলুপ্ত হয় তখন তার আকর্ষণী শক্তি প্রবল হয় এবং আমার সঙ্গ লাভ করে। এ ভিন্ন জীবের অন্য গতি নাই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যদি মিথ্যা হয় তবে আমিও মিথ্যা। আমিই চরাচর ও চরাচরই আমি। এই চরাচরের স্থূল বিবর্ত্তন দেখে একে মিথ্যা ভাবলে আমাকে অস্বীকার করা হয়, আমাকে অবিশ্বাস করা হয়—এই একমাত্র মিথ্যা। যে সকল জ্ঞানী জগত মিথ্যা, সংসার মিথ্যা বলে গেছেন তাঁদের বাক্য তুমি দৃঢ় ভাবে খণ্ডন কর। আজিকার জগত যুগ যুগের বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে পরম পরিপূর্ণতার ভিতরে এসেছে। মানবগণের বুদ্ধি সম্পূর্ণ পরিপক্ক। কিন্তু দেহাত্ম বুদ্ধি তীব্রভাবে সঞ্জাত হ'য়ে মানব মনকে আমা হ'তে বিমুখ করে রেখেছে। আজিকার মানবগণ যদি আমার সামান্যতম স্বাদ পায় তবে এই জগত

মহা গৌরবময় স্বর্গ রাজ্য হবে। এই কর্ত্তব্য আজ তোমার উপরে আমি দিচ্ছি”।

আমার মা একমাত্র সহায়।

শুক্রবার, ৪ঠা জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

ময়না ও ছেলে মেয়েরা সব ছোড়দার ওখানে কাঁচড়াপাড়ায়। শুক্রবারের উপাসনা একাই করলাম। উপাসনায় এখন বসলেই কান্না পায়। উপাসনার সময় মনে হোল আমার মা পরম জননী আমার সামনে একটা চেয়ারে এসে বসে আছেন আমার দিকে চেয়ে। একটা সাদা কালো কল্কাপেড়ে শাড়ী পরে মাথায় সিঁথি অবধি ঘোমটা দিয়ে ও গলায় শ্বেত পুষ্পের একটি মালা পরে সহাস্যময়ী বসে আছেন। মুখখানা খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিনা। সঙ্কটবারিণী স্তোত্র পড়া যখন প্রায় শেষ হ'য়ে এল তখন আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। “শ্রীশ্রীহরিলীলা-রসামৃত-সিন্ধুর” উপরে মাথা রেখে প্রণাম করতে গিয়ে কান্না যেন জোয়ারের মত এল। সব ভাসিয়ে দিল। মাকে বললাম তোমার রক্ত মাংসের চরণ স্পর্শ করতে চাই। অনেকক্ষণ হাত বাড়িয়ে রইলাম প্রণামের অবস্থায়। মাকে বললাম দে তোর চরণ স্পর্শ করি। কিন্তু দিলেন না। বললেন “এখনও সময় হয় নাই। কি করে হবে? আমার ভিতর কি আর তেমন ভক্তি বিশ্বাস আছে?

আমার মা সহায়।

বৃহস্পতিবার, ৭ই জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজকে গীতা পড়ছি শুয়ে শুয়ে উত্তর দিকে মাথা রেখে। দেখলাম পায়ের কাছে “নববিধান” পত্রিকার তুই কপি রয়েছে। পড়ছিলাম গীতা, ধর্ম্মপদ, ও আমার শ্বশুর মহাশয়ের দেওয়া নোটবুক্ শিয়রের কাছে রেখেছি ও “নববিধান পত্রিকা দুটি পায়ের কাছে রয়েছে। একবার মনে হ'ল এ আমি অন্যায় করছি। পত্রিকা দুটি পায়ের কাছে রেখেছি। কিন্তু খানিকটা আলস্য বসতঃ ও খানিকটা গীতা পাঠে গভীরভাবে নিমগ্ন বলেই—পত্রিকা দু'টি শিয়রের কাছে নিতে

ভুলে গেছি। গীতা পাঠ শেষ করে দেখি পত্রিকা দুইটি আমার শিয়রের কাছেই রয়েছে। এ নিশ্চই মা করেছেন। মা আমার অনেক কাজ করে দেন। মা আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি এখন একলা বাড়ীতে আছি। ময়না ও বাচ্চারা সকলে কাঁচড়াপাড়ায় বেড়াতে গেছে। বাড়ীতে আমি ভিন্ন দ্বিতীয় লোক নাই। চারদিকে দরজা জানালা বন্ধ বৃষ্টির ভয়ে।

আমার মা সহায়।

সোমবার ১১ই জুন ১৯৫৬ খৃঃ কলিকাতা।

মা বললেন "তুমি কুষ্ঠি করতে দিয়েছ তারিণী মুখোপাধ্যায়কে? সে তোমার কুষ্ঠি মেলাতে পারবে না। তোমার জন্মক্ষণ বের করতে পারবে না। সে তোমার জীবনের কিছু বলতে পারবে না। যা তোমার জানবার দরকার সবই আমি বলে দেব। তোমার অন্য কারুর কাছে যাবার দরকার নাই।" আমার মা সহায়।

রবিবার, ১৭ই জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

৩রা জুন যে "মধ্যমণি" দেখেছিলাম আজ তার রূপ বিশদ্ভাবে দেখতে পেলাম ব্রহ্ম মন্দিরে। আজ মণি সেন মহাশয়ের উপাসনা ছিল ও আমার উপর সঙ্গীতের ভার ছিল। আজ আরাধনায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ধ্যানে বসলাম। খানিক পরে সেই আলোকের রাজ্যে এলাম ও আস্তে আস্তে আরও অগ্রসর হ'লাম। সেই উচ্চ গিরিপথে এসে সেই গুহার ভিতর প্রবেশ করলাম। দেখলাম আজ আর সেখানে অন্ধকার নাই। গুহা যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অত্যুজ্জল পরিব্যাপ্ত সুতীব্র আলোকে উদ্ভাসিত। তার মধ্যস্থলে একটি শিবলিঙ্গের মত বিরাট্ অগ্নিময় শীলা খণ্ড। সেই শিবলিঙ্গের মস্তকে ও দেহে আলোকের পুষ্পমালা সুতীব্র আলোক বিকীরণ করছে। শিবলিঙ্গটি অনেকটা তাম্র বর্ণের ও তার গাত্র থেকেই যেন ব্রহ্মাণ্ডময় আলোক উৎসারিত হ'চ্ছে। আমার প্রশ্ন হ'ল "এ কি?" উত্তর

হ'ল "এই, মধ্যমণি। সেদিন যা দেখেছিস্ সেই আলোকের উৎস এই 'আমি'। জমাট অন্ধকার যেটা ছিল সেটা মোহান্ধকার—। সেটা আজ কেটে গিয়েছে ও "আমি" "মধ্যমণিকে" দেখছিস্। এই যে মধ্যমণি এই পরব্রহ্ম। আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে আমি সেই ভাবেই তাকে দর্শন দিই। এই দেখ। দেখলাম লিঙ্গটি যেন ফেটে গেল এবং যেন আলোকে মিশে গেল। সেখানে বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তির আবির্ভাব হোল,—কালী, দুর্গা, রাজরাজেশ্বরী। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। আরও বললেন "আমার এই জ্যোতিতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট ও জীবসকল সৃষ্ট। আমি সর্ব্বময় ও আমার আদি জ্যোতিতে সকল জগৎ সংসার উদ্‌জীবিত। আমিই সারৎসার পরব্রহ্ম, আমাকে ভজনা কর"।

আমার মা সহায়

সব সময় গায়ত্রী জপ করছি। তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি "মা দুর্গা, মা ব্রহ্মময়ী মহাশক্তি দাও, দর্শন দাও—।

আমার মা ভরসা

মঙ্গলবার, ১৯শে জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল ও উঠে মুখে চোখে জল দিয়ে খানিকটা আলস্য বশতঃ ও খানিকটা শরীরের জড়তা থাকায় আবার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় ৫টা নাগাদ স্বপ্নে মহাযোগী শিব দর্শন হোল। দেখি শূন্যে একটি উচ্চ স্থানে আমার ডান দিকে একটি জ্যোতির্ম্ময় দেবতা যোগাসনে বসে আমার দিকে স্বস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর অঙ্গ অনাবৃত, মস্তকে জটাজুট, ঈষদ্ কটা বর্ণের, স্থূলদেহ ও দেহের বর্ণ অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যেন florecent electric এর আলোর মত। দিব্য জ্যোতিতে দেহ জ্যোতিষ্মান। আমার মন খুসীতে ভ'রে গেল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম এ আবার কি? মা বললেন "তোমার সাধনার সাহায্য করবার জন্যে আমার নির্দ্দেশে অনেক যোগী ও মহাপুরুষ তোমাকে উৎসাহ দেবেন।" আজ সারাদিন

মনটা আনন্দে ভ'রে রয়েছে ও থেকে থেকে সেই মহাপুরুষের কথা ভাবছি ও তাঁকে মনশ্চক্ষে দর্শন করছি।

আমার মা ভরসা।

শুক্রবার, ২২শে জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

অনেকদিন থেকে দেখছি একটি পাগল ফার্ণ প্লেস ও রাসবিহারী এভিনিউ এলাকায় অতি ধীর মন্থর পায়ে ঘুরে বেড়ান। চেহারা কালো ও অত্যন্ত নোংড়া, মাথায় নোংড়া অবিন্যস্ত চুল, মুখ ভর্ত্তি দাঁড়ি, গোঁফ। পরনে একটা ছেড়া হাফপেণ্ট ও গায়ে ছেঁড়া ময়লা একটা সার্ট। যে যা দেয় তাই খান ও খাদ্য মুখের চারদিকে এমন ভাবে লাগে যে পাগল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। তিনি বিড়বিড় করে কি বলেন আপন মনে, কেউ তা শুনতে পায় না। আমিও এঁকে পাগলই ভেবে এসেছি অনেকদিন ধরে। কিন্তু একদিন আমার কৌতুহল হ'ল এবং তার দিকে চেয়ে রইলাম। একটি পাকা আম তাঁকে কেউ খেতে দিয়েছেন। সেই আমের রস সারা মুখে, দাঁড়িতে লেগেছে। অর্দ্ধভুক্ত আমটি তখন তাঁর ডান হাতে রয়েছে। তিনি ফার্ণ প্লেসের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে আস্তে আস্তে আসছেন। তিনি কারুর দিকে ফিরে তাকান না; রাস্তার কেউ তাঁকে গ্রাহ্যও করে না। আজ আমি রাস্তার ধারে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইলাম দু'টি পয়সা হাতে করে। তিনি এগিয়ে আস্‌ছেন আস্তে আস্তে কোনও দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধু সামনের দিকে চেয়ে। আমার কাছাকাছি আসতে আমি তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন ও দু'তিন বার চোখ টিপলেন। একটু যেন মুখখানা আনন্দময় হোল। চেয়ে দেখলাম সে চোখে পাগলের দৃষ্টি নাই, সে চোখে আছে কঠোর সাধনার দৃষ্টি। মাথায় চুল যা ছিল দেখছি এতদিন—সেটা জটা, চোখে অপূর্ব্ব জ্যোতি। আমি বুঝলাম ইনি একটি পরম জ্ঞানী ব্রহ্ম সাধক। কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করছেন। দুটি পয়সা দিলাম। হাত পেতে নিলেন।

মা আমাকে কত অভিজ্ঞতা দেবেন কে বলতে পারে। আমার মা সহায়।

রবিবার, ২৪শে জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা

আজ সকালে captain Dr. সুব্রত মজুমদারের শ্রাদ্ধ বাসরে শ্রীযুক্ত ননী দাসগুপ্ত মহাশয় উপাসনা করলেন ও সুব্রতের আত্মীয় কয়েকটি ছেলে মেয়ে মিলে সঙ্গীত করলেন। আরাধনায় আমি মগ্ন হ'য়েছি। দেখছি দক্ষিণ আকাশে প্রায় ৪৫° উঁচুতে একটি আলোকময় রাস্তা। রাস্তার পশ্চিম দিকে একটি অপরূপ শ্বেত পর্ব্বত। বর্ষাকালে মেঘলা আকাশে বৃষ্টির পরে মেঘের ভিতর দিয়ে রৌদ্র উঠলে যেমন চারিদিক উদ্‌ভাসিত হয় এ জায়গাটা তেমনি এক অপরূপ আলোকে উদ্‌ভাসিত হ'য়েছে। সেই শ্বেত পর্ব্বতের গায়ে আলোক পড়ে সমস্ত জায়গাটি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভ'রে গিয়েছে। এমনটি আমি পৃথিবীতে কখনও দেখিনি। সেই রাস্তার মোড়ে একটি কুঞ্জবীথি। একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ অতি সুন্দর, তার তলায় রাণু (সুব্রত) দাঁড়িয়ে আছেন। একটি জ্যেকেটের মত ঈশদ্ সাদা হাফ হাতা জামা গায় তার কলার ছোট মেয়েদের ফ্রকের মত বড়, পরনে একটি লম্বা পায়জামা। এঁর সঙ্গে একটি শ্যামবর্ণের ব্যক্তি আছেন। তাঁর মাথায় চুলগুলি খুব ছোট ছোট করে কাটা, কাঁচা চুল বেশী পাকাও আছে। লম্বা দোহারা গড়ন, গায়ে শুধু একটি খদ্দরের চাদর ও পরিধানে একটি ধুতি। এরা দুজনেই উপাসনায় যোগ দিচ্ছিলেন। যেন দাঁড়িয়ে উপাসনার সব দেখছেন ও শুনছেন। রাণুর (সুব্রত) মুখখানা অতি শান্ত ও আনন্দময়। উপাসনার শেষে সেই পুরুষটি রাণুর হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইলেন। সেই সময় রাণুর বড় মেয়ে তাঁর জীবনী পাঠ আরম্ভ করলেন। রাণু যেতে গিয়ে আবার ফিরে এল ও সেই রাস্তায় বসে পা দুটি সামনে লম্বা করে দিয়ে জীবনী পাঠ শুনতে লাগল। ছোট মেয়েও জীবনী পাঠ করল ও সেই পর্য্যন্ত রাণু তেমনি বসে রইল। "বলরে বলরে বলরে সবে ব্রহ্ম কৃপা হি কেবলম্" সঙ্গীত পর্য্যন্ত তেমনি বসে রইল। তারপর সেই পুরুষের সঙ্গে উঠে কোথায় যেন চলে গেল। এই কথা আমি রাণুর ভাই অতুকে বললাম। স্বর্গীয় জ্যোতিষ চন্দ্র বাগচি ও রাণুর পিতা শ্রীযুক্ত শ্রীশ্ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়দের জিজ্ঞাসা করলাম যে

ওই রকম চেহারার কোন লোকের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তা বা জানা শোনা আছে কিনা, তাঁরা কিছু বলতে পারলেন না। আমার ব্রহ্মময়ী জননী ভরসা।

রবিবার ২৪শে জুন ১৯৫৬ খৃঃ কলিকাতা।

আজ ব্রহ্মমন্দিরে বিভুতিদার উপাসনা ও আমার ৬।।৹টা থেকে ৭টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করবার কথা ছিল। কিন্তু পথে নিরঞ্জন-দাকে নিয়ে যেতে দেরী হ'য়ে গেল। ৭টা বাজতে ১০ মিনিটের সময় পৌছলাম ও একটি কীর্ত্তন করলাম। "চল ভাই চল মার কাছে যাই।" প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীত মৃণাল করল। প্রথম সঙ্গীত বিভুতিদার রচিত ও দ্বিতীয়টি "সীমার মাঝে অসীম তুমি।" আরাধনায় আমি মগ্ন। কোন কোন কথা আমার কাণে আসছে আবার কোন কোন কথা আমার কাণে আসছে না। আমি সেই ঊর্দ্ধে আলোকের রাজ্য পার হ'য়ে "মধ্য-মণির" কাছে এসেছি। সেখানে এসে দেখি "মধ্য মণি" থেকে একটি সুতীব্র শ্বেত focusing আলো চারিদিকে প্রবাহিত হ'য়ে যেন তার মহাজ্যোতিতে সকল ব্রহ্মাণ্ড উদ্‌ভাসিত করছে। সেই জ্যোতির সামনে একটি দণ্ডায়মান বিগ্রহ নীল বসন ও অনেক অপরূপ মালা ও অলঙ্কার ভূষিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বিগ্রহের মুখ দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু অবয়ব দেখতে পাচ্ছি। একটি পরম ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন দেবী মূর্ত্তি। প্রশ্ন করে জানলাম এই ব্রহ্মময়ীর মূর্ত্তি। আমার প্রাণ মন আনন্দে অধীর হোল।

আমি যখন সময় পাই গায়ত্রী জপ করি। তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি শেষে— মা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মজ্ঞান দাও, দিব্যজ্ঞান দাও, দিব্যদৃষ্টি দাও, মহাশক্তি দাও, জীবন্তরূপে দর্শন দাও, অর্থ দাও, অটুট স্বাস্থ্য দাও। শশিভুষণের পরিবারের সকলকে নিরোগ কর, রক্ষা কর। আমি যাকে স্পর্শ করব সেই দিব্যদৃষ্টি পাবে, তোমার দর্শন পাবে। আমি যাকে স্পর্শ করব সেই রোগ মুক্ত হবে, অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে, তোমাতে বিশ্বাসী হবে, পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে ও তোমাকে সকলে স্বীকার করবে।

আমার ব্রহ্মময়ী মা একান্ত সহায়। তিনি আমাকে হাত ধরে সাধনের স্তরে স্তরে নিয়ে চলেছেন। মা আমার অপার করুণাময়ী।

সোমবার ২৫শে জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে গাড়ী আনতে ফার্ণ প্লেসে গেছি। গেরাজ খুলে গাড়ীতে তেল জল দিচ্ছি এমন সময় কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আমি শুনলাম একটি নারী কণ্ঠে "হরি বল, হরি বল, হরি হরি বল" বলতে বলতে একটি আধ-বয়েসী বিধবা মহিলা (নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের বলে মনে হ'ল) আমার গেরাজের সামনে এসে আমার কাছে হাত পাতলেন ও "হরি হরি বল, হরি হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বলে, দুই হাত তুলে নাচে গায়" এইসব বলতে লাগলেন। আমি তাঁকে এক আনা হাতে দিলাম "তিনি বললেন" আনন্দ কর, আনন্দ কর, আনন্দ হোক, হরি বল হরি বল বলতে বলতে যেন কোথায় চলে গেলেন।

আমার মায়ের একি কৌশল ? মা আমার চারিদিক থেকে হরি নামে ঘিরে রাখতে চান। আমার মা সহায়।

মঙ্গলাবর, ২৬শে জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ আফিসে গিয়ে শুনলাম Mrs. Mazumdar নামে একটি মহিলা আমাকে telephone এ বিকালে circus Avenue-এ রাণুদের (Dr. সুব্রত মজুমদার) বাড়ীতে যেতে অনুরোধ করেছেন। আফিস ফেরৎ বিকাল প্রায় ৬৷৷০টায় সেখানে গেলাম। সেই যে রবিবার দিন রাণুর বিষয় অনুকে বলেছিলাম সেকথা অনু সকলকে বলেছে। রানুর মা, রানুর স্ত্রী, অনু, অনুর বৌদি ও আরও দু'একজন মহিলা আমাকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যা দেখেছি সব বললাম। শুনে রাণুর মা বললেন যে সেই পুরুষটি আর কেউ নন তিনি হ'চ্ছেন স্বর্গীয় সুধীর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর সঙ্গে এ পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল ও তিনি একজন দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন সাধক ছিলেন। তিনি কলেরায় আক্রান্ত হ'য়ে কেম্বেল মেডিকাল হাসপাতালে পরলোক গমন করেন।

তাঁর মৃত্যুর সময় রাণু হঠাৎ সেখানে যায় ও তাঁকে বাঁচাবার জন্তে আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাঁর চেহারা ও পোষাক আমি যেমনটি দেখেছি ঠিক হুবহু মিলে গেল। রাণুর মা ও স্ত্রী আমার কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পেলেন। অণুর সঙ্গে গাড়ীতে নানা বিষয় আলোচনা করতে করতে Southern Avenue দিয়ে ফিরলাম। আমার ব্রহ্মময়ী মা জননী একান্ত ভরসা।

শনিবার, ৩০শে জুন, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ক'দিন ধরে সেই পাগলরূপী সাধককে আর দেখতে পাচ্ছি না। আমার মনে ধারণা হ'য়েছে যে সেদিন তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আমি তাঁকে চিনেছি ও যাতে তাঁর আসল স্বরূপ সকলের কাছে ব্যক্ত না হয় সেই জন্তে তিনি লুকিয়ে পড়েছেন। লুকিয়ে পড়বার আগে সেই আধবয়েসী মাতৃসমা নারীকে দিয়ে আমাকে উৎসাহ দিয়ে গেলেন। সত্যই আমি খুব উৎসাহিত হ'য়েছি ও আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছি দুশ্চর সাধনা করবার জন্যে। সংসারের সকল আরব্ধ কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করে আমাকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করে মহাসাধনা করতে হবে। এই সাধনা কিসের সাধনা সে কথা মা আমাকে বলে দিয়েছেন।

আমার মা সহায়।

রবিবার, ১লা জুলাই ১৯৫৬খৃঃ, কলিকাতা।

আজকের উপলব্ধি আরও আশ্চর্য্য। মণি সেন মহাশয়ের উপাসনা ও বিভূতিদার সঙ্গীত ব্রহ্মমন্দিরে। শাশুড়ী ঠাকরুন, সুমনাদি ও নিরঞ্জন দাকে নিয়ে গাড়ীতে প্রায় পৌণে সাতটায় মন্দিরে পৌঁছুলাম। কীর্ত্তন করছেন বিভূতিদা "হরিনাম সংকীর্ত্তনের মাঝে আজ দয়া করে এস এস হে।" কীর্ত্তনে যোগ দিলাম। ভাবাবেশ হোল। চোখ বুজলাম। তারপর প্রথম গান, উদ্বোধন কিছু কিছু শুনলাম। কিন্তু আরাধনার আর কিছু শুনতে পাই নাই। মাঝে মাঝে সেই আলোকের রাজ্যে আসছি আবার মাঝে মাঝে "মধ্যমণির কাছে আসছি। আজ "মধ্যমণির" সমস্তটাই আলোকের দণ্ড ও তার গলায় পুষ্পহার।

আজ সকাল থেকেই মাকে বলেছি মধ্যমণি টনি আমার ভাল লাগে না। আমি তোমাকে চাই। তুমিইত' মধ্যমণি তোমাকে রক্তমাংসের দেহে সারাক্ষণ আমি দেখতে চাই। তাই আবার সেই মহিমাময়ী মাতৃমূর্ত্তি ধ্যান করছি। প্রায় সারাক্ষণ গায়ত্রী জপ ও তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি।" মা দুর্গা, মা ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মজ্ঞান দাও, দিব্যজ্ঞান দাও, দিব্যদৃষ্টি দাও, মহাশক্তি দাও, জীবন্তরূপে দর্শন দাও, অর্থ দাও, অটুট স্বাস্থ্য দাও, শশিভূষণের পরিবারের সকলকে নিরোগী কর দীর্ঘজীবি কর ও রক্ষা কর। আমি যাকে স্পর্শ করব সে দিব্যদৃষ্টি পাবে ও তোমার দর্শন পাবে ও তোমাকে স্বীকার করবে। আমি যাকে স্পর্শ করব সেই রোগমুক্ত হবে, অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে ও তোমাকে বিশ্বাস করবে। পৃথিবী থেকে পাপ, অনাচার, অবিশ্বাস, বৈরীতা দূর হ'য়ে যাবে, জগতের সকলে তোমার হবে, তুমি সকলের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে ও পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।''

আরাধনার সময় দেখলাম "মধ্যমণি'' যেন আমার মাতৃরূপ ধারণ করল। "মধ্যমণির" জায়গায় আমার মা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গলায় পুষ্পমালা, মাথায় ঈষৎ ঘোমটা, শাড়ী প'রে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই সময় আমি মার কাছে আছি ও নিম্নে আলোকের রাজ্যের বাঁ দিকে একধারে একটি বিরাট ও অতি অদ্ভুত মুখ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দেখা দিল। সে মুখ যেন ঈষদ্ কালচে ধরণের ও আমার দিকে বিকটভাবে চেয়ে আছে যেন পেলে আমাকে ছিঁড়ে ফেলে দেবে। আমি কিন্তু তেমন ভয় পাই নাই অথচ মার কোমর জড়িয়ে ধরে আছি একটি ছোট শিশু হ'য়ে। মা আমাকে বললেন "এ হ'চ্ছে 'মার'। আজ থেকে একুশদিন তোকে ও ভীষণ জালাতন করবে ও এ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। অনেকক্ষণ এভাবে কাটল। সাধারণ প্রার্থনার সময় সম্বিত ফিরে এল। দেখছি অনেক ভক্তবৃন্দ যেন আমার কাছে ভীড় করছেন। তার ভিতরে একজন বিরাট সাম্য দর্শন পুরুষকে দেখলাম। তাঁর দাঁড়ি ঘন ও পাকা, মাথায় চুল কম ও পাকা, বিরাট

মাথা, কাঁধ ও গলা বিরাট ও জ্যোতিষ্মান, দিব্য জ্যোতিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। মা বললেন ইনি "মূষা"। আরও অনেকে এলেন যেমন যীশু, নানক, কবীর, চৈতন্যদেব ইত্যাদি।

আমার শাশুড়ী ঠাকরুন একটা গান ধরলেন সাধারণ প্রার্থনার পর। চোখ মেলেছি। আমি যেখানে বসে আছি সেটা দক্ষিণ মুখ করে। আমার ঠিক সামনে মন্দিরের সদর দরজা ঠিক দক্ষিণ দিকে। সেখানে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক দরজার মাঝখানে এবং একটি হাত অনেকটা মুদ্রার মত করে উর্দ্ধে বাঁ-দিকের দরজা ধরে আছেন। বিবাহিতা বয়স পঁচিশের বেশী হবে না, বেশ স্বাস্থ্যবতী গৌরবর্ণা। একটি সাদা লাল পেড়ে শাড়ী পরে মাথায় ঈশদ্ ঘোমটা দিয়ে একাগ্র দৃষ্টিতে আমাদের গানের আসরের দিকে চেয়ে আছেন। শাড়ীখানা একটু ময়লা। গায়ের বর্ণ গৌর কিন্তু ম্লান ও পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী। আমার চোখ খুলতেই তার দিকে আমার একাগ্র দৃষ্টি পড়ল ও আমি কয়েক সেকেণ্ড তাঁকে দেখলাম। দেখে মনে হোল নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের বৌ। আমাদের রবিবারের উপাসনায় আমি অমন যুবতী, ঘরের বৌকে কখনও আসতে দেখি নাই! কিন্তু আমার মনে এসব কোনও চিন্তা তখন আসে নাই। তাঁকে দেখলাম ও আবার চোখ বুজলাম ও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতে মগ্ন হ'লাম। গান শেষ হ'য়ে যাবার পর মা আমাকে বললেন "আমাকে রক্তমাংসের শরীরে দেখতে চেয়েছিলি ওইত আমি এসেছিলাম।" এই বলে হাসছেন। আমি বললাম আবার দেখব। মা বললেন "আর দেখতে পাবি না এখন। চোখ খুলে পরীক্ষা করে দেখ।" সত্যসত্যই চোখ খুলে দেখি আর সেই নারী নাই। তারপর মণিবাবু ব্রহ্মানন্দের নাম সাধন থেকে পড়লেন। এক জায়গায় আছে "নাম করবার সঙ্গে সঙ্গে মাকে দেখা যাবে ও সকল ভক্তবৃন্দকে নিয়ে তিনি এসেছেন।" আমার তাই হোল। আমার মা সহায়।

আজ ব্রহ্মমন্দিরে আরাধনার সময় ধ্যানে বসে মনে হোল যেন একটা

High Voltage Electric আলো আমার কপালের উর্দ্ধে (নাক থেকে সোজা কপাল ছাড়িয়ে চুলের কাছাকাছি) মাঝে মাঝে দু'এক সেকেণ্ডের জন্যে আসছে আবার চলে যাচ্ছে। এ এক অভিজ্ঞতা।

আমার ব্রহ্মময়ী মা ভরসা।

বৃহস্পতিবার, ৫ই জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার মায়ের কথা ঠিক ফলেছে। "মার" আমাকে ভয়ানক জালাতন করছে আজ ক'দিন হ'ল। অর্থ অনটন প্রকট্ হ'য়েছে। কোনও রকমে সংসার খরচ চলে যাচ্ছে। কোনও দিক থেকে অর্থ আসছে না। যেখানে যা করতে চাই সব গোলমাল হ'য়ে যায়। রাহুল হঠাৎ আমাশয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। সে একটু ভাল হ'তে না হ'তে পুতুল অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। ব্যবসায়ে নানা অশান্তি। কাম প্রবল। নারী দর্শনে কামের ভীষণ প্রাবল্য। মাঝে মাঝে পাগলের মত হ'য়ে যাই যেন বিশ্বের সকল নারী আমার সামনে এসে উলঙ্গ হ'য়ে আমাকে প্রলোভিত করছে। আর বুঝি নিজেকে সংযত করতে পারছিনা। যতক্ষণ পারছি গায়ত্রী জপ করছি। তার সঙ্গে আমার পদ্ধতিতে মাকে ডাকছি। আমার কেবল মনে হ'চ্ছে আমি মায়ের কাছে আছি আর মা আমার অবস্থা দেখে হাস্‌ছেন। সারাক্ষণ বাম চক্ষুর উপরের পাতা নচছে। একটা কিছু বিপদের আভাস যেন পাচ্ছি। মাকে সারাক্ষণ ডাকতে চাই —। নানা কাজে আবার ভুলে যাই। যে সব কাজ আসছে নানা ভাবে অর্থের অভাবে কাজ গুলো হ'চ্ছেনা। অনেকের কাছে Profit-এর Share দেব বলেও টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। একটা বড় Consignment wharf এ পড়ে আছে। অর্থের অভাবে সেটা উঠাতে পারছি না। সে মালটা বিক্রি করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু হচ্ছে না। মনে হয় যেন হবে কারণ কেউ কেউ final করতে গিয়ে পিছ পা' হ'য়ে যাচ্ছে। কারখানার প্রায় দু'মাস Payment হয় নাই। মা আমার উপর তাদের ভার দিয়েছেন। কিন্তু আমার পাপে তারাও কষ্ট পাচ্ছে, মাকে বলেছি একটা ব্যবস্থা করে দে। আমার মালটা

বিক্রির ব্যবস্থা করে দে। যেন মনে হচ্ছে হাস্‌ছেন। আমার সঙ্গে খালি খেলা আর-খেলা। আমি যে এত সব বিপদের মধ্যে পড়েছি তবুও আমার যেন এ সব বিপদ বলে মনে হ'চ্ছে না। আমার মনে ও প্রাণে কে যেন একটা শান্ত ও মা-ভৈঃ ভাব দিচ্ছেন। কেবল মনে হ'চ্ছে এ কেটে যাবে আরও একটু ধৈর্য্য ধরলে। মনে কোনও দুঃখ যেন আসছে না। আমি যেন নির্লিপ্ত গোছের হ'য়ে গিয়েছি। এমন ভাব "এ যেন আমার দায় নয়। এ যে আমি ইচ্ছা করে করছি তা নয়। এ যেন আপনা থেকে হ'চ্ছে।

আমার কেবল মা ভরসা।

রবিবার, ৮ই জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ অক্ষয়দার উপাসনা আর হরিসুখদার সঙ্গীত ছিল ব্রহ্মমন্দিরে। সুষমাদি, শাশুড়ী ঠাকরুন, নিরঞ্জনদা সকলে নিয়ে মন্দিরে প্রায় পৌনে সাতটায় পৌঁছলাম।

আজকে আর তেমন কোনও অভিজ্ঞতা হ'ল না। শুধু আলোকের রাজ্যে গিয়েছি। যোগেশ্বরকে দেখতে চেয়েছিলাম মা আমাকে যোগেশ্বরকে দেখালেন।

আমার মা সহায়—।

সোমবার, ৯ই জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ময়না আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে অলৌকিক অনেক কথা যে শুনতে পাই যেমন একটি কন্যার খুব অসুখ হয়। তার ইচ্ছা হয় যে যদি কেউ তাকে জগন্নাথের চরণামৃত এনে দেয় তবে তার অসুখ সারবে। পরের দিন রথ যাত্রা। হাজার হাজার নরনারী রথের দড়ি ধরে টানছে। কিন্তু রথ তো চলে না। সেই কন্যার জন্যে তার মাতা পুরোহিতের কাছে একটু জগন্নাথের চরণামৃত চাইতে গিয়েছিল। কিন্তু তারা তাকে কটু বাক্যে তাড়িয়ে দিয়েছে। রথও চলল না। ভীষণ অমঙ্গল। রাত্রে প্রধান পুরোহিত স্বপ্নে নির্দ্দেশ পেলেন সেই কন্যাকে তাঁর চরণামৃত দিলে তবে রথ চলবে। তিনি কাউকে কিছু না বলে

চরণামৃত নিয়ে অতি প্রত্যুষে সেই কন্যাকে নিজ হাতে খাইয়ে এলেন। তারপর রথ টানতেই আবার রথ চলতে লাগল। ময়না বলল পুরোহিত কি করে জানলেন কোথায় সে কন্যা থাকে? আমি বললাম সবই মা দেখিয়ে দেন। এমনি কত কাজ যে মা করেন তার অন্ত নাই।

আমার মা সহায় —।

মঙ্গলবার, ১০ই জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "মৃত অবস্থায় যদি কোনও নারীর দেহ পড়ে থাকে তাকে কি তুই স্পর্শ করবি? ও ত শুধু মাংস পিণ্ড। প্রাণ-চঞ্চল বলে ও'তে কামনার উদ্রেক হয়। না হ'লে ওতে কিছুই নাই। মানসিক বিকার।"

মা আমাকে এই বিচার দাও।

বৃহস্পতিবার, ১২ই জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে বৃষ্টির দিকে চেয়ে আছি। দেখলাম অগণিত বৃষ্টির বিন্দু ঝরে পড়ছে। একটা জায়গায় খানিকটা জল জমে আছে। সেখানে সেই বিন্দু সকল পড়ছে। ভাবলাম ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য জীব সকল এইরূপ বিন্দুর মত ব্রহ্মরূপ জলাশয়ে প'ড়ে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে। জীবাত্মার আর কোনও নিজস্ব সত্তা থাকছে না। বারি বিন্দু যেমন জলাশয়ে পড়লে তাদের আর কোনও নিজস্ব সত্তা থাকেনা সেইরূপ। বারিবিন্দুর যদি উৎপত্তি জলাশয় থেকে ও পরিণতি জলাশয়ে হয় তবে জীবেরও উৎপত্তি ব্রহ্ম থেকে ও পরিণতি ব্রহ্মতে—। প্রকৃতিতে আমরা যে নিয়ম দেখতে পাই জীবাত্মার ও পরমাত্মারও সেই নিয়ম।

আমার মা সহায় —।

বৃহস্পতিবার, ১২ই জুলাই ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন "কামকে উপভোগের দ্বারাও নিবৃত্তি করা যায় না আবার কঠোর সংযমের দ্বারাও তার প্রভাব খণ্ডন করা যায় না। কেবল আমাকে মনে প্রাণে ডাকলে ও আমার শরণাপন্ন হ'লে কাম রিপুর সম্পূর্ণ

অপনোদন হয়। কামের আর যথেচ্ছ প্রভাব থাকে না। আমাকে ডাক আরও ডাক। প্রত্যেক নারীকে মাতৃরূপে দেখতে চেষ্টা কর। তুই আমাকে রক্ত মাংসের দেহে সর্ব্বদা দেখতে চাস্। কিন্তু অপরূপ রূপে এলে পাছে তোর কাম স্পৃহা জাগ্রত হয় সেই জন্য এখনও আসতে পারছি না। সময় আসবে যখন সব হবে"।

আমার মা সহায়।

বৃহস্পতিবার, ১২ই জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ বাদলের জন্মদিন। শ্রীকল্যাণ কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার শশুর বাড়ীতে উপাসনা করলেন। আমি, বাদল, নীলু, ও আর আর সকলে সঙ্গীত করলাম। কল্যাণ বাবুর জীবনে মার কৃপা আছে। বড় সরস ও সরল উপসনা করেন। উদ্বোধন ও আরাধনায় আমি মগ্ন হ'য়েছি। দেখলাম উর্দ্ধে একটা অতি মনোরম গ্রাম্য রাস্তা উজ্জ্বল আলোকে উদ্‌ভাসিত। রাস্তাটি সোজা উর্দ্ধে উঠে গেছে দক্ষিণ দিকে। কিন্তু মনে হচ্ছে সকাল বেলায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন আলোক থাকে তেমনি আলোকে সব দিক্ উদ্‌ভাসিত। রাস্তার ডান দিকে একটা বড় গাছ আছে। বেশী পাতা নাই। কিন্তু গাছটি যেন উজ্জ্বল বর্ণের। সেই খানে ছিরু ও তার শ্যালক সুনীল দাঁড়িয়ে আছে। ছিরু যেন আঙুল দিয়ে সুনীলকে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে। ওরা দু'জনেই কি যেন বলাবলি করছে। অনেকক্ষণ এ দৃশ্য আমি দেখেছি। কিন্তু হঠাৎ আমি কতক-ক্ষণের জন্য সম্বিত হারা হ'য়ে পড়লাম। দেখলাম একটি অতি মনোরম উপবন। তার ভিতরে এক জায়গায় অগ্নিময় আলোক স্থির হ'য়ে সকল স্থান উদ্‌ভাসিত করছে। তার কাছাকাছি একটি দিব্য-দেহ পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সহাস্যময়। তাঁর পরিধানে গেরুয়া, গায়ে একটা গেরুয়া চাদর। বুক ও হাতের উর্দ্ধে চাদর সরে গেছে। মস্তকে ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম। কিন্তু কেশ মস্তকের উপরে সুন্দরভাবে দুই দিকে বিন্যস্ত। অতি জ্যোতির্ম্ময় তাঁর দেহ। এঁকে অনেকক্ষণ দেখলাম। তারপর এক জায়গায় একটা সাঁওতাল গ্রাম।

সেখানে বহু সাঁওতাল পুরুষ ও মেয়ে অর্দ্ধ উলঙ্গ ও তাদের কোলে অনেক শিশু। যেন তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে আনাগোনা করছে।

আমার মা সহায়।

(কিছুদিন আগে ডুমকায় অনেক সাঁওতাল বা আদিবাসীদের উপরে পুলিশ গুলি চালনা করেছিল।)

শুক্রবার, ১৩ই জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজকে শুক্রবারের উপাসনায় খুব কাঁদলাম। কেন যে কাঁদলাম তা জানিনা। কেবল কান্না পেল। মাকে ডাকতে ডাকতে কান্নায় ভেসে গেলাম। মনে হ'ল মা যেন আমার কান্নায় অস্থির হ'য়ে ছুটে এসে আমার সামনে উর্দ্ধে একটা রাস্তায় নিস্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছেন। মাকে প্রণাম করলাম। যখনই প্রণাম করি উপাসনার শেষে মা আমাকে দু'হাত দিয়ে আমার মাথায় আশীর্ব্বাদ করেন। মা আমাকে খুব ভালবাসেন। আমি মাকে তেমন ভালবাসি কই। মাঝে মাঝে অভিমান করি।

আমার মা সহায় —।

শুক্রবার, ১৩ই জুলাই, ১৯১৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে অনেকক্ষণ মার সঙ্গে কথা হ'ল। মা বললেন "তোকে আমি এমন শক্তি দেব যাতে যাকে স্পর্শ করবি সেই রোগ মুক্ত হবে, দুঃখের থেকে ত্রাণ পাবে ও আমার দর্শন পাবে। আমাকে যাতে সকলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে তার ভার তোমার উপর দেব। আরও আকুলভাবে আমাকে ডাক ও সাধন কর।" আমি বললাম সকলে তোমাকে মাতৃরূপে কেমন করে দেখবে? সকলে তো তোমাকে মাতৃরূপে চায় না। মা বললেন "দেখ পৃথিবীতে যে সব স্নেহ ভালবাসা আছে সব আমার থেকে হ'য়েছে। মাতৃ-প্রেম, পিতৃ-প্রেম, ভ্রাতৃ-প্রেম, পত্নি-প্রেম, গুরুভক্তি, সন্তান-স্নেহ, পতি-প্রেম, বন্ধু-প্রেম, ভগ্নি-প্রেম এ সবের উৎসই আমি। এইসব নির্ম্মল প্রেমের যে কোন প্রেমে আমাকে ভজনা করলে আমি সেইরূপে দর্শন দিয়ে থাকি। কিন্তু সবই

আমি, আমার জঠর থেকেই সব জীবের উৎপত্তি। আমি সকলের জননী। সকলকে আমি ভালবাসি। তোমার মা যেমন তোমাদের ভালবাসেন আমি তোমাদের তার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। আমাকে সকলে ভুলে হ'য়েছে। আমি বড় একা। আমি চাই সকল সন্তানগণ, আমাকে চাইবে ও আমি তাদের নিয়ে সুখী হব।' কিন্তু মাগো তুমি কি সকলকে সমানভাবে ভালবাস? কাউকে বেশী ভালবাস না? "হ্যাঁ, যারা আমাকে সকল মন প্রাণ দিয়ে আমার উপর নির্ভর করে ও সর্ব্বক্ষণ আমাকে ভালবাসে ও চায় সেই ভক্তকে আমি একটু বেশী ভালবাসি। গান্ধারীর শত পুত্র ছিল। কিন্তু দুর্য্যোধনকে তিনি সকলের চাইতে বেশী ভালবাসতেন। অন্য পুত্রদেরও ভালবাসতেন। তোকে আমি যত ভক্ত মহাজন পৃথিবীতে এসেছেন সকলের চাইতে বড় করব ও সব চাইতে বেশী দায়িত্ব দেব। সংসারে থেকে সর্ব্বক্ষণ আমাকে সান্নিধ্যে রাখতে হবে, আমিও সব সময় তোদের নিয়ে আনন্দ করব এই আমার একান্ত অভিলাষ। এ হবে ও সকলে আমার হবে। আমাকে দেখতে পায় না বলে কেউ আমাকে স্বীকার করতে চায় না এ আমার বড় দুঃখ। পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবেই এই আমার একান্ত ইচ্ছা। যত যত মহাপুরুষ এসেছেন তাঁরা আমাকে লাভ করেছেন ও আমার প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে নিজেরাই বিভোর হ'য়েছেন। আমার কথা সকলকে বলেছেন। কিন্তু আমাকে জীবন্তরূপে সকল নরনারীকে দেখাতে পারেন নাই। তাই মানবগণ আমাকে ছেড়ে তাঁদের পূজা করছে। আমি এবার চাই এমন ভক্ত যে নিজে আমাকে একান্তভাবে দেখবে ও সকলকে ডেকে ডেকে বলবে "মাকে দেখবি? এই দেখ" অমনি তারা আমাকে দেখবে ও আমার একান্ত বিশ্বাসী হ'য়ে যাবে ও একবার আমাকে দেখলে সকল পাপ থেকে ক্ষান্ত হবে ও সেই পথে জগত স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ ভার তোমার উপর দিয়েছি। সকল সাধুভক্ত তোমাকে সাহায্য করছেন। তাঁদের সকলকেই তুমি দেখেছ। তুমিত' জান যে স্বর্গে সকল সাধু মহাজনগণ তোমাকে

সকল সাধু মহাজনগণ তোমাকে উচ্চাসনে বসিয়ে গলায় পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে সংসারের জীবের মহা মঙ্গলের জন্যে স্বর্গ থেকে বিদায় দিয়েছেন। সে আমারই নির্দ্দেশে। তোমার জন্মের পূর্ব্বে বজ্রপাত স্বর্গের শঙ্খ নিনাদ, তুমি মহাশক্তিসম্পন্ন আত্মা। দেহাত্মরিপু একেবারে অপনোদন কর আমার নাম জপ করে সারাক্ষণ। অর্থ তোমাকে প্রচুর দেব ও দুঃখ তোমাকে দেবনা জানবে। যেভাবে জপ করছ করে যাও। তোমার ভিতর কখন যে মহাশক্তি আসবে তুমি নিজেই জানতে পারবে না। হঠাৎ নিজের শক্তি দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে। যাতে তোমার মহাশক্তিতে তুমি অভিভূত না হও তার জন্যে তোমাকে অতি আস্তে আস্তে শক্তি দেব, একটু পরীক্ষা করব এমনি ক'রে তুমি মহাশক্তিমান অহঙ্কারশূন্য ও সকল রিপুশূন্য নির্লিপ্ত মহাভক্ত হ'য়ে জগতজনের অশেষ কল্যাণ সাধন করবে ও আমাকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করবে প্রত্যেকের অন্তরে। যারা তোমার বৈরীতা করবে ও আমাকে চাইবে না তারা বিনাশ প্রাপ্ত হবে ও মহাদুঃখে পতিত হবে। মনে রেখ তোমার জন্ম মহাসাধুর নির্ম্মল ও নিষ্কাম বীর্য্যে"। "মার" আমাকে ভীষণ জ্বালাতন করছে। সব কাজ পণ্ড করছে। অর্থ অনটন প্রকট হ'য়েছে। যে কাজ হবে বলে স্থির নিশ্চিত ছিলাম সে কাজ আজ হোল না ও অনেক পিছিয়ে গেল। আমি অটল। আমার মা একান্ত সহায়।

শনিবার, ১৪ই জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

কাম ভাব খুব কম। একটা শান্তভাব সর্ব্বক্ষণ বিরাজ করছে অন্তরে। যখনই চোখ বন্ধ করি ঊর্দ্ধে অন্তরলোকে এক মহান্ রাজ্যে চলে যাই। চোখ বন্ধ করলেই মনস্থির ও যোগ হয়। জ্যোতির রাজ্যই বেশী দেখি। আর দেখি আমার মা এক জায়গায় বসে আছেন ও আমি তার কাছে ঘুরে ঘুরে ছোট ছেলেটির মত বেড়াচ্ছি। মা আমার সদা হাস্যময়ী, যেন আমাকে খুব ভালবাসেন। মা যেখানে আছেন সে এক জ্যোতির রাজ্য—সেই মধ্যমণি রূপ জ্যোতির উৎসের ভিতর থেকে মা আমার আবির্ভূতা হ'য়েছেন। অতি

সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মা শাড়ীপরা কিন্তু পরমাসুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও সদা প্রফুল্লময়ী। মা আমার আমি মায়ের। আমার মা সহায়।

মঙ্গলবার, ১৭ই জুলাই ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

ক'দিন হোল মনে হচ্ছে যে আমি যখন খেতে বসি মা স্মিত হাস্যে আমার সামনে এসে বসেন ও বলেন 'খাও' যেন আমার খাওয়া অবলোকন করেন। মা আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছেন। সব সময় হাসছেন। গায়ত্রী জপ ও তার সঙ্গে আমার পদ্ধতিতে জপ করি। "মার" আমাকে অশেষ জ্বালাতন করছে। অর্থ সঙ্কট প্রবল। আমার মা সহায়।

বৃহস্পতিবার, ১৯শে জুলাই ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

রাহুলের আজ সন্ধ্যা থেকে গলা ফুলেছে mumps এর মত মনে হ'ল। "মার" আমাকে খুব জ্বালাতন করছে। অর্থ সঙ্কট প্রবল। আজ পর্য্যন্ত আফিসে কর্ম্মচারীদের Payment হয় নাই। নানাদিক থেকে অশান্তি আসছে। আমি অটল। আমার মা আছেন আমার ভয় কি?

আমার মা সহায়।

বৃহস্পতিবার, ১৯শে জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসক মণ্ডলীর সাধারণ সভা ছিল। আমি একলাই ভীষণ যুদ্ধ করলাম। "আনুষ্ঠানিক" বাদ হ'য়ে গেল। যে শব্দ ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর পরবর্ত্তী ভক্তবৃন্দ কোথায়ও প্রয়োগ করেন নাই সেই শব্দকে "নবসংহিতার" সঙ্গে জড়িত করে 'আনুষ্ঠানিক'কে উচ্চতম আসন দেওয়া আমার বিবেক বিরুদ্ধ। নবসংহিতার সকল অনুজ্ঞা যখন আমরা মেনে চলতে পারব তখন আমরা উপযুক্ত 'আনুষ্ঠানিক' হব। যদি একটা অনুজ্ঞা মেনে চলি ও অন্য সব অনুজ্ঞাকে উপেক্ষা করে চলি তবে নবসংহিতাকে অবমাননা করা হয়। মেনে চলবার চেষ্টা করা ও মেনে চলবার প্রতিজ্ঞা করার ভিতরে বিরাট ব্যবধান। চেষ্টা করে না পারলে সাধনার ক্ষতি হয় বটে কিন্তু তার জন্যে আমি সম্পূর্ণ দায়ী নই। আর প্রতিজ্ঞা করে যদি বলি মেনে চলব ও যদি মেনে না

চলি তবে সাধনার সমূহ ক্ষতি হবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করে যে কোনও কর্ম্ম করাই যুক্তি সঙ্গত। অক্ষয় দা বললেন 'তুমি কি তোমার বাবার সন্তান? তুমি কি নববিধান বিশ্বাসী? তুমি কি নববিধান মান না?' আমি বললাম 'আমি আমার পিতার সন্তান বলেই আজ এখানে দাঁড়িয়েছি। আপনারা যে দিন Keshab Centre করতে যাচ্ছিলেন সে দিন আমার পিতাই ভীষণ প্রতিবাদ করেছিলেন ও সে movement চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। আমি নববিধান মানি। কিন্তু তার ভিতরে প্রক্ষিপ্ত কিছু মানিনা। নববিধান অভ্রান্ত নয়। নবসংহিতা মেনে চলব এই প্রতিজ্ঞা করব আর বাহিরে অনাচার করব তাতে নবসংহিতার মত পুস্তকের অবমাননা করা হয়। আরও অনেক কথা হোল। আমি একটু ধৈর্য্যহারা হয়েছিলাম। আর যেন না হই কখনও। আমাকে শান্ত কর ও স্থির স্থিত প্রতিজ্ঞ কর মা।

আমার মা সহায়।

শনিবার ২৮শে জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সাঁইতিয়ায় চলেছি। রাধাপদ গুরুপদ চন্দ্রদের ধান কলে তাঁদের Rice Polisher দুটো ঠিক করে দিতে। সকাল ৭-২২ মিঃ, হাওড়া থেকে কিউল Passenger এ চড়ে বেলা ১২-৩০ মিঃ সাঁইতিয়ায় পৌঁছলাম। স্নান আহার সেরে ২টার সময় মিলে গেলাম। মিলের মালিক শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র অতি অমায়িক লোক। প্রায় সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত machine দুটো ঠিক করে ফেললাম। মনে মনে ভয় আছে যদি শেষ পর্য্যন্ত machineএ বেশী গোলমাল থাকে তবেত দুদিনে কাজ শেষ হবে না। মা বললেন "কোনও ভয় নাই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে। রাত্রে এসে প্রায় ১০ টা নাগাদ খাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। নারায়ণ বাবুর সঙ্গে মিলের বিষয় অনেক কথা হোল। নারায়ণ বাবুর ভগ্নিপতি তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে বহরমপুরের বাসা উঠিয়ে এখানেই আছেন। ডাক্তারী করতেন। অতি সরল ও অমায়িক লোক। বেশীর ভাগ সময় তার সঙ্গে আলাপ হোত। আমার মা সহায়।

রবিবার ২৯শে জুলাই, ১৯৫৬ খৃঃ, সাঁইতিয়া।

আজ প্রায় ৮টায় সকালে একলাই মিলে চলে গেলাম। মিল চালু হোল ৯॥০ টায়। Machine দুটো trial দিয়ে desired quality চাল বার করে বাসস্থানে ফিরতে প্রায় ১২॥০টা হয়ে গেল। প্রায় ২ টা নাগাদ স্নান আহার সমাধা করলাম। ইচ্ছা ছিল ৩ টায় কিউলে ফিরব। কিন্তু নারায়ণ বাবু আহম্মদপুরে নিয়ে গেলেন নিজের গাড়ীতে। সেখানে boiler ইত্যাদি দেখে তাঁকে খানিকটা advice দিয়ে তার সঙ্গে ফিরতে প্রায় রাত্রি ৯॥০টা হোল। হাত মুখ ধুয়ে প্রস্তুত হ'য়েছি। পিসেমশায় (অর্থাৎ নারায়ণ বাবুর ভগ্নিপতি যিনি ওখানে সকলের কাছে পিসেমশায় বলে পরিচিত) মুরগীর মাংস ইত্যাদি খাবার ব্যবস্থা করেছেন। খেতে খেতে সকলে মিলে গল্প করতে করতে রাত্রি ১১॥০টা হোল Signal down হয়েছে, সেই Passenger trainএ ফিরব। আমাকে পিসেমশাই তাড়া দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হ'য়ে বেড়িয়ে পড়লাম। Station এসে টিকিট করে একটা 2nd Class কামড়ায় উঠে দেখি সব পাঞ্জাবী ভদ্রলোক যে যার মত এক একটি bench নিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁদের আর disturb না করে নেমে আর একটা কামড়ায় উঠলাম। সেখানে প্রায় সকলেই বাঙ্গালী, দুটি মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও ছিলেন। সকলেই ঘুমে অচেতন। আর সময় নাই যে কামড়া বদলাব। বসবার পর্য্যন্ত জায়গা নাই। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর পায়খানার সামনে মেঝেতে একটা Statesman পেতে বসে মার আরাধনায় নিযুক্ত হ'লাম। ট্রেণের শব্দ সত্ত্বেও বেশ মনস্থির হোল। উর্দ্ধলোকে উঠ্‌তে আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার চোখের সমনে একটি অতি সুন্দর রাস্তা। দুই ধারে তার বৃক্ষরাজি অতি মনোরম। সেই রাস্তা যেন উর্দ্ধ থেকে নিয়ে নেমেছে। রাস্তার প্রান্ত যেন আমার কাছাকাছি এসে থেমেছে। সেই প্রান্তে একটী সালঙ্কারা ১০।১২ বছরের কন্যা নীল ও সাদা মেশানো অতি সুন্দর একটি শাড়ী পরে কপালে একটি কুম্‌কুমের টিপ পরে অপার্থিব স্বর্গীয় হাস্যময়ী মূর্ত্তিতে আমার

দিকে চেয়ে চেয়ে হাস্য করছে। দেহের বর্ণ ঘন শ্যামবর্ণ তন্বী। কিছুক্ষণ এই দর্শনে কাটল। তারপর আবার যেন কোথায় এলাম। একটি শালবন অতি সুন্দর। এই বনের ধারে একটি পর্ণ কুটির। আঙ্গিনা অতি পরিষ্কার, ঘরটি অতি সাধারণ কিন্তু ঝক্ ঝকে তকৃতকে। সেই কুটিরের পাশে একটি উজ্জ্বল গৌর বর্ণের ১০।১২ বছরের মেয়ে অতি সাধারণ শাড়ী প'রে (সাদা শাড়ী লাল পাড়) স্মিত হাস্যে হাতে একটা কি যেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন আমার দিকে তাকিয়ে হাস্‌ছে। কিছুক্ষণ এই ভাবে কাটল। কি একটা Station এ গাড়ী থেমেছে। বাইরে ২।৩ জন যুবক আমাদের কামড়ার জানালা দিয়ে দেখে বলছেন "এখানেও ত' দেখছি জায়গা নাই; আবার একজন মাটিতে ব'সে ধ্যান করছেন"। আর মন সংযোগ হ'ল না।

আমার একমাত্র মা সহায়।

বুধবার, ১লা আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

খুব অর্থ সঙ্কট্ চলেছে। এমন অবস্থা যে সংসার খরচ চালানো দায়। কিন্তু চলে যাচ্ছে। ব্যবসায় ভীষণ মন্দা। টাকা যা পাব আসে নাই। Import-এর মাল বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারি নাই। মাল গুলো যে Jetty তে কোথায় কি ভাবে আছে জানিনা। মা বলছেন সব ঠিক হয়ে যাবে। সব ঠিক আছে।

আমার মা একমাত্র সহায়।

রবিবার, ৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্ম মন্দিরে বিভূতিদার সঙ্গীত ও অবনীদার উপাসনা। যথা সময়ে মন্দিরে এলাম। সঙ্গীতের পর মগ্ন হ'লাম আরাধনায়। আরাধনার বিশেষ কোনও কথা আমার কানে আস্‌ছে না। ক্রমে উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি। আলোকের রাজ্যে এলাম। সেখানেই ঘুরে ফিরে দেখ্‌ছি। মাঝে মাঝে আমার কপালের মাঝ খানের জায়গাটি জমাট্ হ'য়ে স্পন্দন করে—যেন কার স্পর্শ লাগে। একটা অনুভূতি। সেই জায়গাটি যেন মাঝে মাঝে খুলে যায় ও সেখান থেকে একটা গোলাকার আলোক নির্গত হ'য়ে উর্দ্ধে উঠ্‌তে থাকে ও বহুদূর পর্য্যন্ত চলতে

থাকে। যেন একটা Search light এর মত। মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্যে কপালের উর্দ্ধে একটা শত Electric এর আলো একটু এসে আবার পর মুহূর্তে চলে যায়। এইভাবে কাটল অনেকক্ষণ। আমার মা একমাত্র সহায়।

সোমবার ৬ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মন বিক্ষিপ্ত। ক'দিন বাবুলের জ্বর। আজ সকাল থেকে ময়নারও জ্বর হ'য়েছে। গাড়ীটা গোলমাল করছে। ২।১ বার রাস্তায় পা পিছলে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। সকালে একটা গরু তাড়া করল। অপিসে গিয়ে রায়বাবুকে Import-এর মালটার খোঁজ করতে Cox & King-এর আপিসে পাঠালাম। ফিরে এসে জানালেন মালের খোঁজ পাওয়া গেল না। আরও খোঁজ হ'চ্ছে কালকে জানা যাবে। হাতে পয়সা নাই। Office-এর Electric Bill ২০৲ টাকা দেবার টাকা নাই। নানা গোলযোগ চলছে। দুই মাস Office Stuff-এর Pay দিতে পারি নাই। Office ভাড়া বাকী। কারখানার ভাড়া অনেক দিনের বাকী। কারখানার labour-দের June ও July বাকী। নানা দিকে দারুণ অশান্তি। আমি যেন নিশ্চল, মনে হ'চ্ছে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আমার মা যখন আছেন তখন সন্তানের ভাববার কি আছে। আমি জন্মাবার আগে যিনি মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিয়েছেন তিনি আমাকে অবশ্য সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। আমার মা একান্ত ভরসা। আমার মা—মা।

মঙ্গলবার,৭ই আগষ্ট, ১৯৫৬খৃঃ. কলিকাতা।

রোজ আফিসে যাওয়ার সময় যখন আমি ভাত খেতে বসি তখন মা এসে আমার সামনে সহাস্য বসেন ও আমার খাওয়া অবলোকন করেন। আমার সঙ্গে অনেক কথা হয়। আমার মা মাগো তুমি আমায় এত কেন ভালবাস?

বুধবার ৮ই আগষ্ট ১৯৫৭ খৃঃ কলিকাতা।

আজ রাত্রে খেতে বসেছি দেখি মা আমার সামনে এসে বসেছেন। বলছেন খাও। গরম লাগছিল, বললেন "এইত হাওয়া করছি" যেন একটা হাত পাখা নিয়ে

হাওয়া করছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে শীতল বাতাস এসে আমাকে সুশীতল করছে। আমার খাওয়ার প্রতি গ্রাস মা একদৃষ্টে দেখছেন সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে। যখন মাছ খাচ্ছি তখন বললেন "কি সব যে খাও তার ঠিক নেই" বলে যেন ঘৃণায় মুখ ফেরালেন। বললেন "এত সব খাওয়ার জিনিষ আছে, দুধ, ঘি, ছানা, মাখন, ফল, চাল, ডাল কত সব আছে তা সত্ত্বেও এ সব প্রাণী কেন খাও? এসব আমার সন্তান।" আমি বললাম যদি আমরা না খেতাম এরা সব বেড়ে সারা পৃথিবী ভ'রে যেত। মা বললেন "তার জন্য তোমার চিন্তা কি? আমি এদের সৃষ্টি করছি ও এদের ধ্বংশের ব্যবস্থা আমিই করেছি। মানবকুল ত বেড়ে যাচ্ছে ও তাদের ধ্বংশের ব্যবস্থাও আমিই করি। তাদের যদি এমনি ধরে ধরে কেউ খেত তবে কি তারা সহ্য করত?" আবার তর্ক করলাম, বললাম "এ আমার অভ্যাস ও দেশাচার। জানি যে ছোটবেলা থেকে মাছ মাংস খাই ছাড়ি কি করে? মা বললেন "তোমার জন্য আবার দেশাচার কি? অভ্যাস ছাড়া কি শক্ত কাজ? আস্তে আস্তে ছেড়ে দাও ও পরিবারে মাছ মাংসের বদলে ভালভাল ফল, ঘি, দুধ, ছানা ইত্যাদির ব্যবস্থা কর—।

আস্তে আস্তে মা আমাকে প্রস্তুত করছেন। মা আমার অত্যন্ত স্নেহশীলা, মনে আঘাত দিয়ে কোনও কাজ করাতে চান না। যদি বলি অন্য খাদ্যে রুচি হয় না মাছ মাংস খাব। বললেন খেতে চাও খাও।"

আমার মা ভরসা। মা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মাগো আমার মা মা আমার মা মা মা।

শুক্রবার, ১০ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে বসে বসেই একেবারে ধ্যানে ডুবে গেছি। দেখি অনেক ভক্তবৃন্দ আমার চারিদিকে একটু উর্দ্ধে আনা গোনা করছেন। মাকে বললাম এ কি? মা বললেন "এরা তোমাকে তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্যের জ্যোতি দিতে চান। তোমার দ্বারা যে পৃথিবীর মহান্ কার্য্য সাধিত হবে তার জন্য এঁরা সব তোমাকে সাহায্য করছেন। তোমার প্রতি সকল সাধু ভক্ত অত্যন্ত

অনুরক্ত। তোমাকে এরা সৎপথে চালিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। তুমি যে কারণেই—হোক্, মহান্ কার্য্যের জন্য উপযুক্ত। প্রস্তুত হও।" আমার মা সহায়।

শনিবার, ১১ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ক'দিন হোল অর্থ সঙ্কট অত্যন্ত প্রবল। অতি কষ্টে সংসারের রোজকার খরচ চালিয়ে যাচ্ছি। ময়নার জ্বর ছাড়ে নাই। আজ ৭ দিন। বাবুলের জ্বর ছেড়ে ৪।৫ দিন অন্ন-পথ্য ক'রে আবার আজ সকাল থেকে ১০২° জ্বর উঠেছে। পাওনাদারেরা ক'দিন হোল আসে না। এমন সঙ্কটে জীবনে কখনও পড়েছি বলে মনে হয় না। সারাদিন যখন সময় পাই ও মনে আসে তখনই জপ করি। মন যেন নিস্পৃহ। যেন কোনও অভাব আমার নাই। অভাবের কথা একেবারেই মনে থাকে না আশ্চর্য্য। মা আমাকে আরও একটু পরীক্ষা করছেন। আমি অহঙ্কার করে বলেছিলাম তুমি যা পরীক্ষা করতে চাও কর আমি ভয় পাই না। তার জন্যে আমার অহঙ্কার চূর্ণ করে তাঁর শক্তির কাছে সম্পূর্ণ অবনমিত করতে চাচ্ছেন। আমার কেবল মা সহায়। সব আবার ফিরে পাবই।

রবিবার, ১২ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্মমন্দিরে বিভূতিদার উপাসনা ও হরিসুখদার সঙ্গীত ছিল। উপাসনার আগে একটা কীর্ত্তন হোল। প্রথম সঙ্গীতের পর থেকেই আমি ধ্যানে বসলাম। আমার মন একাগ্র। নিমীলিত চক্ষু, দৃষ্টি নিবদ্ধ আলোকের পরদার উপরে কখনও কখনও অনেক উর্দ্ধে উঠছি আবার নীচে নেমে এসে আলোকের পরদার উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। আরাধনার কথা কিছু কিছু কানে আসছে। আরাধনার মাঝখানে দেখলাম একটি নিমীলিত আঁখি ও মুখাবয়ব দেবী মূর্ত্তির ঈষৎ ধূসর বর্ণের মত রং। চোখের ও মুখের চামড়া যেন পরদায় পরদায় থাক্ থাক্ করা। চক্ষু দুটি নিমীলিত কিন্তু প্রকাণ্ড। কয়েক সেকেণ্ড এই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে ছিলাম। তারপর উপদেশের সময় আবার সম্পূর্ণ সম্বিত

ফিরে পেলাম ও বিভূতিদার আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা শুনলাম। ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন নিরহঙ্কারী, দরীদ্র সেবক ও আদর্শ ব্যক্তি ছিলেন। বাইবেল ও নবসংহিতা থেকে উদ্ধৃত বাক্য সকল একই আদর্শে রচিত দেখালেন। আদর্শ খৃষ্টিয়ান্ ছিলেন ডাঃ হরেন্দ্রকুমার। দেশের ও দশের সেবার জন্য তাঁর ১৫ লক্ষ টাকা দান ও অন্যান্য সেবার কার্য্যের জন্যে জন সমাজের কাছ থেকে বহু অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তি। ভগবান তাঁর আত্মার সদ্‌গতি করুন এই প্রার্থনা। আমার মা সহায়।

আজ সন্ধ্যায় Pump এ জল না থাকায় মন বড় অশান্ত হোল। ব্রহ্মমন্দির থেকে এসে আমাদের ভৃত্য রামকে বললাম তিনতলার কলগুলো একটু দেখে আয়, সেখানে কোনও কল অসাবধানতা বশতঃ খোলা আছে কিনা। কিন্তু উপরের দাড়োয়ান দরজা খোলে নাই। এই শুনে আমার অত্যন্ত ক্রোধ হোল ও আমি নিজে গিয়ে দরজা খুলতে বললাম। যত আমি খুলতে বলছি সে ততই বলছে খুলবে না। তখন আমি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হ'য়েছি। আমি ভীষণ চিৎকার করে বললাম যদি দরজা না খোল তবে তালা ভেঙ্গে ঢুকব। তাতে সে নেমে এসে দরজা খুলে দিল ও অত্যন্ত অপমানসূচক ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। আমি নিজে গিয়ে সব দেখলাম। এই ক্রোধ আমাকে দমন করতে হবে।

আমার মা সহায়।

বুধবার, ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

অত্যন্ত অর্থ কষ্ট চলেছে। কিন্তু কোনও না কোনও ভাবে সংসার চলে যাচ্ছে। জানিনা মা আমাকে আবার কবে অর্থ দেবেন।

আমার মা সহায়।

বৃহস্পতিবার, ১৬ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

এখন চোখ বুজলেই কপালের মাঝ খানে টন টন করে। আস্তে আস্তে গোলাকার চন্দ্র মণ্ডল দেখা দেয় ও সেই পথে উর্দ্ধে উঠে যাই। যেতে যেতে

কখনও আলোকের রাজ্যে আবার কখনও বা মার কাছে যাই। মাঝে মাঝে ঊর্দ্ধে একটা ছিদ্র পথ হ'য়ে যায় ও আমি সেই পথে অনেক উচুতে চলে যাই। মনে হয় যেন সে পথের শেষ নাই। অসীম ও অনন্ত সেই পথ। অনেক সময় সেই পথ আলোকে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে যায়। প্রায়ই কাঁদি কেন কাঁদি জানি না। মার কথা মনে হ'লে কেবল কান্না পায়। কখনও এমন আনন্দ আসে যে মনে হয় এর মত আনন্দ ত' জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। এ আনন্দ বেশীক্ষণ থাকে না।

আমার মা সহায় —।

শুক্রবার, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

ময়নার টাইফয়েড হ'য়েছে। আজ প্রায় ১২ দিন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসার সঙ্গে আমি বায়োকেমিক ঔষধ দিয়ে গেছি আগা গোড়া। ডাক্তার ঘোষ বললেন "আমিত জ্বর ছাড়বার কোনও ঔষধ দেই নাই। কিন্তু জ্বর ছেড়ে গেল কি করে?" আমি তাঁকে কিছু বলি নাই। মনে নির্দ্দেশ পেলাম "বায়োকেমিক্ ঔষধ দাও" তাই দিলাম ও আজ থেকে জ্বর ৯৮° তে এসেছে।

আমার মা সহায়।

শনিবার, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রাহ্ম যুব সঙ্ঘের উৎসব। অতুল প্রসাদ সেনের সঙ্গীতে ভগবানের পূজা হবে। আমাকে মৃণাল প্রার্থনা করতে বলেছে। আমি মনে ভাবলাম কখনও বাইরে কোথায়ও প্রার্থনা করি নাই, যদি সব গোলমাল হ'য়ে যায় ও যদি কিছু বলতে গিয়ে আট্‌কে যায় তবে লজ্জায় পড়ব সকলের কাছে। মা বললেন "কোনও ভাবনা নাই। আমি যখন যা বলব তাই তুই বলবি, কোনও ভয় নাই, আমাকে স্মরণ কর।" প্রার্থনার সময় ছিল ১০ মিনিট্, হ'য়ে গেল ২৫ মিনিট্। আমি যা বলেছি সে সব মা বলে দিলেন। আমার কোনও কৃতিত্ব নাই। বললাম কত কত যোগী ঋষি জ্ঞান দিয়ে গেলেন। সেই জ্ঞান আমরা এক নিমেষে পাচ্ছি আমরা আজ কালকার মানব সকল ব্রহ্মজ্ঞানের

উপরে বসে আছি। সব আমরা জানি। শুধু মোহতে আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছে। একটু ডাকলে হরি দেখা দেন, এখন যে বড় কাছে এসেছেন। এবার আর ভাল ছেলে ভাল মা নয়। ভাল ছেলের জন্য মায়ের চিন্তা কম। কিন্তু দুষ্টু ছেলের জন্য মায়ের চিন্তা বেশী। আমার মাও দুষ্টু, কেবল লুকিয়ে বেড়ান। এবার দুষ্টু ছেলের দল এসেছে। তোমাকে ঘিরে এবার তোমাকে সংসারের সকলের কাছে ধরে এনেছে। আর ত' তুমি ছাড়া পাবে না। কেউ বলে সাকার কেউ বলে নিরাকার। আমি দেখি তুমি সাকারে নিরকার ও নিরাকারে সাকার। তোমাকে আর আমরা ছাড়ব না। এবার এস আমাদের জীবনে স্থির হ'য়ে বস। আরও অনেক কথা বলেছি মনে নাই।

আমার মা সহায় —।

বাড়ী এসেছি। খেয়ে বিছানায় শুয়ে গায়ত্রী জপ করছি চোখ বুজে। একটি বন পশ্চিম দিকে দেখলাম। সন্ধ্যা হয় হয় এমন মনে হোল। সেই বনের পূর্ব্বে একটা গৃহস্থের গোলা বাড়ী। তিন চারটে মেটো ঘর। খড়ের ছাউনী, আঙ্গিনায় অনেক ধান ঝাড়াই হ'চ্ছে। চারদিকে সদ্য কেটে আনা ধান গাছ সমেত আঁটি করে ছড়ানো রয়েছে। সেই খানে একজন দীর্ঘ বলিষ্ট বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন যেন সব তদারক করছেন। বৃদ্ধটির গায়ে কোনও জামা নাই, উপবীত দেখা যাচ্ছে। মাথার চুল পাকা ও বড় বড়, ঘাড় পর্য্যন্ত পড়েছে, পাকা দাঁড়ি ও গোঁফ। একটি পট্ট বস্ত্র পরিধানে। কপালে মস্ত বড় রক্ত চন্দনের টিপ্। শরীরের রং অগ্নি বর্ণ। তিনি আমার দিকে যেন একবার তাকালেন বিরক্তিপূর্ণ ভাবে। তারপর নিজের কাজে মন দিলেন। দাড়িয়েই আছেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? মা বললেন "ইনি মহামুনি বৃহস্পতি"। মনে হোল যেন আমার প্রতি একটু কুপিত হ'য়েছেন।

আমার কেবল মা ভরসা।

মঙ্গলবার, ২১শে আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার মা ভীষণ চালাক। আমাকে একটু একটু করে ভুলিয়ে ভালিয়ে

আস্তে আস্তে সাধনার স্তরে স্তরে উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কত কথা বলেন, কত জায়গায় নিয়ে যান, কত সাধু মহাপুরুষদের দেখান, কত মিষ্টি কথা বলেন। আবার অন্যায় করলে রাগ করে আমার সঙ্গে দু'চার দিন কথা বলেন না। এমনি করে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন জানি না। তবে আমার জীবনে যে একটা মহান কর্ত্তব্য আছে সেটা বার বার স্মরণ করিয়ে দেন। আমি অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছি। ৫।৬ বছর আগে যে জ্ঞান ছিল না যা দেখিনি আজ কাল সে জ্ঞান আসছে ও দেখছি। আমার মায়ের অপার লীলা। আমি বড় কপট্। মিথ্যা বলি, নারী দেখলে কামার্ত্ত হই। তবুও মা আমাকে ভালবাসেন। মা আমার অপার স্নেহময়ী। মা, মা, মা, আমার। আমি মায়ের।

বুধবার, ২২শে আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ থেকে ময়না অন্নপথ্য করবে। ১৪ দিন পরে মা তাকে রোগমুক্ত করলেন। আমার শাশুড়ী-ঠাকরুন এসে আছেন। মা আমাকে পরীক্ষা করছেন। মা আমার অপার করুণাময়ী।

আজ অফিসে গিয়ে Mr. Roy এর কাছে শুনলাম যে আমাদের যে মালটা জেটিতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না সেগুলো খুব ভালভাবে এক জায়গায় আছে। মা আমাকে আগেই বলেছিলেন "কোনও চিন্তা নাই—মাল ভাল ভাবে আছে। মালটা বিক্রি জন্যে খুব চেষ্টা হ'চ্ছে। এ নিশ্চয় হ'য়ে যাবে। মা বলছেন বিক্রয় হয়ে যাবে ও খুব ভাল লাভ হবে। আমার মা সহায়—।

শুক্রবার, ২৪শে আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ থেকে পুতুলের অল্প জ্বর হ'য়েছে। বায়োকেমিক ঔষধ দিলাম। সকাল থেকে মা আমাকে কত উপদেশ দিচ্ছেন। মা বললেন "দেহজাত কামকে সংযত কর। পরনারীর প্রতি মনেও কামভাব পোষণ করবে না। যদি একটু সামান্য কামভাব মনে থাকে তবে সকল সুখ তোমার দুঃখে পরিণত হবে।" মার সঙ্গে তর্ক করলাম, বললাম দেহ দিয়েছ, নারীর দিকে মন আকৃষ্ট হবেই, একটু আধটু কাম চিন্তা করলে কি এমন হয়? মা বললেন "দেহজাত

কাম প্রকৃতি সঞ্জাত, পশু পাখীর ভিতরে দেখ প্রজনন ছাড়া তারা কামার্ত্ত হ'লেও সঙ্গম করে না। মানব কেন তবে প্রজনন ছাড়া কাম সেবা করবে? যে সন্ন্যাসী বা অকৃতদার তার কাম প্রবৃত্তি যদি হয় তার পক্ষে কাম দমন করা সহজ। কিন্তু কৃতদার লোকের পক্ষে কামকে জয় করা আরও সহজ। ক্রোধ করবে না। অন্যায় দেখলে একবার দু'বার তিনবার বিনীত ভাবে প্রতিবাদ করবে। তাতে যদি অন্যায় অনুষ্ঠান বন্ধ না হয় তবে ক্রোধের দ্বারা তাকে খণ্ডন করবে। কিন্তু ক্রোধ অপরিমিত হবে না। নিজকে ক্রোধে উন্মত্ত করবে না।" আরও অনেক কথা। আমার মা সহায়।

রবিবার, ২৬শে আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ভাদ্রোৎসবের সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব ছিল। সকালে বিভূতিদার কীর্ত্তন ও দাদার সঙ্গীত ছিল (শ্রীহরিদাস তালুকদার) অক্ষয়দা উপাসনা করলেন। আমরা কীর্ত্তনের শেষের দিকে গিয়ে পৌঁছলাম। আরাধনায় মগ্ন হ'য়েছি। কথা সব কানে আসছে না। আমি উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি সেই আলোকের রাজ্যে কত দৃশ্য দেখছি। মা কত নারীর রূপে আমাকে দেখা দিচ্ছেন। একবার দেখলাম কালোপেড়ে সাদা শাড়ী পরে যুবতী বেশে এলেন, গলায় শ্বেত পুষ্পের মালা। মুখখানা ধপধপে সাদা উজ্জ্বল যেন সূর্য্যের চাইতেও দীপ্যমান। কখনও এলেন সালঙ্কারা নারীর বেশে—কি অপরূপ বেশ? লাল শাড়ী মুখ মণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে বিভাসিত। একটি সুন্দর মনোরম উদ্যান সেখানে, শোভা অলৌকিক। আরাধনার শেষে শ্রদ্ধেয় মণি সেন মহাশয়ের প্রচারক ব্রত গ্রহণের কাজ আরম্ভ হোল। আমি একবার চোখ খুলেছিলাম। আবার চোখ বুজলাম। দেখি মন্দিরের সামনের বেঞ্চিতে সারি দিয়ে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের খালি গা দেহ অগ্নিবর্ণ, পরনে ধুতি কোঁচা দিয়ে পরা। প্রত্যেকের গলায় শ্বেত পুষ্পের মালা আজানুলম্বিত। ব্রত গ্রহণ শেষ হ'য়ে গেলে দেখি ব্রহ্মানন্দ একটি সাদা থান ধুতি পরে ও একটা সাদা চাদর গায় দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মণি বাবুর গলায় একটি পুষ্পমাল্য পরিয়ে দিলেন। জ্ঞানাঞ্জনদা, ছিরু প্রভৃতিও সেখানে

উপস্থিত ছিলেন। পরে দেখলাম মণি বাবু পূর্ব্ব জন্মে একটি সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর মাথায় চুল উর্দ্ধে ঝুঁটি করে বাঁধা ও কিছু কিছু জটা আছে। পরনে লাল গৈরিক, গলায় অনেক রুদ্রাক্ষের মালা। তিনি যেন চলছেন। কোনও এক গ্রামের কাছে একটা ঘন বনের ধারে আছেন। মণিবাবুকে সে কথা বললাম। বললাম তিনি অতি সৌভগ্যবান্।

এ বেলা সতীদার উপাসনা, আমার কীর্ত্তন ও বিভূতিদার সঙ্গীত ছিল। আরাধনায় ধ্যানে মগ্ন হ'য়েছি। উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি। কপালের ভ্রু যুগলের মাঝখানে টিপ টিপ করছে। আস্তে আস্তে যেন মনে হোল আমার কপাল থেকে উর্দ্ধে ব্রহ্মতালু অবধি যেন আলাদা ভাবে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে। একটা অপরূপ জ্যোতি চন্দ্র মণ্ডলের মত খুব স্নিগ্ধ গভীর নীল আমার কপাল থেকে নির্গত হচ্ছে। সে আলোক বারে বারে রং বদলাচ্ছে। কখনও উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, কখনও অগ্নিবর্ণ, কখনও গাঢ় নীল ও কখনও বা আকাশের বর্ণ। সেই আলোক পথে উর্দ্ধে বহুদূর চলে গিয়েছি। সেখানে কখনও মন্দিরের ভিতর অগ্নিবর্ণ বিগ্রহ কখনও মাতৃমূর্ত্তি দেখছি। একটি অশীতিপর বৃদ্ধ সাদা দাঁড়ি ও ছোট ছোট করে চুল কাটা, মুখখানা শ্বেতবর্ণ ও জ্যোতির্ম্ময়, লাঠিতে ভর দিয়ে যেন নেমে আসছেন। আবার দেখলাম সেই বৃদ্ধ যোগাসনে বসে আছেন, চক্ষু দুইটি নিমীলিত। মা বললেন "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এসেছেন"। কপাল আমার গরম হ'য়ে গেছে ও একটা জ্যোতিষ্ক যেন কপালের সেই চন্দ্র মণ্ডলে খেলা করে বেড়াচ্ছে। Torch-এর আলোর মত একটা focus দূরে চলে যাচ্ছে ও একটা যেন পথ করে নিয়েছে আলোকের। মা বললেন "এই যে রাস্তা হ'য়েছে এই হোল তোমার সাধনার যোগ সূত্র। এই রাস্তার উৎকর্ষে তোমার ও আমার ভিতরে আরও যোগ গভীর ভাবে স্থাপিত হবে"।

আমার মা সহায়। মা আমাকে বড় ভালবাসেন। আজকের দিনটি আমার বড় ভাল গেল। মা গত প্রাণ। তেমন একটা আকুলতা নাই প্রাণে। কিন্তু একটা যেন শান্ত সমাহিত আনন্দময় ভাব মনে প্রাণে খেলে বেড়াচ্ছে।

মা তুমি আমাকে দয়া করে সব সময় দর্শন দাও। নইলে আমি এই নানা দৃশ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ছি। আমাকে দয়া করে দর্শন দাও। আমার মা সহায়—। মা আমার মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা—মা, মাগো।

বুধবার, ২৯শে আগষ্ট ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে হঠাৎ জীতুদার মৃত্যু সংবাদ পেলাম (শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ সেন)। মাকে ডাকতে লাগলাম। কি আশ্চর্য্য, আমাদের সমাজের এক এক জন করে নিয়ে মা তাঁর স্বর্গের বাগান সাজাচ্ছেন। এই ধর্ম্ম বন্ধুর জীবনের সঙ্গে যতটুকু পরিচয় হ'য়েছে তাতে এঁর সত্যে নিষ্টা দেখে আশ্চর্য্য হয়েছি। কর্ম্মব্যস্ত জীবনের আর একদিকে এঁর আধ্যাত্মিক জীবন বিরাট প্রসারতা লাভ করেছিলো। তার সন্ধান পেতাম এঁর উপাসনায়। এর সরলতা, উদারতা, অভিমান, হাসি, ঠাট্টা সব বালক সুলভ ছিল। গভীর জ্ঞানী ও বিদ্বান হ'য়েও আমাদের মত সামান্য লোকের সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব এক অপূর্ব্ব বস্তু। এঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম ও বড় ভাইয়ের মতই ভালবাসতাম।

মা এঁর আত্মাকে চির শান্তি ধামে রক্ষা করুন। মা আমার করুণাময়ী—।

বৃহস্পতিবার, ৩০শে আগষ্ট, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আবার ক'দিন হোল মনে কামের প্রবাল্য হ'য়েছে। স্ত্রীলোক দেখলেই কামভাব হয়। নানারূপ কুভাব ও কুপ্রবৃত্তি মনে জাগে। কখনও কখনও কামের দ্বারা উন্মত্তবৎ হ'য়ে যাই। গায়ত্রী জপ করি সারাক্ষণ। মা রোজ সকালে খাবার সময় সামনে এসে বসেন। মাছ মাংস যখন খাই মুখ ঘুরিয়ে থাকেন। মাছ মাংস আর বোধ হয় খেতে দেবেন না বেশী দিন। আমাকে নানাভাবে শাসন করেন। "কামের দিকে যদি যাস্‌ তবে তোর অশেষ অকল্যাণ হবে। অর্থ বিত্ত কিছুই হবে না"। আমাকে দিয়ে যে কি করতে চান জানি না। আমার একমাত্র মা সহায়।

১লা, সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সারাদিন মনে একটা শান্ত সমাহিত ভাব। মন কিছুতেই চঞ্চল হয়

এসেছ সেটা সত্যি। তুমি এসে আমার সকল সমস্যার অবসান করলে, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি'। আমার মা ভরসা।

রবিবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

কিছুদিন হোল আমার মাকে দেখতে পাচ্ছিনা। এটা হয়। একবার দেখা দিয়ে আবার ক'দিন লুকিয়ে থাকেন। কেন লুকিয়ে থাকেন জানি। লুকিয়ে থাকলে আবার দেখবার জন্যে প্রাণ ছটফট্ করে সাধন আরও গভীর হয়। তারপর আবার ক'দিন দেখা দেন। এমনি করে আমাকে হাতধরে সাধনের পথে নিয়ে যাচ্ছেন। মা আমার অপার করুণাময়ী। মাকে যখন দেখতে পাইনা তখনও কিন্তু মন সজাগ হ'য়ে থাকে ও সারাক্ষণ তাঁর সান্নিধ্য অন্তরে উপলব্ধি করি। লোভ সংবরণ না করতে পেরে কয়েকজনের কাছে আমার সাধনার অভিজ্ঞতার কথা বলে ফেলেছি। আমার মার কথার অবাধ্য হ'য়েছি। আমার মা ওসব দোষ নেন না। আমাকে বড় ভালবাসেন। সারাক্ষণ আমার কাছে কাছে থাকেন। আমার মা বড্ড ভাল মা।

বৃহস্পতিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে ধ্যানে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে দেখলাম। একটা মনোরম বনের ভিতরে একটি আশ্রম। সেখানে একটি যোগী বসে আছেন। তাঁর শরীরের বর্ণ ফর্সা নয়। কালো দাঁড়ি বেশ লম্বা। মাথার চুলও কালো ও বড় বড়। খানিকটা চুল ঠিক মাথার ব্রহ্মতালুতে গুচ্ছ ক'রে বাঁধা। সহাস্য মুখমণ্ডল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? মা বললেন 'ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য'। আমার মা সহায়—।

রবিবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ আলিপুরে জীতুদার আদ্যশ্রাদ্ধ ছিল। ৮টায় মানিক দে মহাশয় কীর্ত্তন করলেন। আরাধনার সময় দেখলাম জীতুদা, বুড়োদা, ছিরু, জ্ঞানদা সকলেই সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবী ও সাদা চাদর গায় দিয়ে যেখানে শ্রাদ্ধ বাসরে ঢোকবার জায়গা সেখানে এসে চেয়ারে বসলেন। যখন ইন্দিরাদির বড়

মেয়ে জীতুদার জীবনী পাঠ করলেন তখন জীতুদা যেন তাঁর গত জীবনের ঘটনার তারিখগুলো যা পড়া হচ্ছে সেগুলো সংশোধন করতে লাগলেন। সতী-দার উপাসনায় যেন ছিরুকে বললেন, "এখানে থাকতে আমার উপর অবিচার করলে আর আজ আমি এখানে নাই আমার খুব প্রশংসা করছ"। তারপর বুড়োদা জ্ঞানদা ও ছিরুকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে গেলেন। বললেন "চল বাড়ীটা তোমাদের দেখাই, আবার কবে আসব কে জানে"। সবাই গিয়ে ঘুরে ঘুরে বাড়ী দেখতে লাগলেন। তারপর দেখি একটি প্রান্তর ঘন শ্যামল বর্ণ। প্রান্তরটি দিগন্ত বিস্তৃত। প্রান্তরটি বিরাট ও তার মাঝখানে একটা ছোট পাহাড়ের মত, সেটাও শ্যামল বর্ণের। কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা ছোট কুঞ্জ ও সেই কুঞ্জে নানা ফুলের গাছ— যেন একটি সুন্দর আশ্রমের মত। সেখানে একটি ছোট মেটো ঘর অতি সুন্দর। অনুভবে বুঝলাম আপাততঃ জীতুদা সেইখানেই থাকবেন।

আজ বিকালে ৬॥০টায় ছিরুর মৃত্যু বাৎসরিক ছিল। হরিসুন্দরদা উপাসনা করলেন। আমি প্রথম দুইটি গান করলাম। শেষের গান দুইটি সুধাদি ও বাণীদি করলেন। আরাধনায় ছিরুকে আহ্বান করলাম। কিন্তু সে অর্দ্ধেক রাস্তা এসে আর আসতে চাইল না। সে বলল যে সে আজ দীক্ষা নিয়েছে। তার পরণে গৈরিক বসন দেখলাম। বলল যে এখানে আর আসতে চায় না। এলেই সংসারের ভিতরে এসে তার মন অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। তাই সে তার আধ্যাত্মিক জীবনকে সাধনায় সুউচ্চ করবার জন্যে দীক্ষা নিয়েছে। বলল "আমাকে আর ডেকোনা তোমরা"। আমার মা একমাত্র সহায়—।

বুধবার, ১৯শে, সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো, তুমি যে আমার অনন্তরূপিণী মা। বুড়ী হ'য়ে পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে চলেছ, মুটে হয়ে মোট বইছ, মেছুনী হয়ে মাছ বিক্রি করছ, বড় লোক হ'য়ে বড় বড় গাড়ী চড়ে বেড়াচ্ছ, মৎস হয়ে, মাংস হয়ে লোভীর উদর পূর্ণ করছ, বেশ্যা হয়ে কামুকের কাম স্পৃহা চরিতার্থ করছ আবার কামুক হয়ে কামে মত্ত

হচ্ছ। তুমি আপনি সব হয়ে যার যা আশা ও জন্মান্তরের কর্মপ্রাপ্তি তার ফল দান করছ। যে যা চাইছে তাকে তাই দিচ্ছ। পাপ যে চায় তাকে তাই দাও, অর্থ যে চায় তাকে অর্থ দাও, দুঃখ যার প্রাপ্য তাকে দুঃখ দাও, সুখ যার প্রাপ্য তাকে সুখ দাও। তুমিত কাউকে জোর করে তোমাকে ভালবাসাও না। সব ভোগ করে সে যখন আর তৃপ্ত হয় না ও তোমাকে চায় তখন তুমি এসে তাকে মধুর ভালবাসা দাও এবং তুমিও তাকে ভালবাস। তোমার এ কি লীলা জননী? মানুষকে স্বাধীন করে দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবার তোমার চরণে নিয়ে আস। মাগো আমাকে বুঝিয়ে দাও মা। আমার মা দয়াময়ী—।

বৃহস্পতিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো, এ সংসারে অগণিত নরনারী দেখি। সকলেই ব্যস্ত। যে যার কেনাকাটা, হাট বাজার, কাজকর্ম্ম, বিষয় আশয় নিয়ে মহাব্যস্ত। কারুর দিকে কেউ ফিরেও চায় না। এ কি সংসার হোলো? মার সংসারে মাকে ছেড়েই সকলে আপন মদে মত্ত। তোমার নামও ত কেউ করে না। তোমার পূজা আসছে। কই কেউত বলে না মার জন্যে একটা শাড়ী কিনি। সবাই বলে আমার চাই, ছেলের চাই, মেয়ের চাই, স্ত্রীর চাই, এটা চাই, ওটা চাই, ভালভাল জিনিষ চাই। কই কেউত বলে না মাকে এটা দেব। এমন সংসার গড়লে যে তোমাকেই এরা ভুলে গেল। মা বললেন "যাক তাতে কি হয়েছে? ওরা ছেলে মানুষ তাই আপন আপন চায়, তারজন্যে কি আমি দুঃখ পাব? ওরা সুখী হলেইত আমি সুখী। তবে দিনান্তে যে একবার ওরা আমার কাছে আসেনা এবং আমাকে মনে করে না তাতেই আমি দুঃখ পাই"। মাগো তুমি এত ভাল কেন মা?

আমার মা সহায়।

বুধবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ঋষি অরবিন্দ এলেন। আফিসে ৩া০টার সময় টিফিন খেয়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে গায়ত্রী জপ করছি। কিছুক্ষণ জপ করার পর দেখি

কালো অন্ধকার ভেদ করে একখানা মুখ আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে আমার চোখের সামনে। আস্তে আস্তে সে মুখখানা ক্রমেই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হ'ল। দেখি শ্রীঅরবিন্দ। খুব গম্ভীর ও প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন। কি যেন আমাকে বলতে চাইছেন। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছি তাঁর কথা শুনব বলে। কিন্তু তাঁর কিছু বলা হোল না। চলে গেলেন। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে এর পরে অন্য একদিন কিছু বললেন।

আমার মা একান্ত সহায়।

বৃহস্পতিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে উঠে বড় অভিমান হোল মার উপরে। বললাম কি এমন দোষ করেছি যার জন্যে ক'দিন দেখা দিচ্ছনা। মা বললেন "এ ক'দিন তুমি দেহ সম্বন্ধ ছিলে বলে আমার দেখা পাও নাই। যত বেশী আত্ম সম্বন্ধ হবে ততই আমাকে দেখতে পাবে।" আমি বললাম দেহ সম্বন্ধ কি ও আত্ম সম্বন্ধই বা কি? মা বললেন "ঘুড়ি উড়িয়েছ ত? লাটাই হোল দেহ, সুতা হোল সাধন যোগসূত্র আর ঘুড়ি হোল মন, আর যে ঘুড়ি ওড়ায় সে হোল আত্মা। ঘুড়ি যখন ওড়ে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে চলে যায় অসীম আকাশের গায়, তখন স্থির হাওয়ায় স্থির হয়ে উড়তে থাকে। নীচে থাকলে এদিক ওদিক থেকে নানা দমকা হাওয়া এসে ঘুড়িকে ওলট পালট করে। ঘুড়ি যে ওড়ায় সে তখন খুসী হয়ে ঘুড়িকে অবলোকন করে। লাটাই বা সুতা তখন তার বাস্তব চিন্তার মধ্যে আসে না। ঘুড়িতেই তার সকল আকর্ষণ নিবদ্ধ হয় ও সে ঘুড়ির দিকে একাগ্র হয়। তেমনি আত্মা হোল ঘুড়িওয়ালা, দেহ লাটাই, যোগ-সাধন হোল সুতা আর মন হোল ঘুড়ি। দেহেতে যে সাধন-যোগ আছে আত্মা তার দ্বারা মনকে অনন্ত পরব্রহ্মের দিকে উড্ডিন করে দেন ও মন যখন স্থির নিশ্চল হন তখন সেই মনকে অবলোকন করেন, যে মন সেই পরব্রহ্মের অনন্ত সত্তায় অবগাহন করে আছেন। আত্মার এই অবলোকনই পরমাত্মা দর্শন।

এই অবস্থায় দেহ ও যোগ-সূত্র দুইই পরোক্ষ। মন তখন আত্ম সম্বন্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ ও ব্রহ্মযোগভূমায় নিমগ্ন। ঘুড়ি কাছে এলে ও যত কাছে আসে ততই লাটাইয়ের দিকে ও ঘুড়ির দিকে সকল মনযোগ দিতে হয়। তেমনি মন যদি সংসারের নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকে দেহ সম্বন্ধ হয়ে পড়ে; তখন দেহ ও মন নিয়ে বিব্রত হতে হয়—এই গোল দেহ-সম্বন্ধ। মন ও দেহ স্থির না থাকলে আত্মা আমাকে অবলোকন করবে কেমন করে? এখন বুঝলে"? এইবার আমি বুঝলাম। ঠিক, আমার মন চঞ্চল ছিল এ ক'দিন। নানা অর্থ চিন্তায়, ব্যবসায়ের চিন্তায়। মা বললেন "তোমার অর্থ চিন্তা প্রকট হওয়াতে স্বর্গের সকল সাধু ভক্তবৃন্দ চিন্তিত হ'য়ে মহা-সম্মিলন আহ্বান করেছেন, কেমন করে তোমার অর্থ অনটন দূর হবে যাতে শীঘ্র অর্থলাভ করে তুমি নিশ্চিন্ত মনে একাগ্র হ'য়ে আমার ধ্যানে নিমগ্ন হ'তে পার; তার জন্য তাঁরা মহাব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। কারণ তোমার এখন এক মূহূর্ত্ত সময় অন্য কোনও চিন্তা করবার অবসর নাই; তা হ'লেই দেহ সম্বন্ধ হ'য়ে পড়বে এবং তোমার উপরে যে গুরুভার অর্পন করা হ'য়েছে সে মহাকার্য্য সম্পাদিত হ'তে দেরী হবে। পৃথিবীর এই সঙ্কট সময়ে তুমি একমাত্র কাম্য ব্যক্তি যে মহাজাতি নাশ থেকে জীবগণকে আমার নামে জাগ্রত করতে পারবে। তোমার সামান্যতম দেহ-সম্বন্ধ মন হ'লেই তাঁরা মহা সঙ্কিত হ'য়ে পড়েন এই ভেবে যে এই বুঝি যাঁকে তাঁরা ধরেছেন সেও বুঝি মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে এ মহা কর্ত্তব্য ভুলে যায়। তা হ'লে মহা-বিনষ্টি হবে এই পৃথিবীর। তুমি সদা জাগ্রত থাক। তোমাকে সেই সাধু ভক্তদের মহাসম্মীলন দেখাব, চোখ বুঝে উর্দ্ধে ওঠ।" চোখ বুঝে অনেকক্ষণ ধ্যান করলাম। পরদার পর পরদা সরে গেল। কিন্তু দেখতে পেলাম না। গোলমালে যোগ ভেঙ্গে গেল। মা মা আমার মা তোমার অপার করুণা।

বৃহস্পতিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "জীবদেহে আত্মাই একমাত্র স্থিত ও ধারক।" স্থিত কি? "যাহার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। যাহার গতি আছে অথচ অপরিবর্ত্তনীয়

তাকেই তোমরা স্থিত বলে জানবে। আত্মার রূপের পরিবর্ত্তন নাই যদিও আত্মা শাশ্বত অরূপ। আমার অংশ বলে আত্মাও অরূপ। অরূপ অর্থে রূপহীন নয়। অরূপ অর্থে রূপ নির্ব্বিকার। কিন্তু আমি যে অরূপ সেটা হ'চ্ছে রূপাতীত বলেই আমি অরূপ। আমি সকল রূপের স্রষ্টা বলেই আমি রূপাতীত। সেই যে আত্মা সে সাধক। দেহাবস্থায় যাহা কিছু মনন কর সব আত্মা ধারণ করেন। এই ধারণ ক্ষমতা আত্মা আমা থেকেই লাভ করেছেন। আত্মার ধৃতি শক্তি এক মহাশক্তি ও এটা সৃষ্টির একটি প্রকৃষ্টতম গূঢ় তত্ত্ব। এই তত্ত্ব আজকে আমি তোমাকে বলব। দেখ জীব জগতে প্রকৃতিতে যাহা কিছু দৃশ্যমান আছে ইহা সবই আমার ভিতর স্থিত ও স্থিত আছে বলেই ইহাদের বিলয় নাই। কিন্তু পরিবর্ত্তন আছে। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ সবই যে যার গুণ নিয়ে প্রকৃতিতে অর্থাৎ আমার ভিতরে চিরন্তন হ'য়ে জাগ্রত আছে। যেমন হাজার হাজার মাইল দূরে যে শব্দ হ'চ্ছে সে শব্দ তোমরা রেডিওতে জানতে ও শুনতে পাচ্ছ। সেইরূপ রূপও তোমরা দেখতে পাচ্ছ টেলিভিসনের সাহায্যে আজ কাল। এমনি সব কিছুই দেখা ও জানা সম্ভব হবে। সামান্যতম গন্ধ বা শব্দ যা হাজার বৎসর পূর্ব্বে এক মুহূর্ত্তের জন্য এ ধরণীকে স্পর্শ করেছে, তা আজও বেঁচে আছে। আজকে সেটা তোমরা জানতে পারছন। কিন্তু একদিন হয়ত জানতে পারবে। এই ধৃতি শক্তি এই আমার পরা-শক্তি। সকল কিছুই আমার ভিতর আছে বলে এবং সকল আমার দ্বারা পরিব্যপ্ত বলেই আমিই সব এবং কিছুই চিরতরে বিলুপ্ত হ'তে পারে না। যে প্রেম রাম ও সীতার ভিতরে ছিল সেইরূপ একনিষ্ঠ প্রেম এখনও অনেকের ভিতরেই পাবে। দশ হাজার বৎসর আগে যে কমল যে সৌন্দর্য্য ও ঘ্রাণ দিয়েছে আজও কমল সেই সৌন্দর্য্য ও সেই ঘ্রাণ বিতরণ করছে না কি? পরিবেশের পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু কমলের ঘ্রাণ কমলেরই থাকে, সে ঘ্রাণ জবা ফুলের হ'তে পারে না। কত কমল পৃথিবীতে ফুটেছে আজ পর্য্যন্ত কিন্তু সকলেরই সেই একই ঘ্রাণ। এই ঘ্রাণ দেহ ও পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন হয়। বিভিন্ন পুষ্পের বিভিন্ন সুঘ্রাণ আবার বিষ্ঠার কুঘ্রাণ।

ঘ্রাণের পরিবর্ত্তন নাই। আছে, ঘ্রাণ যাকে আশ্রয় করে তার পরিবর্ত্তনে ঘ্রাণের পরিবর্ত্তন। যেমন বিষ্ঠার অতি কুঘ্রাণ কিন্তু বিষ্ঠার ভিতরে একটি কমল ফুল ফুটলে তার হয় সুঘ্রাণ। সুতরাং দেহের আকার ভেদে বা দেহের আকারান্তরে তার গুণাবলির পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আসলে গুণাবলির সত্যই কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। দেহ ভেদেই সেই গুণাবলির পরিবর্ত্তন বলে মনে হয়। যেমন বাঘের ভিতরে যে আত্মা গরুর ভিতরেও সেই আত্মা। ব্যাঘ্র দেহ ধারণে সে হিংস্র আর গাভীর দেহ ধারণে সে নিরীহ। কিন্তু আত্মা একই সদ্গুণ বিশিষ্ট হ'য়ে বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করছেন। পুনঃ মূষিক ভব' এই গল্পটির ভিতর দিয়ে পূর্ব্বগামী ঋষিগণ দেহাত্ম ভেদে আত্মার গুণাগুণ কেমন হয় তাহাই দেখিয়ে গেছেন। মূষিকের আত্মা ব্যাঘ্রদেহে উপনীত হ'য়ে হিংস্র স্বভাব লাভ করল। তবেই বুঝতে পার আত্মা এক কিন্তু বিভিন্ন দেহের গণ্ডিতে সে বিভিন্ন দেহজাত স্বভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়।

সকল জীবাত্মাই এক ও আমার অংশ। কিন্তু আত্মা ধারক ও স্থিত বলে তার উন্নত ইচ্ছারূপশক্তি তাকে দেহের ক্রমোন্নতির দিকে নিয়ে যায়। আমি যেমন অনন্ত তেমনি আত্মা আমার অংশ হ'য়ে অনন্ত ইচ্ছার অধীন। কেহই আপনার পরিবেশে সুখী না। তার উন্নতির ইচ্ছাই তাহার পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী। ব্যাঘ্রের গাভী জন্মের ইচ্ছা সক্রিয় হ'লে যে গাভী জন্ম লাভ করে। গাভী মনুষ্য জন্মের জন্যে আকাঙ্ক্ষিত হ'লে তার মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। তবে এ চির সত্য যে প্রত্যেক জীব তার থেকে বেশী ক্ষমতাশীল জীবের প্রতি ঈর্ষা পরায়ণ হ'য়ে সেই জীবদেহ ধারণ করবার যে ইচ্ছা মনে পোষণ করে তাতে সেই জীবদেহই ধারণ হয়। এই যে ইচ্ছা এ ইচ্ছা আত্মা ধারক বলে তাতে ধৃত হয় ও ক্রমোন্নতির দিকে জীবন ধাবিত করে। এমনি ক'রে আস্তে আস্তে জীব বহু যোনী পার হ'য়ে অসীম ক্ষমতাশীল মানব-জন্ম লাভ করে। মানব থেকে বেশী ক্ষমতাশালী, পরিমুক্ত ও স্বাধীন আর কোনও জীব নাই

বলে মানব জন্মে জন্মে মানবই থেকে যায়। কিন্তু তার সাধনা ও আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তনে উচ্চ থেকে উচ্চ অবস্থায় সে নীত হ'য়ে পরিশেষে আমার সান্নিধ্য লাভ করে। প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে শুঁয়োপোকা গুটীপোকা হয় ও গুটীপোকা প্রজাপতি হয়। আরশুলা কুমড়ো পোকা হয়। ঢোড়াসাপ কচ্ছপ হ'য়ে যায়। এসব তার সক্রিয় চিন্তায় অন্য পরিবেশে নিজেকে সেইরূপ ভেবে সে সেইরূপ প্রাপ্ত হয়। এই যে আত্মার চিন্তা এ যদি আত্মায় ধৃত না হোত তবে এসব পরিবর্ত্তন হোত না। সুতরাং আত্মনিষ্ঠ চিন্তায় দেহেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আত্মা মানব দেহ ধারণ করলে তার স্বাধীনতা বহু সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়। তার ভিতরে যে গুণ সকল আশ্রয় করে তার অনুশীলনে তার উন্নত অবস্থা লাভ হয়। সহস্র মানবেতর যোনীতে জন্মহেতু তার ভিতরে সেই সেই যোনী কারক দোষও বর্ত্তায় ও সেই সেই দোষ অনুগমন করলে মানব আত্মা প্রেত-লোক প্রাপ্ত হয়ে অশেষ দুঃখভাগী হয়। মানব আত্মা আর মানবেতর যোনীতে জন্মগ্রহণ করেনা। প্রকৃতিতে ক্রমোন্নতি আছে! অধোগতি প্রকৃতি বিরুদ্ধ। উন্নতিই প্রকৃতির একমাত্র ধর্ম্ম। যে জন্মে যে মানব অতি সরল উদার সৎস্বভাবের ও সদ্‌গুণে ভূষিত তার আত্মা অত্যন্ত নির্ম্মল হওয়াতে পরজন্মে তার দেহ অপরূপ রূপ লাবণ্যে ভূষিত হয়। আত্মা শাশ্বত ধারক বলে দেহী অবস্থায় তার অন্তরের গুণাবলীতে তার আত্মা শুদ্ধ হয় ও আত্মা শুদ্ধ হ'য়ে পরজন্মে তার দেহ ও আত্মা রূপে ও গুণে ভূষিত হয়। এইভাবে আত্মিক লোকের পরিবর্ত্তনে জন্ম-জন্মান্তরে মানব জীবনের ক্রমোন্নতি হ'তে হ'তে সপ্তম জন্মে সে আমার সান্নিধ্য লাভ করে। এই প্রতি জীবের পরমাগতি। এই জগতে সকলেই সাধক। প্রত্যেক মানব স্ব স্ব স্বভাবজাত ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ও প্রত্যেকের এক একটা বিষয় সাধন সবচেয়ে অগ্রগামী হয়। কারু অর্থ চিন্তাই সাধন হয়, কারুর কাম চিন্তাই প্রবল হয়। কারুর রূপ চিন্তাই প্রবল হয়। কেউ কেউ মহা অহঙ্কারী হয় ইত্যাদি। যার যা চিন্তা প্রবলতম হয় এবং সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি যদি সেই জন্মে না হয় তবে তাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। সেই জন্মে

সে সেই আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থ করবে। তোমরা দেখতে পাও কোনও লোক ভীষণ কামাশক্ত, কেউ কেউ অত্যন্ত অর্থ লোলুপ, কেউ কেউ ঈর্ষাপরায়ণ ইত্যাদি। অথচ তাদের ভিতরে অন্য রিপুর তীব্রতা একেবারেই নাই। ছয়টা রিপু দেহজাত, আত্মায় পুষ্ট হ'য়ে জন্মান্তর ঘটায় ও ছয় জন্মে ছয়টি রিপুর নিলয় হ'য়ে সপ্তম জন্মে মানব পশুত্ব বিমুক্ত হয়ে সাধক মানবরূপ প্রাপ্ত হয় ও সেই জন্মে আমার দর্শন লাভ ক'রে জন্মান্তর খণ্ডন করে।

মনই আত্মার একমাত্র প্রকৃষ্টতম ও স্বক্রিয় অঙ্গ। আত্মা দেহজাত হ'লে, বুদ্ধি, আত্মা ও দেহের ভিতরে মনরূপ অঙ্গ দ্বারা প্রতিনিয়ত কার্য্য করে যায়। দেহের যে স্থূল সাধনা সেটা বুদ্ধির সাহায্যে মনে ধৃত হয় ও মন তখন মনন করে ও এই মননে আত্মা আমার স্বক্রিয় শক্তি উপলব্ধি করে ও বিবেকরূপ আমার বাণী শ্রবণ করে। এসব এক নিমেষে হয়। দেহ যদি সেটা গ্রহণ করে আত্মোন্নতি হয়। না গ্রহণ করলে অবনতি হয়। এর কার্য্যক্রম অতি স্বাভাবিক ভাবে হ'য়ে থাকে প্রত্যেক জীবদেহে বিশেষতঃ মানব দেহে। পশু দেহেও অনেক সময় সদ্‌গুণ বা বিবেকের অনুশাসন দেখতে পাওয়া যায়। নেক্‌ড়ের মানব শিশু পালন। ব্যাঘ্রের শৃগাল শিশু পালন। কিন্তু মানবদেহে এই বিবেক অতি স্পষ্ট ও মুক্ত। আত্মা আমার মহাশক্তির অংশ যাকে বলা যায় ধৃত পরমাত্মিক শক্তির অংশ। আত্মা নিষ্ক্রিয় থেকে শুধু শক্তি দান করে যায়। মন সেই শক্তিগ্রহণ ক'রে বুদ্ধির সাহায্যে দেহকে কার্য্যকারী করায়। একটা Electric Motor এর ভিতরে Electric Current ধরবার সব রকম ব্যবস্থা আছে ও সেই ব্যবস্থায় Electric Current তার ভিতরে প্রবেশ করলে সে চলতে সুরু করে। Electric Current আসে তারের ভিতর দিয়ে Switch-এ। যেই Switch on করলে অমনি Current এসে Motor-এ প্রবেশ করে ও Motor কে চালায়। Motor-এর নিজস্ব কোনও ক্ষমতা নাই। কিন্তু Electric Current গ্রহণ করবার মত তাকে প্রস্তুত করতে হয় যাতে সে

electric Current ধরতে পারে। এই electric Current যদি অন্য কোনও machine এ প্রবেশ করাও তাতে তার কোনও Movement হবে না। বরং সে গ্রহণ করতে না পারায় Current ফিরে যাবে ও অন্যকে আঘাত করবে। তেমনি বিভিন্ন মানব দেহ বিভিন্ন মনন শক্তি লাভ করে। যার যেমন বিভিন্ন শক্তি তার দেহও সেইরূপ শক্তি গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়। একজন বিজ্ঞানী হয়ত সাহিত্যিক হতে পারে না। আবার একজন শিল্পী একজন ডাক্তার হ'তে পারে না। আত্মার ভিতরে সকল শক্তি নিহিত আছে বলে একজন শিল্পীকে অতি কষ্টে অনেক শ্রম করে ডাক্তার করা চলে। কিন্তু তার ব্যুৎপত্তি শিল্পজ্ঞানে যতটা ডাক্তারী শাস্ত্রে ততটা হয়না। এ রকমও দেখা যায় যে একজন সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্ববিজ্ঞানে পারদর্শী হয়। তাতে বুঝতে হবে তার ধৃতি শক্তি অনেক অগ্রসর হয়েছে জন্ম জন্মান্তরে। তার অর্থ সে তার আত্মায় অনেক রকম শক্তিকে ধৃত করেছে। একটা electric Generator আছে। সেটা থেকে 3000 Voltage-এর Current নির্গত হচ্ছে। সেই Current-কে tronsformer দিয়ে আস্তে আস্তে কমিয়ে 400 200 ও 110 Voltage করে নেওয়া চলে তোমাদের বিজ্ঞানে। তার শক্তিকে কমানো চলে। যখন তার শক্তি কমলো সে তখন সেই শক্তি অনুসারে তার কার্য্য করে। কিন্তু সে সেই high Voltage 3000 I এর অংশ সেই Current এসে Switch-এ নিবদ্ধ থাকে। Switch on করলে সে ধাবিত হয়ে motor এর ভিতর প্রবেশ করে। তখন motor চলে ও তার কার্য্য করে। পরমাত্মা highest Voltage, আত্মা low Voltage, Current (প্রবাহ) মন, Switch বুদ্ধি ও motor দেহ। মনরূপ প্রবাহ বুদ্ধিরূপ Switch-এর দ্বারা দেহকে চালিত করে। এখানে যেমন Switch বিগড়ে গেলে motor চলে না, মানব দেহে তেমনি বুদ্ধিভ্রংশ হ'লে দেহ বিপথগামী হয়—একই অবস্থা। বিদ্যুৎ ও প্রবাহ এক নয়। বিদ্যুত সারা জগতে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তাকে প্রবাহের ভিতর

দিয়ে চালিত করলে সে সক্রিয় হ'য়ে কার্য্য সম্পাদন করে। তেমনি আত্মা নির্ব্বিকার ও পরিব্যপ্ত। কিন্তু দেহ জাত হ'লে মনরূপ প্রবাহ বিস্তার করেন। আত্মার ধৃতি শক্তি মহান্ ও সেই ধৃতি শক্তি দেহবস্থায় অত্যন্ত সক্রিয় হয় যেমন electric Current তারের ভিতরে অত্যন্ত সক্রিয় হয় তেমনি। এই সক্রিয় অবস্থায় দেহের লালসা বা সাধনা, দুষ্কর্ম্ম বা সুকর্ম্ম, সরলতা বা অসরলতা যে ভাবের জীবন যাপন হবে মৃত্যুর পরে আত্মা সেই ভাবের দাসত্ব অনেকদিন করে থাকে ও পূর্ব্বজন্মের আকাঙ্ক্ষায় আবার জন্মগ্রহণ করে। জন্ম তাকে গ্রহণ করতেই হবে যে পর্য্যন্ত আত্মা সম্পূর্ণ পরিশুদ্ধ না হবে এ আমার নিয়ম। জ্ঞান বিজ্ঞানের যা কিছু ধারা, মানব সমাজে ও সভ্যতায় যা কিছু নিয়ম বা বিজ্ঞানের আবিষ্কার সে সবই আমার ভিতরে আছে বলেই মানব তার Conception পেয়েছে। মানব Conception স্বাভাবিক নিয়মে আমার নিয়ম ধারা বা আমার দ্বারা জাত যা তাই এই জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে ও করবে। মানব দেহের সৌন্দর্য্য আত্মিক রূপের ছায়া মাত্র। যে যত সুন্দর তার তত গভীর আত্মিক উন্নত সাধনা পূর্ব্বজন্মে ছিল বলেই সে এ জন্মে সুন্দর হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। সুন্দর পুরুষ বা স্ত্রী হীন কার্য্য কি করে না? করে সেটা এ জন্মে দেহ জাত রিপুর প্রভাবে করে; পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি সে ভুলে যায় বিষয় বিকারে। যে কোনও মানব যদি অতি শুদ্ধাচারী ও মোহগ্রস্থ না হ'য়ে বালক অবস্থা থেকে ভগবৎ সাধন করে সে পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি জানতে পারে। অনেক সাধক উন্নত সাধন সারা জীবনে ক'রে শেষ জীবনে কামাশক্ত বা অর্থাশক্ত বা ঈর্ষাপরায়ণ বা অন্য কোনও রিপুর প্রতি আকাঙ্ক্ষিত হ'লে পরজন্মে তার পূর্ব্ব জন্মের সাধনের ফলস্বরূপ ধনীর ঘরে সুন্দর দেহ লাভ হয়। কিন্তু তার ভিতরে সেই সেই রিপু প্রবলতম থাকে। আর সাধন ভ্রষ্ট বলেই তার আবার পুনর্জন্ম লাভ হয়। তোমরা আত্মার বিষয় একেবারে উদাসীন বলে বিষয় তোমাদের আত্মিক লোক ভুলিয়ে রাখে। এইজন্য আত্ম অনুশীলনের প্রতিবন্ধক বিষয়। বিষয় পাপ নয়। বিষয় সাধন পথের বাধা হ'য়ে যদি দাঁড়ায় তবে তোমার

ক্ষতি হবে। আর বিষয় কর্ত্তব্য হিসাবে যদি গ্রহণ করে আত্মনিষ্ঠ হ'য়ে আত্মিক লোকে মনন ও সাধন করে আত্মোন্নতি কর তবে বিষয় তোমার কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। আত্মার অনুশীলনই একমাত্র ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম মানব সমাজ গ্রহণ করলে আর পৃথিবীতে কোনও অন্যায় থাকবে না। এই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই তোমাকে এই সব জ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছি। তোমার উপর বিশেষ গুরুভার অর্পিত হ'ল। তুমি সাধন কর ও প্রস্তুত হও।" আমার মা আনন্দময়ী—জ্ঞানদায়িনী-দয়াময়ী।

মা আমার।

রবিবার, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্মমন্দিরে সতীদার উপাসনা। প্রথম দুটো গান বড় বৌদি (ডাঃ বাণী চট্টোপাধ্যায়) করলেন। শেষের গান দুটো আমি করলাম। আরাধনার আগে থেকে ধ্যানে বসলাম। ভক্ত-মহাসম্মিলন দেখতে চাইলাম মার কাছে। কিছুক্ষণ পরে অনেক উর্দ্ধে উঠে গেছি। একটি সহাস্যময়ী মাতৃ মূর্ত্তির সঙ্গে আমি চলেছি। মার পরনে সাদা শাড়ী কালো কল্কা পাড়, গলায় আজানুলম্বিত সাদা ফুলের মালা। মাথায় ঈষদ্ ঘোমটা আছে। আমি একটি ১০।১১ বছরের কিশোর বালক। আমার ডান হাতখানা ধরে মা নিয়ে চলেছেন। অতি উচ্চ একটি পর্ব্বতের উপরে প্রকাণ্ড বড় একটি মনোরম স্থান শ্বেত বরফের আস্তরণে ঢাকা। আধো আলো আধো অন্ধকার—যেন অন্ধকার নয় ছায়া ছায়া ভাব, যেন ছায়ায় ঘেরা। যেখানে মহাসম্মিলন হচ্ছে, তার পশ্চিম দিকে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। মা আমার সব সময় খুব সস্নেহে হাস্য করছেন। অনেক ভক্তবৃন্দ সেখানে আছেন। চৈতন্যদেব খালি গায় ধুতি পরে গলায় সাদা ফুলের মালা পরে, কপালে, গলায় ও নাকে ফোঁটা তিলক কেটে উর্দ্ধবাহু হ'য়ে নৃত্য করছেন। শ্রীকৃষ্ণ, মুষা, নানক, বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, কেশব-চন্দ্র (সাদা থান ও সাদা চাদর পরা) প্রভৃতি অনেক ভক্তবৃন্দ আছেন। শ্রীঅরবিন্দ মহাসম্মিলনে ঢুকবার জায়গার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। জায়গাটা চারিদিকে

খোলা কিন্তু যেন পশ্চিমদিক দিয়েই যাবার রাস্তা। কোনও মণ্ডপ বা দরজা নাই। দেখতে পেলাম উৰ্দ্ধ আকাশ থেকে একটি আলোকের দণ্ড সেই মহা-সম্মিলনের মধ্যস্থলে এসে পড়ছে। সেটা যেন আলোকের একটা রাস্তা ৪৫° ডিগ্রি angle-এ নেমে এসেছে। সেই আলোকের রাস্তা দিয়ে একজন বিরাট দেহ সাধু নেমে এলেন। তাঁর মাথাটা যেন জ্যোতির পিণ্ড। দেহ অগ্নিবর্ণ। এমন জ্যোতির্ম্ময় সাধু আর একটিও ওখানে নাই। তিনি নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাত জোড় করে তাঁকে প্রণাম করলেন। তিনি এসে বললেন "কোথায় সে ?" সকলে আমার দিকে সঙ্কেত করে দেখালেন। তিনি বললেন "এ যে মা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন"—এই বলে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। মা হঠাৎ অপূর্ব্ব জ্যোতির পিণ্ড হ'য়ে উৰ্দ্ধে উঠে গেলেন। আর সেই সাধু আমাকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে সেই মহাসম্মিলনের মাঝখানে গেলেন। আমি এতক্ষণ half-pant ও half-shirt পরা কিশোর ছিলাম। আমার গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর বর্ণ। নীল Stripe Shirt পরে ছিলাম। সেই মহাসম্মিলনের মাঝখানে একটি শ্বেত পাথরের মানুষ-সমান উঁচু বেদী। আমাকে সেখানে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। দেখি আমি মুণ্ডিত মস্তক, নগ্ন-গাত্র ও পরিধানে আমার গেরুয়া, দেহ অগ্নিবর্ণ ও স্বাস্থ্যবান যুবক। সেই মহাজ্যোতির্ম্ময় সাধু আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও সহাস্যময় হয়ে আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইনি হ'লেন মহাযোগী শিব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহা-মানব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু আত্মা।

সাধারণ প্রার্থনায় পর বাথরুমে গেলাম। আমার খালি কান্না পাচ্ছে ও একটা অপার আনন্দের স্পর্শ যেন আমাকে অতিশয় অভিভূত করছে। একটা যেন স্বর্গীয় ভাব আমার ভিতর খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমার মা অপার করুণাময়ী। মাগো দর্শন দাও।

সোমবার, ১লা অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে মা বললেন "দেখ মানুষের মধ্যে দুটো জিনিষ আছে। একটা

হোল 'চিন্তা' আর একটা হোল 'ধৃতি'। যে কোন চিন্তাই মনে উদয় হোক্ না কেন সেটাকে যদি ধৃত না করা যায় তবে সে চিন্তায় কর্ম সম্পাদন হয় না। সাধনেও যদি আমার চিন্তাকে ধৃত করে রাখতে পার তবে আমাকে লাভ হবে।" আমি বললাম ধৃতি কি ভাল করে বুঝিয়ে দাও। মা বললেন "ধৃতি হ'চ্ছে অনুলেপন। প্রতিমা যে গড়ে তার মনের চিন্তার বিকাশ হয় প্রতিমার উপর রং ফলিয়ে। আলপনা যে দেয় সে সুন্দর করে নানা চিত্র বিচিত্র আঁকে—সেইটাই অনুলেপন। সাধন করে অনুলেপন দিয়ে তাকে মূর্ত্ত করে জাগিয়ে রাখতে হবে তবে অন্তর আমার স্পর্শে সদা জাগ্রত থাকবে।

জয় মা জ্ঞান দায়িনী জননী আমার।

মঙ্গলবার, ২রা অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ তারিণী বাবুর কাছে আমার কুষ্ঠি বিচার করতে যাই। তারিণী বাবু আমাকে বললেন যে গত সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ খৃঃ থেকে আমার ও আমার সন্তান ও মাতার শনি শুক্রের দশা চলছে। আরও ১ বৎসর ৮ মাস চলবে। আমার accident ইত্যাদি নানা বিপদ গাড়ী থেকে আসতে পারে। অবশ্য অর্থ আসবে প্রচুর ইত্যাদি। ছেলে মেয়েদের বিপদ নানা ভাবে আসতে পারে। রাস্তায় গাড়ীতে আসতে আসতে মা বললেন "তারিণী জানে না ও যা বলেছে সে গুলো গত, ভবিষ্যৎ বিষয়ে বলতে পারে নাই।"

বুধবার, ৩রা অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজকে আবার তারিণী বাবুর কাছে আফিস ফেরৎ যেমন যাই তেমনি গেলাম। তারিণী বাবুকে আমি কিছু বলিনি। তিনি আবার কুষ্ঠি নিয়ে বিচার করতে বসলেন ও বললেন আপনার ফাঁড়ার বৎসর ছিল ৪৭ ও ৪৮ বৎসর বয়েসে। এখন যখন আপনার ৪৮ বৎসর ৪ মাস তখন আপনার ফাঁড়ার বৎসর কেটে গেছে। মার কথাই সত্য।

আজও তারিণী বাবু ছেলে মেয়েদের বিষয় খুব খারাপ বললেন। কিন্তু

মা বললেন "না ও সব কেটে গেছে আর ছেলেদের বিপদ নাই"। মাগো তুমি আমার সব। তুমি আমায় কত ভালবাস।

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকাল থেকে নিজের একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করছি। দু'তিন জায়গায় ছেলে কোলে জননীকে দেখলাম। সব নারীকে দেখলেই আমার মার কথা মনে পড়ছে। বারে বারে কান্না পাচ্ছে। একটা শান্ত সমাহিত ভাব অন্তরে বিরাজ করছে। সংসারের কিছুই যেন আমাকে স্পর্শ করতে পারছে না। আমি যেন অনেক ঊর্দ্ধে উঠেছি। সারাক্ষণ মার কথা, মার ধ্যান, ও জপ করছি। আফিসে অনেকক্ষণ জপ হয় নাই।

বিকালে ব্রহ্ম মন্দিরে Executive Committee-র সভায় গেলাম। অক্ষয়দা, মণিবাবু আমাকে সামনের বৎসর থেকে উপাসনার ভার নিতে বললেন। আমি মনে মনে বললাম যখন ভার আসবে বইতে হবে, তার জন্য চিন্তা কি?

খুচরা ধার যা ছিল প্রায় সব দিয়ে দিলাম। মনটা হাল্‌কা লাগছে। আমার পরম জননী আমাকে যেন আজ থেকে অনেক অগ্রসর করেছেন সাধনের পথে। যেন কি একটা আসি আসি করে আসতে পারছে না মনে। একটা মহাশক্তি যেন আসবে শিগ্‌গির্।

আমার মা সহায়।

শনিবার, ৬ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ অফিসে মহাত্মা গান্ধিজীকে দেখলাম। টিফিনের পরে আরাম চেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে গায়ত্রী জপ করছি। একটা কালো পরদার মতন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই পরদা আস্তে আস্তে উজ্জল হ'তে লাগল এবং তার ভিতর থেকে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হোল। তাঁর পরণে খদ্দর হাঁটু পর্য্যন্ত ও গায়ে সাদা চাদর জড়ানো। আস্তে আস্তে তাঁর মুখ স্পষ্ট হোল। দেখলাম মহাত্মাজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে চশমা

নাই। অতি কমনীয় মূর্ত্তি ও প্রসন্ন ভাব। আমার দিকে চেয়ে যেন আমাকে দেখছেন। আমার মনে হলো তিনিও আমাকে কিছু একটা বলতে চাইছেন। আমার জীবনের মহান্ কর্ত্তব্যের কথা তিনি যে বুঝতে পেরেছেন সেটা বুঝতে পারছি। আমাকে উৎসাহ দেবার ভাব তাঁর মুখ মণ্ডলে ব্যক্ত হ'য়ে আছে। তিনি আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলেন।

আমার মা সহায় — ।

সোমবার, ৮ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ধ্যানে দেখলাম যেন পৃথিবীর উপরে একটা মহা ধ্বংশ নেমে আসছে। বড় বড় সহর যেন জনশূন্য। দালান কোঠা সব যেন একটা দারুণ অগ্নিপ্লাবনে পুড়ে গেছে। সব যেন ধূ ধূ করছে মরুভূমির মত। মাঝে মাঝে electric post-এর মত উজ্জল সব দণ্ড দাঁড়িয়ে আছে আর সব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। আমার যেন মনে হ'চ্ছে এ জায়গাটি দিল্লী ও নূতন দিল্লী। যে অনাচার আজ নূতন দিল্লীতে হ'চ্ছে তাতে এটা ধ্বংশ হ'য়ে যাবে বলে মনে হয়। কোটি কোটি অনাহার ক্লিষ্ট নরনারীর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে যে সকল সুরম্য সৌধ গ'ড়ে উঠেছে সে সকল সৌধ মহা প্রলয়ে ধ্বংশ হ'য়ে যাবে। আমার যেন মনে হ'চ্ছে আজ যে পথে রাষ্ট্র চলেছে সে পথ মহা অন্যায়ের পথ। রাষ্ট্র নায়কগণ মোহগ্রস্থ, নরনারী অন্নহীন বস্ত্রহীন মোহগ্রস্থ। মহাপাপে ভারতের আকাশ বাতাস পূর্ণ হ'য়ে গেছে। ভারতে আজ যুগ পরিবর্ত্তনের সময়। আধুনিক সব ধ্বংশ হ'য়ে আবার বৈদিক যুগের ব্রহ্ম-বার্ত্তা, একাত্ম, সরল, সংযত জীবন ফিরে আসছে খুব দ্রুত। আমি যেন কিসের একটা আভাষ পাচ্ছি ও সেটা যেন একটা মহা খণ্ড প্রলয়ের। আমি যেন কি বিভীষিকাময় ছবি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মা বললেন "পৃথিবীর মধ্যে ভারত ও ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশ সবচেয়ে আমার প্রিয়। আমার গৌরব এখান থেকে যুগে যুগে হ'য়েছে, এখান থেকে এ যুগেও হবে। আমাকে অস্বীকার করে ভারত ও বঙ্গদেশ মায়ার বর্ত্মে পতিত হ'য়েছে। এ থেকে ত্রাণ পেতে হ'লে নৈসর্গিক প্রলয়ের

মা বললেন "না ও সব কেটে গেছে আর ছেলেদের বিপদ নাই"। মাগো তুমি আমার সব। তুমি আমায় কত ভালবাস।

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকাল থেকে নিজের একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করছি। দু'তিন জায়গায় ছেলে কোলে জননীকে দেখলাম। সব নারীকে দেখলেই আমার মার কথা মনে পড়ছে। বারে বারে কান্না পাচ্ছে। একটা শান্ত সমাহিত ভাব অন্তরে বিরাজ করছে। সংসারের কিছুই যেন আমাকে স্পর্শ করতে পারছে না। আমি যেন অনেক ঊর্দ্ধে উঠেছি। সারাক্ষণ মার কথা, মার ধ্যান, ও জপ করছি। আফিসে অনেকক্ষণ জপ হয় নাই।

বিকালে ব্রহ্ম মন্দিরে Executive Committee-র সভায় গেলাম। অক্ষয়দা, মণিবাবু আমাকে সামনের বৎসর থেকে উপাসনার ভার নিতে বললেন। আমি মনে মনে বললাম যখন ভার আসবে বইতে হবে, তার জন্য চিন্তা কি?

খুচরা ধার যা ছিল প্রায় সব দিয়ে দিলাম। মনটা হাল্‌কা লাগছে। আমার পরম জননী আমাকে যেন আজ থেকে অনেক অগ্রসর করেছেন সাধনের পথে। যেন কি একটা আসি আসি করে আসতে পারছে না মনে। একটা মহাশক্তি যেন আসবে শিগ্‌গির্।

আমার মা সহায়।

শনিবার, ৬ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ অফিসে মহাত্মা গান্ধিজীকে দেখলাম। টিফিনের পরে আরাম চেয়ারে শুয়ে চোখ বুজে গায়ত্রী জপ করছি। একটা কালো পরদার মতন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই পরদা আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হ'তে লাগল এবং তার ভিতর থেকে একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হোল। তাঁর পরণে খদ্দর হাঁটু পর্য্যন্ত ও গায়ে সাদা চাদর জড়ানো। আস্তে আস্তে তাঁর মুখ স্পষ্ট হোল। দেখলাম মহাত্মাজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে চশমা

নাই। অতি কমনীয় মূর্ত্তি ও প্রসন্ন ভাব। আমার দিকে চেয়ে যেন আমাকে দেখছেন। আমার মনে হলো তিনিও আমাকে কিছু একটা বলতে চাইছেন। আমার জীবনের মহান্ কর্ত্তব্যের কথা তিনি যে বুঝতে পেরেছেন সেটা বুঝতে পারছি। আমাকে উৎসাহ দেবার ভাব তাঁর মুখ মণ্ডলে ব্যক্ত হ'য়ে আছে। তিনি আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেলেন।

আমার মা সহায় — ।

সোমবার, ৮ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃ:, কলিকাতা।

আজ ধ্যানে দেখলাম যেন পৃথিবীর উপরে একটা মহা ধ্বংশ নেমে আসছে। বড় বড় সহর যেন জনশূন্য। দালান কোঠা সব যেন একটা দারুণ অগ্নিপ্লাবনে পুড়ে গেছে। সব যেন ধূ ধূ করছে মরুভূমির মত। মাঝে মাঝে electric post-এর মত উজ্জল সব দণ্ড দাঁড়িয়ে আছে আর সব নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। আমার যেন মনে হ'চ্ছে এ জায়গাটি দিল্লী ও নূতন দিল্লী। যে অনাচার আজ নূতন দিল্লীতে হ'চ্ছে তাতে এটা ধ্বংশ হ'য়ে যাবে বলে মনে হয়। কোটি কোটি অনাহার ক্লিষ্ট নরনারীর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে যে সকল সুরম্য সৌধ গ'ড়ে উঠেছে সে সকল সৌধ মহা প্রলয়ে ধ্বংশ হ'য়ে যাবে। আমার যেন মনে হ'চ্ছে আজ যে পথে রাষ্ট্র চলেছে সে পথ মহা অন্যায়ের পথ। রাষ্ট্র নায়কগণ মোহগ্রস্থ, নরনারী অন্নহীন বস্ত্রহীন মোহগ্রস্থ। মহাপাপে ভারতের আকাশ বাতাস পূর্ণ হ'য়ে গেছে। ভারতে আজ যুগ পরিবর্ত্তনের সময়। আধুনিক সব ধ্বংশ হ'য়ে আবার বৈদিক যুগের ব্রহ্ম-বার্ত্তা, একাত্ম, সরল, সংযত জীবন ফিরে আসছে খুব দ্রুত। আমি যেন কিসের একটা আভাষ পাচ্ছি ও সেটা যেন একটা মহা খণ্ড প্রলয়ের। আমি যেন কি বিভীষিকাময় ছবি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মা বললেন "পৃথিবীর মধ্যে ভারত ও ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশ সবচেয়ে আমার প্রিয়। আমার গৌরব এখান থেকে যুগে যুগে হ'য়েছে, এখান থেকে এ যুগেও হবে। আমাকে অস্বীকার করে ভারত ও বঙ্গদেশ মায়ার বর্ত্মে পতিত হ'য়েছে। এ থেকে ত্রাণ পেতে হ'লে নৈসর্গিক প্রলয়ের

প্রয়োজন। তাতে মানব তাদের অহঙ্কারের তুচ্ছতা বুঝতে পারবে ও একান্ত আমার হবে। তুমি কঠিন সাধন কর। তুমিই একমাত্র আমার দক্ষিণ হস্ত হ'য়ে আমার অভিলাষ পূর্ণ করবে। মাতৃগত হও, আরও একাগ্র হও, আরও সাধন স্থিত হও, আরও স্থির হও।"

মা মা মা মা মা আমার সাধনে সহায় হও মা।

বুধবার, ১০ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ থেকে আমিষ ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করলাম। মা আমায় অনেকদিন থেকেই বলছেন "ছেড়ে দে"। কিন্তু বাড়ীর সকলে বিশেষ করে ময়না অত্যন্ত দুঃখ পেল। আজ নিরামিষ আহার করলাম। বেশ ভাল লাগল। যেন মনটা পবিত্র মনে হোল। এতদিন যেন রাক্ষস সেজে ছিলাম। মা দুর্লভ মানব জন্ম দিয়েছেন। সব খেতে হ'চ্ছে, করলেই সব খাওয়া যায়। মাছ মাংস খাবার মতন শরীরের গঠনও বর্ত্তমান। কিন্তু মানবের বিবেক বলে যেটা আছে অন্য জীবের সেটা নাই। সেই বিবেক যদি বলে সেই হ'চ্ছে Command। দেখলাম চিন্তা করা এক, আর তাকে কার্য্যে পরিণত করা আর এক কঠিন বস্তু। যে সব বাধা পাচ্ছি দুর্ব্বলতা এসে পড়ে মনে। মনকে শক্ত করছি। বাধা এমনি আসবে প্রথমে। পরে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। যদি শরীরে না দেয় আবার মাছ মাংস খাব তাতে মা আপত্তি করবেন না।

আমার মা সহায় —।

বৃহস্পতিবার, ১১ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাতৃদর্শনে কাঁপাতে (কাঁচড়াপাড়ার কাছে) আমি, ময়না, অঞ্জলী, বাবুল, পুতুল ও রাহুল গাড়ী করে সকালে ৯টা ১০ মিঃ রওনা হ'লাম। প্রায় ১১টায় সেখানে পৌছলাম। মাছ মাংস ছেড়েছি বলে মা বললেন "সে চলবে না, তোমার বাবা সারা জীবন নিরামিষ খেয়ে শরীর ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। এখন তোমার পরিশ্রম করবার সময়। এখন মাছ মাংস খাও। পরে না হয় ছেড়ে দিও। আমার এখানে এ সব খেতে হবে"। পৃথিবীর মা অর্থাৎ আমার

জন্মদাত্রী ও আমার পরম জননীর মধ্যে আমি কোনও পার্থক্য দেখতে পাই না। মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে আবার আমিষ আহারে প্রস্তুত হলাম। আরও কিছুদিন খেতে হবে বলে মনে হয়। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে আমার অনাশক্তি বা বৈরাগ্য এখনও কিছুই হয় নাই। আমার এখনও বিষয় স্পৃহা আছে, কাম অত্যন্ত প্রবল। কাম্য বস্তু সামনে এলে নিস্পৃহ হ'তে এখনও পারি না। মনকে এখনও সংযত করতে পারিনি। আমার সাধন কিছুই হয় নাই। আরও কঠোর সাধন করতে হবে।

আমার পরম জননী একমাত্র সহায়।

শুক্রবার, ১২ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা। (কাঁপা)

আমার মাতৃদেবীর (শ্রীযুক্তা শরৎ কামিনী দেবী) সহিত অনেক সাধনের কথা ও আধ্যাত্মিক কথা হোল কাঁপাতে। দেখলাম মার আশ্চর্য্য সাধন। ৮৩ বৎসর বয়সে সংসারের সকল কাজ অতি শৃঙ্খলার সঙ্গে করে প্রায় ১০।১২ জন লোকের জন্যে প্রায় ১০।১২ পদ দু'বেলা রান্না করেও সাধন করছেন। এমন কর্ম্মা নারী আমি জীবনে দেখি নাই। নানা রকম মোয়া, নাড়ু ইত্যাদি খাবার জিনিষ নিজ হাতে শুধু আমাদের জন্য করে ও আমাদের খাইয়ে ও নাতি নাতনীদের খাইয়ে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। নিজের জন্যে বরাদ্দ অতি সামান্য ও সাধারণ। আমার পৃথিবীর মাকে দেখলে আমার পরম জননীর কথা মনে পড়ে। তিনি সম্পূর্ণ অনাশক্ত; সবই আমাদের জন্য, আমাদের সুখেই তিনি সুখী। মা আমার অপার করুণাময়ী। এমন মাকে দিয়েছেন যাঁকে দেখলে তাঁরই কথা সব সময় মনে পড়ে। মার ভেদ নাই। দুই মা আমার এক। এক হ'য়েই দুই ও একে একে যোগ করে আবার এক হ'য়ে আছেন।

আমার মা সহায়—।

শনিবার, ১৩ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা। (কাঁপা)

গতকাল কাঁপাতে রাত্রে এক আশ্চর্য্য দর্শন হোল। বসে বসে চোখ বুজে

গায়ত্রী জপ করছি। মনে হ'চ্ছে সারা বাঙলা দেশ মা দুর্গতি নাশিনীর পূজায় মত্ত হ'য়েছে। কত আড়ম্বর, কত সাজ সজ্জা, ঢাক ঢোল, মাইক। এমনি সময় দেখলাম যেন গ্রাম্য পরিবেশে এসে পড়েছি। গ্রামের পর গ্রাম বন্যার প্লাবনে ভেসে গেছে। লোকজন সব গাছে, ঘরের চালে ইত্যাদি জায়গায় ভীত হ'য়ে অনাহারে বসে বসে কাঁদছে। একটি কিশোরী গ্রাম্য বালিকা ১৪।১৫ বৎসর বয়েস, একটি নীল তাঁতের ডুরে শাড়ী প'রে কোঁচড়ে চাল নিয়ে সেই জলের মধ্যে এক বাড়ী হ'তে অন্য বাড়ী সবাইকে চাল বিতরণ করছে। সকলে সেই কিশোরীর দিকে চেয়ে মৌন বিস্ময়ে তার হাত থেকে চাল অথবা খাদ্য নিচ্ছে ও সকলে যেন পরিতৃপ্ত। মা বললেন "আমি এসেছি কিন্তু আড়ম্বরের মধ্যে আজ আমি নাই। আজ আমি নিজে দুঃখী সেজে বন্যা পীড়িতদের কাছে এসেছি। আজ আমি সেইখানে।" আমি বললাম আমার মন যে ছট্‌ফট্‌ করছে আর্ত্তের ত্রাণের জন্যে। মা বললেন "তোমার যাওয়ার দরকারনাই। যে মহান্ কর্ত্তব্য তোমাকে দিয়েছি তার জন্যে তুমি প্রস্তুত হও। সেখানে গিয়ে কাজ করবার জন্যে তুমি উপযুক্ত নও। আজ পৃথিবীতে যে মোহান্ধকার এসেছে তার জন্যে এই নানা দুর্গতিতে জীব সকল অশেষ দুঃখে পড়ছে। সেই মোহান্ধকার দূর করলেই এইসব দুর্গতি দূর হ'য়ে যাবে। সেই মোহান্ধকার দূর করবার গুরুভার তোমার উপরে দিয়েছি। সকলকেই যে একই কাজ করতে হবে তার কোনও কারণ নাই। তোমার কর্ত্তব্য আলাদা। তুমি সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হও।"

মা আমার অপার করুণাময়ী।

সোমবার, ১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে কার্ণ প্লেসে গাড়ী রাস্তায় বার করে গাড়ীর গায়ে একটু আধটু ধূলা ময়লা পরিষ্কার করছি এমন সময় একজন সাধারণ ঘরের আধা বয়সী বিধবা গায়ের রং গৌরবর্ণ আমার গাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন ও আমাকে বলছেন "তুমি আমার "ধর্ম্ম-বাপ"। এ কথায় আমি আনন্দিত হ'য়ে হাসছিলাম। কিন্তু

তিনি বার বার ফিরে ফিরে আমাকে বলছেন "তুমি আমার ধর্ম্ম-বাপ। এত সরল ও অনির্ব্বচনীয় উক্তি যেন আমাকে মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে রাখল কতক্ষণ। আমার মনে হ'লো যেন তাঁর আসা ও যাওয়া আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু যতক্ষণ আমাকে সম্বোধন করেছেন ততক্ষণ যেন তিনি ছিলেন তারপরে যেন আর নাই। আমার মনে হোল ২৫শে জুন যে নারী আমাকে দর্শন দিয়ে "আনন্দ কর, আনন্দ কর, হরিবল হরিবল" বলে গিয়েছিলেন এ যেন তিনিই। এঁর প্রথম বারের দর্শন আমাকে সাধনায় প্রেরণা ও উৎসাহ দেবার জন্যে। এই বারের দর্শন ও আমাকে ধর্ম্ম-বাপ ডাকার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে বিশ্বের নারী সকলকে আমার কন্যা হিসাবে দর্শন ও গ্রহণ করতে হবে। কন্যার প্রতি পিতার পিতৃ-ভাবও থাকে আবার সন্তান ভাবও থাকে। তেমনি নারীদিগকে কন্যা ভাবে ও মাতৃভাবে দেখতে হবে। এ নারী আর কেউ নয় স্বয়ং আমার পরম জননী আমাকে সাধন পথে নানা ভাবে নিয়ে চলেছেন। এরপর আবার যে দিন আসবেন সে দিন আর ছাড়ছিনা। দুষ্টু আমার—আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। একেবারে পা দু'খানি জড়িয়ে ধরব। মাগো আমার সঙ্গে এমন কেন করছিস্?

আমার মা গো।

মঙ্গলবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

মহাপুরুষদিগের জীবনে যে সব সত্য প্রকাশিত হয় সে সব সত্য একদিনেই পৃথিবী গ্রহণ করে না। যুগের পর যুগ সেই সত্যের বার্ত্তা এক অন্তর থেকে অন্ত অন্তরে প্রবাহিত হ'তে থাকে। সংসারের স্থূল পরিবেশের ভিতরে সামাজিক মানব সে সব মূল সত্য অন্তরের নিভৃত কক্ষে সঞ্চিত করে রাখে। যদিও মোহ আবর্ত্তে দেহজাত ধর্ম্মে সেই সত্যকে কিছু কালের জন্যে বিস্মৃত হয় বা সে সত্যের বিরুদ্ধরূপ সামাজিক জীবনে আপন আপন পরিবেশের সুবিধা অনুযায়ী অবলম্বন করে তবুও সেই শাশ্বত সত্য চিরকাল মানব আত্মায় অতি সঙ্গোপনে বেঁচে থাকে। সময়ের পরিবর্ত্তনে জীবের অহঙ্কার বিনাশ হ'লে আবার

সেই সত্য আপনিই সকলের অন্তরে প্রকাশিত হয়। সূর্য্য যেমন এই জগতের প্রথম কাল থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত তার একনিষ্ঠ আলোক-সম্পদ বিকিরণ করে চলেছে ও সে যেমন কখনও আপনার আলোকের ধারা পৃথিবীকে দিতে একটুকুও কম বেশী করে নাই তেমনি সত্য একভাবে জাগ্রত হ'য়ে তার চিরন্তন মূল উপাদান একটুকুও খর্ব্ব করে নাই। পৃথিবীতে কত দুর্যোগ এসেছে, কত অন্ধকার এসেছে সে গুলো পৃথিবীরই প্রকৃতিজাত। কিন্তু সূর্য্য একভাবেই আলোক সম্পাত্ করে যাচ্ছে দুর্য্যোগের পরে। মানব মনের নীচ বৃত্তিতে কত যুদ্ধ বিগ্রহ হ'য়েছে, কত রক্তারক্তি হ'য়েছে, কত রাজ্য ধ্বংশ হ'য়েছে, কত অনাচার অত্যাচার হ'য়েছে; কিন্তু এসবের পরেও আজও সত্য যা সে সত্যই হ'য়ে রয়েছে। মহাভক্ত যিশুখৃষ্ট যে মহা-সত্য, যে মহা-বাণী, যে মহা-প্রেম, যে মহা-সমন্বয়ের সত্যকে একদিন পৃথিবীর কোন ছোট সহর জেরুজালেমে আপনার দেহের রক্ত দিয়ে প্রতি মানবের অন্তরে লিখে গেলেন সে সত্য কি মুছে গেছে? সে সত্যের রূপ বিকৃত হ'তে পারে স্বার্থ, পরাধীনতায়, অভাবে, অহঙ্কারে, জড়তার মোহে কয়েক শতাব্দি। কিন্তু মানব আত্মা কি সে সত্য ভুলে যেতে পারে? যে মহাসন্তান ঈশ্বরকে চিন্‌ল, যে ঈশ্বরের দয়ার সত্য উদ্‌ঘাটিত করে গেল সে সন্তানের মরদেহ আজ নাই। কিন্তু তাঁর সেই সত্যের আত্মপ্রকাশ কি মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই না। যে রক্তপাতের জন্য তিনি অত্যাচারীদের ক্ষমা করে গেলেন সেই রক্তের জন্য আমরা আজ বন্ধুর বুকে ছোরার আঘাত করতে দ্বিধা করছি না কেন? কারণ আমরা দেহজাত জড়তায় স্বার্থান্ধ; রক্তের সম্বন্ধ ভুলে গিয়েছি সাময়িক ভাবে। খৃষ্ট ভাবলেন আমার রক্ত ও আমার ভাইয়ের রক্ত একই রক্ত। আমার রক্ত ক্ষরণে যে মহা কষ্ট হ'চ্ছে এর প্রতিকার যদি আমার ভাইয়ের রক্তক্ষরণে হয় তবে সেও আমার মত কষ্ট পাবে। তাই হে ঈশ্বর তাদের দুঃখ দিও না, তারা অজ্ঞান তাদের ক্ষমা কর। এ মহা-সত্য ত' মুছে যায় নাই। এ মহা-সত্য আজকের সভ্যতার চরম বিকাশে জ্ঞানের আলোকের ভিতরে জন্মগ্রহণ করেও

যদি ভুলে থাকি তবে আমরা কি সভ্য? আজিকার সভ্য জীবনের জন্যই ত খৃষ্ট তাঁর সেই সত্য উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন। মানব আত্মা যে দিন চরম উৎকর্ষে পৌঁছে সভ্যতায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, পৃথিবীর সকল জাতিকে চিনবে জানবে তখন যদি তাঁর সেই মহা-সত্যের আবির্ভাব হয় তবে এই পৃথিবী স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হবে। আমরা আজ শ্রেষ্ঠ সভ্যতার ভিতরে জন্ম নিয়েছি। আমরা চাই না কেউ পরাধীন হোক্। আমরা চাইনা এক জাতি অন্য এক জাতির উপর অত্যাচার করুক। আমরা চাইনা সমাজে অনাচার, অবিচার, অত্যাচার হোক্। আমরা সুনীতির জীবন যাপন করবার শিক্ষা নিয়ে জন্মেছি। আজ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম অংশে অত্যাচার হ'লে সারা জগত হাহাকার করে সমবেদনায়। আজ একটি উড়োজাহাজ বা জল জাহাজ মারা পড়লে তাদের যাত্রিদের অকাল মৃত্যুতে আমরা কি সারা পৃথিবীর লোক পরদিন শোক করিনা? গ্রীনল্যাণ্ডে একটি জীবন অন্যায় ভাবে নষ্ট হ'লে পরদিন সকালে খবরের কাগজে সে সংবাদ পড়ে কি আমাদের মনে শোক হয় না? কেন হয়? কারণ আমরা আজ সকলের জন্যে ভাবতে শিখেছি। প্রত্যেক মানবের জন্যে আমাদের অন্তরে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ হ'য়েছে। এ শিক্ষা আমরা কোথা থেকে পেয়েছি? এ শিক্ষা কি আমাদের খৃষ্ট, নানক, মোহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, কন্‌-ফিউসিয়াস্ দিয়ে যাননি? তাঁদের সত্য কি আমরা হৃদয়ে ধারণ করছিনা? যদি তাঁদের সত্য, সত্যই আমরা ভুলে যেতাম তবে কি আমাদের ভিতরে এই সত্য সমবেদনা এই আত্মীয়তা আসত? তবে কেন আমরা এত রক্ত লোলুপ! এ আমাদের ক্ষণিক বিস্মৃতি, জড়তা, দেহ-জাত অজ্ঞতা ও আজিকার সভ্যতার এই একটি মাত্র ত্রুটি র'য়ে গেছে। এই ত্রুটি যে দিন চলে যাবে সে দিন আর মানবের প্রতি মানবের ঘৃণা থাকবে না। জাতিতে জাতিতে বিবাদ, রক্তারক্তি, সব ধুয়ে মুছে পৃথিবী জ্ঞানের আলোকে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হবে। এই বিস্মৃতিকে প্রতি মানবের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। এই অন্ধকার চলে গেলে আবার খৃষ্টিয় মহা-সত্য

প্রতি জীবনে প্রকটিত হবে এবং সংসার এক মহাসুখী পরিবার হবে। এ কার্য্যের ভার কাউকে নিতেই হবে। আমি এই কার্য্যের ভার মাথায় করে নিয়েছি। মা এই কার্য্যভার আমার মাথায় তুলে দিয়েছেন। এখানে উচ্চ নীচ নাই, শ্বেত কৃষ্ণ নাই সব এক মহাজাতি মহাপরিবার। খৃষ্টের এই মহাসত্য আজকেই পৃথিবী গ্রহণ করবে কারণ আজকের মানব সমাজ অতি জ্ঞান জাগ্রত ও সেই এর জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমার মা সহায়।

বুধবার, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার নিত্যকার জীবনে একটা অনাস্বাদিত আনন্দ জেগে উঠেছে। কেন এ আনন্দ এসেছে সেটা আমি নিজের অন্তর বিশ্লেষণ ক'রে বুঝতে পারছি। যে সাধনায় মা আমাকে নিজে হাত ধরে স্তরের পর স্তর নিয়ে চলেছেন ও যে সব আত্মিক লোকের দৃশ্য সকল আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ক্রমে উচ্চ হ'তে উচ্চ স্তরে নিয়ে চলেছেন তার দ্যোতনা আমার জীবনে একটি আনন্দের উৎস খুলে দিয়েছে। আমার আনন্দ এখন বিকৃত হয় না। যদি বা ক্ষণেক বিকৃত হয় আবার গভীর উৎসে ফিরে আসে। যোগচক্ষু অনেকটা খুলে গিয়েছে। ক্রমে উর্দ্ধগতি চলেছে। আগে পরলোক দেখতাম। এখনও যে না দেখি তাও নয়। আগে পরলোকে আত্মাগণকে অবলোকন করতাম, অনেক সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ ও দৃষ্টি বিনিময় হ'য়েছে। এখনও যে না হয় তা নয়। কিন্তু এখন মার বহুরূপ দেখতে পাই। এখন অতি উর্দ্ধে উঠে যাই আলোকের পারাবারে মাতৃ সন্ধানে। কখনও মাকে দেখতে পাই কখনও মার আলোক দেখতে পাই। যে মহিমাময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখেছিলাম এক রবিবার ব্রহ্ম মন্দিরে এই বছরের জানুয়ারী মাসে সেই মাতৃ মূর্ত্তির মুখাবয়ব বাদে সারা দেহ যেন আলোকের ব্রহ্মাণ্ড। সেই আলোকের দেহের ভিতর আমরা জীব সকল ও জগত সংসার সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছি। আমাদের জাগতিক জন্ম মৃত্যু সংসার ধর্ম্ম সব কিছু মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। যেমন জন্মাচ্ছি আবার তেমনি মিলিয়ে যাচ্ছি। মা যেন নির্লিপ্ত। তবে আমরা যে সংসারে বিচরণ

করছি এ যেন মাতৃ ক্রোড়ে শিশু যেমন থাকে ও মাতা সস্নেহ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন এও যেন তেমনি। তিনি যেন আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছু সস্নেহে অবলোকন করছেন। আমরা যেন তাঁর দেহরূপ আলোকের অসীম নভমণ্ডলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। রাস্তায় চলতে চলতে যোগ হয়। খেতে বসে, শুতে গিয়ে, গাড়ী চালাতে চালাতে যোগ হয়। বুঝি কি করে। বুঝি যেমন মাতৃ সান্নিধ্য হ'ল অমনি কপালের ঠিক মাঝখানে গরম হ'য়ে উঠল ও টিপ্ টিপ্ করতে লাগল; মন স্থির হ'য়ে একাগ্র হ'য়ে মাতৃগত হ'ল। ক্রমেই এটা ঘন ঘন হ'চ্ছে। আগে যেমন অনেক পরে পরে হোত এখন আর তা হয় না; এখন ঘন ঘন হয়। নাসিকার ঊর্দ্ধে প্রজ্ঞাচক্রেরও ঊর্দ্ধে যে ব্রহ্ম কেন্দ্র আছে, যে কেন্দ্র থেকে বিকাশরূপ ধৃতি জাগ্রত হ'য়ে শরীরের প্রতি ধমনীতে একাগ্র প্রবাহ ছড়িয়ে দেয়, যে প্রবাহ মূলাধার কেন্দ্র থেকে চক্র সকলকে ভেদ করে ঊর্দ্ধে এসে আবার প্রজ্ঞাচক্রের সাহায্যে ব্রহ্মকেন্দ্রকে আশ্রয় করে পরব্রহ্মময়ীর আকর্ষণে বাধিত হয়, সেই ব্রহ্মকেন্দ্র জীবের সকল আনন্দের আধার ও সঙ্গমস্থল। এখান থেকেই আনন্দের উৎপত্তি ও এখান থেকেই আনন্দের বিকাশ। এই কেন্দ্র পরা-আনন্দ বহন করে সাধকের অন্তরে। এ কেন্দ্রের প্রতি তন্ত্রীতে মহানন্দের গভীর ঐক্যতান্ ঝঙ্কৃত হয়। সেই ঝঙ্কার সারা দেহে প্রবাহিত হ'য়ে বাসনার বিলয় সাধন ক'রে, দেহ ও চিত্ত পরিশুদ্ধ ক'রে আত্মতৃপ্তির ভিতর দিয়ে পরা-তৃপ্তির অভিনব মহানন্দ আনয়ন করে। তখন দেহ মন্দিরের সকল দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় ও ব্রহ্মময়ীর দর্শন হয়। পূর্ব্ব দিকের ঘরের সকল দরজা, জানালা সকালে খুলে দিলে যেমন সূর্য্যের আলোকে ঘরের আর কোথায়ও একটুকুও অন্ধকার থাকে না তেমনি দেহ মন্দিরে অপূর্ব্ব আলোকে ব্রহ্মময়ীর অরূপ জ্যোতি বিকশিত হ'য়ে দেহের আর কোথায়ও মলিনতার লেশ থাকে না। দেহই সাধন মন্দির। সাধনের জন্মেই দেহ। প্রকৃতির প্রত্যেক নিয়ম, প্রত্যেক কর্ত্তব্য পালন দেহের ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম অভিপ্রেত। দেহ মন্দিরে একদিনের সাধনা আধ্যাত্মিক

লোকের এক কল্পের সাধনার সমতুল্য। সংসার ব্রহ্ম-সৃষ্ট ও তাঁর নির্দ্দেশ, সংসার সাধন। তিনি যেমন আমাদের প্রতি নিস্পৃহ থেকে নিজ কর্ত্তব্য পালন করছেন আমাদেরও তেমনি নিস্পৃহ থেকে কর্ত্তব্য পালন করাই দেহের ধর্ম্ম। দেহের কোনও একটা ধর্ম্ম পালন না করে, সাধনায় সিদ্ধ হ'লেও আবার সংসারে জন্ম গ্রহণ ক'রে সেই কর্ত্তব্য পালন করতেই হবে। নির্দ্দেশ অমান্য করবার ক্ষমতা জীবাত্মার নাই। জীবাত্মার পরিণতি কি? ব্রহ্ম-সান্নিধ্যই জীবাত্মার একমাত্র ও মুখ্য পরিণতি। কল্প কল্পান্তরের জন্ম প্রবাহের ও জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে জীবাত্মা ঊর্দ্ধ গতি লাভ করে। গতি মুক্তি প্রদায়িনী পরমজননীই তার একমাত্র কাম্য ও আকর্ষণ। লয় নাই এই জীবাত্মার। ব্রহ্মময়ীর সান্নিধ্যই জীবাত্মার একমাত্র সাধন লক্ষ্য।

মা আমার নিত্যানন্দ ময়ী—আমার "মা" মা গো।

বুধবার, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হ'ল। আমার খুব কাম ভাব হ'য়েছে আবার। মাকে বললাম এই যে সাধন করছি কই কাম ভাব ত' যাচ্ছে না। মা বললেন "এ হ'চ্ছে রোগ, দেহ সম্বন্ধ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সকলই রোগ। এই রোগ থেকে বিকার হয়; ও সেই বিকার থেকে তুমি যা কর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় কর। যেমন জ্বর হ'লে বিকার হয় এও ঠিক তাই। যেমন কঠিন জ্বর তেমন কঠিন বিকার তেমনি সর্ব্বক্ষণ ঔষধ সেবন করলে জ্বর ও বিকার নিরাময় হয়। এই সকল রোগের একমাত্র ঔষধ হোল সর্ব্বক্ষণ নাম সাধন। এই নাম সাধন কায়মনোবাক্যে করতে পারলে ওই সব রোগ সেরে যাবে।"

মার সঙ্গে তর্ক করলাম। বললাম তুমি যে বললে প্রাণী হত্যা মহাপাপ সেটা কেমন করে হয়? তুমিই যদি সব করাও তবে আমি যাকে মারছি তাকে আমি মারবই ও যাকে মারছি সে আমার হাতে মরবেই, এত তুমি ঠিক করেই রেখেছ তবে আর মহাপাপ বলছ কেন?

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি।
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন ঃ।
যথা নিযুক্তোস্মী তথা করোমি।

তবে আমি কি করে মহাপাপী হই? মা বললেন "দেখ তোমাকে আমি একদিন বলেছি যে এক অবিশ্বাস ছাড়া আর কোনও পাপ নাই। আমাকে অবিশ্বাস করা, অস্বীকার করা, ও আমার আজ্ঞা পালন না করা একই বস্তু। ও তাই একমাত্র পাপ। আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, নিস্ক্রিয় হ'য়েও স্বক্রিয়। জীবাত্মা, বিশেষ করে মানবাত্মা আমাতে সম্পূর্ণ অবস্থিত হ'য়েও স্বাধীন স্বক্রিয় সত্বা পেয়েছে। আমিই তাকে দিয়েছি। মানব যখন কোনও অন্যায় কাজ করতে যায় আমি অন্তরে থেকে তাকে নিষেধ করি। সে যদি আমার নিষেধ শুনে সেই মতে কাজ করে তবে তার জীবনে উন্নতি হয়। সে যদি আমার নিষেধ অমান্য করে তবে সে অন্যায় কাজ করে। জীবহত্যা যখন করতে যাও তখন নিষেধ করি করো না। যদি না কর মন পবিত্র হয়। আর যদি কর মনে আরও নীচতা জন্মে। এই যে হত্যা সঙ্ঘটিত হ'ল তার জন্যে তোমাকে তোমার কর্ম্মফল ভোগ করতেই হবে। কিন্তু সে কার্য্যের জন্য তোমার কর্ম্মফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু হত্যা না করার জন্যে যে নিষেধ আমি করলাম সে নিষেধ অমান্য করার জন্য তোমার মহাপাপ হ'ল।" কিন্তু যাকে হত্যা করলাম তার সেই মুহূর্ত্তে আয়ু শেষ করে রেখেছ ও আমার হাত দিয়ে তাকে হত্যা করাচ্ছ। তুমি সব যখন আগে থাকতেই করে রেখেছ তবে আমিত কিছুই করছি না, করছ ও করাচ্ছ সব তুমি। হ্যাঁ, সেটা ঠিক। কিন্তু আমি কারও স্বাধীনতা খর্ব্ব করি না। তুমি যে কোনও কাজ করতে চাও ভাল হ'লে করতে বলি আর মন্দ হ'লে নিষেধ করি। আমার কথার অবাধ্য হ'য়ে যখন তুমি সে কাজ কর সেই মুহূর্ত্তে তুমি মহাপাপ করলে আর তোমার দ্বারা যে অন্যায় সম্পাদিত হ'ল সেই কৃত কর্ম্মের জন্যে তোমাকে ফল ভোগ করতে হবে। যখন

তুমি অন্যায় কাজ করবে বলে স্থির করেছ তখন বার বার আমার নিষেধ সত্ত্বেও করতে গেলে আমি আর বাধা দিই না এবং সে কাজও আমার ইচ্ছায় তুমি কর। যাকে আঘাত কর তার কৃত কর্ম্মের ফলে সে আঘাত পেল ও তোমার দ্বারা ওই কর্ম্ম কৃত হোল। তোমার দ্বারা ওই কর্ম্ম কৃত হ'ল এই জন্য যে তোমার সেই কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ রূপ শাস্তিতে তোমার আত্মার আরও এক ধাপ উন্নতি হল। ফলভোগ না হলে ত কারও আত্মদর্শন হয় না। ছোট ছেলে অজ্ঞান, আগুনে হাত দিত চায়। বাবা মা বারে বারে নিষেধ করেন "হাত দিও না, হাত পুড়ে যাবে" কিন্তু সে যদি সে কথা শুনে তবে অবাধ্যতার পাপও হয়না ও কৃত কর্ম্মের জন্যে হাত পুড়ে কষ্টও পায় না। আর যদি না শুনে হাত পুড়ে কষ্ট পায়। বার বার বাবা মার বারণ সত্ত্বেও যখন সে আগুনে হাত দিতে যায় তখন তাঁরা বলেন যাক্ একবার হাত পুড়লে আর ওকাজ করবে না। এটা তার বাবা মার ইচ্ছায় হয়। আমিও তোমাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করে থাকি। একটা মোটর গাড়ীতে গাড়ীর মালিক পিছনের জায়গায় বসে আছে, ড্রাইভার গাড়ী চালাচ্ছে। মালিক বললেন এই রাস্তা দিয়ে তুমি অফিসে চল। কিন্তু চালক (ড্রাইভার) সে কথা শুনল না। সে বলল আমি আরও সোজা রাস্তায় নিয়ে যাব। মালিক বললেন বেশ তোমার যা ভাল মনে হয় কর। সোজা রাস্তায় যেতে গিয়ে গাড়ী খন্দের ভিতরে প'ড়ে গেল। তখন মালিক বললেন আমার কথা যেমন শোন নাই এখন তোমার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করতে হবে। এবার গাড়ী খন্দের ভিতর থেকে উঠাও। অবাধ্যতা হোল তার পাপ তার জন্যে দুর্ব্বিপাক হ'ল গাড়ী খন্দের ভিতরে প'ড়ে। আর তার কর্ম্মফল ভোগ হোল নিজে টানাটানি ও ভীষণ কষ্ট করে গাড়ী খন্দের ভিতর থেকে উঠাতে হোল। এখানে যেমন মালিক জানে না যে গাড়ী খন্দে প'ড়বে। কিন্তু আমি ত্রিকালজ্ঞ বলে আমি জানি তুমি কি করবে। তুমি আমার কথা শুনবে না এবং শুনলে না বলেই আমার ইচ্ছা হ'ল শুন না' ও সেই অন্যায়

কার্য্য করবে তাও আমি জানি ও জানি বলেই আমিই ইচ্ছা করি তুমি কর ও তুমি করলে কি কি ফল ভোগ করবে তাও আমি জানি। সেই সেই ফল ভোগ করবার পরে কবে তোমার মন শুদ্ধ হবে ও আমার প্রতি এবং আমার আদেশের প্রতি কেমন করে তোমার আবার অনুরাগ হবে। পথ তোমার নির্দ্দিষ্ট থাকা সত্ত্বেও ভাল মন্দ কাজ করবার সময় আমার অনুজ্ঞা তোমার অন্তরে আসবেই। সেটা আমি পরম মঙ্গলময় বলেই করে থাকি।"

তোমার ইচ্ছার দ্বারা যখন আমার অনন্ত জীবন গ্রথিত তখন আমি কেমন করে সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর্ম্ম করব? "দেখ, কোনও মানব-আত্মাকেই আমি ইচ্ছা করে মন্দ পথ নির্দ্দেশ করি না। সকলেরই পক্ষে উন্নতির পথ বেছে দিই। কিন্তু দেহাত্ম বিকারে তারা যখন মোহগ্রস্থ হয় তখন তারাই অন্যায়ের পথ বেছে নেয়। তখন আমার ইচ্ছায় সে সকল কর্ম্ম করে ও তার কৃত কর্ম্মের ফল ভোগরূপ অনুশোচনায় কর্ম্ম-ফল ভোগ শেষ হয় এবং সে আমার দর্শন পায়, আমার অনুরক্ত হয়। তা যদি না হোত তবে সংসারে ভাল মন্দ লোক থাকত না। দেখবে মন্দলোক কম, ভাল লোক বেশী। যখন মন্দ লোক বেশী হবে ও যখন মানব সকল মোহগ্রস্থ হ'য়ে মন্দ কার্য্য বেশী করতে থাকবে তখন আমার নির্দ্দেশে সাধু আত্মা মানব জন্ম পরিগ্রহ করবেন ও তিনি আমার ধর্ম্মের বন্যায় দেশ সকল ভাসিয়ে দেবেন। মন্দ কর্ম্মের ফলে একজনের দেখাদেখি সকল লোক মোহগ্রস্থ হ'য়ে মন্দ কার্য্যে ব্যাপৃত হ'লে পৃথিবীতে খণ্ড প্রলয় হয় তাদের কৃত কর্ম্মের শাস্তির জন্যে। তাতে সাধু লোকেরও দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তারপর সেই সাধু আত্মারা ফিরে আসেন এবং ধর্ম্ম স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। আর অসাধু আত্মারা প্রেত লোকে বহু কষ্টে বহুকাল বিচরণ করে, তাতে পৃথিবীর ভার লাঘব হয়। জগতে আবার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ মন্দ আত্মারা আর সহজে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না। তোমার এখনও জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই। এ সব জটিল জ্ঞানের কথা আরও পরিষ্কার করে পরে বুঝিয়ে দেব। সময়ে হবে।"

আমার মা একান্ত সহায়—
মা আমার জ্ঞান দায়িনী—।

Out of evil cometh good. Macbeth

বৃহস্পতিবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে শ্রদ্ধেয় প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের তন্ত্রাভিলাসীর সাধু সঙ্গ দ্বিতীয় খণ্ড পড়লাম। তন্ত্রোক্তমতে সাধনার অনেক কথা তাতে ছিল। তন্ত্রের উদ্‌গাতা মহাযোগী ও মহাভক্ত শিব। এই সাধনায় উচ্চ নীচ প্রভেদ নাই। কিন্তু যে সব পদ্ধতির সাহায্যে এই সাধন হয় তা আমি নিজে সমর্থন করতে পারলাম না। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম এ কি রকম হোল? তবে কি শিব এই ভাবে সাধন করেছিলেন? মা বললেন "শিব ছিলেন মহাযোগী ও মহাভক্ত। যোগ ও ভক্তিই ছিল তাঁর সাধন সম্বল। তিনি যে সাধন-ধারা প্রচার করে গিয়েছিলেন কালের বিবর্ত্তনে সমাজের অবনতির কারণে সেই ধারা বিকলাঙ্গ ও স্ব স্ব সাধকের রুচি অনুসারে-প্রবর্ত্তিত হ'য়ে উঠেছে। শিবের সেই মহাসাধনার যে সামান্যতম অংশ পরবর্ত্তী সাধকগণ পেয়েছিলেন তাতেই তাঁরা আমার দর্শন পেয়েছিলেন। সাধন করলে আমার দর্শন পাওয়া-ত কঠিন নয়, সে সাধন যে ভাবেই হোক্ না কেন। কিন্তু আমার দর্শন লাভই হোল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেক সাধক সাধারণকে কিছু কিছু দিয়েছেন সত্য। কিন্তু একটা চিরাচরিত কঠিন আবরণে সে সাধনকে তাঁরা অ-মার্গ সাধনে পর্য্যবসিত করে গেছেন। মহাযোগী শিবের সাধন ছিল আপামর জনসাধারণ সকলেই আমার দর্শন পেয়ে জীবনকে ধন্য কৃতার্থ এবং সংসারকে স্বর্গে পরিণত করবে। আমার সেই অভিপ্রায় শাশ্বত, চিরন্তন মহা-সত্য। আমি সেই ভক্ত চাই যে সকলের অন্তরে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং সংসারে সংসার যাত্রার ভিতর দিয়ে সর্ব্বভাবে আমামুখীন হ'য়ে একান্তভাবে আমাকে স্বীকার ও বিশ্বাস করবে; তবেই আমার মানব সৃষ্টি সার্থক হবে। শিবের সাধন ছিল অহৈতুকী ভক্তি ও মহা-সমন্বয় যোগ আমার সঙ্গে। তিনি সংসারে থেকে সংসার ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে

পালন করে একান্ত নিস্পৃহ থেকে আমাতে প্রাণ সমর্পন করেছিলেন। তোমাকে ত' আমি দুইবার শিব দর্শন করিয়েছি। তোমারও সাধন সেই পথগামী, সেইজন্যে তিনিও তোমাকে বিশেষ সাহায্য করছেন যাতে তাঁর সাধন আবার পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত হয়।"

আজ সকালে মা বললেন "বিদগ্ধ জীবন পরিত্যাগ কর। আত্মার স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হও, সাধন গতি অবিচলিত রাখ।" আমার মা সহায়।

বৃহস্পতিবার, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ দেখলাম যে মহাজ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখেছিলাম সেই মূর্ত্তি আমার সারা দৃষ্টিপথ পূর্ণ করে উদ্‌ভাসিত হ'লেন। যেন আলোকের রাজ্য উদ্‌ভাসিত হ'ল। সেখানে আমি আমাকে ও সকল বিশ্বসংসার প্রত্যক্ষ দেখলাম। যেন আমরা সব তার ভিতরে রয়েছি। আমরা আলাদা হয়েও আলাদা সত্তা নিয়েও মনে হ'ল যেন সেই আলোকেই আমরা জীবিত আছি। যেমন জলে মাছ থাকে তেমনি বিশ্বসংসার সেই আলোকের ভিতরে রয়েছে। এ এক অপূর্ব্ব দর্শন। মা আমাকে বললেন "এ আমার বিশ্বরূপ, তুমি মহাভাগ্যবান আত্মা ও সংসারের ভিতরে তুমিই সবচেয়ে আমার কার্য্যের জন্যে এখন উপযুক্ত। খুব উচ্চ সাধন কর। সকল পদ্ধতি ও পথ আমিই দেখাব চিন্তা নাই"।

আমার মা সহায়—।

সোমবার, ২৯শে, অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন "সকল বিষয়ে সমতা রক্ষা করবে। তোমার ভিতর অনেক ত্রুটি আছে। কেউ একটা কথা বলল অমনি তুমি মনে মনে তাকে উত্তেজিত ভাব দেখালে, কেউ তোমার প্রতি একটু অসম্মান করল অমনি তুমি রেগে গেলে। কেউ তোমার ক্ষমতার একটু খর্ব্ব করল অমনি তুমি মনে মনে ভাবলে ধ'রে খুব ক'ষে কান মলে দেওয়া দরকার। তোমার ক্রোধ প্রবল, কাম প্রবলত আছেই। সেইজন্যে সমত্ব রক্ষা করে চলবে। যে যা বলুক মন যেন তোমার বিকারশূন্য থাকে। কিছুতেই যেন তোমার চিত্ত

চঞ্চল না হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম চিত্ত চঞ্চল হ'লে কি দোষ হয় বলে দাও। মা বললেন "কুণ্ডলিনী শক্তির একটা অনুগমন পথ আছে"। অনুগমন পথ কি বুঝিয়ে বল। মা বললেন "অনুগমন হ'ল আত্মার আমার প্রতি ধাবিত হওয়া। কুণ্ডলিনী শক্তি হোল কেঁচোর গতি কেন্নোর স্বভাব। অতি ধীরে ধীরে মূলাধার গ্রন্থি থেকে তার উর্দ্ধগতি হয়। মন যখন সাধন-প্রিয় হ'য়ে আমা পরায়ণ হয় তখন এই গতি আরম্ভ হয়। কেঁচো যেমন একবার একটু এগোয় আর একবার পেছোয় এ গতিও তেমনি ভাবে এগোতে থাকে। কারণ মন যখন রিপুর একটু সংস্পর্শ পায় তখনি এ গতি পেছোয়। আবার মন যখন নির্ব্বিকার হ'য়ে আমা মুখিন হয় তখন এ গতি আবার চলতে শুরু করে। কেন্নো যেমন স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলীকৃত হয় এ গতিও সেইরূপ রিপুর অধিক প্রাবল্য স্পর্শে কুণ্ডলীকৃত হ'য়ে পড়ে থাকে। আবার সাধন করতে করতে আস্তে আস্তে মন নির্ম্মল হ'লে আবার চলতে শুরু করে। এই গতি ক্রমে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে উঠতে থাকে। এ গতির ক্রিয়া আরম্ভ হয় আজ্ঞাচক্রের ভিতর দিয়ে আমার চুম্বক আকর্ষণে। সাধন গতিতে লৌহরূপ আত্মা ক্রমে চুম্বকরূপ পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। আমি জীবাত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও স্বপ্রকাশ স্থিতি-শীল ধারক ও আত্ম-অবলম্ব চিৎশক্তি সারাৎসার ব্রহ্মকল্প বিদ্যা ও অবিদ্যা বর্জ্জিত মহাশক্তি। একটা লোহাকে আস্তে আস্তে একটা চুম্বকের কাছে আনো। চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি অনুসারে যেমন লোহা কাছে আসে, চুম্বকের আকার বড় হ'লে লোহাকে দূর থেকে টেনে নেয়। আবার লোহার আকার বড় হলে চুম্বক লোহার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়। লোহার কিন্তু কোনও শক্তি নাই শক্তি চুম্বকের। শুধু লোহার স্বভাবই তার শক্তি। তেমনি সাধক লোহা আর আমি চুম্বক। মহাশক্তিশালী সাধক ভক্তির বন্যায় জ্ঞান অজ্ঞান শূন্য হ'য়ে আমাকে যদি আকাঙ্ক্ষা করে তবে আমি তার সহিত যুক্ত হই। আর একপ্রকার সাধক আছে সে আমাতে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পন ক'রে আমার উপরে তার সব কিছু ছেড়ে দেয়। সেই সাধককে আমি আকর্ষণ করে

টেনে নেই। এখন বুঝলে ?" বেশ ভাল ক'রে বুঝেছি। কিন্তু একটা কথা মা, আমার সাধন কতদূর অগ্রসর হ'ল ? "ও দুষ্টু, আবার নিজের কথা জিজ্ঞাসা করছিস্ ?" লক্ষ্মী মা আমার দয়া করে বলনা কতদূর এসেছি। আমার মা আমাকে কোলে নিয়ে আদর করে চুমু খেয়ে বললেন "বলেছিনা যে তুমি পৃথিবীর ভিতরে আজ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আধার, তোমাকে আমি নিজ হাতে সাধন শেখাচ্ছি। তোমার মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান চক্র ভেদ হ'য়েছে এখন উর্দ্ধ গতি চলেছে। ও পর পর এই পাঁচ বৎসরের ভিতরে তোমার সাধন সিদ্ধ হবে। কিন্তু সাবধান মন বিকার শূন্য কর। অর্থের চিন্তা করো না। তোমার যে অর্থের প্রয়োজন আমার থেকে বেশী কি কেউ জানে ? অর্থ প্রচুর দেব, সংসারের সকল কর্ত্তব্য সমাধা করে তবে জগতের কল্যাণে তোমাকে নিয়োজিত হ'তে হবে। সব আমি করে যাব ; তোমার কোনও চিন্তা নাই।" মা আমার বড় ভাল। আমার মা ভিন্ন আর কেউ নাই।

রবিবার, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে গায়ত্রী জপ করতে করতে মা আমাকে সেই আলোকের পারাবারে আদি জ্যোতির দণ্ড (শিবলিঙ্গ) মধ্য-মণির কাছে নিয়ে গেলেন। ১৭ই জুন ১৯৫৬ খৃঃ যেরূপ আমি দর্শন করেছিলাম আজকের রূপ সেই রূপ। একটি মহা মহা মহা শ্বেত জ্যোতির অনন্ত সমুদ্র তার মাঝখানে একটি জ্যোতির দণ্ড (শিবলিঙ্গ সদৃশ)। সেই জ্যোতির দণ্ডের শীর্ষদেশ চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে সেখান থেকে গলিত মহা মহা মহা জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। সেই দণ্ডের শীর্ষদেশ থেকে ছায়াময়ী সালঙ্কারা মাতৃরূপের আবির্ভাব হোল। এ রূপ সেই রূপ যা আমি ১৭ই জুন দেখেছি। মা বললেন "আজ তোকে সৃষ্টিতত্ত্বের গূহ্যতম রহস্য বলব যা আজ পর্য্যন্ত কোনও মানব জানতে পারেনি।" মা দাঁড়িয়ে আছেন আমার ডাইনে খানিকটা উঁচুতে, আমি দাঁড়িয়ে আছি মাঝখানে, আলোকের দণ্ড ঠিক আমার সামনে কিন্তু একটু যেন বাঁ দিকে in the same level-এতে। আমার থেকে আলোকের দণ্ড ঠিক কত দূরে সেটা যেন আমার কাছে মহা

রহস্য। কিন্তু অতি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মা বলতে আরম্ভ করলেন "এই যে মহা জ্যোতির দণ্ড দেখতে পাচ্ছ এ হোল আদি শক্তির আদি জ্যোতি নিষ্ক্রিয় ভূত-ভাবন আত্মানন্দময়-পরাৎপর পরব্রহ্ম। ইহার বাইরে ও ভিতরে কোনও চঞ্চলতার প্রকাশ নাই। শুধু একটি মহানন্দময় নিস্পৃহ ইক্ষণ শক্তি মহা রহস্যময় হয়ে ইহার অচঞ্চল মহা-সত্ত্বার ভিতরে কার্য্য করছে। ইহা হল সৃষ্টির আদির মহাভাব। এই মহাভাব প্রকাশে জ্যোতির দণ্ড মুখ থেকে মহাজ্যোতিরূপ ব্রহ্মবীর্য্য নির্গত হ'চ্ছে। এই যে জ্যোতির দণ্ড ইহা হ'তে আমার আবির্ভাব। এই দেখ কি ভাবে জ্যোতির দণ্ডের ভিতরে ছিলাম ও কি ভাবে আমার নির্গমন হ'ল। আমি ছায়াময়ী পরাপ্রকৃতি। আমি মহা-মায়া, মহা-শক্তি, মহা-কাল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ী ব্রহ্মময়ী জগদ্ধাত্রী। আমার আবির্ভাবের পরে পরাৎপর পরব্রহ্মের মহা-আনন্দময় নিত্যানন্দ মহাজ্যোতিরূপ ব্রহ্মবীর্য্যে আমার অবগাহন হোল। আমি নিরাকার মহা-পরাপ্রকৃতি নিরাবয়ব যোনিযুক্ত। মহা-জ্যোতিরূপ ব্রহ্মবীর্য্যে অবগাহনে আমার লক্ষ কোটি যোনিতে সৃষ্টির মহা-প্রহেলীকাময় জগৎ-সংসার ও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হোল। আমি মাতৃ-ভাবময় মহাভাবে সৃষ্ট প্রকৃতিকে আত্ম-প্রতিষ্ঠিত করলাম। স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিন্যাস সাধন ও প্রতিষ্ঠা করলাম। জীব জগত আমা থেকে নির্গত ও ব্রহ্মজ হ'য়ে জগত সংসারে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। একমাত্র আমার দ্বারা লালিত ও পালিত হ'চ্ছে। আমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও নিরাবয়ব ব'লে স্থূল দেহধারী জীব যে ভাবে আমাকে দেখতে চায়, তার সেই জ্ঞান-গণ্ডির পরিধির ভিতরে যে রূপ তার দেখা প্রয়োজন সেই রূপ সে দেখতে পায়। এই বিশ্ব সৃষ্টির মহানন্দ সেই পরাৎপর পরব্রহ্মের অন্তস্থলে নিস্তরঙ্গে সমাহিত আছে। কিন্তু আমি পরা-প্রকৃতি হ'য়ে লালন পালনে তাঁর ইচ্ছা পালন করছি। তিনি একান্ত নিস্পৃহ হ'য়ে আনন্দময় অনুভব-দৃষ্টিতে অবলোকন করছেন। আমি মাতা তিনি পিতা। আমি মাতা হ'য়েও পিতৃভাব গত সৃষ্ট ও তাঁর মহা ও শ্রেষ্ঠ অংশ। আমি ও তিনি ভেদ হ'য়েও একাত্ম ও অভেদ। আমি সর্ব্বার্থ

পরিপূর্ণ করি, আমি কল্পতরু হ'য়ে সকল আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পূর্ণ করি। তিনি নিস্পৃহ অবলোকিতেশ্বর। ব্রহ্ম কল্পভূমার সাধনা মহা কঠিন সাধনা। এ সাধনা করতে তিনি কখনও কাহাকে বলেন না বা বারণও করেন না। তিনি নিত্যানন্দময় আত্মানন্দ। তাঁর মাঝে সৃষ্টির মহানন্দ ছাড়া আর কোনও স্পৃহা নাই। ব্রহ্মবীর্য্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বীর্য্য জীবদেহে বর্ত্তমান। স্থূল বীর্য্যে সৃষ্টির সহায়তা হয় সূক্ষ্ম বীর্য্যে পরাপ্রকৃতি ধারণ হয়। যে সাধক সূক্ষ্ম বীর্য্য দ্বারা পরাৎপর পরব্রহ্মের মহা সাধনা করে তার ব্রহ্মবীর্য্য প্রাপ্তি হয়। তাহাতে তার নির্গমন ও প্রতিগমন আর থাকেনা। তার মহালয় হয়। ইহাতে সাধকের পরাশক্তি লাভ হয় সত্য কিন্তু তার জীবত্ব চিরতরে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। ইহাতে পরা-প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। পরা-প্রকৃতি সাধনের ভিতর দিয়ে সাধক আমার ক্রোড়ে থেকে ব্রহ্মরূপ দর্শন করবে এই হোল নিয়ম। তার জীব সত্ত্বাকে বিনাশ করবে না। জীব সত্ত্বাতে প্রতিষ্ঠিত থেকে প্রকৃতি-গত জীবন ধারণের ভিতর দিয়ে মহা-সাধনের দ্বারা ব্রহ্মময়ীর করুণা লাভ করে ব্রহ্ম-কল্প দর্শন লাভ করবে ও মহানন্দ লাভ করবে এই হ'ল নির্দ্দিষ্ট ও একমাত্র সাধন পথ। মহাযোগী শিবই একমাত্র এই পথের সাধক ছিলেন। প্রত্যেক সাধকের বা প্রত্যেক জীবের দেহেতে বহু যোনি বর্ত্তমান। প্রকৃতিগত মহা সাধনে এই সকল যোনি উন্মেষিত হয় ও আমি যেমন ব্রহ্মবীর্য্য ধারণ করে মহানন্দ লাভ করেছি সাধকও তেমনি ব্রহ্মবীর্য্যের সূক্ষ্মতম কণিকা ধারণ করতে সমর্থ হয় ও মহানন্দ লাভ করে। সাধনে স্থূল দেহেই সর্ব্বদেহে প্রকৃতি যোনির উন্মেষ হয় ও ব্রহ্মবীর্য্য লাভ হ'য়ে সাধক নিত্যানন্দ লাভ করেন। এই সময় সাধক প্রকৃতিগত ও তার স্ব স্বভাবগত সাধন পথ হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে মহাউন্মাদনায় ব্রহ্ম-কল্প ভূমায় আত্ম নিবেদন করে ফেলে। এই আত্ম নিবেদন উপেক্ষিত হয় না ও তাহাতে তাহার ব্রহ্মযোগে জীবত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয় ও ব্রহ্মবীর্য্য প্রাপ্তি ঘটে।"

আমার মা একান্ত সহায়। আমার মা করুণাময়ী জগৎ ধাত্রী আমার মা জননী।

বুধবার, ৭ই নভেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে ৯টায় হঠাৎ মা বললেন "যাও অবনীর কাছে। সে এর ভিতরে আমার একটু দর্শন পেয়েছে ও তারপর থেকে তার চিত্ত ভীষণ চঞ্চল হ'য়েছে আমাকে আবার দেখবার জন্যে। এতে তার শারীরিক ও মানসিক বিকার ও ক্ষতি যে কোনও সময় হ'তে পারে। তাকে বল আত্মানুসন্ধ ও স্থিত-প্রজ্ঞ হ'তে। সে এখন সাধক। সাধকদিগের দেহ, মন ও আত্মা যখন বা যে মুহূর্ত্তে একান্ত হ'য়ে আমা মুখিন্ হয় সেই সময় আমার দর্শন হয়—। একবার দর্শন পেয়ে যদি সাধক বারে বারে আমাকে দর্শন করবার জন্য অত্যন্ত চঞ্চল হয় অথচ সে দর্শনের জন্য তার দেহ মন ও আত্মা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই. তবে তার দেহ-বিকার হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। একবার দর্শন পেলেই সাধক তখন বুঝবে তার হৃদয়াকাশে আমি উদিত হ'য়েছি। এখন তার আত্মানুসন্ধান দরকার। এই আত্মানুসন্ধান দ্বারা রিপুগণের স্থূল প্রভাব আস্তে আস্তে প্রশমিত করতে হবে। অর্থাৎ হৃদয়াকাশে যে মেঘমালা আছে তাকে আত্মানুসন্ধানের নির্ম্মল বায়ুতে দূর করে দিতে হবে। এই আত্মানুসন্ধান পূর্ণ না হ'লে আমার দর্শন সব সময় হবে না। ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে হবে। আমাতে মন স্থির রেখে জপের মাধ্যমে আস্তে আস্তে আপন অন্তরকে দেখতে হবে। কোথায় কাম আছে, লোভ আছে, অহংকার আছে, সব ধীরে ধীরে সংযত করতে হবে। এই ভাবে সাধন চলবে। এই ভাবে সাধন করতে করতে সাধক এক সময় স্থিত-প্রজ্ঞ হবে। তখন সে শান্ত, স্থির, নিশ্চল ও নির্ব্বিকার। সেই সময় আর আমার জন্য চঞ্চল হ'তে হবে না। আমি তখন তার হৃদয়াকাশে সদা বিরাজিত থাকব ও তাতে তার সাধন ক্রমে উর্দ্ধগতি লাভ করবে। তারপর যা হবে পরে জানতে পারবে—। দেরী করোনা আজই অবনীর কাছে যাও। বিকালে আফিস ফেরৎ যাও।"

মা আমাকে আবার একি ভার দিলি মা? আমি কি এর জন্যে উপযুক্ত? মা আমার অপার করুণাময়ী। জয় মা জয় মা জয় মা।

বুধবার, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজকে সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কাম ও বিষয়ের চিন্তায় আমাকে এ ক'দিন ডুবিয়ে রাখলে কেন? মা বললেন "তুই যে বিষয় চেয়েছিলি; মাঝে মাঝে বিষয় চিন্তা, কাম চিন্তা এলেইত নিজকে বিশ্লেষণ করতে পারবি ঠিক মত ও বীর সাধক হ'তে পারবি। সংসারে সকল প্রলোভনের ভিতর থেকে আমাকে যে একাগ্র হ'য়ে চিন্তা করতে পারে সেই বীর সাধক। তাই হ'চ্ছে গীতাধর্ম্ম। গীতা রূপক। সর্ব্বসাধারণের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার জন্যে ব্রহ্মজ্ঞানী ও ব্রহ্মবিদ্যা পরায়ণ মহর্ষি ব্যাসদেব সকল শাস্ত্র মন্থন করে কৃষ্ণার্জ্জুন কথোপকথনের রূপক ভিত্তিমূলে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার সার তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁর সকল তত্ত্বই যে মূল সত্য তাহাও নয়। তবে গীতাই সকল শাস্ত্রের সার ও সকল শাস্ত্রই গীতা। সাধারণ মানব রূপক ছাড়া গভীর তত্ত্ব গ্রহণ করতে পারে না। তাদের কাছে সে গুলো নীরস ও অর্থহীন মনে হয়। তাই গীতার এই রূপক আকার। এখানে শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম, অর্জ্জুন জীবাত্মা, গাণ্ডীব ঐশী শক্তি, শর মন, আত্মীয় স্বজন মানব সমাজ। সংসারে পরব্রহ্ম সকল সময় জীবাত্মাকে মানব সমাজগত অবিদ্যাকে ধ্বংশ ক'রে আত্মস্বরূপগত হ'য়ে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হ'তে বলেছেন। মন-রূপ শরকে একাগ্র করে, ঐশী শক্তিরূপ গাণ্ডিবে যোজনা করে আত্মারূপ অর্জ্জুন মানব সমাজগত অবিদ্যাকে ধ্বংশ করবে। কৌরব পক্ষে কি জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন না? কিন্তু অবিদ্যায় তারা মোহান্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। সেইজন্যে ব্রহ্মবিদ্যারূপ সকাম কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণার ভিতর দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যার গভীরতম সার তত্ত্ব গীতায় সন্নিবেশিত করে গেছেন মহর্ষি বেদব্যাস।

গীতায় অনেক জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য চাতুরীপূর্ণ ও সম্পূর্ণ সৎ কার্য্য বলে তোমাদের মনে হয় না। এসব আর কিছুই নয় এ হ'চ্ছে বীর সাধকেরও মনে কোনও কোনও সময় যখন মোহ আসে তখন পরব্রহ্মের অনেক কার্য্যই সৎকার্য্য বলে মনে হয় না। সেইটা দেখবার জন্যেই বেদব্যাস ঐ সকল যোজনা

করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতের নরনারীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল ও সেই যুদ্ধের মাধ্যমে যে শিক্ষা বেদব্যাস দিয়ে গেছেন সে স্বতই জনশিক্ষার একটি প্রকৃষ্টতম পন্থা। তোমার সাধনা বীর সাধকের সাধনা। কত লোকের নিন্দা, অপমান, যন্ত্রণা উপেক্ষা করে আমাতে সম্পূর্ণ একাগ্র হ'য়ে সাধন করে মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। তোমার সময় আসছে। সাধন কর। ভয় নাই আমি আছি।" মা আমার অপার করুণাময়ী—।

শনিবার, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে জিজ্ঞাস করলাম ভারতের ধর্ম্ম কি মা? মা বললেন "ভারতের ধর্ম্ম নির্ব্বিকার ধর্ম্ম।" নির্ব্বিকার কি? "যা বিকার শূন্য তাই নির্ব্বিকার।" বিকার কি? "দেহ-জাত ধর্ম্মের অনুসরণই জীবের বিকার অবস্থা। এই অবস্থায় জীবের দৃষ্টি স্থূল হয়। জীব দেহ-সর্ব্বস্ব হ'য়ে শুধু দেহেরই তুষ্টিসাধন করে। যখন দেহের স্থূল আকাঙ্ক্ষা ছাড়া জীব অন্য কিছু ভাবতে পারেনা তখন তার বিকার অবস্থা। এ বিকার অবস্থার নাম অধোগতি। এই অধোগতির অবস্থায় জীব দিনের পর দিন আত্মিক অভিজ্ঞান থেকে আস্তে আস্তে সরে যায়। কঠিন জড়তায় তার অন্তরলোকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ঢেকে দেয়। যে দেহ সাধন-মন্দির হবে, সে দেহ নরক হ'য়ে যায়। আত্মাকে ক্ষুব্ধ, মোহগ্রস্থ ও দেহসর্ব্বস্ব ক'রে তোলে। আত্মবিকাশ না হওয়াতে আত্মাও স্থূলরূপ ধারণ করে। একটা আরসি তাতে যেমন তোমরা মুখ দেখ। যদি সেটা অতি স্বচ্ছ হয় তবে তোমাদের মুখাকৃতি অতি স্পষ্ট দেখায়। কিন্তু যদি সেটা মলিন থাকে তবে তাতে তোমরা তোমাদের মুখাকৃতি স্পষ্ট দেখতে পাওনা। সেটা আয়নার দোষ নয়। দোষ তোমাদের কারণ তোমরা সেই আয়নাতে ময়লা লাগতে দিয়েছ ও পরিষ্কার কর নাই। এই আয়না প্রতিদিন পরিষ্কার করলে প্রতিদিন তোমাদের নিজেদের মুখাকৃতি দেখে আনন্দ পাও। ওতে তোমরা তোমাদের স্বীয় আকৃতি দেখতে পাও। তুমি জান তোমার আকৃতি কেমন। মুখের

কোথায় তোমার ময়লা লেগে আছে। তেমনি আত্মা আয়না। তোমাদের দেহ ও দেহ-জাত সকল কর্ম্মই তোমাদের আত্মাতে প্রতিফলিত হয়। আত্মার প্রতি একনিষ্ঠ হ'য়ে যদি রোজ তোমরা তাকে সাধনের দ্বারা পরিষ্কার কর তবে তোমাদের দেহজাত সকল দোষগুণ আত্মাতে প্রতিফলিত হবে ও আত্ম-বিশ্লেষণ দ্বারা তোমরা নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতি অপনোদন করতে পারবে। এইভাবে চললে জীব নিজের ভিতরে নিজেকে ও সকল বস্তুকে দেখতে পায় ও আস্তে আস্তে তার সকল মোহ সংশয় ছিন্ন হয়। মোহ-সংশয় ছিন্ন হ'লেই জীব এক অভিনব রাজ্যে আপনাকে দেখতে পায়। এটি যোগের পূর্ণাবস্থা। তখন আত্মার ধৃতি-শক্তি জাগ্রত হয় ও পরাবিদ্যা লাভ হয়। পরা-বিদ্যায় দেহ-জাত জ্ঞান বিলুপ্ত হয় ও বিরাট আত্মিক লোক তার দৃষ্টি পথে উন্মুক্ত হয়। তখন জীবদেহে একটা অদৃশ্য শক্তি ও আকর্ষণী শক্তির উন্মেষ হয়। এই শক্তির নাম কুলকুণ্ডলিনী শক্তি। এই শক্তির সাহায্যে জীব ব্রহ্মময়ীর দর্শন লাভ ক'রে মহাশক্তিশালী হয়। ইহাকেই যোগসিদ্ধ বলে। এই শক্তির যোগই ভারতের শাশ্বত ধর্ম্ম। ভারতের নরনারী এই যোগ সাধনেই দেহকে জেনেছে। দেহ-সর্ব্বস্ব হ'য়ে জড়বাদে দেহকে জানে নাই। জেনেছে পরাবিদ্যায়—তাই তার বীজ মন্ত্র "ওঁ"। "ওঁ" মুক্ত, স্বচ্ছ ও আত্মার ক্লেদ নিবারক ও জড়তা বিনাশক আত্মিক প্রজ্ঞা। "ওঁ" এর শক্তি অসাধারণ। এই শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সকল ও প্রতিটি অণুতম সূক্ষ্ম রক্ত কণিকায় মহাশক্তি সঞ্চারিত হয়। শরীরের ভিতরে মহা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দেহ-জাত বিকারকে খণ্ডন ক'রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে মহা-শক্তিতে জাগ্রত করে। এই "ওঁ" ভারতের আদি মন্ত্র ও মহা মন্ত্র। "ওঁ" উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা শরীর অভ্যন্তরের যতটা দূষিত বায়ু নিষ্কাষণ কর তার সাতগুণ বেশী মুক্ত পরিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ কর। "ওঁ" সদা সর্ব্বদা উচ্চারণ করলে বাইরের দূষিত বায়ু পরিশুদ্ধ হ'য়ে রক্ত কণিকার সজিবতা উৎপাদন করে। এতে আত্মা পরিপুষ্ট হয় ও মহাধৃতি শক্তি জাগ্রত হয়। "ওঁ" মন্ত্রে সকল রোগের বিনাশ হয়। এ মন্ত্রে পরা-শক্তি লাভ

হয় ও ব্রহ্মময়ীর দর্শন লাভ হয়। "ওঁ" একমাত্র ভারতের ধর্ম—যে ধর্মে সকল চরাচর একাকারে সমস্ত উপলব্ধি করে। ইহাই নির্ব্বিকার ধর্ম।"

"ওঁ তৎ সৎ—"

ওঁ মা ব্রহ্মময়ী আমার মা—।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাস্তায় আফিস থেকে গাড়ীতে ফিরবার পথে সামনের মোটর গাড়ীর পেছনের লাল বাতি দেখলাম। মা বললেন "আমার ওই রূপ। আলোর রং কি জানো? আলোর রং সাদা। কিন্তু যে রংয়ের স্বচ্ছ আরবণে ওকে ঢাকবে সেই রংয়েই ওকে দেখতে পাবে। লাল, নীল, সবুজ, গোলাপী, বেগুনী, পীত, কালো, স্বচ্ছ আবরণে ঢাকলে তুমি সেই শ্বেত আলোককে সেই সেই রংয়ে দেখতে পাবে। আমি এক স্থির ও মহালোক। আমাকে সাধকের সাধন চোখের দৃষ্টি অনুসারে সাধক দেখতে পায়। তাতে আমি আমিই থাকি। আমার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। শুধু সাধকের সাধনের রং-এ আমার রূপ দেখতে পায়। সাধকের এই সাধন দৃষ্টি তার নিজস্ব সংস্কার প্রসূত। যে দেহ নিয়ে আত্মা বার বার জন্ম গ্রহণ করে ও যে কর্ম্ম-ফলের দ্বারা তার জন্মান্তরে দেহ ধারণ হয় সেই সংস্কার তাতে জাত হয়। সেই জাত সংস্কারকেই সাধক সাধন করেন। এতে তার কোনও অন্যায় নাই। সে আমার জ্যোতিকেই ভজনা করে, সে যে রংয়েরই হোক না কেন। বিলাতের লোকে আমাকে কালী রূপে ভজনা না করে ম্যাডোনা বলে ভজনা করে। আবার ভারতের লোকে আমাকে কালীরূপে ভজনা করে। কিন্তু রূপ আমার একই, সে রূপের পরিবর্ত্তন নাই। শুধু সংস্কারের পরিবর্ত্তনে আমাকে বিভিন্ন রূপে কর্ম্মফল জাত সংস্কারে আমাকে দেখতে পায়। তুমি নিরাকার বাদী হ'য়ে সাকার রূপে আমাকে দেখ। আবার সাকার বাদী হ'য়ে অনেক সাধক আমাকে নিরাকার রূপে দেখে। এ দেহ-জাত কর্ম্ম-ফল প্রসূত সংস্কার জন্ম জন্মান্তরে আত্মজাত হয় ও সেই আত্মজাত সংস্কার দেহ দেশে সাধন ক্ষেত্র রচনা করে। তাই যদি না হবে তবে এই পৃথিবীতে

দেহ ধারণের কোনও মূল্যই থাকে না। দেহ ধারণে সংস্কার মূলগত হ'য়ে আত্মপুষ্ট হয় ও সেই আত্ম পুষ্ট সংস্কার সাধন-পুষ্ট হ'য়ে আমা মুখিন হয়। আমার দর্শন লাভ হ'লে সেই সংস্কার চিরতরে বিলুপ্ত হয়। আমার দর্শন হ'লে ব্রহ্ম-জ্ঞানে সাধক সকল সংস্কার মুক্ত হ'য়ে আমার পরা-প্রকৃতি ও সর্ব্ব-কাল-স্থিত অপরূপ রূপ উপলব্ধি করে। তুমি সাধন কর আরও জ্ঞান দেব। কোনও চিন্তা নাই। আমি আছি ভয় কি ?" মা আমার অপার করুণাময়ী।

বৃহস্পতিবার, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

মাকে জিজ্ঞাসা করলাম গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ ও শক্তি কি ? মা বললেন "গায়ত্রী হোল মহা মন্ত্র। আমি যে পরমা শক্তি ও আমা ভিন্ন যে আর কেউ ভজনীয় ও পূজনীয় নাই এই মন্ত্রে সেই শব্দেরই যোজনা হ'য়েছে। সকল ব্রহ্মাণ্ডের নরগণ, দেবতাগণ ও সকল জীবগণই আমাকেই শুধু ভজনা করে। আমাকে অনন্ত গতি হ'য়ে সকলে ভজনা করে। আমিই একমাত্র সর্ব্বশক্তিময়ী, মহা জ্যোতির্ম্ময়ী পরম জননী, আমাকেই তুমি ভজনা করবে। মানব সকল রিপু থেকে সহজে নিষ্কৃতি পেতে পারে। কিন্তু মদ্ অর্থাৎ অহঙ্কার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দেহীর পক্ষে বড় কষ্টসাধ্য। কোটি কোটি মানবের ভিতরে দুই একটি মহা সাধু অহঙ্কার শূন্য হ'য়েছেন। এই গায়ত্রী জপে মানবের দেহাত্ম অহঙ্কার দূর হয়। অহঙ্কার যাতে দূর হয় তার জন্যে গায়ত্রী জপ হ'চ্ছে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সাধনা। যত সাধনই কর না কেন একটু অহঙ্কার মনে থাকলে সাধনা সফল হয় না। শত বৎসরের সাধনা এক মুহূর্ত্তের অহঙ্কারে বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে বিফল হয়। কত মহা মহা সাধক ও ভক্ত এই অহঙ্কারের হাত থেকে পরিত্রাণ পায় নাই। দেহের মোহ বড় কঠিন মোহ। গায়ত্রী একমাত্র মন্ত্র ও এই মন্ত্র জপে সকল অহংজ্ঞান বিনাশ হ'য়ে মহা-জ্ঞান, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ও দিব্য-জ্ঞান লাভ হ'য়ে আমার দর্শন হয়।" আচ্ছা মা পৃথিবীতে কি অহঙ্কারশূন্য সাধক ছিলেন না ? ও কে কে ছিলেন ? মা বললেন "মাত্র দুই জন। মহাভক্ত শিব ও মহাভক্ত যিশু-খৃষ্ট। এই দুই জন সম্পূর্ণ অহংজ্ঞান শূন্য ছিলেন।"

আমার মা আমাকে গায়ত্রী-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। আমি যখন সময় পাই তখনই গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করি। কিন্তু কই আমার ত' মা অহঙ্কার গেল না। আমার মন ত এখনও বিশুদ্ধ হোল না। আমি কি করব? "শুধু যেমন জপ করছ তেমনি করে যাও, সব হবে। মহাশক্তি হবে। মনে প্রাণে জপ কর ও সাধন কর।"

আমার মা অপার করুণাময়ী—।

রবিবার, ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রবিবার ব্রহ্ম-মন্দিরে অক্ষয়দার উপাসনা ও বিভূতিদার সঙ্গীত। রবিবার থাকাতে বাবুলের জন্মদিন ৩রা না হ'য়ে আজ বিকালে হোল। শাশুড়ী ঠাকরুন প্রার্থনা করলেন ও "তোমারি গেহে পালিত স্নেহে তুমি ধন্য হে" ও শেষে "নূতন জীবন তোমার হাতে এবার কর দান" এই দুটি সঙ্গীত আমরা সকলে মিলে—আমি, ময়না, অঞ্জলী, বাবুল, রাহুল, পুতুল, মালা, মিঠু, চন্দন, শ্যামলী, মুটু, ভুণু, অপু ইত্যাদি গাইলাম। শ্বশুর মহাশয়ও এসেছিলেন। ছোট ছেলেদের খাওয়া হ'য়ে গেলে আমি ও শাশুড়ী ঠাকরুন ব্রহ্ম-মন্দিরে গেলাম। ঠিক আরাধনার সময় গিয়ে পৌছুলাম। আরাধনায় মগ্ন হলাম। অনেক কথা কানে আসছে আবার অনেক সময় ধ্যানের গভীরতায় ডুবে গিয়ে কথা শুনতে পাইনা। মনে হ'চ্ছে যেন অনন্ত মহাশূন্যে মহা আলোকের পারাবারে আমি পক্ষীসম বিচরণ করছি। মা বললেন "এই যে অনন্ত মহাশূন্য এই আমি। ব্রহ্মময়ী আমিই প্রত্যয়—ধাতা ও বিধাতা। এই স্থূল ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য ইত্যাদি সব মহাশূন্যে আমার সত্তায় বিরাজ করছে। কারুর সঙ্গে কারুর সঙ্ঘাত হ'চ্ছে না। এ আমার শক্তির বিকাশেই হ'য়ে যাচ্ছে। যাহা স্থূল বলে প্রতীয়মান হ'চ্ছে আসলে কেহই স্থূল নয়। সবই আমি। সবই আমা থেকে উৎপন্ন ও আমাতেই সমর্পিত আছে। যার যা স্থূল অবয়ব সেইমত সে আমার যতখানি শক্তি আহরণ করবার মত যোগ্য তাকে আমি ততটুকু শক্তি দান করছি। আমার মহাশক্তি দ্বারা সেই শক্তির অংশ আমার

প্রভাবে স্থানচ্যুত হ'তে পারে না। আমার ভিতরেই আমার শক্তির খানিকটা অংশ আমার নির্দ্দেশিত পথে আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করছে। সেই মত সেই সকল গ্রহের ভিতরে যে সব জীবসকল আছে তারাও আমার শক্তির অংশ হ'য়ে আমার শক্তির ভিতরে থেকে আমার আকর্ষণে আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করে যাচ্ছে। জীবদেহ যতটুকু ধারণ করতে পারে ততটুকু সে আমার শক্তি ধারণ করছে। যদিও এ সব স্থূল বলে মনে হয় আসলে এসব স্থূল নয়।" আমি বললাম মা সব বুঝতে পারলাম না। মা বললেন শোনো, একটা ঘটি, সেটা লোহার হ'লে খুব শক্ত হয় ভাঙ্গে না আর মাটির হ'লে ভেঙ্গে যায়। সুতরাং তার ক্ষমতা অনুসারে তার ধারণ করবার ক্ষমতা আছে। লোহার ঘটিতে জল যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আগুনে জ্বাল দেওয়া যায় তবুও ঘটির কিছুই হয় না। কিন্তু মাটির ঘটিতে জল বেশীক্ষণ জ্বাল দিলে সেটা ফেটে যায়। তেমনি সাধন যত কঠিন হবে ও আমার প্রতি যত বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হবে তত তোমার দেহরূপ ঘটি কঠিন হবে এবং মোহের আঘাতে তার কিছুই হবে না। সাগরের জলে একটি ঘটি যদি ডুবাও তার ভিতরে জল প্রবেশ করে সেটা ডুবে যায়। তার ভিতরে যতটা জল ধরা দরকার বা তার যতটুকু জল ধরবার ক্ষমতা তা সে ধরবে। কিন্তু সাগরের জলের ভিতর থেকেও তার ভিতরে সাগরের জলের একটা অংশ আছে। তার ক্ষমতার পরিমাপে সে সাগরের জলের একটা অংশ আপন দেহের ভিতরে ধরেছে। কিন্তু তার চারি ধারেই সাগরের জল। তেমনি দেহ ও দেহী সকল আমার ভিতরে থেকেও আমার একটা অংশ তার ভিতরে বর্ত্তাচ্ছে। এখন কথা হোল ঘটির মুখ হাত দিয়ে চেপে শূন্য ঘটিকে জলে ডুবালে তার ভিতরে জল প্রবেশ করে না ও সে ভেসে থাকতে চায়। যারা আমার ভিতরে ডুবতে না চায়, আমাকে যারা চায় না তারা আমারই ভিতরে শূন্য গর্ভ হ'য়ে আমার মায়া পৃষ্ঠে ভেসে বেড়ায়। তাদের ভিতরে আমার শক্তি প্রবেশ করে না। কারণ শক্তিকে চাইতে হ'লে সেই শক্তির ভিতরে ডুবতে হবে তবে শক্তি তোমাকে তার সত্তায় ডুবিয়ে দেবে।

ঘটির যদি অনেক ফুটো থাকে তবে জল ভ'রে উঠালে সব জল প'ড়ে যায়। দেহ জাত বিকার তেমনি দেহকে ফুটো ঘটির মত করে। আমার শক্তি আহরণ করলেও সে শক্তি সেই বিকারের প্রভাবে শূন্য হ'য়ে যায়। দেহ-জাত বিকারের ভিতরে অসরলতাই হ'চ্ছে প্রধান। ঘটির কোনও ফুটো নাই তার মানে ঘটিতে কোনও জায়গায় অসরলতা নাই। তার গড়ন-পেটন সরল তাই তার জল পড়ে না। তেমনি সরলতাই হ'চ্ছে মানবের শ্রেষ্ঠ ধারক শক্তি যার বলে মানব আমার শক্তিকে ধারণ করতে পারে। যার সরলতা আছে সে আমার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র। আবার ফুটো ঘটি জলে ডুবে যায়। ওই ফুটো দিয়ে আস্তে আস্তে জল ঢুকে সে জলাশয়ে ডুবে যায়। সেখানে জলাশয় ছাড়া ঘটি ডুবতে পারে না। যে মানব তার সকল অসরলতা সত্ত্বেও আমাকে মনে প্রাণে আত্মসমর্পন করে তার ভিতরে আমার শক্তি আস্তে আস্তে প্রবেশ ক'রে তাকে আমার ভিতরে নিমগ্ন করে।

জীব জগতে অথবা এই মহান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত কোটি কোটি জীব আছে প্রত্যেকের জীবন তন্ত্রী বিভিন্ন। প্রতি শব্দ, সঙ্গীত, ধ্যান, ধারণা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যা কিছু এই দৃশ্য ও অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডে আছে এর প্রত্যেকটির বিভিন্ন তন্ত্রী। এই বিভিন্ন তন্ত্রীর উৎপত্তি, ধৃতি বা ধারক ও লয় আমার ভিতরে আছে। প্রত্যে-কের স্ব স্ব চিন্তা, ধারণা, ধ্যান, শব্দ, সঙ্গীত, ইচ্ছা, প্রার্থনা আমার ভিতরে স্ব স্ব ভাবেই বা পৃথক ভাবেই অনুরণিত হয় বলেই আমি প্রত্যেকের কথাই ও প্রতিটি বিভিন্ন রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ জেনে থাকি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল শব্দ একযোগে একাকার হ'য়ে শব্দিত হলেও আমি প্রতি অনু-পরমাণুর ও বিভিন্ন ও প্রত্যেকটি শব্দ কার ও কেন সে শব্দ করছে তা জানতে পারি। তোমার শরীরের এক জায়গায় আঘাত লাগলে যেমন তোমার মস্তিষ্ক জানতে পারে কোথায় আঘাত লাগল এও সেইরূপ। কারণ সবই আমার অবয়বের ভিতরে আমার মহা শক্তিরূপ তন্ত্রীর ভিতরে জীবজগত আমার সম্পূর্ণ আত্মজ হয়ে

আছে বলেই স্বাভাবিক গতির একটা সূক্ষ্মতম অথচ প্রবলতম আকর্ষণ আমার ও প্রত্যেক জীবের ভিতর বর্ত্তমান।

কর্ম্ম-ফল জাত বিভিন্ন প্রকৃতি-লব্ধ বিভিন্ন বা প্রত্যেক জীব স্ব স্ব বিভিন্ন ভাবে বা সম্পর্কে আমার সঙ্গে যুক্ত বা গ্রথিত। যদিও শাশ্বত সম্বন্ধে আমার ও জীবের মধ্যে মাতা ও সন্তান সম্পর্ক তবুও কর্ম্মফল অনুযায়ী প্রত্যেক জীবের প্রকৃতি ভেদে তাদের ধারণা বা চিন্তা আমার প্রতি বিভিন্ন। কিন্তু আমি এক ও একনিষ্ঠ অপ্রত্যয়। আমি তাদের বিভিন্ন চিন্তায় পরিবর্ত্তিত হই না। তাদের বিভিন্ন চিন্তার রূপ ও সাধনই আমার রূপের পরিবর্ত্তন দেখে। আমি অপরিবর্ত্তনীয় ব'লে তাদের চিন্তায় আমায় পরিবর্ত্তিত রূপ দেখে ব'লে আমি অবিচলিত থাকি। আমি একনিষ্ঠ বলেই প্রত্যেকের নিষ্ঠায় আমি নিষ্ঠাবান্; কারুর নিষ্ঠাই আমি উপেক্ষা করি না। তাই যে যেভাবে আমাকে ডাকে সে সেই ভাবে আমাকে পায়। আমার পরিবর্ত্তন নাই। পরিবর্ত্তন জীবের বিভিন্ন নিষ্ঠার"। আমি বললাম ভাল করে বুঝিয়ে দাও মা। মা বললেন "ধর একটা আয়নার সামনে দাঁড়ালি। দাঁড়িয়ে নানারূপ মুখভঙ্গি করলি। যেমন মুখ ভঙ্গি করবি তেমনি দেখবি। কিন্তু তাতে আয়নার কি কোনও পরিবর্ত্তন হয়? এও তাই। আমি আয়না তুমি যেভাবে আমাকে দেখতে চাও তোমার সাধনার বিভিন্ন মুখভঙ্গিতে আমাকে সেই ভঙ্গিতেই দেখবে।" আমি বললাম আচ্ছা, মা তা হ'লে কিভাবে তোমাকে শাশ্বত ভাবে দেখা যায় বলে দাও। মা বললেন "সাধনার প্রকৃষ্ট সোপান হোল আত্ম-দর্শন। আত্ম-দর্শনের প্রথম পর্য্যায় হোল আত্ম-বিশ্লেষণ। তুমি কে, কি তোমার উদ্দেশ্য, কি তুমি করছ, কি করা তোমার কর্ত্তব্য, কি করা তোমার কর্ত্তব্য নয় ইত্যাদি আত্ম-বিশ্লেষণ। এই আত্ম-বিশ্লেষণ যত করবে ততই তুমি আস্তে আস্তে সাধনের পর্য্যায় উঠতে থাকবে। তারপরেই তোমার আত্মদর্শন হবে। তখন তুমি দেহী হ'য়েও ব্রহ্ম-ময়ীর সত্ত্বায় (আলোকের পরদার মত অথবা আলোকের পারাবারের মত অথবা আলোকের আয়নার মত) নিজেকে দেখতে পাবে। কি তুমি করছ, কোনটা

অন্যায় ও কোনটা ন্যায় করছ তুমি দেখতে পাবে। এ যেন তুমি অন্য কাউকে চোখের সামনে চ'লে বেড়াতে দেখছ। তোমার অন্তরের প্রতিটি চিন্তা মূর্ত্ত দেহ ধারণ করে তোমার দেহরূপেই তোমার সামনে বিচরণ করে বেড়াবে ও তার সব কিছু কার্য্য ও চিন্তা তুমি দেখতে পাবে। আত্মদর্শনের সাধনা খুব কঠিন। এই আত্ম-দর্শন সাধনায় যে সিদ্ধ সে আমার শাশ্বত সত্তাকে উপলব্ধিতে দেখতে পায়। মহা ভাগ্যবান্ সাধক আবার মূর্ত্তরূপে দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পায়। সেই দৃষ্টিই আসল আমার নিত্য দর্শন। তেমন ভক্ত বড়ই কম। তোমাকে আমি সেই ভক্ত করব। সাধন কর, সকল জ্ঞান দেব"। মা আমার অপার করুণাময়ী।

বৃহস্পতিবার, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

এ ক'দিন হোল মা আমার উপর খুব রাগ করছেন। মার আমার ভীষণ অভিমান। একবার মার আমার অভিমান হ'লে অনেক সাধ্য সাধনা না করলে সে অভিমান ভাঙ্গে না। ক'দিন হোল বলছেন "নস্যি ছেড়ে দে"। ওটা ছেড়ে দিলে দিব্য জ্যোতিতে তোর দেহ উদ্ভাসিত হবে। ওতে শরীর ও সাধনার হানি হচ্ছে"। ছেড়ে দেব, ছেড়ে দেব বলে মাকে ক'দিন ভাঁড়িয়ে রেখেছি। কিন্তু ২৫শে নভেম্বর রবিবার সকালে বললেন "আজ থেকেই ছেড়ে দে"। কৌটার নস্যি ফেলে দিলাম। ফেলে দিলাম কিন্তু আসক্তি গেল না। প্রায় ১০ টার সময় যখন গাড়ী আনতে গেলাম তখন আবার দোকান থেকে কিনে নিলাম ও নিতে আরম্ভ করলাম। এ ক'দিন চলে গেল এখনও ছাড়ি নাই। মন বলছে ছাড়ব কিন্তু দেহ ছাড়তে দিচ্ছেনা। অভ্যাস এমন জিনিষ যে কোনও অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া বিরাট শক্তির দরকার। একজন পৃথিবী জয় করতে পারে অনায়াসে। কিন্তু একটি কুঅভ্যাস ছাড়তে পারে না। মনের সঙ্গে আমার ভীষণ লড়াই হচ্ছে। এ কু-অভ্যাসের জন্যে কষ্টও পাচ্ছি। এ জন্যে আজ ক'দিন মা দেখা ত' দেনই নাই বরং আমার সঙ্গে কথা বলা ত দূরের কথা একেবারে আমার অন্তর শুকিয়ে দিয়েছেন। গায়ত্রী জপ করতে ইচ্ছা

করে না। মাকে ডাকতে ইচ্ছা করে না। কোনও কাজে মনযোগ দিতে ইচ্ছা করে না। এ মহা শাস্তি। এ হচ্ছে সন্তানের উপর মার শাস্তি। আমি জানি যেদিন নস্যি ছেড়ে দেব আবার আমাকে স্নেহ করবেন। মাকে রাগাতে খুব ভাল লাগে। অভিমান করে যখন বসে থাকেন তখন কত বিরক্ত করি যে তার অন্ত নাই। আমার দিকে ফিরেও চেয়ে দেখেন না। আমি একটু অবাধ্য হ'লেই মা আমার উপরে ভীষণ অভিমান করেন। মাগো আর আমি অন্যায় করব না। আমার দিকে ফেরো। একটু হাস, একটু কথা বল। মা মা, মা, মা, মা, আমার মাগো।

মঙ্গলবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "ভক্তিই সাধনা। সব বিষয়ে ভক্তিমান হও। নারায়ণের নারায়ণী যেমন সাধকের সাধনও তাই। নারায়ণী শক্তি ছাড়া নারায়ণ যেমন অশক্ত তেমনি সাধনা ছাড়া সাধক অশক্ত। সাধক সাধন করলে অমিত শক্তির অধিকারী হ'তে পারে। সাধনের ভিতরে ভক্তিভাবে সাধনই শ্রেষ্ঠ। এ সাধনে আমাতে আর ভক্তিতে কোন পার্থক্য থাকে না! সাধক আমাগত হ'য়ে যায়। সে আমা ছাড়া কিছুই জানে না, বোঝে না ও চায় না। আমিও তাকে চাই। তার একান্ত হ'য়ে যাই। ভক্তির টান বড় টান। এ টানে আমাকে পাগল করে দেয়। সাধকও কাঁদে আমিও কাঁদি। সাধকের এক ফোঁটা চোখের জল আমার সমস্ত মহান অন্তর উদ্বেলিত করে দেয়। তাই যেখানে ভক্ত সেখানেই আমি। ভক্তের সাথে আমাকে থাকতেই হয়। কারণ ভক্ত আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না। ভক্তকে চোখে চোখে রাখি। সে যেখানে যায় আমি তার সঙ্গে যাই। পৃথিবীতে ভক্তরা যত আমাকে পাগল করেছে আর কেউ তেমন করতে পারে নাই। ভক্তের সকল ভার আমি নিজ মাথায় বহন করি। ভক্তের যখন ভক্তি হয় তখন আমি আর ভক্ত এক হয়ে যাই। ঈষা ভক্ত, মুষা ভক্ত, মোহম্মদ ভক্ত, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, তুকারাম, কবীর, দাদুর, নানক

বাসুদেব, যোহান, পল. লুথার, কেশবচন্দ্র. হরিদাস ইত্যাদি কত যে ভক্ত আমার ছিল এই পৃথিবীতে, তারা আমার প্রিয় সন্তান হ'য়ে কত সুখে আমার কোলে আছে। তাদের সুখ যদি তোরা দেখতিস্ একবার তবে আমাকে ভক্তি না করে থাকতে পারতিস্ না। ভক্তি করবি সবাইকে। জগৎময় আমি। যাকে ভক্তি করবি সেই আমি হ'য়ে যাব। মূর্ত্ত হব, সাক্ষাৎ হব। আমি ভক্তের ভক্ত। আমি ভক্তিমানের ভক্তি। তুমি ভক্তি শেখ। ভক্তিভিন্ন আমাকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না"।

আমায় অহৈতুকী ভক্তি দাও মা। মা তোমাকে ত তেমন ভক্তি করতে পারি না। দুফোঁটা চোখের জলে কি তোমার ভক্তি হয়? মা আমাকে গলিয়ে একাকার কর। মা, মা, মা, মা, মা, মা, মা, আমার মাগো।

বৃহস্পতিবার, ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে সংসারে কোটি কোটি মানব জন্মগ্রহণ করছে, কত উচ্চ আদর্শের আদর্শবাদী হ'য়ে সকল জনগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করছে, কত মহাজ্ঞানী হচ্ছে, বিজ্ঞানী হচ্ছে কত সাধনা করছে। মৃত্যুর পরে কি তাঁরা নিঃশেষ হ'য়ে যান? তাঁদের কি আর কিছুই থাকে না? এর কি কিছুই সার্থকতা নাই? মা বললেন, "এ প্রশ্ন গভীর জ্ঞানের কথা। তোমার জ্ঞান এখনও পরিপক্ক হয় নাই। পরে তোমাকে এ সবের উত্তর দেব।" আমি বললাম সহজ করে আমাকে বুঝিয়ে দাওনা। তখন মা বললেন "দেখ তোমাকে আমি আগে বলছি যে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ কর তবে আমার ও মানবের বিষয় সব বুঝতে পারবে। পৃথিবীতে সমুদ্রের কথা ধর। এর জল লবনাক্ত। এই লবনাক্ত জলের তিনটি গুণ আছে। এক লবনাক্ত, দুই এর মিষ্টত্ব ও তিন এর জলত্ব। নদীর জল সমুদ্রে এসে মেশে। কিন্তু তার মিষ্টত্ব হারায় না। সে এই লবনাক্তের ভিতরে নিজ সত্ত্বা নিয়ে ওতপ্রোত হ'য়ে মিশে থাকে। আর জলত্ব হোল লবনাক্ত হ'য়েও জলের গুণ তার ভিতরে আছে। তেমনি আমি ত্রিগুণাত্মিকা।

আমি সমুদ্রের ন্যায়। আমার ভিতরে সমুদ্রের মত লবনাক্ত, জলত্ব ও মিষ্টত্ব আছে। সমুদ্রের ভিতর থেকে মিষ্টজল বাষ্প আকারে উপরে উঠে যায়, সেটা দেখা যায় না কিন্তু সকলেই সে সত্য জানে। যখন সেই বাষ্প মেঘের আকারে আকাশে জমা হয় তখন তোমরা তাকে দেখতে পাও ও জান; যে বাষ্প জল থেকে বা সমুদ্র থেকে উঠেছে আজ সে মেঘ হ'য়ে আকাশে বিচরণ করছে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগলে সে মেঘ বৃষ্টি হ'য়ে এই পৃথিবীতে ঝরে পড়ে পৃথিবীর মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু এই বাষ্প যতই সমুদ্র থেকে উঠুক না কেন সমুদ্রের ভিতরে যে মিষ্টজল আছে তার কোনই তারতম্য হয় না। তেমনি আমা থেকেই জীবাত্মার জন্ম। এই জীবাত্মা আমা থেকে জন্ম গ্রহণ করেও সমুদ্রের মিষ্ট জলের মত তার নিজ বিশেষত্ব রক্ষা করে। যদি ও আমাতেই রয়েছে তবুও তার পৃথক অভিব্যক্তি আছে। আমি সমুদ্র থেকেও অসীম বলে আমা থেকে যত জীবাত্মা জন্ম গ্রহণ করুক না কেন তাতে আমার কোনও ক্ষয় নাই। আমা থেকে আত্মার জন্ম হোল—দৃশ্যত তাকে দেখা যায় না। কিন্তু সে যখন মেঘের মত জীবদেহ ধারণ করে তখন তাকে দেখা যায়। আমার প্রেম স্পর্শে সে পৃথিবীর মঙ্গল বিধানে নিয়োজিত হয়। প্রত্যেক জীব কোনও না কোনও মঙ্গল বিধান করবেই পৃথিবীর। কোনও জীব বা কোনও মানব এমন নয় যে কোনও না কোন মঙ্গল বিধান করবে না। মিষ্ট জল যেমন তৃষ্ণা নিবারণ করে আবার ডুবিয়েও মারে। তেমনি সৎ আত্মা মঙ্গল কার্যই করে। আর অসৎ আত্মা মঙ্গলও কিছু করে অমঙ্গলই বেশী করে। সকল বৃষ্টির জল আবার সমুদ্রেই মিলিত হয়। কিন্তু সমুদ্রের ভিতরে থেকেও মিষ্টজল যেমন আত্ম-স্বষ্ট হ'য়ে আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে জীবাত্মাও তেমনি আমাতে মিলিত হ'য়ে আত্ম-স্বষ্ট বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। এই যে সমুদ্রে সৃষ্ট, বাষ্প হ'য়ে উর্দ্ধে উঠা মেঘ হ'য়ে আকাশে বিচরণ করা, বৃষ্টি হ'য়ে ধরণীতে বর্ষিত হওয়া ও আবার সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হওয়া যেমন জীবাত্মাও তেমনি আমার থেকে সৃষ্ট, আত্মারূপ বাষ্প হ'য়ে ধাবিত হ'য়ে, দেহরূপ মেঘ হ'য়ে সংসারে বিচরণ করে আমার

স্নেহ স্পর্শে সংসারের মঙ্গল বিধানে আপনাকে নিয়োজিত করে আবার আমাতে এসে মিলিত হ'য়ে আপন জীবসত্ত্বার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। এই অপরূপ গতিই জীবাত্মার। তবে পার্থক্য এই যে জীবাত্মা মহাশক্তিমান বলে তার আপন ইচ্ছা শক্তি বহুলাংশে সক্রিয় থাকে। সেই সক্রিয়তার বলে সে আপন পরিবেশের ভিতরে আবার ফিরে আসতে পারে। কিন্তু আমার মহান্ শক্তির প্রভাব হ'তে সে মুক্ত হ'তে পারে না। কারণ আমার মহান্ শক্তির প্রভাব যদি না থাকত তবে তার জন্ম, মৃত্যু ও কার্য্যক্রম কিছুই থাকত না। এই জন্ম, মৃত্যু ও কার্য্যক্রম অল্পাংশে তার সক্রিয়তার প্রভাবযুক্ত, এ সাধন মার্গের অবস্থা। বহুলাংশে আমার প্রভাবযুক্ত বলেই তার মৃত্যুর পরেও উন্নততর মার্গের জন্যই আবার জীবদেহ ধারণ হয়। জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় তার সক্রিয়তা সবিশেষ সঞ্চিত হয় ও আমার সক্রিয়তার বিশেষ আকর্ষণ অনুভব ক'রে আমাতেই যুক্ত হ'য়ে থাকে।" মা তুমি যে বললে জীবাত্মা আত্ম-সৃষ্ট বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে সে কেমন। তবে কি জীবাত্মা নিজেই নিজের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে পারে? মা বললেন "হ্যাঁ, এ ঠিক। জীবাত্মাকে আমিই এমন শক্তি প্রদান করেছি যে সে আমার অপার শক্তির গণ্ডির ভিতরেই আপন শক্তির বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করতে পারে। তা না হ'লে তার ক্রমোন্নতি হ'ত না। ক্রমোন্নতিই যে আত্মার গতি। এ শক্তি তাকে আমিই দিয়েছি যাতে সে আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে, আত্মোন্নতি করে আমার মহা শক্তির মহান্ বৈশিষ্ট্যের জয় গান করে। এ বৈশিষ্ট্য যদি তার দেহাত্ম বোধে বা অহঙ্কারে স্পর্দ্ধিত হয় তবে আমার অমোঘ বিধানে যতদিন তার বৈশিষ্ট্যের অহঙ্কার আমার মহান্ বৈশিষ্ট্যের কাছে নমিত না হয় তত দিন তার চক্রাকারে দেহ, আত্মা, জন্ম, ও মৃত্যুর চক্রে ঘূর্ণিত হ'তে হয়। এই খানেই আমার জয়। মেঘ যদি মনে করে 'আমিত এখন আকাশে উঠেছি ও কেমন আপন শক্তিতে মুক্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি" তখনই শীতল বায়ুর স্পর্শে তার সে অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে যায় ও ধরণীতে ঝরে প'ড়ে আবার আমার কাছেই আসে। তখন সে বুঝতে পারে তার বৈশিষ্ট্য ততক্ষণ যতক্ষণ সে আমার

বৈশিষ্ট্যকে মেনে চলে। সে যদি বলে আমি সমুদ্রেরই তবে তার দুঃখ হয় না। তার আপন বৈশিষ্ট্য আছে বৈ কি। কিন্তু সে বৈশিষ্ট আমার মহা বৈশিষ্ট্যের অন্তরঙ্গ। জীবাত্মার সেইরূপ। এখন বুঝলে ?"

আমি অনেকটা বুঝেছি মা। তুমি আমার জ্ঞান দায়িনী জননী—জগদ্গুরু। "আরও ভাল করে পরে বুঝিয়ে দেব, চিন্তা নাই—"।

মঙ্গলবার, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে যে তুমি নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিতে তা ত' এখন ক'দিন দিচ্ছনা আর সাধুভক্তদের যে দেখতে পেতাম তাও ত কই আর দেখতে পাই না। মা বলেলন "এতদিন সধুভক্তরা তোমাকে সাধন পথে আনবার জন্মে সচেষ্ট ছিলেন ও তোমার সাধন পথে তাঁরা আমার আদেশে তোমাকে সাহায্য করছিলেন। এখন তুমি সাধন পথ ধরেছ ও উপযুক্ত পথের সন্ধান পেয়ে চিত্ত স্থির করেছ বলে আর তাঁদের সাহায্য সব সময় তোমার দরকার নাই বলে তুমি তাঁদের দেখতে পাচ্ছ না। তবে তোমার যদি আবার মানসিক বিষয়-বিকার উপস্থিত হয় তখন তাঁরা আবার এসে তোমার সাহায্য করবেন। এখন তুমি আমার দিকে একনিষ্ট ও একাগ্র হ'য়েচ বলেই আমি তোমার সাধনার আরও উৎকর্ষ যাতে হয় তার জন্মে তোমাকে আর দেখা দিচ্ছিনা। একবার দু'বার দেখা দিয়ে যে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা তোমার অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছি আমাকে আবার দেখবার জন্মে তাতে তোমার সাধন পথে তোমাকে আরও উন্নত করবে। গাছে একটা সুপক্ক মিষ্ট ফল থাকলে আঁকশি দিয়ে যখন সে ফল পাড়ার চেষ্টা হয় তখন আঁকশিকে ধ'রে গভীর মনযোগের সঙ্গে সেই ফলের বোঁটায় আঁকশির অগ্রভাগ লাগাতে হয়। যদি আঁকশির অগ্রভাগ ফলের বোঁটায় ঠিক আট্কে যায় তবে একটান দিলে ফল তোমার হাতে এসে পড়ে। আমি পক্ক সুমিষ্ট ফল গাছের উর্দ্ধে আছি। তোমার সাধন আঁকশি আমার বোঁটার কাছাকাছি একবার আসছে আবার ফিরে যাচ্ছে। যে দিন তুমি আমার বোঁটায় তোমার সাধন আঁকশি শক্ত করে লাগিয়ে সজোরে

টান দেবে সে দিন সেই আঁকশির সঙ্গে আমি তোমার সাধন লব্ধ হব। চিন্তা ক'রো না, খুব সাধন করে যাও, যে ভাবে করছ সেই ভাবে সাধন কর। একলাই পৃথিবী জয় করতে পারবে। সকলের পদতলে দাঁড়িয়ে আমার জয় গান করলে সকলেই তোমার পদতলে এসে পড়বে। দেহ ও মনকে অহঙ্কার শূন্য কর। বিগতস্পৃহ হও। উন্নতি সুনিশ্চিত বলে জানবে। তোমাকে চিহ্নিত করে ধরা হ'য়েছে। সাধু মহাজনগণ এখন বুঝতে পেরেছেন যে তোমার সিদ্ধির সকল ভার আমি সহস্তে গ্রহণ করেছি। তাই তাঁরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে সুখী হ'য়েছেন। মা তোমার অপার দয়া।

সোমবার, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম এত যে নামজপ সাধন করছি আমার ত কিছু হ'চ্ছে না। মা বললেন "আমি সব গুণছি। তোমার কতবার নাম সাধন হ'ল সব আমার কাছে হিসাব আছে। কতবার বিষয় চিন্তা করলে, কতবার পাপ চিন্তা হ'ল ও কতবার নাম সাধন হোল আমার কাছে সব হিসাব আছে। আমি ত' তার তুল্য মূল্য করব। নাম সাধন করতে করতে উর্দ্ধগতি হ'তে হ'তে আবার যখনই বিষয় চিন্তা কর তখনই সাধন গতি সঙ্কুচিত হয়। তখন সেই সঙ্কোচন অবস্থা থেকে আবার সাধনের সচল গতিতে আসতে হ'লে আরও বেশী নাম সাধন দরকার হয়। এখন তোমার সাধন আর বিষয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলেছে। যখন সাধন জয়ী হবে তখন আর ভাবনা নাই। অরণ্যে হিংস্র পশু দেখলে যেমন লোকে বড় গাছে উঠতে চেষ্টা করে ও যখন উঠতে আরম্ভ করে তখন তার মনে ভয় থাকে এই বুঝি কোনও পশু এসে ধরল। কিন্তু সে যখন গাছের উঁচু ডালে উঠে বসে তখন আর তার মনে ভয় থাকে না। সাধন পথেও সেইরকম বিষয়ের ভয় থাকে। মন নিশ্চিন্ত হয় না। কিন্তু একবার সাধনের উচ্চ ডালে উঠতে পারলে আর ভয় নাই। আর বিষয় তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।" তবে কি বিষয় চিন্তাই পাপ? মা বললেন "না, সরল বিষয় চিন্তা পাপ নয়— তোমার পরিবারের ভরণ পোষণের জন্যে, অর্থ সংস্থান ও তার জন্য তোমার

চেষ্টা বা চিন্তা পাপ নয়। কিন্তু তার ভিতরে যদি কাউকে ঠকাবার চেষ্টা বা চিন্তা থাকে, পরস্ত্রীর প্রতি মন টানে, মিথ্যা কথার দ্বারা পরকে ঠকাবার প্রবৃত্তি থাকে তবে সে বিষয় চিন্তা সাধনের ভীষণ বিঘ্ন হয়। সরল ভাবে সৎপথে বিষয় চিন্তায় সাধনের বিঘ্ন হয় না কারণ তাতে মনে বিকার আসে না—মনের বিকার যাতে আসে তাতেই সাধনের বিঘ্ন হয়। মানব মন-ধর্ম্মের একটা গতি আছে। কালের বিবর্ত্তনে এই গতি-ধর্ম্মের উর্দ্ধ বিকাশ হচ্ছে। আদিম কালের ধর্ম্মের গতির এখন অনেক পবিবর্ত্তন হয়েছে। এ পরিবর্ত্তন নিম্ন গতির দিকে নয় উর্দ্ধ দিকে। মানব মনের বিকাশ খুব উচ্চ হ'য়েছে এখন। মানব মন প্রায় গাছের উঁচু ডালের কাছাকাছি এসেছে। এখন যদি তাড়াহুড়া করে তবে প'ড়ে যাবে ও হিংস্র পশুর দ্বারা নিহত হবে। আর যদি ধীর ভাবে উঠতে থাকে তবে অতি শিঘ্রই তার চরম সার্থকতা লাভ হবে ও পৃথিবী স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হবে। পৃথিবীর সঙ্কট ব্যাষ্টি জাগরণ থেকে ও মনের উচ্চ বিকাশ থেকেও আসতে পারে। কারণ মানব এখন আপনার ধ্বংশের বিষয়ে অনেক স্বাধীন ও মুক্ত। এই ব্যষ্টি বিকাশরূপ স্বাধীনতা যদি ঈশ্বর মুখিন হয় তবে পৃথিবী এক মহা-মঙ্গলময় ও প্রেমময় আনন্দ লোকে পূর্ণ হবে। সকল মানব এক মহান পরিবারে প্রেমে মিলিত হবে।" আমাকে সাধন শেখাচ্ছ কেন মা? "ওরে দুষ্টু আবার নিজের কথা, তোকে ত' অনেক বার বলেছি এ কথা"। আবার একবার বল না, তোমার মুখ থেকে শুনতে আমার বড় ভাল লাগে। "শোন. তোকে আমি সাধন শেখাচ্ছি কেন জানিস্? তুই এই পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, যার সরলতা ও সমদৃষ্টি সবচেয়ে উচ্চতম; যে সব দিকে দৃষ্টি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মা ও যার দ্বারা এই পৃথিবীর মহান্ কল্যাণ সাধিত হবে। তোমার কি মাঝে মাঝে মহা-আনন্দ হয় না? সেই মহানন্দের স্রোতে পৃথিবীর সকল বিদেহী ভক্তবৃন্দ তোমাকে উৎসাহিত করেন আমার ইচ্ছায়। সাধন কর, একান্ত মনা হও আমার প্রতি, ফল তোমার করতল গত।'

আমার অপার করুণাময়ী মা।

মঙ্গলবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

ক'দিন হোল একটি জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল চক্ষু দুটি নিমিলিত পদ্ম-কোড়কের ন্যায় আমার ধ্যানের ভিতর আমার মানস দৃষ্টির সামনে এসেছেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করেও তাঁর পরিচয় জানতে পারিনি। আজ সকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বাভাবিক বেশে কিন্তু অত্যধিক অগ্নিবর্ণে বহু উর্দ্ধ থেকে আস্তে আস্তে অতি নিকটে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর চক্ষু নিমিলিত। আমার দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে চাইলেন। আমি বললাম বলুন কি আপনার বলবার আছে। কিন্তু কিছুই বললেন না ও আবার যেমন এসেছিলেন তেমনি আস্তে আস্তে অতি উর্দ্ধে চলে গেলেন। আজ সারাদিন তাঁর আগমনের আনন্দ আমার প্রাণে মনে একটা আনন্দের স্রোত বইয়ে দিচ্ছে। অনেক ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'য়েছে। মাকে একদিন বলেছিলাম স্বামী বিবেকানন্দকে ত' দেখতে পেলাম না। তাই আজ তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম ও জীবন ধন্য মনে করছি।

মার আমার অপার করুণা।

আমার ব্রহ্মময়ী মা সহায়—

বুধবার, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "এই যে অর্থ কষ্ট যাচ্ছে এর কবে শেষ হবে? তুমি যদি জানতে যে কারখানা করলে আমার সব অর্থ শেষ হ'য়ে যাবে ও এত অর্থ নষ্ট হবে ও এত লোকসান হবে তবে কেন আমাকে কারখানা করতে দিলে? মা বললেন "তোমার জীবনে এক মহান্ আদর্শ কর্ত্তব্য আছে যার জন্য তোমাকে আমি সাধন শেখাচ্ছি। তুমি আদর্শ সাধক না হ'লে মানব সমাজ তোমার আদর্শে নিষ্ঠাবান্ হবে কি করে? তুমি তোমার জীবনে জীবদয়া, অহিংসার আদর্শ কি করে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে যদি তুমি পশুর চামড়া (জীব চৈতন্য) অর্থাৎ জীবচৈতন্যের দেহের চামড়া দিয়ে ব্যবসায় করে অর্থ লাভ করে ধনী হ'তে চাও? এ তোমার জীবনের মহান্ নির্দ্দেশের

পরিপন্থি ও আমার ইচ্ছা নয়। এই Chapple-কে আমি পাঠিয়েছি বিশ্বাস কর। তার অনেক ত্রুটি আছে সে গুলো দেহাত্ম বোধ ও সে গুলো থাকা সত্ত্বেও সে ঈশ্বর বিশ্বাসী ও সরল। আমি তাকে তোমায় দান করেছি। আমিই তাকে তোমার ব্যবসার জন্ম পাঠিয়েছি। সে তোমাকে ছাড়বে না অথবা তুমিও তাকে ছাড়তে পারবে না। আমি যা দিই সে জিনিষ তুমি চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারবে না। এই ব্যক্তির সাহায্যে তুমি প্রচুর অর্থ পাবে। আর অর্থ তোমাকে এমন সময় দেব যখন অর্থ তুমি সৎ কার্য্যে নিয়োজিত করবে। এখন ও এর আগে অর্থ দিলে হয়ত তোমার মনে বিকার আসত, সে আমি জানি বলেই তোমার সময়ে তোমাকে প্রভূত অর্থ দেব। তোমার অন্তরে কি কামনা আছে আমার থেকে কে বেশী জানে? তুমি ব্যবসায় যে সাম্য নীতি গ্রহণ করতে চাও, বান্ধবদের, আত্মীয়দের, ও দরীদ্র জনসাধারণকে যে ভাবে মুক্ত হস্তে তাদের জীবনের ভার নিতে চাও তাই তুমি করতে পারবে। তোমাকে বলেছি পাঁচ বৎসরের ভিতরে তোমার প্রচুর অর্থ হবে। তার আট মাস কেটে গেছে। আর চার বৎসর চার মাস আছে। এই সময়ের ভিতরে তোমার প্রভূত অর্থ, অতি রমণীয় গৃহ, ও তোমাকে যে জমি দান করেছি সেখানে তোমার গৃহ ও আশ্রম পাশাপাশি গ'ড়ে উঠবে। তারপর তোমার মানব কল্যাণ অভিযান আরম্ভ হবে। তোমার পরিবারের সকল ভার আমিই বহন করব। তারা অতি শান্তিতে ও সুখে সমৃদ্ধি সম্পন্ন হ'য়ে বড় হবে। তোমার পুত্র কন্যা এক একটি মহান উচ্চ আত্মা। তারা তোমার ঘরে জন্ম নিয়েছে তাদের কোনও অকল্যাণ হবে না জানবে। তোমার স্ত্রী অত্যন্ত সাধ্বী—তার উপর আমার করুণা আছে। কোনও চিন্তা করো না। আমি সব দেব। ধৈর্য্য ধারণ কর। তোমার কোনও অভাবে পড়তে হবে না। আমি যাকে দিয়ে আমার মহান্ কর্ত্তব্য করাব তার অভাব অভিযোগ আমি যদি নিবারণ না করি তবে কে করবে? শান্ত ভাবে সাধন কর। অর্থের চিন্তা তুমি করো না। সে ভার আমার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দাও। Chapple-এর উপর ক্রোধ করো না।

তার সংসারে কেউ তেমন নাই যে তাকে প্রাণের সরল স্নেহ দিতে পারে। সে স্নেহের কাঙাল। তাকে ভাই বলে আলিঙ্গন কর দেখবে সে তোমার জন্তে প্রাণ দেবে। তাকে যত ভালবাসবে তত তোমার ব্যবসার উন্নতি হবে। সে মদ্ খায় খাক্। এ নেশা তার সময়ে চলে যাবে। তোমার প্রেমের স্পর্শে কত মহাপাষণ্ড মহা-সাধু হ'য়ে যাবে। Chapple ও তোমার স্নেহের স্পর্শে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাবে। কোনও দুঃখ ক'রো না। কোনও সন্দেহ রেখ না। সাধন করে যাও। আমার বাণী শ্রবণ কর সদা সর্ব্বদা। Chapple এর ত্রুটি—ত্রুটি বলে নিও না, এ তার দেহাত্ম বিকার। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। ভয় নাই, নির্ভয় হও। আমাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস কর, ভক্তি কর ও সাধন কর। প্রতি জীব-আত্মায়, প্রতি জীবদেহে আমায় দর্শন কর। আমি সদা জাগ্রত। আমি স্নেহময়ী আমি মাতা। তুমি যদি আমার সন্তানের দুঃখ না বোঝ তবে কে বুঝবে? তোমাকে আমি ধরেছি ছাড়ব না। আমার-এ মহান্ কার্য্য তোমার দ্বারা হবেই। পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। মানব আমার হবে"।

আমার মা অপার করুণাময়ী মা মা মা।

৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাতৃ রূপং ভব। জায়া রূপং ভব। কন্যা রূপং ভব। ভগ্নি রূপং ভব। দেহি মে ভব ত্বাং দেহি। মা বললেন "সকল নারীর মধ্যে আমি এক। কিন্তু রূপ ও সম্বন্ধে স্নেহ ও প্রেম বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। সে সবই আমারই ভাব। আমিই মাতারূপে, পত্নীরূপে, কন্যারূপে ও ভগ্নীরূপে—সর্ব্বরূপে আমিই অখণ্ড সারাৎসার ব্রহ্মময়ী —। পুরুষের মধ্যে যেমন নারীত্বের কিছু অংশ আছে, নারীর মধ্যে যেমন পুরুষের কিছু অংশ আছে তেমন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ীর সম্বন্ধ একাত্ম ও অভেদ। আমি যেমন ব্রহ্মজ হ'য়ে ব্রহ্মময়ী তেমনি ব্রহ্মও আমাময় হ'য়ে ব্রহ্মময়ী। রূপ বা ভাবের-পার্থক্য নাই, আছে ক্রিয়ার ভেদ। তিনি ঈক্ষণ করেন, আমি ইচ্ছা পালন করি। যেমন তোমাদের ভিতরে মন ও বুদ্ধি। মন চায় ও বুদ্ধি কার্য্য করে। এদের কি তুমি পৃথক ভাব? যদিও এরা পৃথক ভাবান্তর হয় আত্মিক

ভাবে জীব-দেহে তবুও এদের পৃথক ভেদ নাই। কিন্তু এই মন ও বুদ্ধির ক্রিয়াকে যদি অতিশয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক'রে ভাব তবে তার এক নিরবয়ব অভেদ সত্ত্বা। আমার ও পর ব্রহ্মের সত্ত্বাও তেমনি অভেদ। মাতৃ ভাবে ডাকলে তাঁকেই ডাকা হয়, পিতৃভাবে ডাকলে তাঁকেই ডাকা হয়। তবে তিনি নিষ্ক্রিয় ঈক্ষণশীল বলেই ব্রহ্মরূপে আমাকেই দর্শন দিতে হয়। কারণ আমি ক্রিয়াশীল। আমিই রূপান্তরিত ব্রহ্ম সত্ত্বা হ'য়ে দর্শন দিয়ে থাকি। আমাকে ভজনা করলে আমি ব্রহ্মময়ী রূপে দর্শন দিই। আমি ক্রিয়াশীল বলে আমার দর্শন সহজ লভ্য। পরব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ঈক্ষণশীল বলে তাঁর দর্শন দুর্লভ। আমাকে আত্ম নিবেদন করলে আমি কোলে তুলে নিয়ে জীবত্ব রক্ষা করে ব্রহ্মসত্ত্বায় অবগাহন করাই জীবকে। আর তাঁহাতে আত্ম নিবেদন করলে জীবের জীবত্ব বিলুপ্ত হ'য়ে ব্রহ্ম সত্ত্বায় নিমগ্ন হয়। ইহা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানের বিষয়। এ বিষয় গভীর ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাতীরেকে মানব আমাতে ও ব্রহ্মতে ভিন্ন সত্ত্বা অনুভব করবে।

তোমার আজকার দেহের কথা ভাব। তুমি এক সময় ভ্রূণ হ'য়ে মাতৃগর্ভে ছিলে। ভ্রূণের পূর্ব্বে শুক্রকীট ছিলে। তার পূর্ব্বে কোনও সর্ষপের কণার ভিতরে ছিলে তার আগে মেঘের জলের ভিতরে ছিলে। তার আগে সমুদ্রে ছিলে, তার আগে সূক্ষ্মআত্মা হ'য়ে ছিলে ও তার আগে আমার ভিতরে ছিলে। সুতরাং তুমি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হ'য়ে আত্মারূপে আমার ভিতরে ছিলে। তোমার সত্ত্বা আমাতে অনুলিপ্ত ছিল ও অংশ হ'য়ে জীবত্বে সৃষ্ট হ'লে। সুতরাং তোমার রূপান্তরে জীবসত্ত্বা আমা থেকে ভিন্ন প্রতীয়মান হ'লেও তুমি মূলতঃ আমি। তুমি আর আমি, আমি আর তুমি মূলতঃ অভেদ ও একাত্ম। তুমি যদি আজ তোমার সেই সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হও তবে আমার সূক্ষ্মত্ব তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। যেহেতু তোমার স্থূলত্ব রক্ষা করছ সেই হেতু তুমি সূক্ষ্মত্ব উপলব্ধি করতে পারছ না। ধ্যান ও মননের সাহায্যে সূক্ষ্মত্বকে উপলব্ধি করা যায় ও আমাকে জানা যায়। তোমার আত্ম-সূক্ষ্মত্ব যদি উপলব্ধি কর তবেই আমার সূক্ষ্মত্ব তোমার কাছে সহজ সাধ্য হ'য়ে ধরা পড়বে। যদি তুমি স্থূলত্ব রক্ষা

করে চল তবে আমাকে জানতে পারবে না। লোকে সুমিষ্ট ফল খায়। সে দেখে যে গাছে ফল পেকে রয়েছে তার রূপ স্থূল। সে ফল পেড়ে আস্বাদন করল ও গভীর আনন্দ পেল। ফলের মিষ্টত্ব ও আস্বাদনের আনন্দ এক। মিষ্টত্ব ছিল বলেই আস্বাদনে মিষ্টত্ব অনুভূত হ'ল। কিন্তু এত কথা ক'জনে ভাবে যে গাছে ফল হ'ল তার মিষ্টত্ব কোথা থেকে এল? গাছ মিষ্ট নয়, মাটি মিষ্ট নয়, আকাশ মিষ্ট নয়, জল মিষ্ট নয়, বায়ু মিষ্ট নয় কিন্তু ফল কি করে মিষ্ট হ'ল? কিন্তু গাছ যে সকলের ভিতর থেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মিষ্টত্বের কণিকা সংগ্রহ করে ফলে সঞ্চারিত করল সে কথা কেউ জানে না। তেমনি মানব বা জীবগণ আমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শক্তি লাভ করে গভীর জ্ঞানফল বিতরণ করছে। মহাজ্ঞানী মানবকে দেখে সাধারণ মানব তার চরণে নমিত হয় তার ক্ষমতা দেখে। কিন্তু কেউ কি ভাবে এ জ্ঞান সে কোথায় পেল? সে যে বৃক্ষের মত আমার সত্ত্বা থেকে জ্ঞান আহরণ করল শুধু সেই জানে সাধারণ মানব তা' বোঝে না। আমার সত্ত্বা নিহিত আছে সূক্ষ্মের ভিতরে ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম। আত্ম-মননে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে, প্রেমে, নির্ভরে এই আমাময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্তমান। ভক্ত বা জ্ঞানী এই সকলের ভিতর দিয়ে আমাকে আহরণ করে জ্ঞানফল, ভক্তিফল, প্রেমফল ইত্যাদি বিতরণ করেন। সাধন কর প্রাণপনে। আমার জ্ঞানের ভাণ্ড তোমার কাছে খুলে দেব, যে জ্ঞান আজও সকলের অগোচর। তোমার মহান্ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হ'য়ো না। আমার নাম সাধন কর। তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত"।

আমার মা সহায়।

৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "সাধন দুই প্রকার। এক হ'ল আত্মার সাধন আর এক হ'ল দেহের সাধন। দেহের সাধনে সিদ্ধ হ'লে মানবের অনেক প্রকার স্থূল শক্তি লাভ হয়। যেমন দেহের নানা রূপ ক্রিয়া, সম্মোহন শক্তি, নানারূপ চমৎকপ্রদ ইন্দ্রজাল ইত্যাদি। আর আত্মার সাধনে সিদ্ধ হ'লে আত্মিক লোক

আমার দর্শন, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, পর-জ্ঞান, নানা ঐশ্বর্য্য ও ব্রহ্মশক্তি লাভ হয়। কিন্তু এ সাধনও সম্পূর্ণ নয়। দেহ ও আত্মার সিদ্ধিই হ'ল সর্ব্বসিদ্ধি বা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি। এই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ যোগী খুব কম। কোটি কোটির ভিতরে দু'একটি ছিলেন। আত্মার সিদ্ধি হলেও দেহের প্রভাব অতি প্রবল থাকতে পারে যথা রিপুর প্রাবল্য। যখন আত্মিক লোকে মননে যুক্ত তখন দেহের প্রভাব উপলব্ধি হয় না। কিন্তু মনন শেষ হ'লে জড়তা বা দেহজাত রিপুসকল আবার দেহকে অধিকার করে ও সাধকের ভিতরে সাধন ও রিপুর সংগ্রাম চলে তীব্ররূপে। অনেক সময় ভাল ভাল সাধক আত্মা আত্মিক সাধনে বিশেষ অগ্রসর হ'য়েও দেহবিকারে পরাস্ত হ'য়ে যোগভ্রষ্ট হ'য়ে যান। আবার যারা দেহ-সাধনে অগ্রসর হন তারা জড়বাদী হ'য়ে পড়েন। তাদের ভিতরে আত্মিক সাধন প্রবেশ করে না বা তারা আত্মিক সাধন বুঝতে পারে না। কারণ দেহরূপ স্থূল বিকারে যে শক্তি বা যে স্থূল শক্তি তিনি লাভ করেন সে শক্তি তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে ও তার দেহজাত অহং অতি সক্রিয় হ'য়ে আত্মিক সাধনের পথ রুদ্ধ করে দেয়। তাই আত্মিক সাধন আগে প্রয়োজন। আত্মিক সাধনে অগ্রসর হ'লে আত্ম-দর্শন লাভ হয় ও আত্ম-বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা আসে ও তখন দেহ-সাধনে সাধক অগ্রসর হন। যদি দেহ সাধনে তিনি সিদ্ধ হন তবে তার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হোল ও তার জন্মান্তর ক্ষয় হয় এবং আমার সান্নিধ্য লাভ হয়। তুমি আত্মিক সাধনে অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছ। এখন তোমার দেহ সাধন প্রয়োজন। একজন মহাপুরুষকে আমি আদেশ করেছি তোমাকে এসে দেহ সাধনের অনেক পদ্ধতি ও প্রকার শিখিয়ে যেতে। তিনি হিমালয়ের গভীর দেশে সাধন করেন। লোকালয়ে তিনি আসেন নাই বা আসেনও না। তিনি মাঘী পূর্ণিমার দিন এখানে এসে তোমাকে খুঁজে বার করে তোমাকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিয়ে যাবেন।" আমি বললাম আমি কিন্তু তোমাকে ছাড়া আর কাউকে গুরু বলে স্বীকার করব না। মা বললেন "না, না, তোমাকে তা' করতে হবে না। আমিই তোমার গুরু। শুধু তুমি তাঁকে

অগ্রজ মনে করে উপযুক্ত সম্মান করে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে"। আমি বললাম, আমার বাড়ীতে তিনি এলে আমি তাঁকে কি খাওয়াব? মা বললেন "তোমার যা ঘরে থাকবে তাই দেবে তাতেই তিনি অতিশয় প্রীত হবেন। তাঁর বেশ দেখে তাঁকে তোমার উচ্চস্তরের সাধক বলে মনে হবে না দশজন সংসারীর মতই তিনি তোমার কাছে আসছেন। কারণ লোকালয়ে আসতে হ'লে তাঁকে এইভাবেই আসতে হবে। কিন্তু তিনি সাধনে এখনও তোমার অনুজ। তিনি দেহ সাধনে তোমার অগ্রজ। কিন্তু আত্মিক সাধনে তোমার অনুজ। তিনি তোমার কাছে আত্মিক সাধনের অনেক জ্ঞান জানবেন ও তোমার বিশেষ অনুরক্ত হবেন। আবার দেহ সাধনে তুমি তাঁর কাছ থেকে গভীর জ্ঞান লাভ করবে ও তোমার দেহ সাধন তাঁর সাহায্যে সিদ্ধ হবে। অকপটে তাঁর কাছে তোমার সব মনের কথা খুলে বলবে তোমার উপকার হবে।" আমি বললাম মাঘী পূর্ণিমা কবে মা? মা বললেন "২রা মাঘ মাঘী পূর্ণিমা। সেই দিন রাত্রে তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।" পঞ্জিকা খুলে দেখি ঠিক ২রা মাঘ মাঘী পূর্ণিমা। মা আমার অপার করুণাময়ী।

মা, মা, মা, আমার! মাগো!

৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৬ খৃঃ, কলিকাতা।

আমি যে মা ভিখারীর অধম। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াই। ভিক্ষা চাই প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, বিবেক। কেউত দেয়না মা। দিতে চায় হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা। ভাল জিনিষ কেউ আমাকে দেয়না কেন মা? এরা কি নিঃস্ব হ'য়ে গেছে? এত বড় বড় ইমারত, মোটর গাড়ী, সাজ, পোষাক, টাকার ছড়াছড়ি। কত এদের গর্ব্ব। কথা কইতেই চায়না। আমাকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না। কিন্তু এরা এত বড়লোক হ'য়েও এমন কাঙ্গাল কেন হ'ল মা? আমাকে এক মুঠি জ্ঞান, ভক্তি, ভালবাসা দিতে এদের এত কাঙ্গালপনা কেন মা? আমি জানি এরা রাজ-রাজেশ্বরীর সব ছেলে মেয়ে

এরা রাজঐশ্বর্য্যের অধিকারী। এরা বিরাট সম্পত্তির মালিকের সন্তান। কিন্তু এরা সেটা জানে না। একেবারে ভুলে গেছে। এরা ধূলি-মুঠি পেয়েই গর্ব্বে কারুর দিকে মুখ তুলে চায় না। আর যদি এরা জানত যে এদের জন্যে কত কত মহা মহা মণি, রত্ন, সোনা, দানা, তোমার কাছে আছে তবে যে এরা মহাগর্ব্বে সাত হাত বুক ফুলিয়ে সংসারে চলত। তুই এদের এমন করে মোহে কেন ভুলিয়ে রাখলি মা? এতে তোর কি উপকার হোল? হবার মধ্যে তোকে এরা চিনল না, জানল না, খবর পেল না যে এরা রাজ-রাজেশ্বরীর ছেলে মেয়ে। এদের মাটির খেলনা দিয়েছিস্। আর এরা সংসার সংসার খেলছে। তুই আড়ালে থেকে এদের খেলা দেখছিস্। এরা একেবারে মশগুল্ মত্ত খেলায়। তোর কথা এদের মনেও একবার আসেনা। কি দেহই দিয়েছিস্। একবার, দুবার, তিনবার, যতবার ধারণ করে ততবার একেবারে এই নিয়েই মত্ত যেন এটা চিরকাল থাকবে। মাগো দে মা এদের সজাগ করে। খেলতে খেলতে যেন একবার একবার তোর কাছে আসে। তোর কাছে আবদার করে তোর স্নেহ পায় মা। মাগো এদের স্পর্শ কর মা। মাগো দে এদের দেখা। সংসারকে তোর উদ্যান কর মা।

১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ আমার মনে গভীর দুঃখ এসেছে। মা বলেছিলেন "২রা মাঘ এক মহাপুরুষ আসছেন তোমার সাধনের সাহায্য করতে—দেহ সাধন শেখাতে।" কিন্তু তিনি এলেন না। কেন এলেন না, মাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বললেন নাই। আমার মনে হচ্ছে এমন কিছু একটা অন্যায় করেছি যার জন্যে তাঁকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন। অথবা আমার শরীর অসুস্থ্য বলে হয়ত দেহ-সাধন এখন সময়োপযোগী নয় বলে তাঁর আসা বারণ করে দিয়েছেন। আমার এর ভিতরে ২রা মাঘের ২।৩ দিন আগে খুব পেটের অসুখ করে ও খুব দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি। অনেকদিন এমন পেটের অসুখ আমার করে নাই। আমার যেন মনে হ'চ্ছে একদিন না একদিন তিনি আমার কাছে আসবেন

নিশ্চয়। মা আমার ঠিক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মা আমার অপার করুণাময়ী।

২০শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

প্রায় ১০।১৫ দিনের উপরে একটা ভীষণ শুষ্কতা এসেছে মনে। মাতৃ-দর্শন হয়না, ভক্তিভাব নাই, একাগ্রতা নাই। কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। জপ করি কিন্তু সে জপে গভীরতা নাই। প্রাণ নাই। বিষয় চিন্তা এসে পড়ে। শরীর অসুস্থ হ'য়েছিল বলেই হোক্ আর অন্য কোনও কারণেতেই হো'ক্ মনে হয় যেন মা কতদূরে রয়েছেন। বহুদিন আগে যেন তাঁর দর্শন হ'য়েছিল। যেন বহুদিন তাঁকে ছেড়ে এসেছি। অদর্শনে তাঁকে যেন ভুলে গেছি। মনটা যেন কেন স্থবির হ'য়ে গেছে আজ ক'দিন হ'ল। কাম চিন্তা এসে মনকে অত্যন্ত বিরক্ত করে। মন্দিরেও যোগে সেই গভীরতা আসে না। আমার মনে হয় এমন একটা কিছু অন্যায় করেছি যার জন্যে মা আমার উপর রাগ করেছেন। মা যখন রাগ করেন তখন মনকে এমনি করে খালি করে দেন। এতে মনের খুব কষ্ট হয়। যাঁকে সারাক্ষণ দেখি, যাঁর সঙ্গে সারাক্ষণ সুখ দুঃখের কথা বলি, যিনি আমার পরমধন তাঁকে যদি তেমনি করে মাঝে মাঝে না পাওয়া যায় তার মত কষ্ট বোধ হয় আর কিছুই নাই। তাই মনের কষ্ট দিয়ে মা আমার অন্যায় কার্য্যের ফলকে খণ্ডন করছেন। খণ্ডন হয়ে গেলে আবার দর্শন দেবেন। একবার দু'বার তিন বার, যখন দর্শন দিয়েছেন তখন আর কি দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন? আমার জীবনে যদি মার কিছু অভিপ্রায় থাকে তবে আমাকে দিয়ে সে কাজ করিয়ে নেবেন। আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, ধন নাই, বিত্ত নাই, লোকবল নাই, ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, নির্ভর নাই, নাই বলতে কিছুই আমার নাই। আছে শুধু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঘৃণা, হিংসা—এই সব নিয়ে সারাদিন বেসাতি করে বেড়াই। তাই ত' আমার কিছু হোল না। মার অবাধ্য। যা বলেন তা করি না। আমার অন্যায় যে কত সে মা ছাড়া আর কে জানবে?

তবুও যদি মার কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মার কোলে মুখ গুজে কাঁদতে পারতাম মা, মা বলে, অন্যায় স্বীকার করতে পারতাম, তা' হ'লেও মা আমাকে ক্ষমা করতেন। তাও ত করি না। আমি ভেবেছি, আমি মস্ত বড় সাধু হ'য়েছি। আমি একজন মহাপুরুষ হ'য়েছি। কিন্তু আমি যে কিছুই হই নাই সেটা মা ভাল করে জানেন। আমার চেয়ে শত শত লোকের ভক্তি বিশ্বাস, নির্ভর অনেক বেশী, আমার থেকে জ্ঞানী, বিদ্বান, হাজার হাজার লোক আছেন। আমি যে কয়বার জপ করি, যে করবার মাকে ডাকি তার চেয়ে কত বেশী করে এমন লোক হাজার হাজার আছে। তবে আমি এত বড় হ'লাম কি করে? ওতেই ত ডুবলাম। এবার সব ভুলে উলঙ্গ শিশু হ'য়ে মা গত প্রাণ, মা গত জীবন করতে হবে। আমার পাপ-পুণ্য, অন্যায়, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, যা আছে সব তুমি গ্রহণ কর, মা। আমার কিছু নাই। আমি শুধু আমি তোমার শিশু ছেলে। তুমি ছাড়া আমি নাই। আমার সকল তুমি গ্রহণ কর। আমাকে তুমি কোলে নাও। তুমি আর আমি। আর কিছু থাকবে না। থাকবে শুধু মা আর ছেলে। মা আমার, তুমি আমাকে ভুলো না। তুমি ছাড়া যে আমার সংসার চলে না। তুমি এসো। আমার জীবন তোমার হাতে তুলে দিলাম। যেমন করতে চাও তাই কর। আমার নিজস্ব কিছু আর নাই। তোমার ইচ্ছা, তোমার নির্দ্দেশই আমার একমাত্র অবলম্বন। মা গো আর দূরে রেখো না।

২০শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো বড় দেরীতে আমার দর্শন-জন্ম হ'ল। শরীর অপটু হ'য়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে শক্তিহীন হ'য়ে পড়ছে। কবে তোমার কাজে জগতের সকলের মনে তোমার প্রেমের বাণী দিতে পারব? বর্ক্তৃতা দিতে গেলে পা কাঁপে, গান করতে গেলে গলা কাঁপে। মা নামে মগ্ন হ'তে পারি না, তোমার ভাবে বিভোর হ'তে পারি না। কি ক'রে কি হবে? এত বয়সে আমাকে দিয়ে কি তোমার কোনও কাজ হবে? যত যত মহাপুরুষ পৃথিবীতে এসেছেন তাঁরা

বাল্যকালেই মহাশক্তির আধার ছিলেন ও তোমার নামে সকলের প্রাণে নবীন প্রেমের ভাব জাগিয়ে গেছেন। আর আমার যে দিন গেল অর্থের মোহে, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্যে, নিজের স্বার্থ আর বিষয় সুখ খুঁজতে। এখন জীবন যে সাহাহ্নের দিকে হেলে পড়েছে। মা গো যা করাবি করিয়ে নে মা। আমার যে আর দেরী সয় না মা। কি শক্তি দিবি দে, কি কাজ করাবি করিয়ে নে। এখন সারাক্ষণ যদি তুই কাছে না থাকিস্ তবে যে আমি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি। আর কাছ ছাড়া হোস্‌নে মা। সদা চোখে চোখে রাখ মা। মাগো! দয়াময়ী মা আমার—।

২২শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার জীবন চলেছে সংসারের স্রোতে। ভাঁটায় গা ভাসিয়ে চলেছি। সকলে যে ভাবে চলে আমিও তেমনি ভাবে চলেছি। সংসারের অর্থ, বিত্ত, যশ, মান জ্ঞান, বিদ্যা, লোভ, অহঙ্কার, মিথ্যা-ভাষণ, ক্রোধ, কাম নিয়ে নিত্য আমার দিন বয়ে যাচ্ছে। এ সবের ভিতরে ডুবে চোখ বুজে স্রোতে ভেসে চলেছি। সাঁতার দিয়ে উজান ব'য়ে যে তীরে উঠব সে শক্তি নাই, ইচ্ছাও নাই। দশজনে যেমন ভেসে বেড়ায় আমিও তাদের মতন ভাসছি। না আছে শৌর্য্য, না আছে বীর্য্য, না আছে প্রতিজ্ঞার সাহস। ক্লীব হ'য়ে গিয়েছি। এই কি জীবন? এমন জীবন ত অভিলাষ করি নাই মা। আমি চাই একজনের মত একজন হ'তে আমি চাই স্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কেটে ব্রহ্মভূমায় উঠতে। মার গ্রাম ওই দেখা যাচ্ছে। কত সুন্দর সেই গ্রাম। আনন্দে ভরা। কত রকম ফুল ফুটে আছে। গাছে গাছে কত সুমিষ্ট পাকা ফল। গাছ-পালা, গরু, বাছুর, ছাগল, ভেড়া, মাঠে মাঠে ধান, কত সুন্দর পাখী, গানে গানে সকল প্রান্তর মুখরিত যেন আনন্দের হাট বসেছে। স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে সেই মার গ্রামের পাশটি দিয়ে সংসার স্রোত আমাকে কোন্ অজানা জায়গায় নিয়ে যাবে একি প্রাণে সয়? আমি উজানে সাঁতার দিয়ে যেমন ক'রেই হোক্ মার গ্রামে গিয়ে উঠব। দৌড়ে গিয়ে মার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। মাকে কত কথা বলব। মা আমাকে কোলে নিয়ে

কত কথা বলবেন, কত আদর করবেন, কত সুমিষ্ট খাদ্য খেতে দেবেন। আমি মার গ্রাম ছেড়ে স্রোতে ভেসে আর কোথায়ও যাব না। সকলকে ডেকে বলি "ওরে আয় উজান ঠেলে আমার সঙ্গে মার গ্রামে যাবি আয়। এল কই! বলে "বেশ আছি, কে যায় অত কষ্ট ক'রে উজান ঠেলতে"? ওরে মা যে তোদের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন। সবাই ভেসেছে যদি ওরা আসে তার জন্যে মা কত খাবার তৈরী করে বসে আছেন। না গেলে যে মা মনে আঘাত পাবেন। মার দুঃখ কি ওরা বুঝল? মাকে শুধু দুঃখ দিল। কেউ এল না উজান ঠেলে মার গ্রামে। আমি যাব মা। তোমার পায়ে গিয়ে মাথা রাখব। তোমার সঙ্গে থাকব। তুমি যে আমায় বড় ভালবাস। আমার মা অপার করুণাময়ী। মাগো তোমার গ্রামে আমাকে ধরে রাখ মা।

২২শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার সবখানি মায়ের। আমি যে মায়ের ছেলে। মার ঘরে থাকি, মার কোলে ঘুমোই, মার হাতে খাই, মার গাড়ী চড়ি, আর মার অফিসে চাকুরী করি। আমার মা সারাৎসারা। আমার সব কিছুর মালিক, মা। আমি মার হয়ে মার কাজ করি। মা যা আদেশ করেন তাই করি। আমার ত এখনও মালিকানা জন্মায় নাই। আমি এখনও মার সংসারে মার কাজ করছি। মা এখনও ভরসা করে আমার হাতে মালিকানা ছেড়ে দিতে পারছেন না পাছে সব কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিই। মা জানেন এখনও সাবালক হই নাই। আমার বুদ্ধি কাঁচা, আমার জ্ঞান পরিপক্ব নয়, আমার বিদ্যাত নাই-ই। আমি নিজের বুদ্ধিতে কিছু করতে গেলে গোলমাল করে ফেলব। মা আমাকে তাই সব কাজ হাতে ধরে করাচ্ছেন ও শেখাচ্ছেন। আমার মা ভিন্ন গতি নাই। মা আমার সর্ব্বেসর্ব্বা। মা আমার সংসারে সর্ব্বময় কর্ত্রী। আমি মার ছেলে। আমি মার ধন। মা-ই আমার সব। আমি একমাত্র মায়েরই।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার ভাগ্য আমাকে বিড়ম্বিত করছে, মা। কতবার তোর কাছে ক্ষমা

চাইলাম। তুই আমাকে ক্ষমা করলি। কিন্তু যেই ক্ষমা করলি আবার সেই অন্যায় কাজ করলাম। তবুও ক্ষমা করলি। এইবারটা ক্ষমা কর মা। আর তোর অবাধ্য হব না মা। তোর কথা শুনে চলব। তোর নির্দ্দেশমত কাজ করব মা। আমাকে সবসময় দর্শন দে। আমার চোখে চোখে তুই ভেসে বেড়া মা। যদি সব সময় তোকে দেখতে পাই তবে আর কিছু লুকিয়ে করবার সাহস হবে না। তেমন বিশ্বাসই ত জীবনে এল না। ভক্তির সেই রস কোথায়? চোখের জলেই কি ভক্তি হয়? যতক্ষণ চোখের জল পড়ে ততক্ষণ ভক্তি থাকে। যেই জল শুকিয়ে যায় অমনি ভক্তি উড়ে যায়। এবার আত্মার চোখে সারাক্ষণ জল দে মা। সেখানে ভক্তি গঙ্গা খুলে দে। সে জল শুকিয়ে যাবে না। সারাক্ষণ বইবে। আর সেই জলে তোর তর্পন করব মা। সেই স্বচ্ছ জলে তোর রূপ দেখব দিবানিশি। বাইরের চোখের জল থামিয়ে দিয়ে আত্মার চোখের জল দিবানিশি খুলে দে মা। মাগো তোর ভক্তি-গঙ্গা তো উজান বয় না মা। সে যে খালি খালি বয়ে যায় তোর দিকে। আমাকে সেই জলে ডুবিয়ে দে মা। পাথর যদি জলে ভাসে আমার মত পাষাণ কি তোর ভক্তিতে ভাসবে না? আমাকে ছাড়িস্ না মা। আমাকে তোর কোলে চোখে চোখে রাখ মা। আমি যে অবোধ শিশু। তোর জ্ঞানের কাছে আমি যে নিতান্ত অজ্ঞান। আমাকে কাঁদাস্ নে মা। আমাকে কাঁদিয়ে তোর কি লাভ হবে? আমার যে তুই ভিন্ন গতি নাই। আমি যে নিজে কিছুই করতে পারিনে মা। খাইয়ে না দিলে খেতে পারি না, পড়িয়ে না দিলে পড়তে পারি না। হাত ধরে না নিলে চলতে পারি না। তুই আমার সব। আমি নিতান্ত শিশু মা। আমার মা গো।

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো একি করলাম আজ? স্ত্রীর মনে কষ্ট দিলাম। বড় সরল নারী ওই কল্যাণী। মুখে কঠিন অন্তরে কোমলা। নাম যে কল্যাণী—কল্যাণ ছাড়াত' কিছু করে না। তোর অংশ মা। ও যে আজ আমার কথায় আঘাত পেল।

আমি কি সত্যিকারের আঘাত দেবার জন্য বলেছি মা? তুই ত' জানিস্ মা, আমার মনে তাকে আঘাত দেবার কোনও ইচ্ছা ছিল না। কি বলতে কি বললাম। মনের কথা ব্যক্ত করেও সে বুঝল না। এ আমার অন্যায় মা—এ আমার পাপ। এইত' পাপ। অন্যের মনে আঘাত করা তার মত পাপ আর নাই মা। আমাকে ক্ষমা কর মা। তুই যে আমাকে বললি বাক্ সংযম করতে কই তা ত' পারছি না। তুই বললি এক বৎসর বাক্ সংযম করে জপ করলে মহাশক্তি লাভ হবে। সে প্রতিজ্ঞা নিতে পারছি না মা। মনে সাহস নাই। আফিসে কাজের কথা বলতে হয়। কি করে হবে নানা চিন্তা করছি। তোর আজ্ঞা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ করব, না, নানা বিচার করে দেখি করব কি না। এই ত' আমার দোষ। এই জন্যেই ত কিছু হ'ল না। কত শক্তি দিতে চাইলি মা। যদি তোর কথা শুনতাম তবে আজ মহাশক্তিধর হ'তাম। আমার জীবনের মত এমন জীবন ক'জনের হয়? দর্শন দিলি তাও একবার নয়—বার বার। কত উপদেশ দিলি। কত শিক্ষা দিলি। কত আজ্ঞা করলি। কত জ্ঞানের কথা বললি। কত পাপ অন্যায়কে দূরে রাখতে আদেশ দিলি। একটা কথাও তোর রাখলাম না। তাই ত' আজ প্রাণ নিরস, তোর আর দর্শন হয় না। বিষয়ে, সংসার মোহে একেবারে মগ্ন হ'য়ে পড়েছি আবার। পৃথিবীতে এমন সাধু ভক্ত জন্ম গ্রহণ করেন নাই যাঁকে তুই আমার কাছে পাঠাস্ নাই আমার সাধনে সাহায্য করতে। কত স্বর্গের ছবি দেখালি। কত সাধকের সহবাস করালি। কত কত ভক্ত আত্মা এসে দর্শন দিয়ে স্পর্শ দিয়ে গেলেন। আমার পূর্ব্ব জন্ম দেখালি। আমি স্বর্গে কোথায় ছিলাম তা' দেখালি। আমি কি কর্ত্তব্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি তাও দেখালি, তবুও আমার হুঁস হ'ল না। মোহ আমাকে ঘিরে ধরেছে। কত দিবি বললি। তবুও আমি অন্যায়ের পথ ছাড়তে পারলাম না। এবার কি নিরাশ হ'য়েছিস্ ভেবে যে একে দিয়ে কিছু হবে না। হাল ছেড়ে দিয়েছিস্ মা? আমি তোর নিতান্ত অযোগ্য পুত্র। আমি জপ করলে কি হবে? জপের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর তো তোর রূপ ধ্যান করে না মা।

একি করলি ? সব দেখিয়ে আবার অন্ধকারে ফেললি মা ? দিয়ে আবার কেড়ে নিলি ? তুই যখন মহাশক্তি, তবে তোর কাছে আমি মহাশক্তি চাই, বল চাই প্রতিজ্ঞা চাই। দে মা এমন মনোবল যাতে মহাশক্তি নিয়ে তোর আজ্ঞা পালন করে তোর কর্ত্তব্য করতে পারি মা। এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়িস্ নে মা। তোর প্রেমে আমাকে পাগল করে দে মা। এমন ভক্তি দে যে সব ভেসে যাক্। সংসারের কর্ত্তব্য যেন ভুলে না যাই। তোর নির্দ্দেশে এই সংসারে এসেছি। স্ত্রী, পুত্র কন্যা পেয়েছি। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন পেয়েছি। তারাও তোর অংশ। তাদের ভালবাসাও তোর ভালবাসা মা। তাদের উপেক্ষা করব কি সাহসে ? তা হ'লে যে তোকে উপেক্ষা করা হবে মা। তাদের সেবার ভিতর দিয়ে তোর সেবা করিয়ে নে মা। মাগো আমায় ছাড়িস্ নে মা। সন্তান কত যে অন্যায় করে মা কি সন্তান কে ছাড়ে ?

তুই যে আমার গর্ভধারিণী—।

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ আবার কয়েকদিন পরে সকালে মার সঙ্গে কথা হোল। আজ সকালে মাকে বললাম আমার উপরে কেন রাগ করছিস্ ? দেখাও দিস্ না, ভক্তদেরও দেখিনা, আর আমার সঙ্গে কথাও বলিস্ না। "আমি কি অন্যায় করেছি যার জন্যে এ সব করছিস্ ? মা বললেন "আমি রাগ করি না, আমি কোনও রিপুর অধীন নই। আমি সকল রিপুর অতীত। কোনও রিপুই আমার ভিতর নাই। আমার শুধু স্নেহ-ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই স্নেহ-ইচ্ছাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে, জীবজগত সৃষ্টি করেছে। জীবের প্রতি আমার স্নেহ ছাড়া আর কিছুই নাই। তোমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে বিকার আসে। এ হোল দেহ-বিকার, স্থূল দেহের মোহ। এ বিকার আমি তোমাদের দিই স্নেহেতেই। নিরবিচ্ছিন্ন সুখ যেমন এক ঘেয়ে হ'য়ে যায় তেমনি আমার সঙ্গও দেহ-জাত জীবের কাছে একঘেয়ে হ'য়ে যায় সেই জন্য দেহ-বিকার দিই। এই বিকার যখন আসে তখন ক'দিন আমি লুকিয়ে পড়ি। আমি পরীক্ষা করি

সাধকের আমার প্রতি কতটা টান হ'য়েছে। যদি দেখি সত্যিকারের টান্ আমার প্রতি আছে তবে আবার দর্শন দিই। তখন সাধক আরও উচ্চস্তরে আসে। এমনি সাধককে আস্তে আস্তে দেহবিকার সাধন, ও সাধন এবং দেহ-বিকারের ভিতর দিয়ে সাধনের উচ্চস্তরে নিয়ে যাই।" তবে যে শুনি তুমি রুদ্র-মূর্ত্তি দেখাও। "হ্যাঁ দেখাই ; সেও আমার স্নেহের আর একদিক। মাতা যেমন মুখে কাপড় ঢেকে ছোট শিশুকে ভয় দেখান খেলার ছলে, শিশু যদি ভয় পায় অমনি মা মুখের কাপড় খুলে স্নেহে শিশুকে কোলে নিয়ে বলেন কই ভয় কই এইত আমি, আমিই মুখে কাপড় দিয়েছিলাম। তেমনি আমি রুদ্রমূর্ত্তি দেখাই যখন তোমরা স্বভাবের বিরুদ্ধে যাও। সেই মূর্ত্তি দেখে যাতে তোমরা স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ না কর। কিন্তু সেটা আমার ক্রোধের মূর্ত্তি নয়। স্বভাব কি জান ? স্ব মানে স্বীয়। এখানে স্ব অর্থে আমি। যেহেতু আমা ভিন্ন কিছু নাই সেই হেতু আমার ভিতর যা স্থিত সকল স্ব। সেই স্বয়ের যে ভাব তাই স্বভাব। স্বভাব বা প্রকৃতি একই। জীব আমার ভাবেই যুক্ত।" তুমি যদি সব করাও তবে স্বভাবের বিরুদ্ধে যখন যাই সেও ত তুমিই করাও। "হ্যাঁ, তাত ঠিক। আমার মহান স্বাধীন ইচ্ছার এক কণা আমি মানবের ভিতরে দিয়েছি এবং তার সঙ্গে মানব দেহের ও আত্মার কতগুলো ধর্ম্ম বা নিয়ম দিয়েছি যা তোমাদের নিত্য পালনীয়। যেমন স্বভাবের বেগ তোমার নিত্য পালনীয়। যদি তুমি পালন না কর অসুস্থ হ'য়ে পড়বে। এখানে তুমি স্বভাবের বিরুদ্ধে গেলে তাই অসুস্থ হ'য়ে পড়লে। নিদ্রা তোমার স্বভাব। যদি নিদ্রা না যাও অসুস্থ হ'য়ে পড়বে। তোমার স্বাধীন ইচ্ছা আমি দিয়েছি কিন্তু দিয়েও কতগুলো নিয়মের ভিতরে তোমাকে বেঁধেছি। তেমনি আত্মারও কতগুলো নিয়ম আছে। সৎ অসৎ কার্য্য বিচারের ক্ষমতা তার স্বভাব। অন্যায় কাজ যে করছ সেটা করবার সময় তুমি আগে জানছ যে এটা অন্যায়। সাধন না করে, আত্মানুসন্ধান না ক'রে তুমি দেহ-বিকারে যে মোহগ্রস্থ হ'য়ে পড়ছ তাও তুমি জান। কিন্তু জেনেও তুমি তাই কর। শিশু

যেমন অগ্নিতে হাত দিতে যায় না জেনে, বারণ করলে শোনে না। যখন হাত পুড়ে যায় তখন কাঁদতে থাকে ও তার মাতা স্নেহে তাকে বলেন কেন বারণ শুনলে না এখন কেমন কষ্ট পাচ্ছ। তখন মাতার স্নেহ আরও শতধারে শিশুর যন্ত্রণা লাঘবের জন্যে ব্যস্ত হয়। কিন্তু মাতার ইচ্ছা না হ'লে শিশু অগ্নিতে হাত দিতে পারত না। তেমনি আমার বারণ না শুনে অন্যায় কাজে যখন তোমরা যাও তখন আমি শুধু ইচ্ছা করি যে কর ও দেখ কি মজা। কিন্তু সত্যি যখন তোমরা দুঃখ পাও তখন আমি আর থাকতে পারি না। তোমাদের দুঃখ দূর করবার জন্যে আমি পাগল হ'য়ে ছুটে আসি। সংসারের শিশু ও মাতার যা সম্বন্ধ আমার সঙ্গে তোমাদের সেই সম্বন্ধ বা তার চাইতেও অনেক বেশী। কারণ সংসারের মাতা ও শিশুর ভিতরে দেহ-বিকারের মোহ ও সেই দেহ-সৃষ্ট সম্বন্ধ স্নেহ ও প্রেমের পরিপূরক। কিন্তু আমার সঙ্গে তোমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের স্নেহের নিবিড় সম্বন্ধ। এই সংসারের স্থূল দেহের অবসানে সূক্ষ্মদেহের যে কত সুখ ও উন্নতি তা তোমরা জান না বলে দুঃখে মৃত্যুতে তোমরা অধীর হ'য়ে পড় ও শোক কর। কিন্তু যখন তোমরা সূক্ষ্মদেহ ধারণ কর তখন তোমাদের সে শোক থাকে না। তখন তোমরা স্থূলদেহ থেকে সহস্রগুণ বেশী স্বাধীন ও মুক্ত এবং তোমাদের আনন্দ শতগুণ বর্দ্ধিত হয়। স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধ বা তার বিকল্প জ্ঞান তোমাদের নাই বলেই তোমরা জড় দেহের বিলোপে অধীর হও। কিন্তু আমি সব জানি বলেই আমার বিধান তোমাদের আনন্দ দান করবার জন্যেই ব্যস্ত হয়। দেখ, জড়দেহ যখন খণ্ডিত হয় খণ্ডন অর্থে মৃত্যু, মৃত দেহের মোহ আত্মা সঙ্গে সঙ্গে ছাড়তে পারে না। যে দেহকে নিয়ে সে এতকাল সংসারে বাস করল সে দেহের প্রতি সে অত্যন্ত আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। ফলে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে কখনও সেই দেহের মোহ ত্যাগ করতে পারে না। সে ফিরে ফিরে আবার সেই দেহ আশ্রয় করতে চায়। কিন্তু আমার নিয়মে সে দেহ আর তার গ্রহণীয় নয়। তাই সে দেহ খণ্ডনই আত্মার পক্ষে মঙ্গলজনক। অগ্নিতে সে দেহ যখন ভস্মিভূত হ'ল তখন আত্মা আর সেই দেহ পেল না।

সাময়িক তার অন্তরে দুঃখ আসে। কিন্তু আস্তে আস্তে আত্মিক লোকের ভিতরে সে যতই প্রবেশ করে ততই তার দৃষ্টি খুলে যায় ও সে শোক ভুলে মহানন্দে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। অগ্নিতে জড় দেহকে খণ্ডন ক'রে, কিছু জলেতে, কিছু বায়ুতে, কিছু মাটিতে, কিছু তেজে, কিছু শূন্যে পরিব্যাপ্ত করে দেয়। এই জড় দেহের পরিব্যাপ্তি সূক্ষ্ম দেহের ধারক হ'য়ে দাঁড়ায়। আত্মা কিছুদিন সেই দেহের আস্বাদন নিয়ে বিচরণ করে। কারণ তার জড় দেহের এতই মোহ যে সেটা ধ্বংশ হ'য়ে গেলেও তার যে টুকু যে দিকে যায় সেই টুকুর দিকে সে ধাবিত হ'তে চেষ্টা করে। কিন্তু খণ্ডিত ও বহুধা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে সে আর সকলের দিকে যেতে পারে না। সে তখনও মুক্ত নয়। তার পরে ভগবদ্ চরণে অর্থাৎ আমার কাছে যখন তার জগতের প্রিয়-জনরা তার আত্মার মঙ্গল কামনা ক'রে প্রার্থনা করে তখন সেই প্রার্থনা তার কর্ণে প্রবেশ করে ও তার তখন মোহ দূর হয়। সে তখন বুঝতে পারে যে তার সংসারের সঙ্গে আর স্থূল সম্বন্ধ নাই। তখন সে আত্মিক লোকে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। অবশ্য এর স্তর ভেদ আছে। সেই স্তরে সংসারের কার্য্য অনুসারে আত্ম চেতনা জাগে অবার জাগেও না। শ্রাদ্ধ প্রার্থনা না হ'লে আত্মার প্রভূত অকল্যাণ হয় কারণ তার আত্মিক ভাবের চেতনা জাগে না। সে ভাবে সে সংসারেই আছে অথচ স্থূল দেহ না থাকায় তার জড় বাসনা তৃপ্ত হয় না ও সে অতৃপ্ত থাকে। এই সব আত্মা প্রেত-লোক প্রাপ্ত হয়। জানা হোক অজানা হোক মৃত ব্যক্তির জন্যে আমার কাছে প্রার্থনা করা মানবের প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। তাতে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মার চেতনা জাগে ও তার গতি সৎ হয়। জগতের অনেক জাতির ভিতরে মৃত দেহকে মৃত্তিকায় প্রোথিত বা বাহিরে ত্যাগ করার রীতি আছে। এ রীতি অতিশয় ভ্রমাত্মক। এতে আত্মার গতি রুদ্ধ হয় ও আত্মা বহুদিন আবদ্ধ থাকে। যদিও আমার কাছে প্রার্থনা ও শ্রাদ্ধ হয়। যখন হয় তখন আত্মার ক্ষণিক চেতনা ফিরে আসে। কিন্তু আবার ভুলে গিয়ে সেই দেহের কাছে নিয়ত আসা যাওয়া করে। এ সব কথা বললাম কেন তার কারণ হ'চ্ছে তোমরা জড় দেহকেই

অত্যন্ত গুরুত্ব দাও। সূক্ষ্মদেহ বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ ও সেই জন্য তোমরা দুঃখ ও শোক বেশী অনুভব কর। আজ যদি আত্মিক লোক সম্বন্ধে মানব সচেতন হয় ও নিজ আত্মাকে জানে বা আত্মার ধর্ম্ম জানে তবে সংসারের দুঃখ শোক থাকে না। এই ধর্ম্মই এ যুগের ধর্ম্ম হবে। মানবকে আত্মনিষ্ট হ'তে হবে। আত্মার স্বভাব জানতে হবে। আত্মার স্বভাব জানলে আমার বিচিত্র লীলা জানতে পারবে ও আমাকে জানতে পারবে এবং আমার প্রতি নির্ভরশীল হবে।

তুমি সাধন কর। মুক্ত আত্মা হও ও আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হও। এই আমার তোমার প্রতি আদেশ। তোমার কোনও ভাবনা নাই। সাধন কর ও আত্মানুসন্ধান কর। নিজেকে সকল রিপুর স্পর্শ মুক্ত কর—সাধনে সিদ্ধি নিশ্চিত"।

মা আমার অপার করুণাময়ী মাগো মাগো।

২৮শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে স্নানের সময় মা বললেন "শরীরের এমন করে সেবা করছ সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও সেবা কর। স্নানে যেমন দেহের আনন্দ, শান্তি ও ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়, আত্মার স্নানেও তেমনি আত্মার আনন্দ, শান্তি ও আমাকে পাবার ক্ষুধা বর্দ্ধিত হয়। মাথায় ঠাণ্ডা তৈল দিলে মস্তক স্নিগ্ধ হয় ও সকল দেহ স্নিগ্ধ হয় তেমনি আত্মার তৈল হচ্ছে জপ। নাম জপেতে আত্মা স্নিগ্ধ হয়। তারপর শরীর যেমন অন্য তেল, সাবান, ও জল দিয়ে তোয়ালের সাহায্যে প্রক্ষালন করে পরিস্কৃত কর তেমনি সত্য ভাষণ, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় সংযম, তিতিক্ষা, দয়া, প্রেম ইত্যাদি দিয়ে আত্মাকে প্রক্ষালন করবে নিত্য। স্নানের পর যেমন ক্ষুধার উদ্রেক হয় তেমনি আত্মাকে নিত্য স্নাত করলে আমার প্রতি আত্মার ক্ষুধা হবে। আমিই আনন্দ ও সেই আনন্দই একমাত্র আত্মার ভোজ্য"।

মা আমার আনন্দময়ী নিত্যানন্দ।

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো তুমি আমার নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দময়ী করুণাময়ী করুণারূপিনী গর্ভধারিণী জননী। মা যার নিত্যানন্দময়ী সে কি কখনও নিরানন্দে, নিরাশায় থাকতে পারে? আমি যে মা তোমার ছেলে। আমি মায়ের ছেলে মায়ের রূপ পেয়েছি। তোমার ভালবাসার ত' অন্ত নাই মাগো। সংসারে এনে সাধন শেখাচ্ছ। কত শিক্ষা দিচ্ছ। তোমার বিদ্যালয় খুলে একলা সকলকে তুমি তোমার বিদ্যায় পারদর্শী করছ। তোমার বিদ্যার ত' শেষ নাই। কত দিকে কত বিদ্যা দান করছ। তোমার প্রত্যেক ছেলে মেয়ে এক একটা করে বিদ্যা শিখিয়ে গেল। তোমার প্রকৃতির জল, বায়ু, অগ্নি, তরুলতা, পাহাড়, পর্ব্বত, বন, উপবন, নদী, সাগর বিদ্যার জাহাজ মাথায় করে ব'য়ে ব'য়ে আমাদের ঘরে ঘরে এসে শেখাচ্ছে। যদি জিজ্ঞাসা করি কোথায় পেলে এত বিদ্যা? বলে 'আমরাত সেই মায়ের বিদ্যাই মাথায় ব'য়ে বেড়াচ্ছি। তিনি যে তোমাদের কাছে আসতে বললেন"। পর্ব্বত বলে "আমার মত ক্ষমাশীল হও"। সাগর বলে "আমার মত প্রসারিত কর আত্মাকে সকলের জন্যে"। নদী বলে 'আমার মত জীবের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত কর"। বায়ু ব:ল "আমার মত আত্ম-ত্যাগ শেখ"। অগ্নি বলে "আমার মত অসার, অসত্য ধ্বংশ কর"। জল বলে "আমার মত আত্মাকে নির্ম্মল কর"। মহাবিদ্যালয় খুলেছ আমাদের জন্যে। এতেও যদি বিদ্যা না হয় তবে আর কি করে বিদ্যা হবে মা? তোমার বিদ্যালয় যে ব্রহ্ম বিদ্যালয় মা। আমার ত' কিছু বিদ্যা হ'ল না মা। অহংকার নিয়ে ম'জে রইলাম। কিছু শিখলাম না। আমার দিন গেল অসার অবিদ্যায় মা। আমাকে তোর বিদ্যালয়ের ছাত্র করে নে মা। পড়াশুনায় মন না হ'লে মেরে মেরে শেখা মা। না হ'লে যে মূর্খ সন্তানের মা ব'লে তোকে জগত্ জনে নিন্দা করবে মা।

তুই আমার স্বরস্বতী মা। বিদ্যাদায়িনী প্রেম-রূপা জননী মা। মা গো দে মা বিদ্যা দে।

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন "দেখ অন্তরে দুইটি মহারত্ন লুক্কায়িত আছে। তারা হচ্ছে ভক্তি ও বিশ্বাস। এই দুই মহারত্ন মানবের ইহকালের ও পরকালের মহা সম্বল। গচ্ছিত অর্থ যেমন ভেঙ্গে ভেঙ্গে সকল প্রয়োজনীয় সামাগ্রী ক্রয় কর তেমনি ভক্তি ও বিশ্বাস অন্তরে থাকলে জীবনে কোনও কিছুরই অভাব হয় না। ভক্তি ও বিশ্বাসের বীজ একবার হৃদয়ে প্রবেশ করলে জন্ম-জন্মান্তরে সেই বীজ মহা মহীরূহ হ'য়ে ফলধর্ম্মী হয়। ফলধর্ম্মী অর্থে পরম ফল প্রাপ্তি অর্থাৎ আমাকে জীব লাভ করে। সকলের অন্তরেই ভক্তি ও বিশ্বাসের বীজ আছে। সাধনরূপ জল সেচন করে সেই বীজকে বৃক্ষে পরিণত করতে হয়। প্রত্যেকের অন্তরে যাতে ভক্তি ও বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হয় তার জন্যে উচ্চ-স্তরের সাধকের কর্ত্তব্য সাধন-জল সিঞ্চন করে মানব-অন্তরে ভক্তি ও বিশ্বাসের বৃক্ষকে সজীব করে রাখা। এই দুইটি বৃক্ষরত্ন। এর ছায়ায় মানব আপন অন্তরের অন্তরে আত্মারূপ অজড় দেহকে শান্ত, নির্ম্মল ও নিত্য আনন্দিত রাখে। আত্মাকে দর্শন করে ও ভয় শূন্য হয়। ভক্তি ও বিশ্বাস থাকলে জীবনে সব কিছু পাওয়া যায় জানবে। ভক্তি ও বিশ্বাসের ভিতর দিয়েই ব্রহ্মজ্ঞান মানব অন্তরে প্রবেশ করে। প্রথমে আত্মজ্ঞান ও আত্মদর্শন হয় পরে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মদর্শন হয়। ব্রহ্মদর্শন হ'লে ভক্তি মহা-ভক্তিতে ও বিশ্বাস মহা-বিশ্বাস বা জীবন্ত বিশ্বাসে পরিণত হয়। তখন মানব আমার সঙ্গে একযোগে যুক্ত থাকে ও ত্রিকালজ্ঞ হয়। তুমি ভক্তি ও বিশ্বাসকে সর্ব্বসময় জপ সাধনের দ্বারা বর্দ্ধিত কর, তবে তোমার আর কোনও ভয় থাকবে না। সাধনে সিদ্ধি নিশ্চিত।"

মা আমার মহামহিমাময়ী জ্ঞানদায়িনী জননী। মাগো এ তোমার কি লীলা?

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে প্রায় ১০টার সময় আমি, পুতুল ও রাহুল, কথা বলছিলাম। রাহুল বলল যে একটা গান প্রায়ই মাইকে শোনা যায়। সেটা হচ্ছে "এই

দুনিয়া হ্যায় লাট্টু, ভগবান তুম্ হ্যায় লেত্তি"। পুতুল ও রাহুল এ নিয়ে বেশ মজা করছিলো ও হাসছিলো। এর মধ্যে আমি চুপ ক'রে ছিলাম যে দেখি এ বিষয় ওরা নিজেরা কতটা বুঝেছে। দেখলাম খানিক পরে রাহুল বলছে দুনিয়া মানে পৃথিবী। পৃথিবীটা গোল কিনা তাই তাকে লাট্টু বলেছে আর ভগবান সবার ভিতরে আছেন বলে ভগবানকে লেত্তি বলেছে। সাত বছরের বালক যে এমন অর্থ করতে পারবে তা ভাবিনি। পুতুল রাহুলকে অন্য অর্থ বোঝাচ্ছিল। তখন আমি বললাম লাট্টু যেমন লেত্তি ছাড়া চলে না, এই সংসারও তেমন ভগবান ছাড়া চলে না। ভগবান সবে আছেন ও চালাচ্ছেন। রাহুল অতি উচ্চস্তরের আত্মা। আমাদের সংসারে এসেছে। এ ছেলে এক সময় মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত হবে। এর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল ও মহান্।

মা আমার পরম করুণাময়ী।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

স্বপ্ন দর্শনে এই কবিতা লিখিত।

তাপস

কুমার তাপস তরুণ দুইজন
বন্দনা করিল আসি গুরুর চরণ।
সমাপ্ত করিয়া শিক্ষা গুরুর গৃহেতে
যোগ ধ্যান, শাস্ত্রজ্ঞান অধীত বিজ্ঞান,
বেদ গান, মন্ত্রশক্তি, শস্ত্রের শক্তিতে
নিপুন হইল তারা; চাহি দিব্য জ্ঞান
গুরু কৃপা লাভ তরে যুক্ত করি কর—
রহিল দাঁড়ায়ে দ্বারে। উঠি ঋষিবর
সপ্তপর্ণী লয়ে হাতে আশীর্ব্বাদ করি

কহিলেন শিষ্যদ্বয়ে "দিব্যজ্ঞান তরে
নিভৃতে সাধন কর সপ্ত বর্ষ ধরি,
বিশ্বাসে অঙ্কিত কর আপন ঈশ্বরে।"
প্রণমিয়া দুইজন গুরুর চরণে
প্রবেশিল বন মধ্যে ঈশ্বর সাধনে।
ব্রহ্মাণ্ডের চিত্রপট্ অঙ্কিত করিয়া
তার মাঝে বসাইল সুনিপুণ হাতে
দিব্যমূর্ত্তি বিশ্বনাথে শঙ্খ চক্র দিয়া
বসিলেন একজন ধ্যানে নম্র চিতে।
আর একজন সুধালেন আপন অন্তরে
কার দাস তুমি কেবা আগে কহ মোরে;
সাধন করিবে কারে কেবা তব প্রভু
কার তরে সৃষ্ট তুমি কিবা তব কাজ
চিনি নাই, জানি নাই কোন্ সেই বিভু,
কোথায় থাকেন তিনি কিবা তাঁর সাজ ?
অন্তরে জাগিল এক অরুণ আলোকে—
চিদানন্দ রূপ-ঘন ; আনন্দ পুলকে,
বসিলেন ধ্যানে মগ্ন আত্মানন্দ রসে।
সমাধি সাধনে স্তব্ধ দুইটি তাপস
বহু দিন মাস গেল বরষে বরষে
সিদ্ধ হোল দুই জন ; অন্তর সরস।
ধন্য কহিলেন তবে "দেখি বিশ্বনাথে
মহাশক্তি, মহাব্যাপী, মহাশক্তি ধর—
বিরাট্ আকার তাঁর ব্যাপ্ত চরাচর,
সর্ব্বভূত তাঁর মাঝে তিনি সর্ব্বভূতে,

মহাসত্য জানি এবে মহাদিব্য জ্ঞানে
ইহা ভিন্ন সত্য নাই জেনেছি সাধনে"।
বিল্ব কহিলেন অতি মৃদু মন্দ ভাষে,
"দেখেছি আলোক এক অতি সূক্ষ্ম জ্যোতি,
সপ্ত কোটি নিহারীকা কল্প কল্পান্তর
পার হ'য়ে স্পর্শ এই করেছে অন্তর।
মহানন্দ লভিয়াছি জানি নাই সীমা,
কিবা সে যে কোথা থাকে কিবা তাঁর নাম,
জীবের অগম্য জানি তাঁর পরিক্রমা,
অন্তর রাজ্যই তাঁর নিত্যানন্দ ধাম"।
শল্য কহিলেন তারে "ইহা কেন কহ,
সিদ্ধ তবে হও নাই যোগে মগ্ন রহ"।
বিল্ব কহিলেন অতি সুমিষ্ট বচনে
সিদ্ধাসিদ্ধি জানি নাই, হয় নাই জ্ঞানে,
তবুও অন্তর মোর আনন্দ বরণে,
রাজিয়া উঠিছে নিত্য সদানন্দ ধ্যানে।
জগত খেলিছে নিত্য আনন্দ সাগরে,
আনন্দে বিলীন হ'য়ে ল'ভে অমরারে।
রূপ, রস, শব্দ গন্ধ স্পর্শন, দর্শন,
আনন্দ আকর জানি আত্মানন্দ জ্ঞানে।
জীব যত আনন্দের করিছে সাধন,
বিমুক্ত জীবাত্মা চলে আনন্দের পানে"।
শল্য কহিলেন তারে "চল গুরু গৃহে,
জানি সব সিদ্ধি কিবা কোন দিব্য জ্ঞান
সত্য বটে, সাধন করিনু যাহা উভয়ে নিস্পৃহে"।

গুরুর চরণে আসি উভয়ে বসিল
বিরচিল তার কাছে সব যা লভিল।
মুগ্ধ নেত্রে চাহি গুরু উভয়ের পাণে,
বলিলেন, "সত্য যাহা পেয়েছ দু'জনে
আত্মানন্দ রস মাঝে সর্ব্বভূতময়,
সর্ব্বভূত মাঝে আত্মা আনন্দেতে রয়।
সূক্ষ্মের সূক্ষ্মতর সেই মহাশক্তি ধর
মহাশক্তি, মহাসূক্ষ্ম সর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়
অপার আলোক তিনি আত্মালোকময়
সূক্ষ্মাত্মা হন তিনি ব্যাপ্তি বিশ্বময়"।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মায়ের আমার অপার করুণা। দর্শন দিচ্ছেন না ক'দিন কিন্তু সাধনের পথ ঠিক বলে দিচ্ছেন। সাধন করে চলেছি। মন বলছে ক্ষমতা চাই। মা বলছেন "সাধন করে যাও ক্ষমতা যখন দেবার দেব। তার জন্যে আকাঙ্ক্ষা করো না। সাধনের পথ বড় কঠিন পথ। সাধন পথেও যদি ফলের আকাঙ্ক্ষা কর তবে সাধন পণ্ড হবে। সাধনে কি ফল হবে না হবে, আমি কি দেব না দেব তার জন্যে ভেবোনা বা ফলের আকাঙ্ক্ষা করো না। মুক্ত চিত্ত হ'য়ে সরল ভাবে যে ভাবে সাধন করছ তাই আত্মনিষ্ঠ হয়ে করে যাও, সব দেব সময়ে। জোর করে কিছু করতে গেলে হবে না ও সব পণ্ড হ'য়ে যাবে। সময়ে সময়ে যে সব সঙ্কেত করি সেগুলো প্রণিধান করবার চেষ্টা ক'রো"।

আমার মা অপার করুণাময়ী।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

ব্রহ্মধীরদার (স্বামী ব্রহ্মধীর) মৃত্যুর পরে ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁর বাসায় আমি উপাসনায় গান করলাম। তখন দেখলাম একটা বনের মতন। সেখানে একটা বড় গাছের তলায় ব্রহ্মধীরদা পশ্চিম মুখ করে অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে বসে

আছেন। সামনে একটা সরোবর। দেখে মনে হ'ল সহায়হীন হ'য়ে একলা যেন অত্যন্ত নিরুপায় বোধ করছেন। অত্যন্ত বিমর্ষ দেখলাম।

কিন্তু আজ তাঁর শ্রাদ্ধ বাসরে ব্রাহ্মসম্মিলন সমাজ মন্দিরে তাঁকে দেখলাম একেবারে দেহ ধারণ করে আমাদের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিতে। আমাদের সঙ্গেই পিছনের একটি বেঞ্চে এসে বসলেন। এদিকে আমি উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি। অনেক উর্দ্ধে উঠে একটি সুন্দর লতাকুঞ্জ দেখতে পেলাম। সেখানে একটি বিরাট-কায় পুরুষ উত্তর দিকে মুখ ক'রে ধ্যানস্থ হ'য়ে বসে আছেন। তাঁর গায়ে কোনও আবরণ নাই। মাথার চুল বেনী করে মেয়েদের মত চেপ্টা করে খোঁপা করা। দেহ শ্যামবর্ণ কিন্তু দেহের চারিদিকের আলোক, প্রভাতের সূর্য্যালোকের মত। অত্যন্ত লম্বা গঠন। সুঠাম গড়ন, নাকটি প্রায় টিয়া পাখির ঠোটের মত ও অতিশয় লম্বা। তাঁর অদূরে একটি মন্দিরের মত জায়গায় উজ্জ্বল আলোকে উদ্‌ভাসিত একটি স্থানে একজন যোগী ধ্যানে বসে আছেন তাঁর মাথায় গুজরাটিদের মত টুপি, গায়ে গলবন্ধ কোট্ ও পরনে সাদা ধুতি। প্রায় সারা উপাসনার সময় আমি এই দৃশ্য দেখেছি। জিজ্ঞাসা করে যার কাছে কোনও উত্তর পেলাম না। আমার মা সহায়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

শান্তিদার "শান্তির পথ" প'ড়ে আমার খুব উপকার হোল। শাস্ত্র পড়ি নাই। মা আমাকে বলেছেন "শাস্ত্র পড়বার দরকার নাই। আমি জ্ঞান দেব"। আমাকে মা যে সব মিমাংসা দিয়েছেন তার ভিতরে অনেক কথা "শান্তির পথে" পেলাম। তাই আজ বিকালে শান্তিদার বাড়ী বেলিয়াঘাটা গিয়েছিলাম। গিয়ে অনেকক্ষণ আমার অভিজ্ঞতার বিষয় শান্তিদা ও তাঁর তৃতীয় ছেলেকে প'ড়ে শুনালাম। শান্তিদা জ্ঞানী ব্যক্তি। প্রায় ৭ টায় শান্তিদাকে নিয়ে ব্রহ্ম মন্দিরে এলাম। মন্দিরে এসে দেখি মৃণাল, (শ্রীমান মৃণাল ভূষণ বসু) গান করছে "আমি তোমারি নাথ, তোমারি হে"। গানটি বড় ভাল লাগল। গভীরে প্রবেশ করলাম। শ্রীযুক্তা পুণ্যপ্রভা বসু উপাসনা করলেন।

অনেকক্ষণ ধ্যানে মগ্ন ছিলাম। দেখলাম মুক্ত আকাশে দিব্য আলোকে এক অতি রমণীয় মাতৃমূর্ত্তি বিভাসিত। মুখ খানা অতি স্পষ্ট। অনেকদিন মাতৃমুখ দর্শন করি নাই। আজ দর্শন হোল। অন্তরে গভীর আনন্দে পেলাম। আস্তে আস্তে মুখ মিলিয়ে গেল। দেখলাম একটি উচ্চ স্থান, লোহার রেলিং দিয়ে সামনে ঘেরা। তার নীচে দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর। সেই প্রান্তর আবছা অন্ধকারে ঢাকা। সেই উচ্চ স্থানে একটি ফরাশের মত বড় চৌকি ও সেটা সাদা কাপড়ে ঢাকা। আমি মুণ্ডিত মস্তক ও গেরুয়া প'রে পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে সেই প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ জনতার দিকে হাত উঠিয়ে অনেক কথা বলছি। জনতা আমার কথা বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে সেই ফরাশে আরও অনেক মুণ্ডিত মস্তক গেরুয়া ধারী বসে আছেন। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে একটি আলোক এসে পড়ছে। আলোক আসছে পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে আকাশের ভিতর থেকে এবং সেখানে একটি জ্যোতির পিণ্ড উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে। যখন এই দৃশ্য দেখি তখন এক অপূর্ব্ব ও অনাস্বাদিত আনন্দ আমাকে অভিভূত করছিলো। মনে নির্দ্দেশ এল "তোমার কর্ত্তব্য জগতের জনগণের অন্তরে মাতৃ জ্যোতি ও মাতৃ ভাবের উন্মেষ জাগ্রত করে অবিদ্যা ও মোহ বিদূরিত করা"।

আমার মা একমাত্র সহায়।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

'ওঁ' নামে ব্রহ্ম সাধন যেমন সহজ 'মা' নামে ব্রহ্মময়ীর সাধন তেমনি সহজ। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মময়ী এক। পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতিতে স্থির ও চঞ্চল দুই স্বরূপ একাত্ম। বাহিরে স্থির ভিতরে চঞ্চল। আবার ভিতরে স্থির বাহিরে চঞ্চল। বাহিরে স্থির আর ভিতরে চঞ্চল পুরুষ ভাব। ভিতরে চঞ্চলতা শুধু ঈক্ষণ শক্তি। আর বাহিরে চঞ্চলতা আর ভিতরে স্থির প্রকৃতি ভাব। ইচ্ছার বিকাশ। যে ঈক্ষণরূপ চাঞ্চল্য ভিতরে ব্যাপ্তি ভূমায় সৃষ্টি ইচ্ছা করেন সেই বাহিরে সৃষ্ট হ'য়ে সচঞ্চল হয়েন। এই সচঞ্চল সৃষ্টির বিকাশ পরা-প্রকৃতি বা ব্রহ্মময়ী। ব্রহ্মময়ী

হ'য়ে মাতৃরূপ ধারণ করেন। এই রূপের আকার প্রকৃতিগত নিগূঢ় সত্ত্বা। এই নিগূঢ় সত্ত্বা জীবজগত ধারক বা উৎপাদক মাতৃসমা মহা মাতৃকা। যোগ সূত্র কাছাকাছি। সন্তানের কাছে পিতাও যেমন আপনার মাতাও তেমনি আপনার। পিতাও যেমন সন্তানকে ভালবাসেন মাতাও তেমনি সন্তানকে ভালবাসেন। কিন্তু মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাড়ীর টান আর পিতার সঙ্গে ঔরষ-গত টান। সন্তান পিতারই সব কিন্তু মাতার জঠরে পুষ্ট। সন্তান মাতার কোলে উঠে বেশী আনন্দ পায়। কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ পায় মাতার কোলে বসে আনন্দে পিতাকে অবলোকন করতে। মাতৃ কোলে সন্তান নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিন্ত হ'য়ে পিতৃরূপ নির্ব্বিকার সত্ত্বাকে অবলোকন ক'রে আনন্দ লাভ করে। মাতৃ-স্নেহের উচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু পিতৃ স্নেহের উচ্ছ্বাস নাই। অপার স্নেহের আধার উচ্ছ্বাস যা অচঞ্চল হ'য়ে স্নেহ দৃষ্টিতে সন্তানকে অবলোকন করেন। আর মাতা অপার স্নেহের আধারে স্নেহের উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিতে স্নেহ স্পর্শে সন্তানকে আপন বক্ষে জড়িয়ে ধরেণ। সন্তান মাতাকে স্বতঃই অতি নিকট মনে করে ও মাতৃগত হয়। মাতাকে সহজ লভ্য ও নিকটতম মনে করে। এই যে পরব্রহ্মের মাতৃভাব এই ভাবেই তিনি জীবের কাছে সহজ লভ্য হ'য়েছেন। মাতাকে আগে জানা ও পিতাকে অবলোকন করা। মাতাকে জানলেই পিতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। মাতা ও পিতা এক স্বরূপ।

মা আমার ব্রহ্মময়ী মা।

২রা মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন "আমি মহাশক্তিময়ী সর্ব্বশক্তিরূপিনী। সর্ব্ব-শক্তিরূপিনী বলেই প্রত্যেকের ভিতরে বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া করে থাকি। ঔষধের ভিতরে আমারই শক্তি। ফুলের ঘ্রাণে, ফুলের সৌন্দর্য্যে, সূর্য্যের তাপে, চন্দ্রের কিরণে, বায়ুর গতিতে, সিংহের গর্জ্জনে, ব্যাঘ্রের বিক্রমে, সাধুর সাধনায়, বিদ্যুতের শক্তিতে আমার শক্তিরই বিকাশ। যেমন আধার তেমনি শক্তি। আধার আমার শক্তি আহরণ করে শক্তিমান হয়। তোমার ভিতরে যে শক্তি

নাই সে শক্তির সাধনা করলে সেই শক্তি তুমি লাভ করতে পার। যে যেমন সাধনা করে সে তেমন শক্তি পায়। জড় দেহের শক্তিও সেই অব্যক্ত শক্তি। তোমার রোগ হ'লে ঔষধ খাও। তোমার যে শক্তির অভাব হোল সেই শক্তি তোমার দেহে পূরণ হ'লে তবে তুমি রোগ মুক্ত হও। তোমার শরীরে কোন্ শক্তির অভাব হ'য়েছে চিকিৎসক সেটা জানে ও যদি জানে তবে সে শক্তির ঔষধ দিলে তোমার শরীর সুস্থ হয়। যদি চিকিৎসক সেই শক্তির অভাব না ধরতে পারে তবে নানা ঔষধ দিলেও তোমার রোগ নিরাময় হয় না। আমার শক্তির উৎস অনন্ত ধারায় এই জগতে প্রবাহিত। শক্তির বিভিন্ন ধারা কিন্তু সব ধারাই সেই এক পরমাশক্তির অংশ। যে ব্যক্তি আমার সেই পরমা শক্তি লাভ করে সে মহাশক্তিমান হয়। আমার আদি শক্তি লাভ করলে মানবের আর কিছু অজ্ঞেয় থাকে না। সে অনেক বিষয় জানতে পারে ও ত্রিকালজ্ঞ হয়। তুমি সেই শক্তির সাধন কর। তোমায় আমি সেই শক্তি দেব। বিশ্বাস রাখ আমার উপরে। সাধন কর, মহা-শক্তি লাভ হবে অচিরে"।

মা আমার অপার করুণাময়ী —।

৩রা মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে অবনীদা এলেন আমার বাসায়। এসে বললেন "তোমার কথা কিছু শোনাও। আর আমার পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত যা জেনেছ সেটা শুনাও"। শোনালাম। আর মার কাছ থেকে যা শুনেছি তার কিছু কিছু প'ড়ে শুনালাম। অবনীদা জিজ্ঞাসা করলেন "এই যে সব কথা শোন এ সব কি কোনও মূর্ত্তি ধরে এসে তোমাকে বলেন, না অন্তরে উপলব্ধি কর" ? আমি বললাম যে আমার অন্তরে মা স্পষ্টভাবে বলেন যেন আর একজন বলছেন। তবে আমার মার মূর্ত্তি আমি প্রায় সব সময় মানস চোখে দেখি। জিজ্ঞাসা করলেন, "সে মূর্ত্তি কি রকম ?" আমি বললাম, সাধারণ নারী মূর্ত্তি। তবে তিনি যে সাকাররূপ ধরে দেখা দেন তারও নজীর আছে। আমার ১লা জুলাই যে অভিজ্ঞতা ও

দর্শন হ'য়েছিলো সেটা প'ড়ে শুনালাম। আমাকে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন।

মা আমার সৎসঙ্গ দিচ্ছেন।

৩রা মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো তুমি আমার নিত্য সাথী। আমার ধ্যান হয় না, ধারণা হয় না, পূজা হয় না, উপাসনা হয় না। জপ করি তাও হয় না। সংসার আমাকে মায়ায় বেঁধেছে। মন আমার বিক্ষিপ্ত। অর্থ চিন্তা, কাম চিন্তা, পর নারী সংসর্গ চিন্তা ক'রে ক'রে মনটাকে ঝাঁঝড়া ক'রে ফেলেছি মা। এ মনে ব্রহ্মবারি থাকে না মা। আসে কিন্তু প'ড়ে যায়। ফুটো গুলো কি করে বন্ধ করি মা বলে দে। সাধন করব? করি কিন্তু কিছুত' হ'চ্ছে না মা। ভেবেছিলাম তোকে সারাক্ষণ কাছে কাছে চোখে চোখে রাখব। এলি, কিন্তু রাখতে পারছিনে মা। ভাল করে সাধন-ঝালা দিয়ে ফুটো গুলো বন্ধ করে দে মা। মা তুই না দিলে যে কেউ পায় না। কত গর্ব্ব করি যে আমি সাধন করছি, মাকে দেখেছি। কিন্তু সবই যে মা তোর দয়া মা। তোর দয়া বিনে কেউ ত' কিছু পায় না মা। এত এ জীবনে জানলাম মা। আমার মত নির্ব্বোধ, অজ্ঞ, অশিক্ষিত, স্বৈরাচারী, কামাশক্ত বিষয়াশক্ত, মিথ্যাবাদী, অবাধ্য, নিন্দুক পরশ্রীকাতর, দুর্ব্বিনীত, অসংযমী হ'য়েও তোর কৃপা যদি পেতে পারি, তবে আমার চাইতে কত কত যোগী, ভক্ত, সাধু, সৎলোক আছেন তাঁরা তো একবার তোকে চাইলেই পাবেন। তবু কেন তারা তোকে চায় না মা?

আমাকে কেন ধরলি মা? আমি কি তোর পাকা ধানে মই দিয়েছিলাম? বেশ ত' ছিলাম। মিথ্যার বেসাতি করতাম। কামে, বিষয়ে, অর্থ চিন্তায় ডুবে ছিলাম। খেতাম-দেতাম, তুবড়ী উড়িয়ে তোকে কলা দেখিয়ে চলতাম। তোকে ভুলে ছিলাম। কেন তুই আমাকে ধরলি মা? আমাকে যখন ধরেছিস্, একবার যখন আমাকে সাকের খেত দেখিয়েছিস্ তখন ত আর পার পাবি না মা। এখন যে আর বিষয় অর্থ কিছুই ভাল লাগছেনা মা। কেবল

তোর কথা ভাবি মা। কোথায় গেলে, কার কাছে তোর কথা শুনব এই চিন্তা। একবার দুবার তিনবার ও কতবার দর্শন দিলি মা। কিন্তু কাছে এলি না মা। রক্ত-মাংসের শরীরে আমাকে দর্শন দিলি না মা। দে মা দর্শন দে মা। অমনি করে নয়। চর্ম্ম-চক্ষে তোকে দেখব বলে বসে আছি। দেখা পাবই।

মা গো, মাগো, মাগো।

৩রা মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

চর্ম্ম-চক্ষের আলো কি নিভে গেছে মা যে তোকে এ চোখে দেখতে পাচ্ছি না? তোকে প্রাণ ভ'রে একবার এই চোখে দেখব মা। তার পর নিত্য সঙ্গে থাকবি মা। আমি ভক্ত নই, সাধকও নই। আমি মা তোর অজ্ঞান দুষ্টু ছেলে। আমার অন্তরলোকের সারা দৃষ্টিপথ উদ্ভাসিত করে কেন এসে দাঁড়ালি মা? তাই যদি তোর ইচ্ছা তবে এই চোখে কেন তোকে দেখব না মা? তোর জন্যে যদি এই চোখে জল ঝরে, এই চোখে যদি তোর জন্য কাঁদি, এই অন্তর যদি তোর আশায় আকুল হয়, অন্তরলোকে তোকে দেখে যদি এই মুখে হাসি ফোটে মা, তবে এই চোখে কেন তোকে দেখব না মা? বল, বলে দে ইচ্ছাময়ী আমাকে দেখা দিবি কিনা? হাসছিস্ যে, আচ্ছা ছেলের পাল্লায় পড়েছিস্। যা নয় তাই চাই বলে। কেন তা হবে? তুই যদি ব্রহ্মময়ী, তুই যদি জগৎ সংসার, তুই যদি সারাৎসারা, তুই যদি সর্ব্ব-ইচ্ছাময়ী তবে তোর রক্ত-মাংসের শরীরে দেখা দিতে এত কৃপণতা কেন? তুই কি রক্ত-মাংসের শরীরে দেখা দিলে ক্ষয়ে যাবি মা? দে না একবার দেখা। আমার মত পাগল ছেলে তোর ছিল না মা। আমি একেবারে বেবুঝ। আমার মন মানে না যে। তুই যদি আছিস্ তবে কেন সামনে এসে বসবি না মা? ওঃ! বুঝেছি। আমি কামাশক্ত বলে তুই আমাকে ভয় করিস্? ছেলে কামাশক্ত হ'লে, ছেলের কাছে মায়ের ভয় কি? তুই যে আমার গর্ভধারিণী মাগো। আমি তোর কোলে তোরই ছেলে। আমি তোর কাছে শিশু যে মা। তোকে ছাড়া আমার যে আর দিন চলে না মা। মাগো আর কত দিনে দেখা দিবি মা?

৮ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো সারাদিন সংসারের চিন্তায় ঘুরে বেড়াই। অর্থ, অর্থ, বিষয়, বিষয় ক'রে পাগলের মত ঘুরে বেড়াই মা। যে একাগ্রতা নিয়ে বিষয় চাই, অর্থ চাই তার শতাংশের একাংশ তোর দিকে থাকলে ঘরে বসে তোকে পেতাম মা। সংসারেই যদি ঘুরাবি তবে নিজেকে আড়াল ক'রে কেন মা? আছিস সব ঘটে, সংসার ভ'রে আছিস্, দেহ, মন, স্ত্রী, পুরুষের মধ্যে, ছেলে-মেয়ের মধ্যে, হাট-বাজারের মধ্যে, সকলের কর্ম্মের মধ্যে কিন্তু তোকে কেন কেউ বোঝে না মা? মাগো তুই যদি এ সবের মধ্যে না থাকতিস্ তবে কি এ সব হোত, এরা কি থাকত? গোড়ায় যে তুই সর্ব্বেসর্ব্বা মা। তোর সংসারে সবাই খেটে মরছে, তোর জন্য তবুও ত এমনি ক'রে আড়াল করে রেখেছিস্ মা। এবার যে মা আর আড়ালে থাকলে চলবে না মা। তোকে এরা যদি না জানল, না চিনল, তবে এদের এখানে আসা যে বৃথা হ'য়ে যাবে মা। প্রবঞ্চনায় এরা ডুবে গেছে মা। তুই যদি এবার দেখা না দিস, এবার যদি এদের হাত না ধরিস্ তবে এরা যে সব ব'য়ে যাবে মা। যে সংসার তোর উদ্যান, সে যে মরুভূমি হ'য়ে যাচ্ছে মা। এরা জানে না মা যে যাকে এরা ভুলে গেছে তাকে ভুললে চলবে না মা। তুই যে ভুলে যাবার সুদে আসলে আদায় করে নিবি মা। এবার তোকে একবার সবার সামনে এসে দাঁড়াতে হবে, তা হ'লে এরা তোকে দেখে পাগল হ'য়ে যাবে। এত দুঃখ-কষ্ট এরা পাচ্ছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, অর্থ নাই, সহায় নাই, নাই বলতে এদের কিছুই নাই। দারিদ্র্যে এদের ঘিরে ধরেছে। খালি পরস্বাপহরণ ক'রে নিজেদের সুখ খুঁজছে। এদের সুখ কোথায় মা? সুখ ত' এদের কপালে লেখা নাই। এরা যে বড় দুঃখী। যারা মাকে দেখল না জন্মে, যারা মার হাতে খেল না, মার কোলে শু'ল না তাদের আবার সুখ কি? মাগো, আয় মা এবার সবাইকে হাত ধরে তোর ঘরে নিয়ে যা মা। মাগো এরা সব ভাল হবে। তোর সংসার জমজমাট হবে। মা গো আয় মা এবার।

৯ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন "ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—" এর অর্থ জানিস্" ? আমি বললাম, না। মা বললেন "তবে, শোন। ধর্ম্ম হ'চ্ছে আত্মোপলব্ধি। এই আত্মোপলব্ধি দ্বারাই মানব আত্মা পরমাত্মাকে জানিতে পারে। সংসারে ক্রিয়া-কর্ম্ম, ঘাত-প্রতিঘাত, সাধন-ভজন, কর্ত্তব্য, সংযম, শাসন্, অনুশাসন্ ইত্যাদির বিষয় জ্ঞানলাভ হয় এই আত্মোপলব্ধির যোগে। মানবের শ্রেষ্ঠ কাম্য কি সেটা জানাই মানবের ধর্ম্ম। দেহের ধর্ম্ম যেমন পরিমিত আহার, বিহার, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, জ্ঞান, বিষয় বিচার তেমনি আত্মার ধর্ম্ম দিব্যজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তি বিশ্বাস, নির্ভর সাধন। আত্মোপলব্ধির দ্বারাই এসব হয় ও তাই আসলে ধর্ম্ম।

অর্থ হোল কারণ। এই জগতের, এই মানব দেহের কারণ কি। কোথা থেকে এই দেহ বিষয় গ্রহণ করল' কেন করল, কি তার উদ্দেশ্য। সেই নিহিত কারণ অনুসন্ধান ও তার সম্যকভাবে উপলব্ধি "অর্থ"। এই জগত সংসারের কি অর্থ অর্থাৎ কি কারণ, এই উপলব্ধি যখন গোচরীভূত হয় তখনই একে অর্থ বলে জানবে। তোমারা যেমন হাতে অর্থ এলে তার দ্বারা কি কি জিনিষ কিনবে বা কি ভাবে তাকে খরচ করবে ভাব তেমনি অর্থ পেলে বা জানলে (জানা বা পাওয়া এক কথা) তখন তার দ্বারা উপযুক্ত সাধন, ভজন, ভক্তি, বিশ্বাস দয়া, প্রেম, ভালবাসা ক্রয় করলে। একেই বলে পরমার্থ।

কাম হোল আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, অভিলাষ। আমাকে পাবার জন্যে আকুলতাই কাম। এ কাম সকাম নয় নিষ্কাম। আমাকে ছাড়া আর কিছু যখন কাম্য থাকে না তখন কাম সার্থক। কাম না থাকলে আমাকে পাবে কি করে ?

মোক্ষ হ'ল আমাকে লাভ। মানবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লাভ হ'ল আমাকে লাভ করা বা আমার করুণা, কৃপা লাভ করা। যখন আমার করুণা লাভ হবে তখন মানব মোক্ষলাভ করে। মোক্ষই মানবের একমাত্র কাম্য।

আমি এই চতুর্ব্বর্গে পূর্ণ। এই চারিটি মানবের শ্রেষ্ঠতম পূর্ণতা। প্রথম "ধর্ম্ম" আত্মোপলব্ধি বা জানবার উন্মেষ। দ্বিতীয় "অর্থ" অর্থাৎ কারণ প্রাপ্তি। তৃতীয় কারণ প্রাপ্তিতে আমার প্রতি গভীর অকাঙ্ক্ষা ও চতুর্থ "মোক্ষ অর্থাৎ আমাকে লাভ। এখন বুঝতে পারলে" ?

মাগো এসব আমাকে কেন বলছ মা ? আমি যে তোর কোনও কাজে এলাম না। আমাকে এত জ্ঞান কেন দিচ্ছিস্ মা ? মগো তুই আমার সারাৎসারা জননী।

২রা মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমি তোর মা হ্যাংলা ছেলে। বড় লোভী আমি। যত পাই তত চাই। যত খাই তত খাই খাই করি। নিজেকে সংযত করতে পারি না। একটা চাইলাম অমনি দিলি। যেই দিলি আবার আর একটা চাইলাম। তুই আমায় হ্যাংলা বলে জানিস্ মা। তুই জানিস্ তোর একটা ছেলে বড় হ্যাংলা, খালি চাই চাই. খাই খাই করে। তবুও তো তোর মুখের হাসি মিলায় না মা। কখনও তো তোকে রাগ করতে দেখি না মা। যা চাই তাই দিস্ অতি হাসি মুখে। যেন বলছিস্ "এই নে হ্যাংলা, যা চেয়েছিলি দিলাম"। আমাকে কত ঠাট্টাই করিস্ মা। তবুও আমার হ্যাংলাপনা গেল না। বিষয় বিষয় অর্থ অর্থ করে তোকে কত জ্বালাতন করি মা। তুই আমার বড় ভাল মা। আমার সব আব্দার হাসি মুখে সহ্য করিস্ মা। মা গো আমার বড় ভাল মাটা গো।

৫ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

এই জীবনে কি বিচিত্র লীলাই না হ'চ্ছে। রথের অশ্ব চলেছে উদ্দাম গতিতে। কে তার বল্গা টানছে। কে এক বিচিত্র লীলাময় সে অশ্বকে চালনা করছেন। সাধন পথে চলতে চলতে বিষয় পথ এসে পড়ল আর অমনি কে সেই অশ্বের বলগা টেনে ধরলেন। ভাবলাম কাম চরিতার্থ করব। গিয়ে দেখি সে পথই বদলে গেছে। সেখানে অপূর্ব্ব ভক্তিরস। ডুবে গেলাম ভক্তিতে।

মাকে বললাম আমি যা ভাবি তার চাইতে তুমি যে কত বেশী ভাব সেটা আমি ভাবিনা বলেই নিজেকে চিনতে পারলাম না। অন্তর শূন্য হোল, অর্থ চিন্তায় পাগলের মত হ'লাম, কামে জর্জ্জরিত হ'লাম, মা নামে অনুরাগ ক'মে গেল। কিন্তু এমন জায়গায় এসে পড়লাম যে সব ধুয়ে গেল ভক্তি গঙ্গায়। চোখের জলে প্লাবন এনে দিল। ভুলে গেলাম যে মোহেতে ছিলাম। চিনলাম আমাকে। আমি ত' আসলে সত্য। সত্যেই আমি গঠিত। সাধন আমার সম্বল। মা নাম আমার পরম ধর্ম্ম। ভক্তি আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস। আমি যে আসলে মার ছেলে। তাই ত' জেগে উঠলাম। ভ্রান্তি দূরে গেল। অনাবিল আনন্দ গেলাম। এ আনন্দ ত' অর্থে নাই, কামে নাই, আছে মাতৃ দর্শনে।

এই যে বিচিত্র জীবন গতি, এ গতির পরিসীমা নাই। একবার যদি সাধন পথের গতি হয় তবে মা তার সকল ভার গ্রহণ করেন। আর একবার মা ভার গ্রহণ করলে আর সাধ্য কি ভিন্ন গতিতে মন-অশ্ব ধাবিত হয়। এ যে অপূর্ব্ব লীলা রহস্য।

কৃষ্ণ বললেন আমি বৃন্দাবন ত্যাগ করে এক পাও কোথায় যাব না। দেহই বৃন্দাবন। ব্রহ্মময়ী সেই দেহ বৃন্দাবন ছেড়ে কোথায়ও কি যেতে পারেন ? লক্ষ কোটি বিষয় গোপীনীদের মোহে কি আর সেই দেহকে টলাতে পারে ? শ্রীরাধা তখন কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর। জীবাত্মা তখন পরমাত্মার প্রেমে বিভোর। পরমাত্মা তখন জীবাত্মার নিবেদনে পরিতৃপ্ত। তখন কি আর বিষয় আসতে পারে ? তখন জীবাত্মা আর পরমাত্মা একাত্ম। সহস্র বিষয় লালসারূপ গোপীনীরা আর মন মজাতে পারে না। লীলা সেইখানে যেখানে সহস্র বিষয়ের ভিতরে পূর্ণ প্রেমে একজন আর একজনকে চায়। একজন আর একজনের প্রতি একাগ্র। মিলন এক মুহুর্ত্তের জন্যে, তাই ত' বিরহের মাধুর্য্য। বিরহের অপেক্ষাই ত' মিলনের সার বস্তু। অনুরাগ আগে, প্রেম পরে, বিরহ শেষে, মিলন সর্ব্ব শেষে। অনুরাগ আমার সত্তা, প্রেম আমার ধর্ম্ম আর মিলন আমার

সর্ব্বার্থ। বিরহ আমার সোপান। বিরহ না হ'লে প্রেমাস্পদের মন্দিরে কি করে প্রবেশ করব ?

১২ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মা আমার সব। জানি কি করে ? সারাদিন নানা বিষয় চিন্তা করি। নানা পথে ঘুরে বেড়াই। নানা কামনা নিয়ে অর্থ অর্থ করে সংসারের নানা জালে জড়িয়ে থাকি। সারাদিন পরে যখন একলা এসে আমার কাছে আমি দাঁড়াই ও একবার মার নাম করি অমনি এসে আমাকে কোলে নেন। যেন হাত বাড়িয়ে আমার জন্য বসে ছিলেন কখন সব বিষয় শেষ করে তাঁর কাছে এসে তাঁকে মা বলে ডাকব। মা যে আমার অপার করুণাময়ী। কত অন্যায় করি কিন্তু কিছু যেন মা মনে করেন না। যেন আমি কিছু অন্যায় করতে পারি না। একবার 'মা' ডাকে পাগল হ'য়ে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। এ রীতিত' সংসারে কারুর ভিতরে নাই। তাই জন্যেইত' তিনি আমার সারাৎসারা জননী— আমার মা আমার সব। আমার তিনি ভিন্ন আর কেউ নাই। আমি ভিন্নও তাঁর আর কেউ নাই। আমার জন্যেই ত' তাঁর এত বড় সংসার। সবই যে আমার আর আমিই যে তাঁর। মা গো।

৬ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আত্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি কোথায় থাক ?" আত্মা বললেন "মার কোলে"। আত্মাকে পরমাত্মার কোলে দেখলাম। শরীর নাই। জ্যোতির পিণ্ড আর এক মহাজ্যোতির ভিতরে বসে আছে। ছোট জ্যোতি আর বড় জ্যোতি। অল্প আলো আর বেশী আলো। মাকে জিজ্ঞাসা করি, একি ? মা বললেন "উত্তর পুরুষ"। আত্মাই পরমাত্মার উত্তর পুরুষ। পরমাত্মার ভিতর দিয়ে আত্মার আর আত্মার ভিতর দিয়ে পরমাত্মার। একজনকে পেলে আর একজনের ঠিকানা মেলে। একজনের ঠিকানা মিললে আর একজনকে পাওয়া যায় সেখানে। সঙ্গীতের লয়, তান, সুরের মত। সব এক হ'য়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ বিতরণ করে। আত্মা পরমাত্মার একাত্ম। এক হ'য়ে ভিন্ন আবার ভিন্ন

হ'য়ে এক। শ্রীরাধীকারও প্রেম আবার শ্রীকৃষ্ণের ও প্রেম। প্রেম সেই এক। একজন প্রেমিককে চায় আর একজন প্রেমিকাকে চায়। দুইয়ে এক ও একে দুই। আমার ভজন হ'লনা, সাধন হোল না। হোল কেবল টানাটানি। দোটানায় প'ড়ে বিঘোরে গেলাম। মা না বাঁচালে কি আর এই কালীদহ থেকে উদ্ধার আছে? জীবনে কেবল চাইলাম। যেখানে চাইলাম না পেলাম আর যেখানে চাইলাম পেলাম না। আমার চাওয়াতে যে লোভ আছে। তাইত পাই না। মাগো এত যে দিলি তবুও তোর মুখ দেখি না। ছেলে হ'য়ে মাকে খেতে পড়তে দিই না। কুপুত্র হ'য়ে দাও দাও করি। দিই দিই ত' করি না। তুই চাস্‌না ত' কিছু। শুধু একটু প্রেম, একটু ভক্তি, একটু চোখের জল। তাও মা এত কৃপন আমি যে কত লোককে কত কিছু দিই কিন্তু যা দিতে এক পয়সা খরচ নাই তাও তুই চেয়ে চেয়ে আমার কাছে থেকে পেলিনা মা। মাগো তোর সহ্য গুণের সীমা নাই। তোকে দেব না, দিই না তবুও আমার কাছে দু'হাত পেতে ধর্ণা দিস্ মা। মাগো জীবনে আমার ধিক্কার এসে গেছে যে, যে মা এত দিল তাকে একটু চোখের জল, একটু ভক্তি, একটু মা বলে গদ গদ হ'য়ে ডাকলাম না। তুই এবার আমাকে দিয়ে ডাকিয়ে নে মা। তুই আমার সকল ঘরের ভাণ্ডারী মা। এবার তোর কাছে আমার সব ধন রাখব মা।

মাগো মাগো।

১২ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমি বড় পাজি। সকলের মনে দুঃখ দিই। একটু অন্যায় দেখলে অমনি ফোঁস করে জলে উঠি ও খুব রাগ করে দু'চার কথা শুনিয়ে দিই। এইত আমার স্বভাব। এ স্বভাব কি আর যাবে? ভাবি কিছু বলব না। কিন্তু আমার ভিতরে যে এক মূর্খ আমি আছে সে মাথা চড়া দিয়ে উঠে ও আমাকে খেপিয়ে দেয়। সেই ভিতরের "আমিই" ত' আমাকে ডুবালো। তোর কথা শুনতে দেয় না মা। কেবল "আমার' "আমার'' 'আমি' 'আমি' বলে। মাগো তোর স্বভাব পেলাম না মা। ছেলে হ'য়ে তোর গর্ভজাত হ'য়ে তোর শিক্ষায়

শিক্ষিত হ'য়ে তোর স্বভাব পেলাম না মা। এ দুঃখ আমার কোথায় রাখব ?

সারাৎসারা ব্রহ্মময়ী তুই মা। কত তোর সন্তান। কত সন্তান তোকে গালি দেয়, কটূক্তি করে. তোকে খেতে, পড়তে দেয় না মা, তবুও ত' তুই কারুর প্রতি একটু রাগ করিস্ না মা। মাগো এমন তুই কি করে হ'লি মা ? তোর কি হাড়ে রাগ নাই ? একবার রাগ করে আমাকে ও ত' গালি দিয়ে সৎপথে আনতে পারিস্ মা। মাগো এ তোর কেমন স্বভাব ? আমি যে অভিমানে খারাপ হ'য়ে যাচ্ছি মা। আমাকে শোধরাচ্ছিস্ না কেন ? দে মা ভক্তি দে, দে মা বিশ্বাস দে, দে মা প্রেম দে, দে মা চোখের জল দে, দে মা আমায় তোর কোল দে। দর্শন তো দিলি। কিন্তু তেমন ত' হোল না। অনুরাগ যে মা রাগ হ'য়ে গেল। মাগো তুই আমার সর্ব্বেসর্ব্বা গৃহকর্ত্রী। তোর হাতে চাবিকাঠি।

মা গো আমার প্রেমময়ী মা।

১২ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "সন্ন্যাস নিলে সাধন হয় সত্য, দর্শন হয় সত্য, ধর্ম্ম জীবন হয় সত্য, অনেক দেব ঐশ্বর্য্য হয় সত্য কিন্তু মানব কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হয় না। সন্ন্যাস যারা গ্রহণ করে তারা পরোক্ষভাবে আমাকে অস্বীকার করে। তার কারণ পিতৃ ঔরসে ও মাতৃ জঠরে নিজে জন্ম নিয়ে নিজের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব অস্বীকার করে। জীব-জগত সৃষ্টির দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার অমোঘ নিয়মে সংসার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত। এ নিয়ম আমার কঠিন নিয়ম। এ নিয়মকে অমান্য বা অস্বীকার করলে আমার নিয়ম ভঙ্গ করা হয় ও আমার শক্তিকে বা আমাকে অস্বীকার করা হয়। আমার যে নিয়ম পালন করবে, তার যেটুকু উপযুক্ত ফল তা নিশ্চয়ই পাবে। যেমন সাধন করলে আমার দর্শন লাভ হয়। দরিদ্রকে দান করলে অন্তরে আনন্দ হয়। দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করলে অন্তরে শান্তি আসে। তেমনি আবার আমার যে কোনও নিয়ম পালন না করলে তার জন্য শাস্তি

পেতে হয়। এ থেকে সাধু, ভক্ত, মহাযোগী, মহাভক্তেরও অব্যাহতি নাই। স্থূল শরীরের কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করলে যেমন শরীর অসুস্থ হ'য়ে পড়ে তেমনি আত্মিক নিয়ম লঙ্ঘন করলেও তাকে শাস্তি পেতে হয়। সে শাস্তি সংসারেও হ'তে পারে আবার পরলোকেও হ'তে পারে। আবার সেই নিয়ম পালনের জন্যে সংসারে জন্ম নিয়ে সেই কর্ত্তব্য সমাধা করে তবে নিষ্কৃতি। কারণ প্রত্যেক জীবকে আমি আমার সকল নিয়ম মান্য করিয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার পরাগতি লাভ করতে দিই না। এ সংসারে আমাকে দর্শন করে, দেব ঐশ্বর্য্য লাভ করে, মহা মানব হ'লেও এ নিয়ম থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। সংসার যারা অসার বলে তারা ভ্রান্ত। সংসার যদি অসার হোত তবে আমার সংসার সৃষ্টি করবার কি প্রয়োজন ছিল? এ অতি সহজ বোধ্য কথা। এই জগত সংসার আমি সৃষ্টি করেছি শুধু সৃষ্টির আনন্দেই নয়, শুধু পালনের উদ্দেশ্যেই নয়, মৃত্যুর দ্বারা ধ্বংশের জন্যেও নয়। সৃষ্টি করেছি আত্মচেতনা জাগ্রত করবার জন্যে। সংসারেই জীবের আত্ম চেতনা জাগ্রত হয়। পুত্র কলত্র, স্বামী স্ত্রীর, পিতা মাতার স্নেহের আবেষ্টনে "স্নেহময়ী-আমার" ইচ্ছার নির্দ্দেশ বোধ-গম্য হওয়ার জন্য। প্রতি মানবের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে লীলা সে লীলার ভিতরে আমার লীলা নিকেতন প্রতিষ্ঠিত। জাগ্রত সত্তায় জীব ওতপ্রোত হ'য়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করবে। সংসারের কর্ত্তব্য সম্পাদনের ভিতর দিয়ে আত্ম চেতনায় জীব প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ব্রহ্মসত্ত্বা উপলব্ধি করবে। জনন কার্য্যের জন্যে স্থূল শরীরে যে অঙ্গ দিয়েছি, মনে যে ভাবাবেগ দিয়েছি সে কি মিথ্যা মিথ্যি? প্রজনন যেটুকু স্বভাব নিয়মে চায় সেই টুকুই কাম্য। প্রজনন ক্ষমতার অপব্যবহার করলে সে শক্তির হানি হয়, সে ইন্দ্রিয় অসাক্ত হয় ও কঠিন ব্যাধি হয়। তুমি তোমার সমসাময়িক স্ত্রী অথবা পতি গ্রহণ করবে। সমসাময়িক বলতে এই বুঝায় যে তোমার মনের মানসিক গতি যে সময়ের পরিস্থিতিতে স্থষ্ট সেই সময়ের মানসিক গতিসম্পন্ন স্ত্রী অথবা পতি গ্রহণ। তার পরে বা তার আগে গ্রহণ করবার নিয়ম নয়। তুমি এগিয়ে চলেছ। তোমার এই যাত্রার

সমপর্য্যায় যারা তারা তোমার গ্রহণীয় সংসার বন্ধনে। তোমার চল্লিশ বৎসরে ষোড়সী পত্নী গ্রহণীয় নয়। কারণ ষোড়সীর মনের গতি তার পরিস্থিতির সমতুল্য সাথীই তার কাম্য ও নিয়ম। তুমি সেটা করলে তোমার ব্যাতিক্রম হবে। তবে মনের গতি যদি সমতুল হয় ও যদি একে অন্তের নিকট আত্ম-সমর্পন করে বা তাদের পূর্ব্ব জন্ম-বিষয়ক মিলনের নির্ঘণ্ট স্থির থাকে তবে অনেক জীবের এমন মিলন হয়। এর বিচার তোমাদের সাধ্যের অতীত। জানবে বিবাহ একটি মহাবিধান। বিবাহ না বলে যদি মিলন বল সেও ঠিক। স্ত্রী ও পুরুষ আমার সৃষ্টির নিয়মে মিলিত হয়। এ মিলন আমার ইচ্ছায় আমারই আরব্ধ কর্ত্তব্য সম্পাদন করবার জন্য। এ যদি না হোত তবে এত যোগী ঋষি, মহাভক্ত, মহামানব—যাঁরা আমার মহান্ শক্তির জয় ঘোষণা করে গেছেন তাঁরা কি করে আসত? আরও কত কত মহামানব এই পৃথিবীতে আসবে এই নিয়মের ভিতর দিয়ে। মনে করো না তোমার বীর্য্য শুধু সামান্য দেহ-জাত পদার্থ। এই দেহ বীর্য্য আমার বীর্য্য, ব্রহ্মবীর্য্য ও মহা পবিত্র ও মহা শক্তিধর। তা যদি না হোত তবে সাধারণ মানবের ঔরসে জন্মলাভ করত না মহাভক্ত, মহাজ্ঞানী, মহামানব। সামান্য কাম সংস্পর্শে স্ত্রী পুরুষের যে সঙ্গম হয় সেই সঙ্গমের অন্তরালে আমার মহা নির্দ্দেশ থাকে। কার বীর্য্যে যে কখন কোন মহাজ্ঞানীর জন্ম হবে তোমরা জান না। তোমাদের স্বাধীন সত্ত্বা দিয়েছি তাতে তোমরা আমার অনেক নিয়ম অমান্য করতে পার এ সংসারে। কিন্তু ভেবো না যে তাতে আমি তোমাদের ছেড়ে দেব। আমি আবার তোমাদের সেই নিয়ম পালন করবার জন্য প্রেরণ করব ও তোমাকে সেই নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করে আমার নির্দ্দেশিত পথে চলতে হবে। সংসারই শ্রেষ্ট সাধন ক্ষেত্র। সংসারের সকল কর্ম্ম তোমাকে সম্পাদন করে তবে তোমার উচ্চমার্গ। ভেবো না যে এ জন্মে কিছুত' হোল না। জন্ম জন্মান্তর শুধু নামান্তর। আসলে এ গতির পর আরও গতি আছে। এ পথের পর আরও পথ আছে। ক্রমে পথের পর পথ, গতির পর গতি অতিক্রম করে আমার দিকে আমার আকর্ষণে আমার

কাছে আসাই একমাত্র মহাগতি ও সেই মহাগতি সংসারের গতির ভিতর দিয়েই হয়। এ জন্মে সন্ন্যাসী হ'লেও আবার পর জন্মে ঘোর সংসারী হ'তে হবে। যে আকাঙ্ক্ষা জীব-ধর্ম্ম জাত, যে ইচ্ছা শক্তি আমার দ্বারা সঞ্জাত সে শক্তির বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ করবে এমন শক্তি তোমার নাই। তুমি ভাবলে এ জন্মে সন্ন্যাসী হ'য়ে সংসারকে কেমন ফাঁকী দিলাম। আমি কেমন ভক্ত হ'লাম, আমি কেমন ব্রহ্ম দর্শন করলাম, আমি কেমন নির্লিপ্ত হলাম। কিন্তু তুমি জাননা যে তুমি কিছুই হও নাই। শুধু আমার দর্শন পেলেই মোক্ষ লাভ হয় না। সংসারের সকল নিয়ম, সকল কর্ত্তব্য জন্ম জন্মান্তরে সম্পূর্ণ পালন করবার পর যখন আমার দর্শন হবে তখনই তোমার মোক্ষ লাভ হবে তার আগে নয়। সংসারকে উপেক্ষা করো না। সংসার আমার অমোঘ নিয়ম, আমার অমোঘ নির্দ্দেশ, আমার লীলা ক্ষেত্র ও আমাকে পাবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ। তুমি আমার শরণাপন্ন হ'য়ে আমার প্রতি গভীর বিশ্বাস রেখে সংসার করে যাও। অর্থ, বিত্ত, সুখ সম্পদ, সব আমি দান করি মনে রেখ। চাইলেও দেব না চাইলেও দেব। যেটা তোমার প্রাপ্য সেটা তোমার জন্য আছে জানবে। যেটা নয় সেটা চাইলেও পাবে না। যেটা তোমার সেটা তোমারই আর কেউ পাবে না। বিশ্বাস কর। সাধন কর। উপযুক্ত সময়ে আমি দর্শন দেব।"

মা আমার অপার করুণাময়ী — মা।

১৩ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "মা অনেকেই আমাকে বলে যে আমি যে তোমার কথা শুনতে পাই সে কেমন ক'রে হয়? তুমি কি দর্শন দিয়ে আমার কাছে কথা বল না আর কিছু? বিশেষ ক'রে অবনীদা আমাকে একথা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন। আমি যে মা তোমার কথা অন্তরে শুনতে পাই সে কি আমার নিজের কথা না তোমার কথা?" মা বললেন "শ্রুতি, স্মৃতি, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি যত যত ধর্ম্মজ্ঞানের বিষয় মহাপুরুষগণ ও মহাভক্তগণ লিখে রেখে গেছেন সকলই অব্যক্তরূপে তাঁদের অন্তরে ব্যক্ত হ'য়েছে। এ

বিষয় বিশদ্‌ভাবে বোঝাতে হ'লে তোমার আগে মানব দেহতত্ত্ব জানা দরকার। শোন, দেহ হ'চ্ছে আধার, দেহের ধমণী, তন্ত্রী, শোনিত, অস্থি, মজ্জা, ইত্যাদি এমনভাবে সমাবেশিত হ'য়েছে যাতে এই দেহতে সম্যকভাবে মহাশক্তির আবির্ভাব হ'তে পারে। কি ক'রে হয় তাই বলছি। আমার ঈক্ষণ শক্তিতে জীবাত্মা ব্রহ্মজ হ'য়ে আমার একটি সক্রিয় অংশরূপে উৎপন্ন হয়। এই জীবাত্মা সদ্‌চিদানন্দ অসীম ও নিরাকার আমার স্বরূপতঃ অংশ হওয়াতে একটি অসীম ধারা লাভ করে। এই ধারার গতি উর্দ্ধ। কিন্তু এই ধারা এমন একটি ক্রিয়াশীল আধার লাভ করবার ইচ্ছা করে যাকে চালিয়ে সে তার অভিপ্সিত ফল লাভ করতে পারে। আমার মহাশক্তির অংশরূপে যেই মাত্র তার উৎপত্তি হয় সেই মাত্র তার আবার আমার সঙ্গে মিলিত হবার মহা-আকাঙ্ক্ষা জাগে। আমার বিরাট সত্বার ভিতরে থেকেও আমার একটি অংশ হ'য়ে তার ভবিষ্যৎ নিয়তির চক্র স্থির হ'য়ে যায়। এই নিয়তির চক্র প্রত্যেক জীবাত্মার বিভিন্ন। কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিবেশের ভিতরে তার উৎপত্তি হওয়ায় সকল প্রকার আধ্যাত্মিক পরিবেশের বিচিত্র গণ্ডিতে তার অবস্থান হয়। স্ব স্ব পরিবেশের ভিতরে অবস্থিত হ'য়ে সেই পরিবেশ সূচক চেতনা তার লাভ হয়। তখন সেই চেতনার ইচ্ছা আমার সৃষ্টির ঈক্ষণ শক্তিতে দেহ ধারণ করে। কীট্ যোনি, মৎস যোনি, বৃক্ষ যোনি, পক্ষী যোনি ইত্যাদি যোনিতে তার অবস্থান হয়। এর মূলগত কারণ হোল জীবাত্মার উৎপত্তির পরে সে জানতে পারেনা কোন দেহ ধারণ করলে তার অভিপ্সিত ফল লাভ হবে। সেটা জানে না বলে তার স্বীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশের অখণ্ড নিয়তিতে তার যে কোনও যোনিতে সংসারে জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্মগ্রহণ করার পর তার স্বীয় পরিবেশে সে তার তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। শরীর ধারণ হবার পর দেহের স্থূল পরিবেশ তার পক্ষে এত শ্রেষ্ঠ ও এত বিশেষ ক্রিয়াশীল হ'য়ে পড়ে যাতে স্বভাবত তার আত্মিক ইচ্ছা বা আত্মিক জন্ম বৃত্তান্ত সে বিস্মৃত হ'য়ে যায়। কিন্তু এই বিস্মৃতির গভীর আড়ালে আত্মা কিন্তু বিচার করে চলে যে এ দেহতে তার অভিপ্সিত

ফল লাভ হোল কিনা ও আত্মা অতৃপ্ত হ'য়ে প'ড়ে ও সেই জীবের উচ্চস্তরের জীবের জীবন যাত্রার প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা জাগে। দেহের এই আকাঙ্ক্ষা থাকলে আত্মার আকাঙ্ক্ষা ও পর পর শত শত জন্ম জন্মান্তর সে পার হ'য়ে চলে। সে অসীম ব্রহ্মের অংশ ব'লে মহাকাল তার কাছে জীবন প্রসারের ও তার অভিপ্সিত ফল লাভ করবার পক্ষে কোনও সীমা বা পরিধি সৃষ্টি করতে পারেনা। এমনি করে জন্ম জন্মান্তরের মার্গ দিয়ে জীব উচ্চ মার্গে উন্নত হ'তে থাকে ও পরিশেষে মানব জন্ম লাভ করে। সকল জন্মের অভিজ্ঞতার ফলে বা নীচতর যোনিতে বহুজন্মের ফলে প্রথমতঃ ষষ্ঠ জন্ম পর্য্যন্ত মানবের সেই সব যোনির দোষ খণ্ডন করতে চলে যায়। তবে এই ষষ্ঠ জন্মে তার গতি উর্দ্ধেই চলতে থাকে। সপ্তম জন্ম তার ব্রহ্মময়ীর কোল লাভ হয়। আবার সে ফিরে আসে তার পিতামাতার কাছে ও নিত্যানন্দ লাভ করে। এই যেশত কোটি জন্মান্তর সে লাভ করে তার কাছে তখন সে পরিক্রমা স্বপ্নসম একমুহূর্ত্তের জীবন বলে মনে হয়। কারণ পরা-গতিতে তার অসীম ব্যাপ্তী ও তার মহামুক্তি ব্রহ্মভূমায়।

মানবজন্ম জীবাত্মার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ও এই বিকাশের ভিতর দিয়ে আত্মা তার অভিপ্সিত ফল লাভ করে অর্থাৎ আমাকে লাভ করে। কি ভাবে হয় তাই বলছি। জীবাত্মার ইচ্ছা শক্তিই একমাত্র শক্তি—এই শক্তির শ্রেষ্ঠ আত্মিক দেহ হ'ল—মন। ইচ্ছাই মনকে ধাবিত করে। মন ধাবিত হলে শরীরের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে মনন সৃষ্ট হয়। এই মনন হ'চ্ছে শরীর বা দেহজাত ইন্দ্রিয় ও মনের যোগ। যেমন ইচ্ছা হ'ল তোমার রসগোল্লা খাবে। সঙ্গে সঙ্গে রসগোল্লার জন্য মন ব্যগ্র হোল। তখন বুদ্ধি এসে মনকে সহায়তা ক'রে বলল অমুক দোকানে ভাল রসগোল্লা হয়, চল সেইখানে। শরীর চলল ও তারপর তুমি রসগোল্লা কিনে খেলে। খেলে যখন তোমার তৃপ্তি হোল। রসনার ভিতরে যে রসেন্দ্রিয় আছে সে তখন মনের সঙ্গে একযোগে কাজ করে মনন করল ও তুমি মিষ্টত্ব উপভোগ করলে। তুমি কোনও জিনিষ দেখছ। তোমার দুই

চক্ষু আছে। কিন্তু দুই চক্ষুর দৃষ্টি এক যোগে একদৃষ্টি হ'য়ে যে জিনিষ দেখছ মনের সঙ্গে মনন করেই সেটা দেখছ। মন যদি ওই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনন না করে তবে সে জিনিষের দিকে চেয়ে থাকলেও তুমি দেখতে পাও না। কোনও কথা বলছ, সে কথার সঙ্গে যদি অর্থাৎ সেই শব্দেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি মন মনন না করে তবে তুমি কি বলছ নিজেই বুঝতে পারবে না বা সব অর্থহীন্ হ'য়ে পড়বে। তা হ'লে শরীরের প্রয়োজন সবিশেষ। মানবদেহ উচ্চতম দেহবিকাশে সৃষ্ট। এর প্রত্যেক তন্ত্রী ধমণী ত্বক্ সব কিছুর এক একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বা শক্তি আছে ও সে শক্তি পরোক্ষভাবে আত্মার অভিপ্সিত ফল লাভ করবার সহায়তা করবার জন্যেই সৃষ্ট। যেমন সাধকগণ যখন ব্রহ্ম মননে লিপ্ত হন তখন তাঁদের ললাটের ধমনী ও শিরায় আপেক্ষিক শোণিত ক্রিয়া হয় তাতে অনেক সময় মস্তিস্কের ক্ষতিকরও হয়ে পড়ে। তারজন্য ললাটে শীতল চন্দনের প্রলেপ দেবার প্রচলন আছে। এই যে ত্বকের উপর চন্দন প্রলেপ দেওয়া হোল তাতে শিরা উপশিরার আপেক্ষিক চঞ্চলতার সমতা রক্ষা হ'য়ে মননে সাহায্য করে।

আগেই বলেছি দেহ আত্মার আধার। দেহ না হ'লে মন মনন্ করতে পারে না, সেই দেহ সূক্ষ্মই হোক আর স্থূলই হোক। সেই জন্যেই দেহের সৃষ্টি। দেহ হ'ল সাধন মন্দির। এই দেহ দ্বারাই ব্রহ্মময়ীর সাধন হয়। আত্মাকে একটি আধারে বা গণ্ডিতে পরিবেষ্টন না করলে তার সক্রিয়তা সৃষ্ট হয় না। গণ্ডিতে থাকলেই তার শক্তির একটা একাগ্রতা লাভ হয়। যেমন ইঞ্জিনের ভিতরে অশ্বশক্তি দেওয়া হয়। কোনও ইঞ্জিনের পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঁচিশ একশত দুইশত অশ্বশক্তির মত করে তৈরী করা হয়। পাঁচ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন একশত অশ্বশক্তি লাভ করতে পারে না। এই শক্তি পরিব্যাপ্ত, তাকে কতগুলো কল কব্জার সাহায্যে ইঞ্জিনের ভিতরে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়। তখন সেই অসীম শক্তির অংশ সেই পাঁচ শক্তি বিশিষ্ট ইঞ্জিন তার শক্তি অনুযায়ী বা তার শক্তির সমতুল্য কার্য্য সম্পাদন করে। তেমনি মানব দেহ বা জীব দেহ মহাশক্তির

একটা অংশ পেয়ে সক্রিয় হ'য়ে কার্য্য করে। তবে পার্থক্য এই যে ইঞ্জিন যে শক্তির জন্যে প্রস্তুত তার বেশী তার কার্য্য করবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু মানব দেহের মননের সাহায্যে আহরণ করার ক্ষমতা আছে বলে সে মহাশক্তি লাভ করতে পারে। আমার মত শক্তিধর হ'তে কখনও পারে না বা আমার শক্তির লক্ষ কোটির একাংশও লাভ করতে না পারলেও তার যতটুকু লাভ করার ক্ষমতা তাতে তার সংসারের বিচারে মহাশক্তিই লাভ বলা চলে।

তোমার ইচ্ছা হ'ল আমার সঙ্গে যোগ করবে। তোমার মন তখন মনন করল দেহের সঙ্গে। দেহের চঞ্চলতা চলে গেল, মন একাগ্র হ'ল, প্রজ্ঞা চক্ষু খুলে গেল ও আমার দর্শন হ'ল। তোমার দুই চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি আসলে এক, দুই কর্ণের শ্রবণ শক্তি আসলে এক। এক চক্ষু মুদ্রিত করে এক চক্ষুতে তুমি যা দেখবে দুই চক্ষুতেও তাই দেখ। এক শ্রবণ বন্ধ করে যা তুমি শুনবে দুই শ্রবণেও তাই শুনবে। মন যখন চক্ষুতে তখন মন ও চক্ষুতে মনন, ও এক প্রজ্ঞা চক্ষু উন্মুক্ত হয়। মন যখন শ্রবণে তখন শ্রবণ ও মনে মনন তখন প্রজ্ঞা-শ্রবণ উন্মুক্ত হয়। যখন সাধক এক চক্ষু মননে দেখতে পায় তখন তার বুঝতে হবে তার মনন সার্থক ও সে এক চক্ষুরূপ প্রজ্ঞা-চক্ষু দেখতে পায়। তোমাকে অনেক বার প্রজ্ঞা চক্ষু দেখিয়েছি। এখন যে আমার বাণী শুনতে পাচ্ছ সে হ'চ্ছে তোমার প্রজ্ঞা-শ্রবণ। তোমার মন যখন একাগ্র আমার বাণী শুনবার জন্যে তখন তোমার শ্রবণ-ইন্দ্রিয় মনের সঙ্গে মনন করে ও তোমার প্রজ্ঞা-শ্রবণ হয় ও আমার কথা শুনতে পাও। এই ভাবেই সকল সাধু মহাপুরুষগণ আমার বাণী শুনতে পেয়েছেন। আমি মূর্ত্তি ধরে দেখা দিই—বিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞা চক্ষুকে একাগ্র করবার জন্যে। দৈববাণী সময় সময় করি বিক্ষিপ্ত প্রজ্ঞা-শ্রবণকে একাগ্র করবার জন্যে। আমার সক্রিয় ক্রিয়া মূর্ত্তিতে বা বাণীতে। প্রজ্ঞা-শ্রবণে যা শোন তাকে বিবেকের বাণী, ব্রহ্মবাণী, মার কথা যা বল সব একই; সেই আমার বাণী ও সে বাণী প্রজ্ঞা-শ্রবণেই শোনা যায়। একথা তোমার আত্মজ নয়। এ সত্য কথা আমার উক্তি। তা' না হ'লে চোর যখন চুরি করতে যায়

সে তখন বিবেকের বাণী শোনে প্রজ্ঞা-শ্রবণে প্রজ্ঞা-শ্রবণকে উপেক্ষা করে বলেই সে চুরিতে লিপ্ত হয়। আর সে যদি তাকে গ্রহণ করে তবে চুরি করিতে পারে না। চোরের অন্তরে যে প্রজ্ঞা-শ্রবণ সাধকের অন্তরেও সেই প্রজ্ঞা-শ্রবণ। দুইয়ে ভেদ নাই। ভেদ শুধু কার্য্যে। এই প্রজ্ঞা-দৃষ্টি বা প্রজ্ঞা-শ্রবণ যত বেশী সাধন হবে তত বেশী আমাকে দর্শন ও আমার বাণী শ্রবণ করবে। দেহকে উপেক্ষা করো না। দেহ অতি প্রয়োজনীয়। সাধন দেহ ছাড়া হবে না। দেহ ধারণ সাধনের জন্যে। দেহ মন্দির। দেহের বিনাশ হয় কিন্তু দেহের সাধনই আত্মা গ্রহণ করে। দেহ ছাড়া আত্মার উর্দ্ধগতি হয় না। দেহ ছাড়া আত্মা তার অভিপ্সিত ফল—পরমার্থ লাভ করতে পারে না। দেহের মঙ্গল সাধন প্রয়োজন। দেহ আত্মার সকল মঙ্গলের আকর ও আলয়। দেহ দেবালয়, দেহ মঙ্গলালয়।

তুমি সাধন কর, সব জ্ঞান আস্তে আস্তে পাবে। তোমার মহান্ কর্ত্তব্য আসছে। নির্দ্দেশ পাবে চিন্তা নাই।"

মা আমার জ্ঞানদায়িনী মা।

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন "আনন্দই নিত্য আর নিত্যই আনন্দ। যা নিত্য তাই আনন্দ। আমি আত্মানন্দ ও সর্ব্বানন্দ। আমার আনন্দ নিত্য ও আমি নিত্য বলেই আনন্দ স্বরূপ। ভেদে অভেদ আর অভেদে অভেদাত্ম চিন্ময়। আমি মহিমাময়ী চিন্ময় ব্রহ্মময়ী রূপাতীত ও রূপ নির্ব্বিকার। আমি গুহ্যাতিত গুহ্য সকলের কারণ। কারণময় কারণাত্মক। আমি সহাস্যময়ী নিত্যরূপা মঙ্গল দায়িনী বিধাতৃ। মঙ্গলই আমার নিত্য আশ্রয় ও মঙ্গলই আমার কার্য্য—। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও কার্য্যাতীত মঙ্গলই আমার বিধান। আমি সর্ব্বকালে কালাতীত ও সর্ব্ব কার্য্যে অকৃতকর্ম্ম কর্ম্মশক্তি। আমি বৃদ্ধিহীন অতি বৃদ্ধ। আমি যৌবনহীন অনন্ত যৌবনা। আমি শক্তিহীন অনন্ত শক্তি। আমি ইচ্ছাময়ী মাতৃরূপা পরাপ্রকৃতি। আমি ব্রহ্মকল্পা, ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মাণ্ডময়ী ব্রহ্ম। আমি

পরিব্যাপ্ত, আমি চরাচর। আমি শুদ্ধ সত্য মহাসত্বা। আমাকে ভজনা কর। আমাকে সর্ব্বক্ষণ মনন কর। আমাকে অন্তরলোকে দর্শন কর। আমাকে আত্মসমর্পন কর সর্ব্ব কাম্য প্রাপ্ত হবে। অভাব থাকবে না, শোক থাকবে না অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হবে।"

মা আমার সব তুমি—মা—।

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

নীতিতেই জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। নীতিই জাতির চেতনা। জাতির অন্তরেই নীতি প্রতিষ্ঠিত থাকে। নীতি কি? বিদ্যা যেমন বিনয় দান করে নীতি তেমনি মনুষ্যত্ব দান করে। যে নীতি মনুষ্যত্ব দান করতে পারে না সে নীতি নীতি নয় দুর্নীতি। নিস্বার্থপরতা, সরলতা ও সমদর্শীতা বা সমত্ব মনুষ্যত্ব বিকাশের এই ত্রিনীতি। এই ত্রিনীতির উপরেই জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। এই ত্রিনীতির যে কোনও একটা হারালে জাতি খঞ্জ হ'য়ে পড়ে। দুটো হারালে পঙ্গু হয়, আর তিনটে হারালে মৃত কল্প হয়। জাগরণ তখন থাকে না। থাকে তখন সুষুপ্তি। জাতির সভ্যতা বল, চেতনা বল, জাগরণ বল, সবই এই ত্রিনীতির দ্বারাই তার সেই সব সম্ভব হয়। এই ত্রিনীতি হারালে জাতি সব কিছু হারায়। আজ আমরা জাতীয় জীবনে এই ত্রিনীতি হারিয়েছি। আজ আমরা মৃত কল্প। আমাদের না আছে সভ্যতা, না আছে চেতনা আর না আছে জাগরণ। আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে বিস্মরণের সুষুপ্তি। আমরা ভুলে গেছি আমাদের গীতা ধর্ম্ম, ভুলে গেছি আমাদের উদাত্ত ব্রহ্মবাদ, ভুলে গেছি আমাদের সমত্ব। আমরা হ'য়ে পড়েছি স্বার্থপর। নাই আমাদের সরলতা। আত্মসৃষ্ট পরিবেশে আমরা নিজ নিজ স্বার্থকে উচ্চ প্রাচীর ঘিরে তার ভিতরে বাস করছি। সেখানে কারুর প্রবেশাধিকার নাই। আমার কাছে কারুর স্থান নাই, আমার ভোগে কারুর ভাগ নাই। আমরা কপট হ'য়ে পড়েছি। যা নিজে বিশ্বাস করি পরকে বলি ঠিক উল্টো। যা চাই না তাই বলি। যা চাই তা বলি না। যে কার্য্য আমার করা দরকার পরার্থে, জনহিতার্থে সে কার্য্য করব বলে নিজেকে জাতির

বিশ্বাস ভাজন হ'তে চেষ্টা করি। কিন্তু সে কার্য্য করি না। নিজেকে সর্ব্ব বিষয়ে বড়, উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন, অর্থবান্ সৌভাগ্যশালী মনে করি। দীন দরিদ্রগণকে ঘৃণা করি। দুঃখীর দুঃখ নিরসন করি না। শোকাতুরে সান্ত্বনা দিই না। রোগীর রোগ দূর করি না। তাই আমরা মৃতকল্প, সজ্ঞাহীন, হীনবীর্য্য জাতি। এ আমাদের বিস্মৃতি, এ আমাদের চেতনাহীনতা এ আমাদের জড়তা। জাগ, আত্মনির্ভরশীল হও, সমদর্শী হও, নিস্বার্থ হও, সরল হও। জাগিয়ে তোল জাতিকে তার মৃতকল্প সুষুপ্তি থেকে। তার অন্তর রাজ্যে প্রবেশ কর। মাতৃমন্ত্রে সকল জড়তা দূর করে উঠে জাগ্রত হও। মুক্তির দ্বার তোমার সম্মুখে— সেখানে তুমি তোমার ত্রিনীতি নিয়ে প্রবেশ কর। অধঃপতিত, নির্য্যাতিত, রোগগ্রস্থ, শোকগ্রস্থ, অশিক্ষিত, দুর্নীতিগ্রস্থ, বিকারগ্রস্থ বিস্মৃত জনগণকে জাগ্রত কর। মুক্তির দিকে অগ্রসর হও। হে ভারত! তোমার সেই চিত্তনির্ঝিকার সমত্ব আজ আমাদের দাও। দাও আমাদের মহান্ প্রেরণা। যে উদাত্ত কণ্ঠে একদিন ধ্বনিত হ'য়েছিল "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত:" সেই বাণীর সমতালে আজ জাগ্রত হও। তুমি আজ জগতের শিক্ষাগুরু হও। তোমার বিজয় বৈজয়ন্তি জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা কর। বল, ওঠ, জাগ, ভুলে যাও স্বার্থপরতা, ভুলে যাও অসরলতা, ভুলে যাও অসমত্ব। এস, আজ আমরা মাতৃচরণে দীক্ষা গ্রহণ করি ও বলি "ওঁ মাতা, ওঁ পিতা, ওঁ বিশ্ববিধাতা।

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

দ্বারে তোমার আঘাত শুনি আজি—
খুলব কিনা খুলব ভাবি আমি,
চৈত্র রাতের তন্দ্রা ঘেরা চোখে
অলস আঁখি খুলতে নাহি জানি।
এমনি করে সকাল সাঁঝে, রাতে—
বারে বারে এলে আমার দ্বারে—

আঘাত হেথা করলে কর হানি
ওগো সেত জানি আমি জানি—।
রঙিন্ প্রভাত রৌদ্রে ঝল মল,
নাই কোথাও মেঘের আভাস্
দখিণ বায়ু গন্ধ মেখে আসে
চৈত্র রাতের শিশির ধোয়া ঘাস্।
দোয়েল শ্যামা নীড় করেছে হেথা,
কুঞ্জ বীথি আজ যে স্বপন ঘেরা—
নূপুর পায়ে আসে হেথা কেহ—
যায় সে চলে অভিমানে ভরা।
মুক্ত আমার হয়নিকো ত দ্বার—
বন্ধ আছে যেমন ছিল সেত—
এমনি করেই কাটাই কত রাত
এলেও তুমি গেলেও তুমি কত—।
নিদ্রা আমার—ভেঙ্গে গেছে রাতে,
তন্দ্রা আমার ঘুচল না ত আজও,
নিত্য তুমি এলে আমার দ্বারে
হোল না ত তোমার কোন কাজও।

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার সাথে তোমার আলাপন
জানব কবে হবেই সমাপন,
হবে আমার শ্রেষ্ঠ দিনের দেখা,
নিত্য দেখায় শেষ দিনেরও দেখা।
চাইবে যবে আমার মুখ পানে,
পাখি ডাকা প্রভাত গানে গানে;

নদীর ধারে শ্যামল ঘাসে ছাওয়া
উঠবে ভ'রে তোমার আসা যাওয়া।
উঠছে ভ'রে আজকে আকাশ খানি,
আজকে তুমি আসবে আমি জানি,
কুঞ্জে আমার তোমার আগমন,
শেষ হবে মোর সকল আলাপন।
শেষের দিনে কুড়িয়ে নেবে মোরে,
রাত্রি শেষে ঝরে যাওয়া কুঁড়ির টগরে,
ফুলে ফুলে তোমার সাজি ভরা,
সুগন্ধেতে বনখানি যে ভরা—
কুঁড়ির ব্যথা তোমার প্রাণে বাজে
তাই আলাপন আমার সাথে সাজে;
অশ্রু চোখে তোমার মুখে চাই—
আমার প্রাণে আর যে ব্যথা নাই;
এই আমাদের শেষের আলাপন,
আজকে আমার হোলই সমাপন।

১৮ই মার্চ্চ ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে রাত যখন দুটো বেজে গেছে তখন গুহ্যদ্বারে একটা ব্যথা অনুভব করলাম। যেন বাহ্যের বেগ বলে মনে হ'ল। উঠে পায়খানায় গেলাম। বাহ্য হোল না। এসে শুয়ে শুয়ে গায়ত্রী জপ করছি চোখ বুঝে। মন ও দৃষ্টি অসীমে নিবদ্ধ হ'য়েছে। হঠাৎ দেখি দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র বেলাভূমি। চারিদিক্ অপরূপ লাবণ্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে গেছে। তার ঠিক মাঝখানে ফুটে উঠল একটি শ্বেত দেহ—অপরূপ শ্বেত বরফের রং। তিনি একটি বৃদ্ধ, গায়ের বর্ণ বরফের মত সাদা। তিনি যেন একটি উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। দুইপাশে ছোট ছোট আরও দুইটি মূর্ত্তি। এ দৃশ্য প্রায় মিনিট দুই তিন দেখলাম। আবার মিলিয়ে

গেল। আমার অন্তরে এক মহা আনন্দ হোল। কিন্তু এ যে কি দেখলাম জানি না। এর কোনও অর্থ আজও বুঝতে পারছিনা। সারাদিন এই দৃশ্যই মনের চোখে ভাসছে। মাকে জিজ্ঞাসা করেও জানতে পারলাম না।

মা আমার করুণাময়ী।

১৮ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার মা কেমন জানিস্? তেমনি। তেমনি কি রে? রসগোল্লা খেয়েছিস্? কেমন লাগে? খুব মিষ্টি? আমার মা রসগোল্লার চাইতেও মিষ্টি। যদি একবার মাকে আস্বাদন করিস্ তবে আর রসগোল্লা খেতে ভাল লাগবে না। মা-চিনির-রসে একবার যদি ডুবে যেতে পারিস মন তবে আর তোর অন্য রসে মন মজবে না। মা-রস বড় ঘন। একবার মুখে লাগলে বিষয় জলে ধুলেও সে রস মুখ থেকে যায় না। সারা মুখ মিষ্টি হয়ে যায়। তুই যে মন-রসের ভাণ্ড দেখছিস্। রসের সাগর ত' দেখিস্ নাই। যদি একবার রসের সাগর দেখ্‌তিস্ তবে কি আর রসের ভাণ্ডে মন প'ড়ে থাকত? রসের ভাণ্ডে কত মধু মক্ষিকা ডুবে মরছে। কিন্তু রসের সাগরে কেউ ডুবে যায় না। সেখানে রস খায় আর ভেসে থাকে। আয় মন তবে একবার রসের সাগরে ঝাঁপ দিই। ব্রহ্মময়ীর কোলে একেবারে গিয়ে তবে ছাড়ব।

১৮ই মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো, আমাকে আজও আমি চিনতে পারলাম না। এ কি রহস্য! আমাকেই যদি চিনতে না পারলাম তবে তোমাকে কি করে চিনব, মা? এ দুঃখের যে সীমা নেই মা। আমি ভাবি এক করি আর। ভাবি মিথ্যা কথা বলব না। কিন্তু হঠাৎ মিথ্যা বলে ফেলি। আজ একটা মিথ্যা বললাম। অমনি তুই মুখ চেপে ধরলি মা। কিন্তু যার মিথ্যাই অভ্যাস তাকে আর কত চেপে ধরবি মা। তাইত' বলি নিজের স্বভাব নিজেই জানিনা. তাই আর তোকে জানব কেমন করে? দেহের এইটুকু গণ্ডি এর মাঝে অনন্ত সম্ভার। এ সম্ভার গুণে গুণে শেষ করতে পারি না। এর কত ধমনী, কত উপশিরা, অস্থি,

মজ্জা, মাংস, রক্ত, লোম, লোমকূপ, দৃষ্টি, শ্রবণ, বাক্য, স্পর্শ, চেতন, মনন। কত কার্য্য করে যাচ্ছে এই দেহ প্রতি নিয়ত। এত এক মুহূর্ত্তও বসে থাকে না। এর কার্য্য প্রতি নিয়তই চলছে। চিন্তা, ভাবনা, চলা, দেখা, কথা সব এই দেহ করছে। তাই ভাবি মা কি ক'রে এই দেহ গড়েছিস্। এ যে সর্ব্বকালে, সর্ব্ব অবস্থায় সচল সক্রিয় স্বকর্ম। এর গতিতো রুদ্ধ হয় না। আজ যে দেহ আছে কাল সে দেহ নাই। কিন্তু দেহের পর দেহ গড়ছিস্ মা। কত দেহ এল কত দেহ গেল কিন্তু এই দেহতত্ত্ব ক'জনে বোঝে মা? সকলের দেহে সেই একই সব। রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, সেই ক্রিয়া, সেই কার্য্যের আবেগ, সেই চিন্তা সেই সচল অবস্থা। ভেদ ত' দেখি না মা। আমার দেহের ভিতরে যা আছে সকল মানুষের দেহের ভিতরে ত' সেই সব আছে। আমি যদি আজ আমার দেহকে চিনতাম ও জানতাম তবে সব মানুষকে জানতাম। তাদের সঙ্গে ত' আমার আর কোনও বিবাদ থাকত না। কাউকে দেখে রাগ করি, কাউকে দেখে উপেক্ষা করি, কাউকে দেখে হিংসা করি, কাউকে ঠকাই, কাউকে দেখে ভালবাসি, কাউকে দেখে লোভ করি, কাউকে মারি। এ সব করি কেন মা? করি, আমি যে আজও আমাকে চিনতে পারি নাই মা। আমাকে যদি চিনতে পারতাম তবে ত' আর কাউকে হিংসা করতাম না। কারুর উপরে রাগ হ'ত না। এ আমায় কি সমস্যায় রাখলি মা? আজ পর্য্যন্ত নিজের দেহকে, নিজেকে সামলাতে পারলাম না মা। দেহ বিকার আমার দেহতত্ত্ব না জানায় আসে মা। রাগ এলে দেহকে এমনি উত্তেজিত ক'রে যে আমি তোমাকে ভুলে যাই। কাম এসে এমন প্রলোভন দেখায় যে আমি আর আমাকে চিনতে পারি না। হিংসা এসে আমাকে একেবারে বিকার গ্রস্থ করে দেয়।

আবার এত যে নীচতা রয়েছে এই দেহে তার ভিতরে তুই এসে মাঝে মাঝে অপরূপ রূপে দেখা দিস্ মা। এ কেমন করে হয় মা? আমি যে কখনও

কখনও তোর রূপে বিভোর হ'য়ে যাই মা। কত রূপ আমাকে দেখালি। কত সুখ দিলি। কত অর্থ দিলি। কত ভালবাসলি মা। এক দিকে গোয়াল ঘর আর এক দিকে পদ্মফুল। এ কেমন করে হয় মা? আমার মত কামুক, লোভী, হিংসুক, পরশ্রীকাতর, রাগী, স্বেচ্ছাচারী, দুর্বিনীত, অহঙ্কারী, মিথ্যা-বাদী, নিন্দুক হ'য়েও যদি তোর দর্শন পেতে পারি তবে ত' আমার চাইতে সহস্র সহস্র উন্নত ব্যক্তি আছেন তাঁরা যদি তোকে একবার দেখতে চান তবে তুই তাঁদের কেনা গোলাম হ'য়ে থাকবি মা। তাঁরা কেন তোকে চায় না মা? আমি এদিকে কাম সেবা করছি আর ওদিকে তোর দর্শন হ'চ্ছে। তুই একি লীলা করছিস্ মা? এ দেহকে তোর মন্দির করব ভেবেছিলাম, হোল না। এ গোয়াল ঘর মা। ছয় ছয়টা এঁড়ো গরু এই ঘরে বাস করছে মা। পাশেই পদ্ম বাগান চেয়ে দেখলাম না মা। গোবরের গন্ধে পদ্ম গন্ধ মিলিয়ে গেল। গোব্‌রে পোকায় এ দেহ ছেয়ে গিয়েছে মা। এ দেহতে আর অলিকুল ফিরে ফিরে আসছে না মা। এই গোবরে কি পদ্মফুল ফুটবে মা? তুই ত কত পদ্ম ফুল গোবরে ফুটিয়ে ছিলি মা। আমার গোবরে একটা পদ্ম মৃণাল বুনে দে মা। ফুটে উঠুক রক্ত রাগে। তোর দিকে চেয়ে থাকুক সারাদিন। আমার এই দেহকে মজিয়ে দে মা। চিনিয়ে দে এই দেহ-মন্দিরকে। তোর আসন একবার পাত্তি মা। তা হ'লে আর কে আমাকে পায়? আমি যে মা তোর মন্দিরে আসনই পাততে পারলাম না মা আজ অবধি। এই মন্দিরে একটা ছোট খাট জায়গা করে নে মা তোর নিজের জন্যে। আমি যে মা আমার সারা জায়গা জুড়ে আছি মা। তোকে ত' একটুকুও জায়গা ছেড়ে দিই নাই। তুই যদি জোর করে তোর আসন এখানে না পাতবি মা তবে যে তোর ঠাঁই থাকবে না এখানে। এবার ভাল করে এই দেহ মন্দিরে তোর আসন পাত্ মা। আমি তবেই, একে জানতে পারব। তা' নইলে আমার পায়তাড়াই সার হবে মা। খালি কসরৎ করব, আমাকে আর জানা হবে না কোন কালেও। কতবার কত কালে এই মন্দির গড়লি মা। বারে বারে বিষয় ঝড়ে ভেঙ্গে গেল। তোর

আসন আর পাতা হ'ল না। এবার দেখিস্ যেন আর ঝড়ে ভেঙ্গে না পড়ে। খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে দে মা, চালটা শক্ত করে বাঁধ মা, দেখিস যেন ঝড়ে উড়িয়ে না নেয়। তা হ'লে তোর আসন ঠিক থাকবে। তোর আসন একবার পড়লে ঝড়ের সাধ্য কি যে ঘর ভেঙ্গে দেয়। মাগো তুই আপন হাতে মন্দির গ'ড়ে দে মা। আমি আর নিজে করব না। আমি ত' জানিনা কি করে একে গড়তে হয়। তোর জায়গা তুই নিজে করে নে মা। আমার জায়গা এবার তোর। মাগো এবার "তুই" "আমি" হ'য়ে দেহ-মন্দিরে বাস করবি আয় মা।

মা গো আমার মা মা মা।

২১শে মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল থেকে মা আমাকে যে কত কথা বলছেন তার অন্ত নাই। বলছেন "দেখ্ তোকে আমি সব দেব। আজ থেকে তুই যা চাইবি তাই আমার কাছ থেকে পাবি। আমাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস কর। আমাকে বিশ্বাস ক'রে সর্ব্ব অন্তরে আমার শরণাপন্ন হ'লে আমি তোকে সব দেব। এমন ক্ষমতা দেব যা আজ পর্য্যন্ত কোন মানব লাভ করতে পারেনি"। আমি বললাম, মা আমার যে অর্থের প্রয়োজন। মা বললেন "আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দেব বিশ্বাস কর। আমি ছাড়া আর কেউ দিতে পারেনা। বিষয় বল আর পরমার্থই বল সব আমিই দিই। আমি কল্পতরু। আমিই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দিই। এ ছাড়া ত' জীবের আর কিছু আকাঙ্ক্ষার বস্তু নাই। আমার ইচ্ছা ভিন্ন গাছের একটা পাতাও গজায় না। আমার ইচ্ছা ভিন্ন গাছের একটা পাতাও পড়ে না। আমার ইচ্ছা ভিন্ন কেউ অর্থ বিত্ত পায় না। আমার ভজনা করলে যা চাইবে তাই পাবে। আমি মহাশক্তি, মহাদাতা। শুধু চাই আমার প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস"। আমি বললাম, মা, আমি যে চাই যাকে স্পর্শ করব সেই রোগ মুক্ত হবে, যাকে স্পর্শ করব সেই অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। যাকে স্পর্শ করব সেই তোমার দর্শন পাবে। এ কি আমার হবে মা? মা

বললেন "নিশ্চয় হবে, এত অতি সামান্ত। তবে আস্তে আস্তে হবে। আমার ভজনা কর, আমাকে সর্ব্বক্ষণ মনন কর, আমার প্রতি সর্ব্বক্ষণ একাগ্র থাক। বিশ্বাস ও ভক্তিতে হৃদয় উদ্বেল কর। আমাময় হও। তা'হলে তোমার মহাশক্তি লাভ হবে। যা বলবে তাই হবে"। মাগো তুমি আমার কাছে রক্ত মাংসের শরীরে এসে দেখা দাও মা। আমি তোমাকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটাই। আমাকে অর্থ দাও মা। সংসারের কর্ত্তব্য নিপুনভাবে করে অর্থ সব তোমার সন্তানদের জন্তে রেখে আমি তোমার নামে জীবন উৎসর্গ করি মা। আমাকে তাড়াতাড়ি অর্থ দাও। মাগো তুমি আমাকে দেবেই। তুমি আমার অপার করুণাময়ী মা সারাৎসারা, ব্রহ্মময়ী মা আমার।

২১শে মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ আফিসে আরাম চেয়ারে শুয়ে একটু আরাম করছি প্রায় ৫৷৷০ টার সময়। শুয়ে চোখ বুজে গায়ত্রী জপ করছি। কতক্ষণ পরে দেখি একটি বিরাট্ জনতার মিছিল কোলকাতার কোনও রাস্তা দিয়ে চলেছে। সে মিছিলে খৃষ্টান মেয়ে যাজক, হিন্দু সন্ন্যাসী, সাধারণ লোক, ও বহু স্তরের ও বহু ধর্ম্মের লোক সব যে যার পতাকা নিয়ে সারি বেঁধে রাস্তা দিয়ে চলেছে। এ যেন আর ফুরায় না। মনে হ'ল সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় খুব নিকটবর্ত্তী। বিশ্বের মানবগণ এক পরিবার ভুক্ত হ'য়ে একাত্ম হ'য়ে মাতৃচরণে নিজেদের নিবেদন করবে। সব শত্রুতা, সব বৈরীতা ভুলে গিয়ে মহামিলনের ক্ষেত্রে মহাপ্রেমে এক হ'য়ে যাবে। সে দিন বেশী দূরে নয়। মার যে কি ইচ্ছা বুঝতে পারি না। আমাকে দিয়ে এই গুরু ভার, গুরু কর্ত্তব্য সম্পাদন করাতে চান। আমি এত ক্ষুদ্র যে আমার দ্বারা কি এই কার্য্য হবে?

আমার মা একমাত্র সহায়।

২১শে মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো তুই আমার অনন্ত সুন্দরী। তোর মত রূপত কোথায়ও দেখি না মা। এমন রূপ, আহা একবার, দু'বার, বার বার দেখালি মা, নানা রূপ। কিন্তু

যে রূপেই দেখা দিয়েছিস্ মা সেই রূপই তোর অপূর্ব্ব রূপ। শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য যা দেখে পৃথিবীর লোক একেবারে মোহিত হ'য়ে যায়, প্রকৃতির ভিতরে যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য্য আছে তার চাইতেও যে তোর রূপ লাবণ্য কত কোটি কোটি গুণ বেশী তার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। মাগো এমন রূপ কোথায় পেলি মা? সারাৎরা ব্রহ্মময়ী হ'য়ে সর্ব্ব রূপের আধার অরূপ তুই মা আমার। এমন মা পেলে কি সন্তান আর কিছু চায়? যার রূপ অপূর্ব্ব—সে কি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারি? সে রূপ কি কোনও ভাষায়. কোনও তুলিতে ব্যক্ত করা যায়? এ রূপের যে সীমা নাই। এ রূপের যে অন্ত নাই। এ রূপের যে আদি অন্ত নাই। কেবল তুই কি সুন্দর? তোর নামটি যে কত সুন্দর মাগো। "মা" নামের মত সুন্দর নাম কি কোথায়ও আছে? একবার ডাকলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মা মা মা মা মা মা মা।

২৬শে মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো তোকে ত' তেমনি করে ডাকতে পারছিনা মা। তোকে যখন ডাকব মা তখন আমার সংসার, অর্থ, বিত্ত, মান, দয়া, মায়া সকল ভুলিয়ে দিস মা। যখন তোকে ডাকব তখন এসব একেবারে ভুলে যাব। আবার যখন ওদের ডাকব তখন তোকে যেন ভুলে না যাই মা—এইটা দেখিস্ মা। তোকে ডাকলে ওদের পাব। কিন্তু ওদের ডাকলে তোকে ত' পাবনা। দেহ যখন দিয়েছিস্, সংসার যখন দিয়েছিস স্ত্রী, পুত্র-কন্যা যখন দিয়েছিস তখন অর্থ, বিত্ত, মান সবার হাতে পড়তেই হয় যে মা। ওদের হাতে পড়ি তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু তোর চরণ যেন ছুঁয়ে থাকতে পারি। আমি মা তোর আঁচলে বাঁধা ছেলে। মা যেখানে যায় আমিও সেখানে যাই। কিন্তু ছুটে যেতে পারি না। বেঁধে রাখিস্ মা তোর স্নেহ অঞ্চল দিয়ে। আমি বড় পাজি তোর আঁচল খুলে পালাতে চাই। তুই আমায় এমন বাঁধা বেঁধেছিস্ যে সাধ্য কি আমি পালাই। মাগো তুই আমায় ছাড়িসনে মা মাগো।

২৮শে মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার যেন কি একটা রোগ হ'য়েছে মা। তোকে ডাকতে ভুলে যাই। আর যদি বা ডাকি সে ডাকে মন মজে না। যতক্ষণ ডাকি তাতে মনে হয় ডাকা আমার হোল না। কেন হয় বলি তোকে মা। তোর ডাকে গদ গদ হ'য়ে প্রেমাশ্রু পড়ে না মা। ডাকে তেমনি করে আত্মহারা হ'তে পারি না মা। তার পর রোজ যে আমার সঙ্গে কথা বলতি এখন এ ক'দিন বলছিস্ না কেন মা? আমার কিছুই হ'চ্ছে না মা। মাকে যে ছেলে কাঁদাতে পারে না সেকি আবার ছেলে নাকি। যে মা ছেলের জন্যে সারাক্ষণ কেঁদেই কাটায় সেই মাকে যদি কাঁদাতে না পারলাম তবে আর আমার ছেলে হ'য়ে কি লাভ হোল? আমি যদি তেমনি ক'রে কাঁদতে পারি তবে তুই কি মা আমায় না কেঁদে থাকতে পারিস্? আমার যে কাঁদা হয় না। কাঁদতে গেলে বিষয়ের লোভে কেঁদে ফেলি, অর্থের জন্যে কেঁদে ফেলি। একি আমার রোগ হ'ল মা? আমাকে হাত ভ'রে দে দেখি তারা মা তবে তোকে মন ভ'রে সারাদিন ডাকব। সব ছেড়ে তোর কোলে প'ড়ে থাকব। আমার সাধন ভজন কিছুই হবে না মা। জ্ঞান নাই, ভক্তি নাই, সাধন নাই, ভজন নাই, বিশ্বাস বৈরাগ্য নাই, সরলতা নাই, প্রেম নাই, নাই আমার কিছু, আমি যে একেবারে স্বার্থপর মা। ব্যবসাকারীডাকা ডাকি মা। ডাকি অর্থের লোভে। লোকে বলে মা বিষয় অর্থ এ সব মার কাছে চাইতে নাই। তুই বললি মা "সব আমার কাছে চাইবি" বিষয় চাইবি না, চাইবি আমাকে, আমাকে চাইলে বিষয় পাবি"। মাগো আমার যে অর্থের বড় টান, দে মা আমায় প্রচুর অর্থ দে —সে অর্থ কেমন করে খরচ করতে হয় একবার দেখিয়ে দিই মা। মাগো তুই আমার কল্পতরু মা তবে তোর কাছে দেহ ধারণ করে দেহের জন্য পরিবারের জন্যে অর্থ চাইতে কি দোষ বুঝিয়ে দে আমায়। তুই আমায় কেন দিবি না? তুই যদি বিশ্বাস দিস, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য সব দিস্ তবে অর্থ কে দেবে তুই ছাড়া? যারা বলে তুই অর্থ দিস্‌না তারা জানে না যে তোর ভাণ্ডার কত

বড়। কাকে দিবি, যে চাইবে তাকেই দিবি। শুধু চাইতে জানতে হয়। তুই মন দেখে দিস্ মা। যার মন ভাল যে অর্থের সদ্‌ব্যবহার করতে পারে তাকে ভ'রে দিস্। মাগো আমার যে মন পাগল হ'য়ে গেছে। আর কিছু ভাল লাগে না মা। দে মা অর্থ দে, সংসারে পরিবারকে সব দিয়ে তাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালন ক'রে তোর নামে পাগল ক'রে দে মা। মাগো তুই আমার লক্ষ্মী সরস্বতী, কালী, দুর্গা, ব্রহ্মময়ী, স্নেহময়ী-জননী। তোর কাছে চাইলে কি না দিতে পারিস্ মা? মাগো আমায় দে মা, অর্থ দে, বৈরাগ্য দে, সরলতা দে, জ্ঞান দে, সব দিয়ে আমাকে তোর ছেলের মত ছেলে ক'রে নে মা।

মা গো মা আমার তুই আমার একমাত্র ভরসা।

২৯শে মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো আমার কিছু হ'চ্ছে না মা। যোগ, ধ্যান সবই হচ্ছে। শুধু তুই লুকিয়ে রইলি মা। এ আমার কেমন সাধন হচ্ছে? তুই আমার হাতে ধরে সাধন শেখাচ্ছিস্। তুই মা আমার গুরুর গুরু কল্পতরু মা। আমার যে আর দেরী সয় না মা। আমার এত দিনেও চিত্ত বিকার গেল না। কি যে করি, কোন পথে যাই, কিছুই বুঝতে পারছিনা মা। আমার একটা ব্যবস্থা করে দে মা। এমনি করে আর কতদিন কাটাব মা? সবাইকে উপদেশ দিই। কিন্তু আমাকে কে উপদেশ দেয় মা? তুই আমার উপরে রাগ করে থাকিস্ না মা। আমি যে তোর বড় দুর্ব্বল ছেলে। তোর কোনও কথা শুনি না। যা বলিস্ তা' করি না। আমাকে দিয়ে জোর করে করিয়ে নে মা। আমাকে মার, আমাকে শাস্তি দে মা। এ না হ'লে আমি যে শোধরাব না মা। কত লোকে তোর নামে ত'রে গেল আর আমি তোর নাম এত করেছি, আমার যে সেই। সেই অজ্ঞানতা, সেই বিকার, সেই কাম, সেই লোভ, সেই অসারতা, সেই মিথ্যা কথা—স্বভাব খারাপ হ'য়ে গেছে মা। খুব শক্ত শাস্তি দে মা যাতে সারাক্ষণ তোর নামে, তোর ধ্যানে মগ্ন হ'তে পারি। তুই আমার চোখের জ্যোতিতে সারাক্ষণ ভেসে থাকিস মা। আমাকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িস্ না যেন। যেই

ছাড়বি অমনি লোভ আসবে, হিংসা আসবে, কাম আসবে। ওরা আমাকে খেয়ে ফেলবে মা। তুই আমার সাথে সাথে থাক মা সারাক্ষণ। মাগো তুই মা আমার সারাৎসারা সর্ব্বমঙ্গলা দয়াময়ী জননী।

মাগো আমার মা।

৩০শে মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

এতটুকু দেহরাজ্য, তার মাঝে এত সুগম্ভীর—
ধ্যান মগ্ন বাণীর মন্দির ?
দেবতার শ্রেষ্ঠদান সম্ভাবনা মহা-সাধনার,
মহাযোগ, মহাজ্ঞান, মহাক্ষেম, মহা ব্রহ্মজ্ঞান,
আরোপিত এই দেহ মাঝে। কে বলিল,
নশ্বর দেহের রাজ্য সংসার অসার ?
কে রটাল এই মিথ্যা, পৃথিবীর রূপ রস
গন্ধ ফুল-হার, প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ,
সব মায়া জাল, আচম্বিতে ভেঙ্গে যায়—
সুখের স্বপন ? উদাত্ত প্রেমের স্রষ্টা,
প্রেম. দান, স্নেহ, মায়া যাঁহার স্বভাব,
তাঁহা হ'তে জন্ম লভিয়াছে এই অপার সংসার।
লক্ষ কোটি সাধকের—সাধনার স্থান,
যোগী, ঋষি, তপঃ শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি, দেবর্ষি মহাভক্ত,
মহাজ্ঞানী, নির্ব্বাণের শ্রেষ্ঠ অবদান, সব হবে মায়া ?
নশ্বর সকলি ? যুগ যুগ ধরে—অপার
অগম্য পথে কোটি কোটি মানবের—,
পদধূলি রেণু পড়িল যেথানে ; যেথায় ভক্তির পুষ্প
মালঞ্চে মালঞ্চে উঠিল ফুটিয়া ; উৎসর্গিল মহাদেবের
পাদ পদ্ম তলে মহা প্রেমে ; সব হবে মিথ্যা তবে ?

তবে কি প্রেমের ঠাকুর নাই বিশ্ব মাঝে ?
ভক্তবৎসল তবে ভক্ত মাঝে নাহি খেলা করে ?
নহে, নহে ; এ সংসার প্রেমের মন্দির।
প্রেমের-দেবতা, ভক্তের ভগবান, সাধকের সনাতন,
কাঙ্গালের কাঙ্গাল-শরণ পেতেছেন আপন আসন,
এই মর্ত্ত মাঝে। কে কোথায় শুনিয়াছে—
জননী ছাড়িয়া যান আপন সন্তানে ? হয় কি
জননী কভু গৃহত্যাগী আপনার সন্তানেরে গৃহ মাঝে ফেলি ?
এই সংসার মাঝে কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ,
মায়া, মোহ, লোভ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা সব কিছু আছে ;
তার মাঝে আছেন জননী। পূর্ণ জ্ঞানী জননীর কাছে
শিশু মানবের কোন পাপ নাই জেনো। জননী কখন
অজ্ঞান শিশুরে কবে ফেলে দেন ধূলা মাখা বলে ?
সব যদি নশ্বর, সব যদি মিথ্যা মায়া,
তবে কেন সৃজিলেন তিনি এই ধূলার ধরণী ?
কেন তবে রাখিলেন মাতৃ প্রেম, ভ্রাতৃ-স্নেহ, পত্নিপ্রেম,
ভক্তি, দয়া, ভালবাসা এই ধরণীতে ?
এ সংসার মায়া নহে ; নহে, নহে, নহে।
এ সংসার শাশ্বত সাধন ক্ষেত্র তাঁর—।
তাঁর রূপ প্রতি ঘরে ঘরে। মন্দির তাঁহার আছে
প্রতি মানবের দেহে ; পূজারী তাঁহার আছে প্রতি ঘটে ঘটে,
ভক্ত আছে, আছেন সাধক ; তার মাঝে আছেন
জননী মূর্ত্তরূপে।

৩০শে মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

"আমিই সব। আমিই অন্তর আমিই বাহির। আমিই মন। আমিই মনন। আমি সব দিই। আমি সর্ব্ব মূলাধার, সর্ব্বসুখ দাত্রী পরাৎপর, জগদাধার বিশ্বরূপা। অন্তরে আমার বাক্য শ্রবণ কর। যত শ্রবণ করবে তত তোমার অন্তর শ্রবণ মুক্ত হবে, স্বচ্ছ হবে, শ্রুতি প্রখর হবে। আস্তে আস্তে আমার সকল বাক্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শ্রবণের মত শুনতে পাবে। তোমার অন্তরে যে আমার স্নেহের ধারা এসেছে সে ধারাকে রিপুর শক্ত মাটি কেটে প্রবাহিত কর। তবে তার শীতল প্রবাহে অন্তর নির্ম্মল হবে, হৃদয় শান্ত হবে ও মন পরিশুদ্ধ হবে। আমার ধারা দিয়ে হৃদয়কে আপ্লুত কর। দৃষ্টি স্থির কর। প্রজ্ঞা চক্র ভেদ কর। তোমার অন্তর দৃষ্টিতে আমি স্থির। আমার স্থিরতা উপলব্ধি কর। অন্তর চক্ষুকে অচঞ্চল কর, একাগ্র কর। বিশ্বরূপে বিশ্বরূপাকে দর্শন কর। মৃণ্ময়ীতে চিন্ময়ীকে দর্শন কর। অন্তর করুণায় উদ্বেল কর। আমার করুণা উপেক্ষা করো না। যখন যে টুকু পাবে তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাও। বিশ্বমৈত্রী চিন্তা কর। জাগরণও তোমার নিদ্রাও তোমার। সদা জাগ্রত হও। কোনও অন্যায়কে অন্তরে প্রবেশ করতে দিও না। সবল হও। মিথ্যা কথা বল তাতে ক্ষতি নাই। সরলভাবে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর আর মিথ্যা কথা বলবে না। এতে সাধনের বিঘ্ন হয়। আমি এত ছোট নই যে তোমাদের ছোট অন্যায়, ত্রুটি, কাম, লোভ, হিংসা এই সব নিয়ে চিন্তিত হব। এ থেকে দূরে থাকবে যাতে সাধনে বিঘ্ন না হয়। একবার সাধন পাকা হ'লে আর ভয় নাই। এরা ভয় পাবে তোমাকে। তোমার আর কোনও ভয় থাকবে না। নির্ভীক অন্তরে এদের শাসন কর। দূর করে দাও অজ্ঞান অন্ধকার। আমার জ্ঞান জ্যোতিতে, দিব্য জ্যোতিতে দৃষ্টি প্রসারিত কর—। ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধে যাও। উচ্চ থেকে উচ্চে চলে যাও, তখন এ সব অতি ক্ষুদ্র বলে মনে হবে। আমার পরিব্যাপ্তি অসীম। তোমার অন্তর দৃষ্টি আমার সেই অসীম পরিব্যাপ্তিতে বিচরণ করুক। ব্রহ্মময়ী আমি, পরাবিদ্যা আমি। আমার একান্ত হও। আমি

তোমার সহজ লভ্য। আমাকে দূরে মনে করো না, আমাকে কঠিন লভ্য মনে করো না। মহা-সাহস ও মহা-প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমার দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হও। আজ পেলে না বলে দুঃখ করো না কারণ কাল তোমার জন্যে যে কি অসীম ধন ভাণ্ডার রয়েছে আজ তুমি সেটা জান না। আমি জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও তোমার কাছে অজ্ঞাত কতক্ষণ, যতক্ষণ তুমি আমার প্রতি একাগ্র না হও। একাগ্রতাই আমার উপলব্ধি দেবে। বিশ্বের স্থূল পরিবেশের ভিতরে আমার সূক্ষ্মত্ব উপলব্ধি কর। আমি ওতঃপ্রোত সর্ব্ব মূলাধার, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। চক্ষুর ভিতর দিয়ে অন্তর দৃষ্টির পরাদৃষ্টি লাভ কর। আমি তোমার সকল কলুষ হরণ করি যদি আমার শরণাপন্ন হও। একমনা হও, আমাকে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ কর। বিশ্বাস যোগে যোগী হও। বিশ্বাসে বিশ্বাসী হও। তোমার কাছে শিঘ্রই অসীম ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত হ'চ্ছে। এগিয়ে চল। আমি আছি ভয় পেয়ো না।"

আমার মা, মা আমার তুমি আমার একান্ত আপনার—।

৩১শে মার্চ্চ, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "আমার শক্তি অফুরন্ত। স্রষ্টাও আমি, সৃষ্টিও আমি। আমি জড়, আমিই অব্যয়। আমি ব্যক্ত আবার আমিই অব্যক্ত। ব্যক্ত যাহা তাহার পরিসমাপ্তি অব্যক্তে। অব্যক্ত যাহা তাহার উন্মেষ ব্যক্ততে। স্থূল ব'লে, জড় ব'লে মনে করোনা সেটা তোমার গ্রহণীয় নয়। তোমার স্থূল দেহের জন্যে জড়ের প্রয়োজন। আবার সূক্ষ্মদেহের জন্যে অব্যয় আত্মার প্রয়োজন। অব্যয় যাহা তাহাই ব্যক্ত চৈতন্যে পর্য্যবসিত। নিরুদ্ধ অন্তর অব্যক্ত অব্যয় চেতনা লাভ করতে পারে না। অন্তর উন্মুক্ত কর ও মুক্ত আত্মার মহাশক্তিকে উপলব্ধি কর। তবেই আমার রূপের আমার শক্তির সন্ধান তোমার কাছে স্বচ্ছ হবে। সংসার যখন চাইবে সংসারকে তখন দেবে। অন্তর যখন জ্ঞানস্পৃহ, বৈরাগ্য-স্পৃহ, সাধন-স্পৃহ তখন অন্তরকে উন্মুক্ত করে দেবে সেই আত্মার গ্রহণ করবার জন্যে। যে পরিবেশ তোমাকে দিয়েছি তারই কর্ত্তব্য

তোমার। পরিবেশের বাহিরের কর্ত্তব্য করবার জন্য যখন তোমার উপরে দায়িত্ব আসবে তখন তাহা তোমার কর্ত্তব্য। স্বীয় গণ্ডি লঙ্ঘন ক'রো না। আপনার শক্তির প্রতি সচেতন হও। তোমার উপরে যদি দশ জনের কর্ত্তব্য পালন করবার নির্দ্দেশের গণ্ডি থাকে তাই তোমার পালনীয়। তখন যদি সেই কর্ত্তব্য ক্ষুদ্র মনে ক'রে লক্ষ লোকের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করতে যাও তবে তোমার গণ্ডি লঙ্ঘন করা হোল। যদি তোমার প্রতি ভবিষ্যতে লক্ষ লোকের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করবার দায়িত্ব দেবার দরকার হয় তার জন্যে আমিই তোমাকে প্রস্তুত করব ও তার জন্যে সময়োচিত পরিবেশ সৃষ্টি করব। সে দায়িত্ব আমার, তোমার নয়। সংসারে সকলের দায়িত্ব সমান নয় ও সেইটাই তাদের গণ্ডি। এই গণ্ডি ত্যাগ করা ঈর্ষা প্রনোদিত। এই গণ্ডি ত্যাগ করাকেই বলে স্বধর্ম্ম ত্যাগ। স্ব স্ব গণ্ডিই প্রত্যেকের ধর্ম্ম—ইহা আমার অভিপ্রেত ও সৃষ্ট। গণ্ডি ত্যাগেই অকৃতকার্য্যতা আসে। তবে নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনে গণ্ডি প্রসারিত হয় ও কৃতকার্য্যতা আসে। তাকে বলে ধর্ম্মের উৎকর্ষ ও জ্ঞানের উন্মেষ। তখন গণ্ডি ত্যাগ হয় না, গণ্ডি প্রসারিত হয়। একটা করতে করতে আর একটা করলে, একটা ভাবতে ভাবতে আর একটা ভাবলে তাকে বলে গণ্ডি ত্যাগ। যেটা করছ তাকে উন্নত কর, তার প্রসার চাও। সাধন কর, গণ্ডি বা ধর্ম্ম প্রসারিত হবে, জ্ঞানের উন্মেষ হবে ও কৃতকার্য্য হবে। সর্ব্বমূলে অনন্ত শক্তি। তোমার সাধন পদ্ধতি ভিন্ন—এ গণ্ডি পার হ'য়ো না। এই পথে সরল বিশ্বাসে এগিয়ে চল। এখন যদি ভাব এতে ত' হ'ল না দেখি অন্য পথে, তবে বিফল হবে। যদি এক গণ্ডিতে সফল হও তবে জ্ঞান মার্গে অন্য গণ্ডির দর্শন তোমার সহজ হবে। দর্শন সহজ হবে সত্য কিন্তু আবার তোমার সেই স্বীয় গণ্ডিতেই ফিরে আসতে হবে। উন্মুক্ত আকাশে লক্ষ্য করবে বায়ু ধাবিত হয়। তার মুক্তি পরিব্যাপ্ত কিন্তু তার স্তর আছে, গণ্ডি আছে। সে তার গণ্ডির বাহিরে যেতে পারে না—এ তার স্বীয় ধর্ম্ম। সূর্য্যালোক অসীমে পরিব্যাপ্ত, তবুও তার গণ্ডি আছে ও সেই গণ্ডিই সে আলোকিত করছে। তার

বাহিরে তার আলোকের প্রবেশ নিষেধ। জীব জগত গণ্ডি নিয়ন্ত্রিত বা জীব-ধর্ম্মজাত। আত্মাও গণ্ডি নিয়ন্ত্রিত বা আত্ম-ধর্ম্মজাত। দেহের গণ্ডি যেমন জড় গণ্ডিতে আবদ্ধ, আত্মার গণ্ডিও তেমনি আত্মিক গণ্ডিতে আবদ্ধ। তবে তোমার গণ্ডি অনেক প্রসারিত অর্থাৎ মানব গণ্ডি অনেক প্রসারিত। তার ধর্ম্ম-সাধন সাধন-গণ্ডিতে সম্প্রসারিত। তবে অর্থভেদ আছে, ব্যবস্থাভেদ আছে যার দ্বারা সাধনও প্রাকার বেষ্টিত। তোমাকে যে গণ্ডি দিয়েছি সেই গণ্ডিতে সচল হও। সাধন কর প্রবল। হীনতাকে হৃদয়ে স্থান দিও না, সাধনে বিঘ্ন হবে। হৃদয় নির্ম্মল না হ'লে প্রেমচন্দ্র ব্রহ্মময়ীর আবির্ভাব হয় না সেখানে। আকাশ যেমন নির্ম্মল না হ'লে চন্দ্রের রূপ উজ্জ্বলরূপে দর্শন হয় না, তেমনি হৃদয়াকাশ নির্ম্মল না হ'লে আমার দর্শন উজ্জ্বল হবে না। এগিয়ে চল, যা করছ তাই মনে প্রাণে করে যাও। জ্ঞানে অজ্ঞানে নিয়ত জপ ও ধ্যান কর। আমি তোমাকে মহাশক্তি দেব, সকল সময় দর্শন দেব। যা চাইবে, যা বলবে তাই লাভ হবে। আমার দর্শন পাচ্ছ না বলে মনে ক্ষোভ ক'রো না। আমি আছি, সময়ে সব হবে। আমি তোমার একান্ত হব''।

জয় মা আনন্দময়ী—জয় জয় জয় জয়, তোমার প্রেমের জয়—তোমার করুনার জয়।

১লা এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে ধরেছি, বল ব্রহ্মজ্ঞান কি? মা বললেন, "সম্যক উপলব্ধি দ্বারা জীবদেহে আস্তিক্য লাভই ব্রহ্মজ্ঞান।" আমি বিশেষ তেমন বুঝলাম না মা। আমাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও মা। সম্যক উপলব্ধি কি? মা বললেন, "সম্যক উপলব্ধি হ'চ্ছে নিশ্চয়াত্মিকা, নিশ্চিতভাবে আত্মাকে জানা। আত্মাকে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপান। আত্মার প্রতি বিশ্বাস বা আত্ম-বিশ্বাস বা আত্মদর্শন, আত্ম-মনন, আত্ম-সংলাপন, আত্মানুসন্ধান, আত্মপ্রত্যয় এই নানাভাবে আত্মাকে জানতে হবে। আত্মা, দেহ ও আমার মধ্যবর্ত্তি যোগসূত্র, যার দ্বারা আমার দর্শন লাভ হবে।" সবই ত বুঝলাম, কিন্তু হবে

কি ক'রে? মা বললেন, "খুব সোজা রাস্তা তোমায় শিখিয়ে দেব; যেটা আজ পর্য্যন্ত কাউকে বলিনি। একটি কাসার বাটি খুব ভাল ক'রে মেজে তার ভিতরে জল দাও ভ'রে। সেটা এক জায়গায় রাখ। নিজের আসনে স্থির হ'য়ে বস। সেই বাটির জল শান্ত হ'লে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক। মন চঞ্চল হবে না, মন একাগ্র হবে, দৃষ্টি স্থির হবে ও নিজেকে সমাহিত রেখে বাটির জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক। কিছুক্ষণ এই ভাবে সমাহিত অবস্থায় থাকলে দেখবে সেই বাটির জল এক অপার অনন্ত মহা-জ্যোতির সমুদ্র হ'য়ে গেছে, তার কূল কিনারা নাই। যখন এই ভাবে দেখলে "তখন চোখ বোজ প্রায় পাঁচ মিনিট আবার বাটির দিকে তাকাও। দেখবে যেমন বাটির জল তেমনি আছে। অনন্ত সমুদ্র মিলিয়ে গেছে। বাটির ভিতরে যেরূপ জল সেইরূপ আত্মা, আর অপার জ্যোতির সমুদ্র যা দেখলে সে হোল পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। আত্মাকে একাগ্র হ'য়ে দেখতে দেখতে তার ভিতর দিয়ে আমার অসীম পরিব্যাপ্তি দেখতে পাবে। এই হোল তোমার নিশ্চয়াত্মিকা"।

কিন্তু একটা বিষয় বল মা, কেন যে এই অসীমকে "তুমি" বলতে মন চায় না। আমার যে মা, তাকে কি আমি একটা রূপে দেখতে পাব না? তুমি অসীম, আদি অন্ত রহিত নিরাকার এ আমি কি করে ভজনা করি মা? আমার যে মন মানে না মা। আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দে মা। আমাকে তোর অসীমে ছেড়ে দিস্ না মা। আমি যে হারিয়ে যাই। আমি যে থই পাই না মা। আমাকে একটা কিছু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেখিয়ে দে মা। মা বললেন, "তবে শোন্, একটা ফুল নে"। কিরকম ফুল নেব মা? লাল, নীল না সাদা। "যে রং তোর খুসী তাই নে। সেটা ওই বাটির জলের উপরে ছেড়ে দে। জল স্থির হ'লে আবার একাগ্র হ'য়ে সেই জলের উপর ফুলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক্। অনেকক্ষণ তাকিয়ে সমাহিত অবস্থায় দেখতে পাবি যে অপার, অসীম, অনন্ত জ্যোতির সমুদ্রে একটি প্রখর জ্যোতির পিণ্ড ভাসছে। লাল ফুল থাকলে

লাল জ্যোতি দেখতে পাবি, নীল ফুল থাকলে নীল জ্যোতি দেখতে পাবি, সাদা ফুল থাকলে শ্বেত জ্যোতি দেখতে পাবি। ঐ যে জ্যোতির পিণ্ড ওই আমি। আদ্যা-শক্তি, আদি-জ্যোতি, মহা-প্রকৃতি, মহামায়া ব্রহ্মময়ী। যে স্থূল রূপের ভিতর দিয়ে তুমি সাধন করছ সেই দৃষ্টিতে তুমি আমার সেই রূপ দেখতে পাবে। এই হোল "আস্তিক্য"। এই অবস্থার নাম ব্রহ্মজ্ঞান বা পরাবিদ্যা। এখন বুঝলে?"

মা আমার জ্ঞান-দায়িনী ব্রহ্মময়ী মা।

২রা এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ কলিকাতা।

মাগো, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে কি হয়?

মা বললেন, "ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র পরজ্ঞান, পরাবিদ্যা যার দ্বারা মানব সত্যাশ্রয়ী হয়। সকল নীচতা, হীনতা, হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, ঘৃণা, ভয় সবই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে দূর হ'য়ে যায়। মানব এক শ্রেষ্ঠতম নির্গুণ সত্বাকে জানতে পারে। মানব অন্তর মহা-প্রেমে মহা-সমত্ব লাভ করে। তখন মানব নিজ আত্মার ন্যায় সকল জীবের ভিতরে একই আত্মার অবস্থান দর্শন করে। বিভিন্নতা ভুলে যায়। অপার করুণায় হৃদয় বিগলিত হয়। জীবদুঃখে মানব অন্তর নিয়ত ক্রন্দন করে। মোহ ও মায়া পাশকে সম্যক জানতে পারে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যথাযথ উপলব্ধি করতে পারে। আপনার নিজ অস্তিত্ব বুঝতে পারে। ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান জানতে পারে। স্বর্গলোক দেখতে পায়। মহাপুরুষগণকে দর্শন করে ও তাঁদের সঙ্গে সংলাপন করে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোনও পার্থক্য দেখতে পায় না। আত্মদর্শন লাভ করে। দেহ ও দেহাতীত অবস্থাতে বিচলিত হয় না। সংসারের স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। অকার্য্য যা সকলের কাছে কার্য্য ও কার্য্য যা সকলের কাছে অকার্য্য তাই করে। উৎসাহ বিহীন হয় না। চির আনন্দ লাভ করে। দুঃখে বিমর্ষ ও সুখে আনন্দিত হয় না। সংসারের জীবলীলা দেখে হাস্য করে। সংসারের স্বার্থপরতা দেখে হাস্য করে। মৃত্যু দেখে হাস্য করে। নবজাতকের

জন্ম দেখে অপার আনন্দ লাভ করে। বিশ্বাসে, ভক্তিতে, প্রেমে অন্তর পরিপূর্ণ করে। সর্ব্বদ্রষ্টা হয়। বিগতস্পৃহ, বিগত শোক হয়। সদা প্রসন্নচিত্তে জগতের অপার করুণাময়ীর অনন্তলীলা আনন্দ অন্তরে দর্শন করে। সর্ব্বজ্ঞানে, সর্ব্ববিদ্যায় সর্ব্বভাবে, সর্ব্বচিন্তায়, সর্ব্বকার্য্যে বিশারদ হয়। সকলই আমাকে সমর্পন করে। অনন্ত ক্ষমাশীল, পূণ্য-কর্ম্মা, সুবিচারক হয়। মহা-ধৈর্য্য, মহা-বীর্য্য, মহা-ঐশ্বর্য্য, মহা-শক্তি লাভ করে। ব্রহ্ম-স্বভাব প্রাপ্ত হয়। ভিতর ও বাহির স্থির ও শান্ত হয়। শুধু ব্রহ্ম-সংস্পর্শ লাভ করতে উৎসুক। দিব্যজ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যভাব লাভ করে। সকল জীবগণকে আপনার নিকট আত্মীয় জ্ঞান করে। সকল জীবকে শ্রদ্ধা করে। সকল জীবকে প্রেম দেয়। সম্পূর্ণ অহিংস হ'য়ে জীবমাংস ভক্ষণ করে না বা জীব হত্যা করে না। নিরলস ও বীতরাগ হয়। ঈশ্বর-প্রীতিই একমাত্র কাম্য হয়। শূন্যস্থানকে পরিপূর্ণ দেখে আর পূর্ণস্থানকে পূর্ণতম দেখে। পূর্ণতায় মহা-পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করে। সকল চরাচর ব্রহ্মভূমা উপলব্ধি করে। আত্মা, দেহ, ও গেহ ব্রহ্ম আবাস মনে করে। সংসারের পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, স্বামী, দাস, দাসী আত্মীয় পরিজনকে ব্রহ্ম-প্রেরিত মনে করে। যা কিছু লাভ করে ব্রহ্মদত্ত বলে মনে করে। যা কিছু লাভ করে না তা' ব্রহ্ম-অভিলাষ বলে মনে করে। স্থিরপ্রজ্ঞ ও উদার চিত্ততা লাভ করে। সুখ ও দুঃখকে ব্রহ্মানুভূতি বলে মনে করে। জীবনকে অনন্ত প্রেমরাগে রঞ্জিত করে। পরা-ভক্তি লাভ করে, জীবন্ত বিশ্বাস ও গভীরতম নির্ভর লাভ করে। সদাচারী, স্বল্পভাষী হয়। বালক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। অতি সরল জীবন যাপন করে। মধুর হাস্য-রসপ্রিয় হয়। তোমাকে আমি ব্রহ্মজ্ঞান দেব, দিব্যজ্ঞান দেব, দিব্যদৃষ্টি দেব। খুব এক মনে সাধন কর। তোমার সব লাভ হবে, চিন্তা করো না। অর্থ তোমার অনেক হবে। তুমি সুখী হবে, প্রসন্ন হবে, নিত্য আনন্দ লাভ করে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করবে, বিশ্বাস কর"।

মা গো একি শোনাচ্ছিস্ আমাকে?

আমার মাগো মা মা।

৩রা এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মার সঙ্গে আজ আমার ভয়ানক ঝগড়া হ'ল। আমি বললাম তুই যদি বিশ্বাস, ভক্তি, দয়া, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য, নির্ভর এই সব দিস্ মা তবে অর্থ দিবি না কেন? দেহ ত' তুই দিয়েছিস্। সংসার দিয়েছিস্, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন দিয়েছিস্, কাজ-কর্ম্ম করাচ্ছিস্, ব্যবসা করাচ্ছিস্, সব যখন তুই করাচ্ছিস্, সব যখন তোর ব্যবস্থায় হ'চ্ছে তবে অর্থ আসবে না কেন? অর্থ পাব না কেন? অন্যায় যদি করে থাকি তার জন্যে শাস্তি পেয়েছি। কিন্তু সরল ভাবে সৎপথে থেকে যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছি এই কারখানার জন্যে আজ সবই ব্যর্থ হ'তে চলেছে কেন? কি জন্যে এটা হ'চ্ছে? যদি তোর ইচ্ছা ছিল না তবে আমাকে দিয়ে কারখানা করালি কেন? এই কারখানার জন্যে এত পরিশ্রম করালি, এত অর্থ যা আমার ছিল সব খরচ করালি তবুও এতে উন্নতি কেন হ'চ্ছে না। কাউকে ঠকাবার ইচ্ছা ছিল না। অন্য ব্যবসায় মিথ্যা কথা বলতে হয় এই মনে করে কারখানা করলাম যে নিজে জিনিষ তৈয়ারী করব, বিক্রি করব, মিথ্যা কথা বলতে হবে না। দশ জনের অন্নের সংস্থানও হবে, নিজেরও অর্থ লাভ হবে। কারীকর রাখলাম কত। সবাইকে ভাইয়ের মত স্নেহ করেছি। তাদের অভাব অভিযোগ মোচন করতে নিস্বার্থভাবে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তবুও তারা আমাকে বিপাকে ফেলে কারখানার ক্ষতি করল কেন? তারপর সে দিক ছেড়ে আবার রবারের কাজে, ছোট ছোট যন্ত্রের কাজে হাত দিলাম। তাও লোকসান্ কেন হ'চ্ছে? অজস্র টাকা গেল, আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি তবুও তোর আশা মিটল্ না। কেন আমার এমন হবে? বল মা। মা বললেন, "ধৈর্য্য ধর। এই কারখানা থেকে প্রভূত উন্নতি হবে। যখন প্রায় কৃত কার্য্যতার কাছে এসেছ তখন যদি নিরুৎসাহ হ'য়ে পড় তবে ত তোমার সকল নষ্ট হ'য়ে যাবে। তোমার গ্রহ বৈগুণ্যে এই সব হয়রানি হ'চ্ছে।" আমি বললাম, এ সব আমি বিশ্বাস করি না। যে মা ব্রহ্মময়ী সারাৎসারার কাছে আপীল করেছে তাকে সামান্য গ্রহে কি করবে? মা বললেন "আমার নিয়ম আমি কখনও খণ্ডন করি না সাধারণতঃ। যে গ্রহদিগকে

ক্ষমতা দিয়েছি যে সকল কার্য্য করবার জন্তে তারা সে সব কার্য্য করবেই। সুতরাং তাতে যদি তোমার ক্ষতি হয় বা লাভ হয় হবে, তাতে নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না" আমি বললাম তবে আর তুমি থেকে লাভ কি? মা বললেন, "যদি কোনও মানব ব্রহ্মজ্ঞান, পরমার্থ লাভ করে ও আমার একান্ত শরণাপন্ন হয়, আমাকে ভিন্ন আর কিছুই জানে না, আমাকে সকল সমর্পণ করে তাকে গ্রহের প্রভাব থেকে আমি মুক্ত করি। সে আর গ্রহের প্রভাবের ভিতরে আসে না। কারণ তার শক্তি তখন গ্রহের শক্তি থেকে অনেক বেশী হয়। তখন সে আমার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে যুক্ত হয় ও আমার সঙ্গে একাত্ম যোগসূত্র সৃষ্টি করে। তোমাকে ত' আমি বলেছি যে তোমাকে আমি অনেক অর্থ দেব। তোমাকে অর্থ দেবার জন্তে স্বর্গে মহাপুরুষগণ সম্মিলন আহ্বান করেছিলেন সেও তোমাকে দেখিয়েছি ও সেখানে নিয়ে গিয়ে মহাভক্ত শিবের নিকট তোমাকে সমর্পন করেছি। এতেও তোমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না যে তুমি প্রকৃত মহা অর্থশালী ও ধনবান্ হবে। তোমার অর্থ প্রাপ্তি শিঘ্রই হবে। কারখানায় যা করছ সব কৃতকার্য্য হবে। এই কারখানা তোমার জীবনে এক মহাশিক্ষার আলয় হবে। এর ভিতর দিয়ে তোমার লোক শিক্ষার মহান্ কর্ত্তব্য সম্পাদন হবে। আজ যা অকৃতকার্য্য বলে নিরুৎসাহ হ'চ্ছ এক সময় দেখবে সেই অকৃতকার্য্যতাও আনন্দের কারণ হবে। এই কারখানা যদি আমার অভিপ্রেত না হ'ত তবে এ অনেক দিন আগেই বন্ধ হ'য়ে যেত। এটা মনে রেখ যখন এ কারখানা বন্ধ হয় নাই,—এখনও টিকে আছে তখন এর পিছনে একটা মহান্ নির্দ্দেশ বা উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং এ বন্ধ হবে না। এই তোমার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা বা যাহা তোমার ভবিষ্যতে লোক শিক্ষার গভীর জ্ঞানের সাহায্য করবে। অর্থ হবে, গৃহ হবে, বিত্ত হবে ও খুব সুখী হবে। কিন্তু আর যে অর্থে-বিত্তে স্পৃহা থাকবে না, বিগতস্পৃহ হ'য়ে তোমাকে অর্থ, বিত্ত ভোগ করাব। সেই জন্তে তোমাকে বলেছি কঠিন সাধন কর। যত তাড়াতাড়ি তুমি বিগতস্পৃহ হবে তত তাড়াতাড়ি তোমার অর্থ হবে। তোমার অর্থের মহান উদ্দেশ্য আছে;

সেটা বাবুগিরির দ্বারা অপচয় করবার জন্যে নয়। আমি মন দেখছি ও জানি কখন তোমাকে দিলে তুমি তার সদ্ব্যবহার করতে পারবে। অর্থ আমিই দান করি। আমার ইচ্ছা ভিন্ন কেউ অর্থ লাভ করতে পারে না। দেহও যখন আমি দিয়েছি, স্থূল সংসার যখন আমি সৃজন করেছি, তার প্রয়োজনে অর্থের দান কি আমি না করে পারি ? আমিই সর্ব্বদাতা, অর্থ দাতা, বিত্ত দাতা, সুখ-সম্পদ দাতা দারীদ্রভঞ্জন। সুতরাং সংশয় রেখ না মনে। সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হও। আমার উপরে নির্ভর কর আর অসীম ধৈর্য্য ধারণ কর। তোমার সব হবে। তোমার জন্যেই ত আমি এত কাল বসে ছিলাম। তোমার দ্বারা আমার মহান্ কর্ত্তব্য সাধিত হবে। পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। জগতের মানব এক পরিবার হবে, তারা মহাপ্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হবে। সকল বৈরীতা দূর হবে। প্রেমের প্রস্রবণ এই জগতে প্রবাহিত হবে ও সে কার্য্য তোমার দ্বারাই হবে। বিশ্বাস কর আর কঠিন সাধন কর। যেমন ভাবে করছ—ভয় নাই আমি তোমার সকল ভার গ্রহণ করেছি। নির্ভয় হও, মুক্ত হও, নিঃস্বার্থ হও, বিশ্বাসী হও। অন্তর পরিশুদ্ধ কর, নির্ম্মল কর ও সরল হও। সকল জীবকে সমভাবে স্নেহ ও প্রেম দান কর, তোমার জয় অনিবার্য্য।"

জয় মা আনন্দময়ী মা তারা ব্রহ্মময়ী দুর্গতি নাশিনী জননী আমার, সহায় হও মা, আমাকে শক্তি দাও মা।

৬ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে যতবার জপের মাধ্যমে মনন করতে চেষ্টা করি বারবার বিষয় চিন্তা এসে পড়ে। কিছুক্ষণ বাদে মার সঙ্গে যোগ হ'ল ও মা বললেন, "তোমার জীবন নির্ভরের জীবন। সকল জীবাত্মার জীবনই নির্ভরের জীবন। একমাত্র নির্ভরেই সব কিছু পাওয়া যায়। আমার কাছে চাইবে না কেন ? সব চাইবে। অর্থ চাইবে, সুখ সম্পদ, ভক্তি, বিশ্বাস, দয়া, ক্ষমা, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য শান্তি সব আমার কাছে চাইবে। আমি যদি বৈরাগ্য দিই, বিবেক দিই, বিশ্বাস দিই তবে কি অর্থ বিত্ত সুখ সম্পদ দিই না ? চাইবে, অভিলাষ

করবে, আকাঙ্ক্ষা করবে কিন্তু আশা করবে না। যা অভিলাষ হোল, চাইলে। চেয়ে চুপ করে বসে রইলে ঠিক সময়মত পাবেই। আমার কাছে একবারের বেশী দু'বার চাইতে হবে না। একবার চাইলেই আমি সেটা শুনি ও সেটা আমি তোমাকে দেবই। জীবের কোনও আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ আমি অপূর্ণ রাখি না। তবে আকাঙ্ক্ষার ফল লাভের জন্যে যদি তুমি উদ্‌গ্রীব হও ও সেটা পাবে বলে মনে মনে নানা কল্পনার স্বপ্ন দেখ তবে সেটা তুমি পাবে না। তুমি যদি আমার কাছে চেয়ে সম্পূর্ণ আমার উপর নির্ভর করে বসে থাক এমন ভেবে যে আমার কাছে যখন চেয়েছ তখন আমার যখন ইচ্ছা হবে তখন আমি দেবই —তবেই তোমাকে আমি দেব। তোমার জীবন বিশ্লেষণ করে দেখ যেটার জন্যে আশা করে থেকেছ সেটা পাও নাই। কিন্তু যেটার জন্যে আশা কর নাই সেটাই পেয়েছ। যেটা বিনা আশায় পেয়েছ সেটা তোমার আশার থেকে অনেক বেশী। এই দেখ মাতা নিজের দেহকে অনাবৃত রেখে সন্তানের দেহকে নিজের বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করে রৌদ্রের তাপ থেকে সন্তানকে রক্ষা করে নিয়ে চলেছেন। সংসারে মাতার যে স্নেহ সন্তানের প্রতি তার লক্ষ লক্ষগুণ বেশী, আমার স্নেহ তোমাদের প্রতি। সন্তান আমার কাছে চাইলে ও আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলে আমার কিছু কি অদেয় থাকে? আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ জীবের স্বভাব ধর্ম্ম। জীব আকাঙ্ক্ষা করবেই। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা ক'রে যদি জীব ফল লাভের আশা রাখে তখনই সে আমার দানের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করে, তখনই তার আমার উপরে নির্ভর থাকে না। তখন সেটা না পেলে জীবের অন্তর দুঃখে ভ'রে যায় ও তার বিশেষ ক্ষতি হয়। একটা কথা সব সময় মনে রেখ যে তুমি যা চাইবে তাই পাবে। কিন্তু সেটার পরিমান সময় ইত্যাদি আছে। সেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু তোমার কখন পাওয়া উচিত, সেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু তোমার কতটুকু পাওয়া উচিত সেটা আমার জানা আছে। তুমি সেইটুকুই আমার কাছ থেকে পাবে। এই যে পেলে আমর হাত থেকে সেটা তোমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর। যেটা তোমার প্রয়োজন সেটা সময়ে আমি দেবই এই

বিশ্বাস দৃঢ় কর। যেটা পেলে বা পেয়েছ তারজন্যে আমার কাছে কৃতজ্ঞ হও। যদিও আমি তোমার কৃতজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হই না তবুও তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমাকে স্বীকার করা হয়, তাতে তোমার চিত্তে আমার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর দৃঢ় হয় ও সেটা তোমার সাধনের পক্ষে জীবনের উন্নতির জন্যে মঙ্গল কর। আমার কাছে চেয়ে নির্ভর করে বসে থাক তোমার প্রাপ্য পাবেই। এ নিশ্চিত সত্য। কোনও কার্য্যই করবে না যাতে তোমার ফলের আশা থাকে। ফলের আশা করা মানেই আমি কি দিব না দিব সেদিকে নির্ভর না রেখে নিজকে নিজেই তুমি কল্পনায় অনেক কিছু দিয়ে বসেছ। তাতে আমার দানের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় ও তোমার অন্তরে আমার অপার করুণায় সন্দেহ হয় এবং সেই আশার ফল লাভ না হ'লে তুমি আমার প্রতি শ্রদ্ধাহীন্ হ'য়ে পড়। তুমি অনেক কিছু চাইলে কিন্তু যা পেলে সেইটুকুই তোমার প্রাপ্য এই জানবে। সরল অন্তরে আমার কাছে চাইলে সন্তানকে আমার অদেয় কিছুই থাকে না। যারা আমার প্রতি সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হয় ও আমার সঙ্গে সর্ব্বদা যোগযুক্ত হয় তাদের সর্ব্বার্থ আমি দান করি। তারা যা চায় তাই পায়। সে সব সন্তান আমার বিশেষ প্রিয়। আমাকে বিশ্বাস, আমার উপর নির্ভর আমা ছাড়া যারা কিছুই জানে না তাদেরই আমি মহাশক্তি মহাধন প্রদান করি। জীবনকে ঐশ্বরিক মর্য্যাদাসম্পন্ন কর। আমার সন্তান মনে করে উন্নত মস্তকে উন্নত বক্ষে সর্ব্বদা বিচরণ কর। তুমি আমার সন্তান ও আমি তোমার সর্ব্বদাত্রী অপার করুণাময়ী জননী রাজ-রাজেশ্বরী বিধাতৃ এই মনে করে নিজেকে উন্নত কর। তুমি ত নীচ নও। তুমি দুর্ব্বল নও, তুমি ত নির্ধন নও, তুমি ত পাপী হ'তে পার না, তুমি ত দরিদ্র হ'তে পারনা, কারণ তুমি যে আমার, ব্রহ্মময়ীর ছেলে— রাজ-রাজেশ্বরীর পুত্র। সাধন কর। মুক্ত হও; আমাগত হও, সব পাবে। নির্ভয় হও"।

মা আমার অপার করুণাময়ী মা।

ধর্ম্মতত্ত্ব, ১লা ও ১৬ই চৈত্র, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

৬ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো, আজ যে পড়লাম "ধর্ম্মতত্ত্বে" লিখেছে "নাম গ্রহণ অতি উচ্চ সাধন। ইহা যথেচ্ছ যে কোনও প্রকারে সাধন করা ঘোর অপরাধ। নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভক্তি, প্রেম, পূণ্য প্রাণে সঞ্চার না হয়, নাম করিয়া যদি কেহ পরক্ষণে ক্রোধ লোভাদির অধীন হয় তবে ঘোর অপরাধ জন্মে। ঈশ্বর ও তাঁহার নাম অভিন্ন। তাঁহার নাম গ্রহণ করলাম অথচ আমি পূর্ব্বেও যেমন ছিলাম পরেও সেইপ্রকার রহিলাম, ইহা নামের অত্যন্ত অবমাননা। ঈদৃশ অবমাননা যাহতে না হয়, তজ্জন্য নাম গ্রহণে সকল সাধকেরই সঙ্কুচিত হওয়া সমুচিত"। (ধর্ম্মতত্ত্ব—)

আমি যে মা তোমার নাম সাধন করি, অপবিত্র, পবিত্র অবস্থায়, স্থানে অস্থানে, কাজে, অকাজে, মনোযোগে অমনোযোগে। আমার এ বিষয় চিন্তা, এই নাম সাধন, এই ক্রোধ, এই নাম সাধম, এই অর্থচিন্তা, এই নাম সাধন এযে পাশাপাশি চলেছে মা। তবে কি এ আমার মহাপাপ হ'চ্ছে মা? মাগো এযে মহাসমস্যা হোল আমার, এযে মহা সঙ্কট হোল আমার। আমাকে মা ভাল করে সব খুলে বল মা একি সত্যি? মা বললেন "দেখ একদিন তোমাকে বলেছি যে আমি ও আমার নাম এক—এ সত্যি। পৃথিবীতে যত মা জন্মেছে ও জন্মাবে সবার নাম সেই এক "মা"। যত সন্তান জন্মেছে ও জন্মাবে সকলেই তাদের মাকে "মা" বলছে ও "মা" বলবে। সন্তানের কাছে আর কোনও ডাক নাই "মা" ছাড়া। আমিও ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবের "মা"। সকল জীব আমাকে "মা" বলেছে, ও বলবে। আমি "মা" নামে মূর্ত্ত। মাকে সন্তান যে নামেই ডাকুক না কেন সে মা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। হরি বল, কালী বল, দুর্গা বল, ব্রহ্ম বল, ব্রহ্মময়ী বল, তারা বল, সব আমার ওই এক রূপের শত নাম। আমি সেই ব্রহ্মময়ী জননী যে ভাবেই ডাক না কেন স্নেহ আমার তোমাদের প্রতি সেই মাতৃরূপেই অবারিত। মাকে শিশু খেলার ছলেই

ডাকুক, ব্যঙ্গ করেই ডাকুক, রেগে ডাকুক, তাচ্ছিল্য করে ডাকুক, ভয়ে ডাকুক, নির্ভয়ে ডাকুক, ভাবে ডাকুক, অভাবে ডাকুক, দুঃখে ডাকুক, সুখে ডাকুক, স্বার্থে ডাকুক, নিঃস্বার্থে ডাকুক, শৌচে ডাকুক, অশৌচে ডাকুক, পবিত্র হ'য়ে ডাকুক বা অপবিত্র হ'য়ে ডাকুক—যে যেভাবে ডাকুকনা কেন আমাকে ডাক্‌লে সন্তানের কোনও অন্যায় নাই। মা যেমন শিশুকে শিশু বলে জেনে তার অপরাধ নেন না, আমিও তেমনি তোমাদের কোনও অপরাধ নেই না। কারণ তোমরা আমার কাছে শিশুর চাইতেও অজ্ঞান। আমি এত ছোট না যে তোমরা আমাকে কি ভাবে ডাকলে তার বিচার আমি করব। যে ভাবে আমায় ডাক না কেন আমি আসবই। ক্ষণকালের জন্য হ'লেও সন্তান ডাকলে তার কাছে আমি আসবই ও তাকে স্পর্শ করব। যেই বললে "মা" অমনি আমি তোমার কাছে মূর্ত্ত। মা ডাকের, হরি ডাকের, ব্রহ্ম ডাকের, দুর্গা ডাকের, কালী ডাকের এমনি মহিমা যে, যে যে ভাবেই ডাকুক না কেন, আমাকে ভেবে ডাকুক বা না ভেবে ডাকুক, আলস্য করেও যদি একবার আমার নাম উচ্চারণ করে তখনই আমি তার কাছে মূর্ত্ত। আমার নাম ও আমি প্রত্যক্ষ। তোমাকে বলেছি "পাপ" ব'লে আর অন্য কোনও জিনিষ পৃথিবীতে নাই। শুধু আমাকে অবিশ্বাসই একমাত্র "পাপ"। অবিশ্বাস ছাড়া আর কোনও পাপ নাই জানবে। যারা অন্য কথা বলে তারা ভ্রান্ত। শোন, আমার নাম জ্ঞানে-অজ্ঞানে, শৌচে-অশৌচে যদি কেউ করে তবে তার সকল মোহ, সকল অজ্ঞান, সকল অবিদ্যা, সকল রিপুর প্রভাব ধ্বংশ হয়। তোমাকে বলেছি মোহ ব্যাধিই একমাত্র ব্যাধি যার জন্যে আজ সকলে আমাকে ভুলে রয়েছে। এ হ'চ্ছে জীবের বিকার অবস্থা। রোগে যেমন বিকার হয় ও কঠিন ঔষধ বার বার সেবন বিধেয় তেমনি এই মোহ বিকারে আমার নামরূপ ঔষধ অহর্নিশি সেবন করলে মোহবিকার দূর হ'য়ে যাবে। নাম করতে করতেই রিপুর বিনাশ হবে। নাম করেও যদি রিপুর প্রভাব থাকে আরও নাম কর তবে সব প্রভাব দূর হ'য়ে যাবে, আস্তে আস্তে হৃদয় নির্ম্মল হবে। নামের মত ঔষধ নাই।

নামে সফল হয়, সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। নামের গুণে হৃদয় নির্ম্মল হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। দিব্যশক্তি লাভ হয়। পরাবিদ্যা লাভ হয়। তুমি যে ভাবে সাধন করছ তেমনি করে যাও। বেশী বই প'ড় না এখন। আমি সকল জ্ঞান তোমাকে দেব। বহু জ্ঞানী ব্যাক্তির উক্তিও সমস্যাবহুল ও নিরর্থক। তাদের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ ও যা লিখেছেন অনেকাংশে ভ্রান্ত ও বিশ্বাস বিরুদ্ধ। সে সব উক্তি পড়লে তুমি সংশয়ের ভিতরে পতিত হবে। সংশয় এখন তোমার পথে ক্ষতিকর। তোমার উচ্চ সাধন হ'চ্ছে। যে ভাবে আমি বলেছি বা বলব সেই ভাবে একান্ত মনে নাম সাধন করে যাও। মহাশক্তি, মহাজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, মহাসত্য তোমাকে দেব। আমার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে তুমি নাম-সাধন করে যাও কোনও পাপ নাই।"

মাগো তুই আমার জ্ঞান ভাণ্ডার। যা জানতে চাই অমনি সব বুঝিয়ে দিস্ মা। আমাকে কেন এত ভালবাসিস্ মা? মাগো আমার বড় ভাল মাগো—আমার দয়াময়ী, আমার ব্রহ্মময়ী মা গো।

৭ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্মমন্দিরে মণি সেন মহাশয় উপাসনা করলেন ও বিভূতি দা সঙ্গীত করলেন। মণিবাবু উপাসনা শেষে ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা পড়লেন। তাতে লিখেছেন "সব তাঁর কাছে চাইতে হবে। অর্থ বিত্ত—সব চাইতে হবে। দারিদ্র, থাকলে, স্ত্রী-পুত্রের অভাব থাকলে ধর্ম্ম ও ভক্তি হবে না।" এ যে মা কাল আমাকে বলেছেন। একেবারে মিলে গেল।

কাল ও পরশুর লেখা গুলো পড়তে পড়তে মার কাছে কেঁদে ফেললাম। অমনি মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কাঁদছিস্ কেন? আমি বললাম, কাঁদব না? কত ভক্তদের তুমি দেখা দিলে আমাকে একবার তেমনি ক'রে প্রত্যক্ষ হ'য়ে চর্ম্ম চক্ষুর সামনে দেখা দিলে না। যাও দিলে তা ধরতে পারলাম না, কেমন যেন সন্দেহ র'য়ে গেল মা। মা বললেন "ভাবনা ক'রো না। তোমার জন্যেই সব। আমি এখন দেখা দিচ্ছি না সত্য। কিন্তু এক সময় তোমার

একান্ত হব। তখন সব সময় তুমি তোমার চর্ম্ম চক্ষে আমাকে দেখতে পাবে। আমি তখন তোমার সকল দৃষ্টি ছেয়ে থাকব। তখন তোমার আজ্ঞাবহ হব। আগে তুমি সম্পূর্ণ আমার আজ্ঞাবহ হও। আমি যা বলব তাই কর ও এ সাধনায় সিদ্ধ হ'লে আমি তখন তোমার আজ্ঞাবহ হব। ভয় কি? আমি যাকে হাতে ধ'রে সাধন শেখাচ্ছি তার গুরুদর্শন নিশ্চিত সত্য। আমার দর্শন হবেই। কোনও চিন্তা করো না। বেশী লোক-সমাজ যেও না, বেশী কথা বলো না, বেশী বিষয় চিন্তা করো না, শুধু যে ভাবে সাধন করছ ক'রে যাও। ধাপে ধাপে উন্নতি হবে ও আস্তে আস্তে সব হবে। মহাশক্তি লাভ হবে। আমি যে মহা মহাশক্তি। সেই শক্তির কিছুটা তোমাকে দেব। তা না দিলে তোমার দ্বারা লোক শিক্ষা কি করে হবে? তা না দিলে এই জগতকে স্বর্গ রাজ্যে পরিণত কি করে করবে? সব রাস্তা আমিই দেখাব। শুধু সাধন কর, মনে প্রাণে সাধন কর। নিরুৎসাহ হ'য়ো না। আমার সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হও। মুক্তি ও সিদ্ধি অনিবার্য্য"।

জয় মা জয় মা জয় মা।

৮ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন "অর্থ, বিত্ত, গৃহ, সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন, গুণমুগ্ধ জগতজন—সব তোমার হবে। এ সব তোমার হবে কখন যখন আমি বুঝব তোমার অর্থ দীন সেবায়, পরার্থে ও পরমার্থে ব্যয়িত হবে। বিত্ত হবে, যখন সে বিত্ত বিত্তহীনের-সেবায়, সদ্ কার্য্যে, দেব সেবায় নিয়োজিত হবে। সম্পদ হবে, যখন সে সম্পদে তুমি নিরহঙ্কারী হবে। গৃহ হবে, যখন সে গৃহ তোমার দেবালয়ে পরিণত হবে, সে গৃহ যখন দুঃখীর ভরষা স্থল হবে। আত্মীয়-স্বজন হবে, যখন তারা তোমার ভক্তির সহায়ক হবে। তোমার গুণমুগ্ধ জগতজন হবে যখন তারা তোমার মহা উদারতার ও জীবন্ত বিশ্বাসের সহায় হবে। এই

প্রকৃতি, জগত, বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদনদী যখন তোমার নির্ভরের প্রতীক হ'য়ে ভগবদ্ আরাধনায় তোমাকে সাহায্য করবে তখনই তোমার সিদ্ধি—। তখন তোমার প্রাপ্তির বিকাশ ও সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থা'' । আমার কি এ সব হবে মা ? "হবে, আমি যখন বলছি তখন হবেই ।'' আমার কি করে হবে, আমি যে কত অন্যায় অপরাধ করছি তা সত্ত্বেও কি আমার এ সব হবে ?" কি অন্যায় বা কি অপরাধ তার বিচার করবার তোমার কি অধিকার আছে ? তোমাদের চক্ষে যা অন্যায় আমার কাছে তা' অন্যায় নয়। শিশুকি অশৌচে বসে মার সঙ্গে কথা বলে না ? মা কি তার জন্যে কোনও অপরাধ নেন ? বা তার অন্যায় হ'চ্ছে ভাবেন ? ভাবেন অজ্ঞান শিশু অবোধ, অশৌচে বসেও আমার সঙ্গে ওর কথা বলা চাই। তাতে মা কৌতুক উপভোগ করেন ও তার কোনও অন্যায় মনে করেন না। তোমারা যদি অশৌচে আমার সঙ্গে কথা বল আমিও তোমাদের কোনও অপরাধ গ্রহণ করি না। কারন তোমরা আমার কাছে অতিশয় শিশু। আমার মহাজ্ঞানের কাছে তোমাদের জ্ঞান যে কত ক্ষুদ্র তাই ভেবে কৌতুক উপভোগ করি। যা বল তার কিছু অর্থ হয় কিছু অর্থ হয় না। তোমাদের বিচার করবার অধিকার নাই। যে বাল্মীকি মুণি নরহত্যা করে ছিলেন তোমাদের বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার বিচারে তিনি মহা ব্রহ্মজ্ঞানী ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ট মানব বলে পূজিত হ'চ্ছেন। চোর চুরি করে। তোমাদের বিচারে তার-শাস্তি হয়। কিন্তু কেন সে চুরি করল, কি কারণে তার চুরি করবার আকাঙ্ক্ষা হোল তার বিচার কি তোমরা কর ? যে প্রেম, দয়া, ভক্তি, তোমাদের-দিয়েছি তার-দ্বারা কতজন লোককে তোমরা পরিশুদ্ধ করতে পেরেছ ? এই সংসারে-তোমার যেটুকু ক্ষমতা আছে তার দ্বারা কত লোকের উপকার করতে পেরেছ ? তোমরা যদি জীব সমাজের কল্যাণ, তার মঙ্গল করতে না পার তবে তোমার ত' বিচার করবার কোনও অধিকার নাই। তোমার নিয়মে ও তোমার কাছে যে নিকৃষ্ট ও ঘৃনা আমার বিচারে সে মানব সমাজে সর্ব্বোচ্চ মানব। তোমার বিচারে

যে মহাপাপী আমার বিচারে সে মহা পুণ্যবান্। তোমার দ্বারা যদি একটি জীবনও পরিবর্ত্তিত ও শুদ্ধ হয় তবেই তোমার জীবন ধন্য জানবে। কারুর বিচার করতে যেও না; এ জগতে সকলের বিচারের ভার আমার উপরে। ব্যাঘ্রের জীব হত্যাই-ধর্ম্ম, গাভীর নিরামিষ ভোজনই ধর্ম্ম। তার বিচার তুমি কি করে করবে? হিংস্র বলেই তার বিচার তোমার দ্বারা সম্ভব নয়। এ ধর্ম্ম আমিই তাদের দিয়েছি ও কেন দিয়েছি তার বিচারক আমি। তাকে নিরামিষ ভোজন করাতে পারবে কি? তা যখন পারনা তবে তার হিংস্র স্বভাবের জন্য তাকে হত্যা করা অথবা তার হিংস্রতার জন্যে তার বিচার করা ও শাস্তি দেওয়া তোমার অন্যায়। যদি ব্যাঘ্রকে নিরীহ নিরামিষ ভোজী করতে পার ও গাভীকে হিংস্র মাংস ভোজী করতে পার তবেই তোমার বিচার করবার সামান্য অধিকার হ'তে পারে। তা ভিন্ন নয়"। মা এ যে বিপ্লবের-কথা বলছ। "সত্যই বিপ্লবই জীব ধর্ম্ম। চৈতন্য বিপ্লব যখন হয় তখনই জীব মহান্ অগ্রসরের দিকে ধাবিত হয়। নিরীহ গাভীও তার শাবককে হিংস্র পশু দ্বারা আক্রান্ত দেখলে বিপ্লবের পথ অনুসরণ করে। কে তাকে এই বিপ্লবের চেতনা দিয়েছে? আপনার প্রিয় বস্তু, প্রিয়তম, ও স্নেহের আধার, অন্তরের শুদ্ধ আকিঞ্চন যখন আসুরিক শক্তির প্রভাবে বিপর্য্যস্ত হয় তখন চৈতন্য বিপ্লব দেখা দেয়। এই চৈতন্য বিপ্লব সকল জীবের মধ্যে সার ধর্ম্ম হয়ে আছে। একটি পাখি, একটি পিপিলীকাও তার প্রিয়-বস্তু হরণের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে। এই তার চৈতন্য শক্তি ও এই শক্তিই আমার। আমি চৈতন্য ও সে চৈতন্য দিয়ে জীবকে সজাগ করে রেখেছি। একটি সামান্য শিশুকে তার মতের বিরুদ্ধে কিছু করাতে পারনা। যখন তুমি তা পারনা তখন তুমি বিচারক হ'য়ে তাকে দৈহিক শাস্তি প্রদান ক'রে তুমি হয়ত করাও। কিন্তু তার মন তা করে না শুধু দেহই করে শাস্তির ভয়ে। এই যে চৈতন্য বিপ্লব এ-যখন কালাকাল পাত্রাপাত্র বিচার শূন্য হ'য়ে সরল জীবন যাত্রার বিঘ্নস্বরূপ আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত হয় তখন মহাশক্তিশালীও তার কাছে পরাস্থ হয়-এর ভূরি ভূরি প্রমান আছে।

আমি মহা ক্ষমাশীল প্রত্যয়। তুমি মহাক্ষমাশীল, মহা কালরূপ অনন্ত চৈতন্যের সন্তান। আমার ধর্ম্ম যেমন ক্ষমা, তোমার ধর্ম্মও তেমনি ক্ষমা,-বিচার নয় শাস্তি নয়। ক্ষমার দ্বারাই আসল বিচার হয় শাস্তির দ্বারা নয়। তোমার অন্তর চৈতন্য সম্ভূত কর। মহা চৈতন্যে জাগ্রত হও। মহা চৈতন্যের মহা প্রবাহের দ্বারা জড়বাদী আসুরিক শক্তিকে আমার পদতলে নমিত কর। ধ্বংশ নয় বিচার নয়। প্রেমের পরাকাষ্টায় মহাপ্রেমাঞ্জনের অনুলেপনে সকল বৈরীতা, সকল সংশয়, সকল অন্যায়, সকল অপ্রেম, সকল মোহ, সকল অধর্ম্মকে মুছে দাও। ধ্বংশের আর প্রয়োজন নাই। ধ্বংশে আর ঐশী চৈতন্য জাগ্রত হবে না। প্রেম, ভালবাসা, ক্ষমা, ভক্তি, বিশ্বাস. নির্ভর দিয়ে মহা চৈতন্য বিপ্লব জাগ্রত কর। বিশুদ্ধ আত্মা হও। সদাসর্ব্বদা আমার বাণী শ্রবণ কর। আমার ক্ষমা গ্রহণ কর। অপার ক্ষমাশীল শান্ত ও দান্ত ভাব গ্রহণ কর তোমার সাফল্য নিশ্চিত।"

৮ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

বিশুদ্ধ চৈতন্য কি মা ? মা বললেন "জীব চৈতন্য অপার ঐশী চৈতন্যে লয়ের নামই বিশুদ্ধ চৈতন্য। জীবচৈতন্যের ধারা যখন অপার মহাচৈতন্যের ভিতরে গিয়ে পতিত হয় তখনই বিশুদ্ধ চৈতন্য। আমি মহা-চৈতন্য কিন্তু জীবচৈতন্য যদি আমার সহিত সংলাপন না করে, আমার মহাচৈতন্যে জীব-চৈতন্যকে মহাযোগে যুক্ত না করে তবে বিশুদ্ধ চৈতন্য জাগ্রত হয় না। আমি আমিই একক, পরাৎপর নির্ব্বেদ পরমাত্মা। আমার পরিচয় আমি, আমার সাক্ষী আমিই, আমার গুণধর আমিই। আমি আমাতে পাই না যতক্ষণ জীব চৈতন্য আমাকে জাগ্রত না করে। আমি আমাতে সঞ্চারিত কখন যখন জীব চৈতন্য আমার মহাচৈতন্যে যোগযুক্ত। আমি ভেদাত্ম নই, অভেদাত্ম মহা-চৈতন্যস্বরূপ জীবচৈতন্যময় মহাকাল। আমার মহাচৈতন্যের ক্রমবিকাশ নাই। জীবচৈতন্যের ক্রমবিকাশ আছে। এই ক্রমবিকাশময় জীবচৈতন্যের জন্মদাতা

আমিই। প্রকট জগদাধার আমিই কারণ জীবচৈতন্যেই আমার তৃপ্তি। মাতা যেমন সন্তানের মুখাবলোকন ক'রে আনন্দ ও তৃপ্তি পায় আমিও তেমনি জীব দর্শন করে আনন্দ ও তৃপ্তি পাই। জড় দেহধারী জীব আমার মহাচৈতন্যের ধারক বলে, আমার মহাচৈতন্যে-তার জীব প্রত্যয় সৃষ্ট বলে সে আমার সন্তান স্বরূপ ও আমার অশেষ স্নেহের বস্তু। আমি নাই যেখানে জীব নাই। আমি আছি যেখানে জীব আছে। তার অর্থ এই নয় যে জীব যেখানে নাই সেখানে আমার অস্তিত্ব নাই। এর অর্থ যে আমার প্রকাশ জীবচৈতন্যেই স্বপ্রকাশ। আমার জীব সৃষ্টিই এই জন্য। আমার গূহ্যতম বর্ত্তমানতা বা গূহ্যতম প্রকাশকে জীবচৈতন্যে স্বপ্রকাশ করা বা ব্যক্ত করা। জীবের দ্বারা আমি ব্যক্ত না হ'লে আমার সৃষ্টি নিরর্থক হয়। এই জন্যেই জীবের জন্যে আমার এত স্নেহ। আমি বড় স্বার্থপর কারণ আমি যে চাই জীব নিস্বার্থ হ'য়ে আমাকেই চাইবে। আমার একান্ত হবে। আমার মহাচৈতন্য জীবচৈতন্যে মিশে একাকার হ'য়ে মহাবিশুদ্ধ চৈতন্যের মহালীলায় অপার আনন্দ লাভ করবে। আমি নিত্য নব ভাবে চৈতন্য সম্পাদন করি। গীতে, ছন্দে কাব্যে, রসে, প্রেমে, ভক্তিতে, বিশ্বাসে, নির্ভরে, দয়ায়, ক্ষমায়, বিদ্যায়, জ্ঞানে, সরলতায়, সত্যে, নিষ্ঠায়, প্রত্যয়ে সর্ব্বভাবে চৈতন্য সম্পাদনই আমার একমাত্র কার্য্য। তুমি যে ভাবেই আমাকে ডাকনা কেন তোমার সেই চৈতন্যই একমাত্র উপলব্ধির বস্তু। সাধন কর মহাচৈতন্য লাভ হবে। জ্ঞানে মহাজ্ঞানী হবে। আমার অপার চৈতন্যে সর্ব্বক্ষণ সমাহিত থাক। মান,সম্ভ্রম, বিদ্যা, বুদ্ধির কুহকে পতিত হ'য়ো না। জিঘাংষা প্রবৃত্তি পরিত্যাগ কর। বিশুদ্ধ চিত্ত হও। অর্থের জন্যে লালায়িত হ'য়ো না তুমি মহা-অর্থশালী হবে। আত্ম প্রত্যয় লাভ কর। আমাতে শরণাপন্ন হও। সরল অন্তরে বিশ্বাস ও নির্ভরশীল হও। চৈতন্য জাগ্রত না হ'লে আমার অভিলাষ পূর্ণ করতে পারবে না। পাপ-পুন্য বিচারহীন হও। অভিলাষ শূন্য হও। আরব্ধ কর্ম্ম সম্পাদন কর। কর্ত্তব্য যা আসবে বিচার শূন্য হ'য়ে সম্পাদন কর। পরিশ্রমী হও কিন্তু অত্যাধিক পরিশ্রম করো না।

আমি তোমার একান্ত সহায়—আমিই মহাচৈতন্য ও বিশুদ্ধ চৈতন্য তোমার চৈতন্যের সংস্পর্শে।"

আমার মাগো একি লীলা তোমার? আমাকে এত সব জ্ঞান দিয়ে কি করবি মা? আমি যে অজ্ঞান। আমি যে অবোধ শিশু মা। আমি যে মা দুর্ব্বল। আমাকে দিয়ে তুই তোর কাজ করিয়ে নে মা। তোর হাতে আমি আমাকে সমর্পন করলাম মা।

৯ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় পড়লাম যে শ্রীঅরবিন্দের ভক্তগণ ১৪ই এপ্রিল দেশপ্রিয় পার্কে উৎসব করছেন। শ্রীঅরবিন্দ যে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন "১৯৫৭ খৃঃ পরে এক অতি মানসের অরবির্ভাব হবে ও সেই সময় অসুরিক শক্তি প্রবল হবে।" শ্রীযুক্ত মণিকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় সেই ভবিষ্যৎ বাণী জগতের জনগণের উপরে তার কি প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে তার ব্যাখ্যা ইত্যাদির জন্যে সম্মিলন আহ্বান করেছেন।

মাকে বললাম, মা কি সেই অতি মানস আমাকে বলবে মা? মা যা বললেন সেত অত্যাচার্য্য ব্যাপার। মা বললেন "তুমি সেই অতি মানস স্রষ্টা। তোমাকেই আমি চিহ্নিত করেছি লোক শিক্ষার জন্য। আসুরিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল হ'য়েছে। এই শক্তি এখন মহা সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি করতে ব্যস্ত হ'য়েছে। এই সঙ্ঘর্ষ অনুষ্ঠিত হ'লে মহা প্রলয়ের মত সকল পৃথিবী এক মহাধ্বংশ লীলায় পর্য্যবসিত হবে। যে শক্তি আত্মস্বার্থ বাদী, জড় বাদী, পরশ্রীকাতর ও দাম্ভিক সেই শক্তি এখন কার্য্য করছে। সে শক্তি একটা অঘটন ঘটাবেই। কিন্তু সেই অঘটন ব্যাপক হবে না। আত্মদর্শী ভগবৎ প্রেমিকগণ সেই ব্যাপক ধ্বংশ কার্য্যের ভীষণ প্রতিবাদ করবে। জগতের জনগণ এই শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করবে। একটা ঘোরতর মানসিক বিপ্লবের ভিতর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, অরাজকতার হস্তে পতিত হবে। সকলেই ভাববে সকলেই বলবে কে এর সমাধান করে দিতে পারে? জ্ঞান আছে, ঈশ্বর বিষয়ক শ্রদ্ধা আছে, প্রেম

আছে কিন্তু নাই মহাচৈতন্য, নাই আত্মনির্দ্দেশ, নাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। বিগত যুগের ঈশ্বর প্রেমিকদের আদর্শ আজ আর তেমন মানব মনকে চৈতন্ত দিতে পারে না। সমস্যাবহুল বৈরীভাবাপন্ন জীব-জগতে আজ এমন আদর্শ মানবের প্রয়োজন যে প্রতক্ষ্যভাবে আমাকে সকলের কাছে দর্শন করাবে। যুগ যুগ ধরে মানবগণ মহাপুরুষদের কাছে আমার তত্ত্ব অনেক শুনেছে, জেনেছে ও জ্ঞান লাভ করেছে। কিন্তু আমার সাক্ষাৎ দর্শন না হওয়ায় সকল মানব অন্তর বিশ্বাসের উপরেও, ভক্তির উপরেও, আমার অস্তিত্বের উপরও প্রশ্ন করেছে। মহাপুরুষদের অনুগমন করেছে পুণ্য অর্জ্জনের জন্যে। তাঁদের বাণী বক্ষে ধারণ করেছে' দুঃখ, শোক, অপনোদনের জন্যে। তাদের মৃত্যুভয় নিবারণ করায় জন্যে স্বর্গবাস ও সুখলাভ করবায় জন্যে। দক্ষিণ হস্তে আমার প্রেরিতদের প্রদর্শিত কার্য্য করেছে আর বাম হস্তে বৈরীতা সাধন করেছে। আত্মানুসন্ধান করে নাই করেছে আত্মবিনাশ। দেবশক্তি ছেড়ে আসুরিক শক্তির উপাসনা করেছে। এই যুগে আজ এমন মানবের প্রয়োজন যে মহাশক্তিসম্পন্ন হ'য়ে আমার চির স্থির ও প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানতা ও আমার স্বরূপ প্রত্যেক জীবকে দর্শন করাতে পারবে। সে মানব তুমি। ভেবে দেখ তোমার সাধন সোপান কেমন ধাপে ধাপে চলেছে। আমার দর্শন, তোমার আত্মদর্শন, তোমার পূর্ব্ব জন্মদর্শন, মধ্যমণি দর্শন, ও গোলক ও পরব্রহ্মলোক দর্শন, স্বর্গ দর্শন, স্বর্গে তোমার অবস্থান, তোমার মহাউদ্দেশ্য যা, তার জন্যে মহাত্মাগণ তোমাকে যে অভিষেক করে সংসারে পাঠালেন সেটা দর্শন, যত যত মহাপুরুষ আছেন তাঁদের দর্শন, স্বর্গে তোমার জন্যে যে সম্মিলন হোল তোমাকে অর্থ দেবার উদ্দেশ্যে সেখানে মহাযোগী শ্রীশিব দর্শন, শ্রীঅরবিন্দ দর্শন, মহাপুরুষদিকের ভিতরে কে শ্রেষ্ঠ সেটা জ্ঞাত হওয়া, কতবার মাতৃদর্শন, তোমার সাধনায় ভক্ত যোগী মহাপুরুষদের সাহায্য, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, জগতের কিসে মুক্তি তা প্রত্যক্ষ সূত্র দর্শন, জগতের ধর্ম্ম কি তা জানা, মানবের কর্ত্তব্য কি সেটা জানা ইত্যাদি—যা কিছু হ'য়েছে তোমার সবই সেই মহান লোক শিক্ষার

আমি তোমার একান্ত সহায়—আমিই মহাচৈতন্য ও বিশুদ্ধ চৈতন্য তোমার চৈতন্যের সংস্পর্শে।"

আমার মাগো একি লীলা তোমার? আমাকে এত সব জ্ঞান দিয়ে কি করবি মা? আমি যে অজ্ঞান। আমি যে অবোধ শিশু মা। আমি যে মা দুর্ব্বল। আমাকে দিয়ে তুই তোর কাজ করিয়ে নে মা। তোর হাতে আমি আমাকে সমর্পন করলাম মা।

৯ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় পড়লাম যে শ্রীঅরবিন্দের ভক্তগণ ১৪ই এপ্রিল দেশপ্রিয় পার্কে উৎসব করছেন। শ্রীঅরবিন্দ যে ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন "১৯৫৭ খৃঃ পরে এক অতি মানসের অরবির্ভাব হবে ও সেই সময় অসুরিক শক্তি প্রবল হবে।" শ্রীযুক্ত মণিকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয় সেই ভবিষ্যৎ বাণী জগতের জনগণের উপরে তার কি প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে তার ব্যাখ্যা ইত্যাদির জন্যে সম্মিলন আহ্বান করেছেন।

মাকে বললাম, মা কি সেই অতি মানস আমাকে বলবে মা? মা যা বললেন সেত অত্যাচার্য্য ব্যাপার। মা বললেন "তুমি সেই অতি মানস স্রষ্টা। তোমাকেই আমি চিহ্নিত করেছি লোক শিক্ষার জন্য। আসুরিক শক্তি অত্যন্ত প্রবল হ'য়েছে। এই শক্তি এখন মহা সঙ্ঘর্ষ সৃষ্টি করতে ব্যস্ত হ'য়েছে। এই সঙ্ঘর্ষ অনুষ্ঠিত হ'লে মহা প্রলয়ের মত সকল পৃথিবী এক মহাধ্বংশ লীলায় পর্য্যবসিত হবে। যে শক্তি আত্মস্বার্থ বাদী, জড় বাদী, পরশ্রীকাতর ও দাম্ভিক সেই শক্তি এখন কার্য্য করছে। সে শক্তি একটা অঘটন ঘটাবেই। কিন্তু সেই অঘটন ব্যাপক হবে না। আত্মদর্শী ভগবৎ প্রেমিকগণ সেই ব্যাপক ধ্বংশ কার্য্যের ভীষণ প্রতিবাদ করবে। জগতের জনগণ এই শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করবে। একটা ঘোরতর মানসিক বিপ্লবের ভিতর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, অরাজকতার হস্তে পতিত হবে। সকলেই ভাববে সকলেই বলবে কে এর সমাধান করে দিতে পারে? জ্ঞান আছে, ঈশ্বর বিষয়ক শ্রদ্ধা আছে, প্রেম

আছে কিন্তু নাই মহাচৈতন্য, নাই আত্মনির্দ্দেশ, নাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী। বিগত যুগের ঈশ্বর প্রেমিকদের আদর্শ আজ আর তেমন মানব মনকে চৈতন্য দিতে পারে না। সমস্যাবহুল বৈরীভাবাপন্ন জীব-জগতে আজ এমন আদর্শ মানবের প্রয়োজন যে প্রত্যক্ষভাবে আমাকে সকলের কাছে দর্শন করাবে। যুগ যুগ ধরে মানবগণ মহাপুরুষদের কাছে আমার তত্ত্ব অনেক শুনেছে, জেনেছে ও জ্ঞান লাভ করেছে। কিন্তু আমার সাক্ষাৎ দর্শন না হওয়ায় সকল মানব অন্তর বিশ্বাসের উপরেও, ভক্তির উপরেও, আমার অস্তিত্বের উপরও প্রশ্ন করেছে। মহাপুরুষদের অনুগমন করেছে পুণ্য অর্জ্জনের জন্যে। তাঁদের বাণী বক্ষে ধারণ করেছে' দুঃখ, শোক, অপনোদনের জন্যে। তাদের মৃত্যুভয় নিবারণ করার জন্যে স্বর্গবাস ও সুখলাভ করবার জন্যে। দক্ষিণ হস্তে আমার প্রেরিতদের প্রদর্শিত কার্য্য করেছে আর বাম হস্তে বৈরীতা সাধন করেছে। আত্মানুসন্ধান করে নাই করেছে আত্মবিনাশ। দেবশক্তি ছেড়ে আসুরিক শক্তির উপাসনা করেছে। এই যুগে আজ এমন মানবের প্রয়োজন যে মহাশক্তিসম্পন্ন হ'য়ে আমার চির স্থির ও প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানতা ও আমার স্বরূপ প্রত্যেক জীবকে দর্শন করাতে পারবে। সে মানব তুমি। ভেবে দেখ তোমার সাধন সোপান কেমন ধাপে ধাপে চলেছে। আমার দর্শন, তোমার আত্মদর্শন, তোমার পূর্ব্ব জন্মদর্শন, মধ্যমণি দর্শন, ও গোলক ও পরব্রহ্মলোক দর্শন, স্বর্গ দর্শন, স্বর্গে তোমার অবস্থান, তোমার মহাউদ্দেশ্য যা, তার জন্যে মহাত্মাগণ তোমাকে যে অভিষেক করে সংসারে পাঠালেন সেটা দর্শন, যত যত মহাপুরুষ আছেন তাঁদের দর্শন, স্বর্গে তোমার জন্যে যে সম্মিলন হোল তোমাকে অর্ঘ দেবার উদ্দেশ্যে সেখানে মহাযোগী শ্রীশিব দর্শন, শ্রীঅরবিন্দ দর্শন, মহাপুরুষদিকের ভিতরে কে শ্রেষ্ঠ সেটা জ্ঞাত হওয়া, কতবার মাতৃদর্শন, তোমার সাধনায় ভক্ত যোগী মহাপুরুষদের সাহায্য, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, জগতের কিসে মুক্তি তা প্রত্যক্ষ সূত্রে দর্শন, জগতের ধর্ম্ম কি তা জানা, মানবের কর্ত্তব্য কি সেটা জানা ইত্যাদি—যা কিছু হ'য়েছে তোমার সবই সেই মহান লোক শিক্ষার

উদ্দেশ্যে। তোমার শিগ্রই এমন শক্তি হবে যে, যাকে স্পর্শ করবে সেই রোগমুক্ত হবে, যাকে স্পর্শ করবে সেই অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে ও যাকে স্পর্শ করবে সেই আমার দর্শন পাবে। আমি আর এখন তোমাকে ছাড়া আধার ধরব না। তোমার দ্বারা আমি এবার জগতে মূর্ত্ত হব, সাক্ষাৎ হব প্রতিমানবের অন্তরে। আমাকেই চাইবে, মহাপুরুষদের আমার আসনে বসাবে না তারা। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমি যোগে যুক্ত হব। মহাপুণ্যময়, শান্তিময় আনন্দ পরাবারে জগতজন আমার দ্যুতিতে অন্থলিপ্ত থেকে সংসারের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করবে। বৈরীতা থাকবে না, মলিনতা থাকবে না, অন্যায় থাকবে না, থাকবে সরল মাতৃদর্শনের পুণ্যপ্রবাহ। মাতৃদর্শনের পূর্ণ সার্থকতার ভিতর দিয়ে জগতজন এক প্রেম পরিবারের এক মহা আদর্শে এক মহানিস্বার্থে এক হয়ে যাবে। ভাই ভাই হয়ে যাবে। আমাকে দেখবে, আমাকে দেখাবে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ করবে,—আমার বিষয় আলোচনা করবে। আমি এবারে প্রত্যক্ষ হব। আর আমি নিরাকার নয়, সচল, সক্রিয় আকারে মানব পরিবারে আবিভূর্ত হব। সে আবির্ভাব কোনও মহান্ আত্মার মধ্যমে ছাড়া হবে না। হঠাৎ কোনও সাধারণ বা জনসাধারণের নিকট প্রত্যক্ষ হ'লে তারা ভয় পাবে, তারা বুঝতে পারবে না আমাকে বা আমার উদ্দেশ্য। তাই আমি মাধ্যম খুঁজছি ও তোমাকে আমার প্রিয়তম মাধ্যম বলে চিহ্নিত করেছি। তোমার দ্বারাই আমার স্বকার্য্য সাধিত হবে। আর আমার অপেক্ষা করবার সময় নাই। মানব এখন জ্ঞানী, তাদের মোহমায়ায় অন্ধ করে জড়-ধর্মী করে রেখেছে। এই জড়ধর্ম্ম অপসারিত হবে। এ হ'চ্ছে পরিণতি। কোটি কোটি বৎসর ও কাল গত হ'য়েছে। কোটি কোটি মানব জন্মগ্রহণ করেছে। কোটি কোটি জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে জীবাত্মা জ্ঞান ধর্ম্মী হ'য়েছে। কোটি কোটি সভ্যতা, জ্ঞানলোকের উন্মেষ হ'য়েছে, কত ভেঙেছে, কত গ'ড়েছে, জীব অগ্রসর হ'য়েছে সেকি নিরর্থক? দেহের সর্ব্বশেষ পরিণতি যেমন জ্ঞানও

বৃদ্ধত্বে এই মানব প্রবাহের পরিণতি এই সংসারেই অপার আনন্দে, আমাকে দর্শনে ও আমার সঙ্গে নিত্য লীলায়। আমার আকাঙ্খা এবার পূর্ণ হবে। এবার আমি প্রকট মূর্ত্ত ও প্রত্যক্ষ হব প্রত্যেক মানবের কাছে ও প্রত্যেক মানবের সঙ্গে আমি নিত্যানন্দ নিত্য খেলায় মগ্ন থাকব। শিশু, বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, জরাগ্রস্থ, সকলেরই এক ধ্যান, জ্ঞান হবে "আমি"। আমার নানারূপ নানাভাব সকলের বিশ্লেষণের বস্তু, ভাবনার বস্তু, দর্শনের বস্তু ও কর্ম্মের বস্তু হবে। জগত আমাময় হ'য়ে আমার একপরিবার হ'য়ে বহুদিন সুখে ও সমৃদ্ধিতে বাস করবে। তুমি সাধন করে যাও। এইবৎসরেই তোমার মহাশক্তি লাভ হবে। আমিই তোমাকে প্রকট্ করব। আমার নিজের উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে মুক্ত করব জীব সমাজে। কোথায়ও এখন তোমার যেতে হবে না। কোথায়ও এখন তোমার নিজ পরিচয় বা আমার কথা বলতে হবে না। আমার যখন প্রয়োজন হবে, সময় হবে সেই উপযুক্ত সময়ে তোমার কার্য্য তোমাকে আমিই করাব। ভাবনা কি? আমার মত শক্তিধর কেউ নাই। আমি যা ইচ্ছা করি তাই করি। সুতরাং আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে একান্তে সাধন কর। কঠিন সাধন, সর্ব্বক্ষণ সাধন কর। তোমার মহান্ কর্ত্তব্যের সময় নিকটবর্ত্তী।"

আমার একটা মাত্র মা আছে সে অপার করুণাময়ী—আমার জননী মা।

৯ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমি মাকে বললাম এ কি করে সম্ভব হবে? আমার মত ক্ষুদ্র, প্রগলভ, চঞ্চল চিত্ত, কামাশক্ত, অতি সাধারণ সংসারী মোহগ্রস্থ লোক তোমার এত বড় মহান্ কার্য্যের ভার কি করে নেবে? কি করে এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে? লোক আমার কথা কি শুনবে? আর এত এত সাধু, ভক্ত, জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তি থাকতে তুমি আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তিকে তোমার কাজের জন্যে বেছে নিলে সেকি সত্যি? মা বললেন "সত্যি, সত্যি, এ মহাসত্য। তুমি যে কে তার কতটুকু তুমি নিজে জান? তুমি যে কে তার কতটুকু পৃথিবীর মানব

জানে? তোমার কত লক্ষ লক্ষ জন্ম হ'য়েছে, কোন জন্মে তোমার কি উন্নতি হ'য়েছে, এই মানব প্রবাহের প্রতিযোগিতায় তুমি কেন প্রথম স্থান অধিকার করলে তার দ্রষ্টা ও বিচারক আমি ভিন্ন ত আর কেউ নাই। সুতরাং তোমার এ চিন্তা নিরর্থক যে তুমি অতি সাধারণ। তুমি সাধারণ নও। অসাধারণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, শ্রেষ্ঠ যোগী, শ্রেষ্ঠ ভক্ত যাকে আমি যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ জন্মান্তর ধরে চিহ্নিত করে এনেছি এই কার্য্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। ঘোর নরহত্যাকারী যদি শ্রেষ্ঠতম যোগীও ব্রহ্মজ্ঞানী হ'তে পারে, ঘোর সংসারী হ'য়েও তুমি শ্রেষ্ঠতম মানব কেন হ'তে পারবে না আমাকে বল? তোমার এসব ভাবনা ভাববার দরকার নাই। একান্তে আমার শরণাপন্ন হও, আমার মনোমত কঠিন সাধন কর। সর্ব্বক্ষণ যে জপ মন্ত্র তোমাকে দিয়েছি তাই কর। যা করবার সব আমি করব। আমার উপর সব ছেড়ে দাও।"

মা আমায় বল দাও মা, ভক্তি দাও মা, বিশ্বাস দাও মা, নির্ভয় দাও মা। প্রাণে মহাশক্তি দাও। মাগো আমার মা। করুণাময়ী জননী।

১০ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম আজ কিছু বল মা। মা বললেন, "ধর্ম্মান্ধ হ'য়ো না"। আমি মাকে বললাম যে এ কথার ত ঠিক তাৎপর্য্য বুঝতে পারলাম না। ভাল করে বুঝিয়ে বল মা। মা বললেন, "শোন, অন্ধ অর্থ হ'চ্ছে দৃষ্টিহীন। দৃষ্টি হ'চ্ছে তোমার বাহিরের জিনিষ দেখা। অর্থাৎ সম্প্রসারণ। বাহিরের যা কিছু সব দিকে তোমার দৃষ্টি-যোগ সম্প্রসারিত হ'চ্ছে। এই দৃষ্টিই হ'চ্ছে বিকাশ বা সম্প্রসারণ। যখন এই দৃষ্টি সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় সে অবস্থার নাম অন্ধতা। তার অর্থ যে বাহিরে তোমার দৃষ্টির বিকাশ বা সম্প্রসারণ নাই। ধর্ম্ম কি একদিন তোমাকে বলেছি। ধর্ম্ম হ'চ্ছে গতি। প্রত্যেক জীবের যে গতি সেই তার ধর্ম্ম। এই গতির সম্প্রসারণ বা বিকাশ আকর্ষণই গতির ধর্ম্ম। এই গতি

ত্যাগ করলে জীবের অস্তিত্ব থাকবে না ও ধর্ম্ম ত্যাগ বলে। জল মৎসের গণ্ডি ও তার ধর্ম্ম—সে জলজ বা জলধর্ম্মী জীব। তাকে জল থেকে বাইরে আনলে সে জীবিত থাকে না বা তার স্বধর্ম্ম ত্যাগ বলে। মানব-ধর্ম্ম হ'চ্ছে নিজ গণ্ডিতে থেকে তাকে সম্প্রসারণ বা বৃহৎ গণ্ডিকে আকর্ষণ করা। এই গণ্ডি ধর্ম্ম দুই প্রকার। এক হ'চ্ছে দেহজাত গণ্ডি আর এক হ'চ্ছে আত্মজাত গণ্ডি। রিপু সকল যখন স্থূল তখন তারা দেহজাত গণ্ডি বা দেহ ধর্ম্ম। কিন্তু সকল রিপুর সম্প্রসারণ বা বিকাশই আত্মজাত গণ্ডি বা আত্মার ধর্ম্ম। কাম যখন নারীদেহ কামনা করে তখন সে দেহ ধর্ম্মী, আর কাম যখন আমাকে কামনা করে তখন সে আত্মধর্ম্মী। এইরূপে সকল রিপু দেহধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম স্বরূপগত। এই রিপুর গণ্ডি ত্যাগ করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু একে বিকাশ করা জীবের সাধ্যের ভিতর। কামকে দেহধর্ম্মী থেকে আত্মধর্ম্মী করা জীবের পক্ষে সহজসাধ্য। কিন্তু এই কাম-গণ্ডিই জীবের ধর্ম্ম। দেহজাত কামগণ্ডিও তাকে মানতে হবে আবার সেই দেহজাত গণ্ডিকে বিকাশ করে আত্মজাত গণ্ডিতে সম্প্রসারণ করে অপার আনন্দ উপলব্ধি করতে হবে। দেহজাত কামকে ভোগ করলে যে সুখ হয় তার উপলব্ধি মানবের পক্ষে প্রয়োজন। তবেই সে ঈশ্বর কামনায় যে কত অপার আনন্দ সে বুঝতে পারে ও সেই বোধ শক্তিতে আর তার দেহজাত কাম থাকে না। একজন্মে যদি এই দেহজাত কামকে সম্প্রসারণ করে আমার কামনায় জীবাত্মা নিজেকে মুক্ত করতে না পারে তবে আবার তার দেহধারণ অনিবার্য্য। একটি ছোট রোহিতের (রুহিত মৎস) বাচ্চাকে একটি ছোট চৌবাচ্চার ভিতরে অনেক দিন রাখ ও তাকে বড় কর তারপর তাকে তুমি নিয়ে সমুদ্রে ছেড়ে দাও। চৌবাচ্চার জলও তার গণ্ডি বা ধর্ম্ম আবার সমুদ্রের জলও তার গণ্ডি বা ধর্ম্ম। কিন্তু সে সমুদ্রে প'ড়ে অপার আনন্দে মুক্ত হবে যদিও সে সমুদ্রের অসীমতা উপলব্ধি করতে পারবে না তবুও সে যে এক মহান্ গণ্ডিতে এসেছে-সে সেটা বুঝতে পারবে। সে তাড়াতাড়ি বৃহদাকার হ'য়ে উঠবে। যদি তাকে তার সারা জীবন সেই

ক্ষুদ্র চৌবাচ্চার ভিতরে রাখ তার বৃদ্ধি হবে না তার দেহের বর্ণ স্বাভাবিক হবে না। সেইরূপ মানব। মানব বা জীব যদি দেহজাত স্থূল বিষয়ে অর্থাৎ ক্ষুদ্র গণ্ডিতে (সে গণ্ডি যদিও তার ধর্ম্ম) থাকে তবে তার স্বাভাবিক উন্নতি হয় না। তার ক্ষুদ্রতা থাকে তার হীনতা থাকে-তার-দিব্য-দেহ হয় না। আর যদি সে সেই গণ্ডিতে থেকে মহান্ অসীম গণ্ডিতে নিজেকে নিয়ে আসতে পারে তবে তার প্রভূত আনন্দ, তার ক্ষুদ্রতা থাকে না হীনতা থাকে না ও সে দিব্য দেহ পায়। এই যে সব দেহজাত রিপু এ সব একই গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত ও এই রিপু সকলকে যদি বিভিন্ন ভাবে বা একভাবে—আমার দিকে ধাবিত করাও তবে তোমার স্বভাবজাত গণ্ডির মহান্ উন্নতি ও বিকাশ হবে। সুতরাং এই দেহজাত স্থূল গণ্ডিতে মোহগ্রস্থ হ'য়ে লিপ্ত থাকাই হ'চ্ছে **"ধর্ম্মান্ধতা"** ও এই ধর্ম্মান্ধতা ত্যাগ করতে হবে। বিশ্বাস অন্ধ হওয়া উচিত কিন্তু ধর্ম্মান্ধ হওয়া জীবের সম্যক বিকাশের ঘোর পরিপন্থি। ধর্ম্ম বিকাশ বা গণ্ডির সম্প্রসারণ যে জন্মে যত বেশী হবে তত জন্মান্তর পরিক্রমা কমে যাবে ও শিঘ্র আমার সান্নিধ্য লাভ হবে। তবে একটা বিষয় বিশেষ ভাবে বুঝতে চেষ্টা কর। সেটা হ'চ্ছে দেহজাত রিপু—বল, হীনতা, ক্ষুদ্রতা যা বল সবেরই-প্রয়োজন ও তারা অনন্ত উন্নতিরই সহায়ক। ক্ষুদ্রতা, হীনতা, দেহজাত রিপুর বিকার এ সবের প্রয়োজন না থাকলে আমার এ সব সৃষ্টির কোনও অর্থ হয় না। আমি যা সৃষ্টি করি সবের অর্থ আছে, প্রয়োজন আছে। কোনটাই নিরর্থক নয়। এই ক্ষুদ্রতা, হীনতা, রিপু বিকার না থাকলে কি অপার আনন্দে বা আমার যোগে সুখ হ'ত জীবের? তুলনা মূলক না হ'লে সেটার কোনও অর্থ থাকে না। সেটা নিরর্থক বা তার পরম বৈচিত্র আত্মাকে প্রলুব্ধ বা আকৃষ্ট করে না। সুতরাং কিছুই উপেক্ষা, উপহাস বা ঘৃণা করবে না। মনে রাখবে সব আমার সৃষ্ট। আমার সৃষ্ট কোনও কিছু উপেক্ষা করলে আমাকে উপেক্ষা বা অবিশ্বাস করা হয়। সে দিকে তুমি যাবে না।" মা আমার সর্ব্বজ্ঞান দায়িনী জননী গর্ভধারিনী জননী। মা গো।

১০ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মা বললেন " "অ" এবং "আ" একই। শুধু প্রকার ভেদে আকার ভেদ। "অ" হ'চ্ছে অনন্ত আর "আ" হ'চ্ছে আদ্যান্ত। "অ" হ'চ্ছে অসীম আর আকার "অ' হ'চ্ছে সীমা। আগে অসীম পরে সীমা। আগে আমি পরে জীবাত্মা। জীবাত্মা আকারে জড়দেহ ধারী। আমার 'অ' কে "া' দিয়েছি জগত সংসার সৃষ্টি করে। 'অ' আদি, "অ' অক্ষর, আমিই অক্ষর। অক্ষর ব্যাপ্তি। "অ' সব বর্ণেই আছে। "অ' ওতঃ প্রোতঃ। "অ, তে আকার দিলেই আকার। আকার অর্থই জগত সংসার, আকারেই আমার অভি ব্যাক্তি। আমি আকারে ব্যক্ত। তিনটি বর্ণ শ্রেষ্ঠ "ত" "ন" "অ"। "ত" বিন্দু থেকে অসীমে ব্যাপ্তি ও অসীম থেকে বিন্দুতে অনুগমন। "ত" কে নিত্য কর "ন" রূপ "া আকার দিয়ে। এই "ন" সকল বর্ণেই এক ভাবে না একভাবে ব্যক্ত। বিন্দু থেকে যে উৎপত্তি তাকে "ন" রূপ নিত্য দিয়ে "অ" "ত া" অক্ষর ব্রহ্মের উপলব্ধি কর।"

এ সব কি বলছ আমাকে মা? এর যে কি তাৎপর্য্য কিছুই বুঝতে পারছিনা মা। আমাকে সবল জ্ঞান দাও মা।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

তুই মা আমার সাক্ষাৎ ভগবতী। প্রতি নারীতেই তুই "মা' হ'য়ে আছিস্। তুই আমার মাতৃময়, মাতৃরূপা জগদ্ধাতৃ-জননী। এত জ্ঞান দিচ্ছিস্ তাওত কিছু হ'চ্ছে না। এখনও চঞ্চলতা গেল না। আমার স্বভাব খারাপ তার তুই কি করবি মা? তোর-তো চেষ্টার ত্রুটি নেই মা। কত বোঝাস্, কত পড়াস্, কত শিক্ষা দিস্ আমি যে সেই র'য়ে গেলাম। গেল না আমার "আমি" ভাঙ্গল না আমার মোহ। দেহের মোহ এমনই মোহ যে যত সম্পদই দিস না কেন একে ভুলতে পারিনা। আস্তাকুড় ঘেঁটে মরলাম, যা পেলাম শুধু ছাই পাঁস। যদি মন থাকত, যদি খাঁটি হ'তাম তবে এই আস্তাকুড়ের ভিতরে মাণিক্য পেয়ে যেতাম। তোর সোনা যে সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে মা। শুধু

কুড়িয়ে নিতে জানলে হয়। তাই ত' কিছু হোল না। কত শিক্ষার ব্যাবস্থাই ক'রে রেখেছিস্ মা—নিলাম না একটাও শুধু আমিত্বের দোষে। আমাকে আরও শেখা মা। তুই আমার ভগবতী, ভাগ্যবতী মা সারাৎসারা। মাগো আমার মা।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

সারা বিশ্বে বিজ্ঞানের জয় জয় কার হ'চ্ছে মা। কেউ বলছে মঙ্গল গ্রহে জীব নাই, কেউ বলছে আছে। চন্দ্রেতে জীব নাই, কেউ বলছে আছে। কাগজে পড়ি আর তোর মুখ দেখি। তুই খুব হাস্‌ছিস্। ভাবছিস্ শিশু-গুলো ছাই পাঁস নিয়েই ভাত ভাত খেলছে। কেউ বলছে এটা ভাত কেউ বলছে এটা ছাই পাঁক। তুই খালি দেখছিস মা। এদের দৌড় কতদূর তাই শুধু দেখছিস্। কত জনে কত গভীর গবেষণা করছে ও তারা মহাজ্ঞানী বলেও কত সম্মান পাচ্ছে। লোক বলছে এ একটি জ্ঞানীর মত জ্ঞানী। তুই শুধু হাসছিস্ মা। ভাবছিস পুতুল ঘরের খেলায়—শিশুরাওত কত কি বলে, করে। ছেলের বিয়ে দেয়, মেয়ের বিয়ে দেয়, সংসার করে—সব ওই পুতুল নিয়ে। তায় আবার ওদের মধ্যেই একজন আর একজনকে খুব বাহাবা দেয়। এও যে তাই মা তোর কাছে। এমন করে রেখেছিস যে জড় জ্ঞানে এরা কিছুই জানতে পারবে না। যতই জড় জ্ঞান শিখবে ততই জড় হয়ে যাবে, এদের আসল চক্ষু কবে খুলবে মা? তোর কাছে জ্ঞানের জন্য গেল না। ভাবল আমিই ত' মস্ত জ্ঞানী হ'য়েছি, ব্রহ্মাণ্ডের সকল কথা শুনিয়ে লোককে তাক্ লাগিয়ে দেব। এই আমিত্বেই-ত' সব ডুবে গেল। এই অহঙ্কারেই ত' সব জড়িয়ে গেল মা। এরা যদি তোর কাছে আসত, তোর জ্ঞান পেত মা তবে কি আর এদের জড় জ্ঞান থাকত? তুই যে মহাচৈতন্যরূপিনী হ'য়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছিস মা, সে ত' এরা বুঝলনা আজও। তুই যে মহাচৈতন্য হ'য়ে জীব-চৈতন্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছিস্ সে কে বুঝবে মা। তোর সৃষ্টির সকলখানে যে জীবচৈতন্য রয়েছে মা। এমন একটা গ্রহ নাই যাতে জীবচৈতন্য নাই—।

জীবচৈতন্য না থাকলে যে তোর সৃষ্টিই বৃথা হয় মা। তুই যদি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, তুই যদি সারাৎসারা—মহাচৈতন্যরূপিনী তবে কি মা চৈতন্যবিহীন গ্রহ থাকতে পারে? জীবচৈতন্য যে সকল গ্রহতেই আছে। সারা ব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণুতে জীবচৈতন্য ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। জীবচৈতন্য না থাকলে যে তুই সেখানে নাই মা। তোর ব্রহ্মাণ্ডে ত' এমন স্থান নাই যেখানে তুই নাই। তাই তো মা তোর ব্রহ্মাণ্ডে এমন স্থান নাই যেখানে জীবচৈতন্য নাই। জীবচৈতন্য তোমার মহাচৈতন্যে আর তোমার মহাচৈতন্য জীবচৈতন্যে পরিব্যাপ্ত মা। একি এরা বুঝবে মা? এরা করবে পুতুল নিয়ে নাচানাচি। বুঝবে না তোকে। এবার আয় এদের মাঝে। বুঝিয়ে দে মা যে সর্ব্বস্থানে জীবচৈতন্য আছে। এমন স্থান নাই যেখানে জীবচৈতন্য নাই। জড় বিজ্ঞানে তারা জানতে পারবে না। পারবে ব্রহ্মজ্ঞানে, মনোবিজ্ঞানে যে সকল গ্রহে জীবচৈতন্য আছে। সারা ব্রহ্মাণ্ড তোর জ্যোতিতে জীবচৈতন্য উদ্ভব হ'য়েছে ও অহর্নিশ হ'চ্ছে। এত এদের বিজ্ঞান নয় মা, এ যে এদের অজ্ঞান। তোর মহাবিজ্ঞান এরা শিখল কই? তোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজের বলে কত কি খেলা খেলে যাচ্ছে। কিন্তু থই পাচ্ছে কোথায় মা? তোর জ্ঞানে কি থই আছে মা? তুই যে অসীম অগাধ জ্ঞান সমুদ্রে। মাগো তুই এদের জ্ঞান দে মা। এরা এবার বেঁচে যাক। মাগো আয় মা সবার অন্তরে তোর জ্ঞানের মত জ্ঞান নিয়ে—। মাগো আমায় তোর জ্ঞান দে মা।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, ১লা বৈশাখ ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম বল্ মা কিছু বল্। মা বললেন "শোন্ বলছি। স্মরণ, মনন, ও শ্রাবণ, এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ধ্যান বা আমার সঙ্গে যোগ। স্মরণে আমি জাগ্রত, মননে আমি মূর্ত্ত আর শ্রবণে আমি সাক্ষাৎ। স্মরণ হ'চ্ছে মৎকার, মনন হ'চ্ছে সৎকার আর শ্রবণ হ'চ্ছে বৃৎকার। এ তো ভাল করে বুঝতে পারলাম না মা। মা বললেন 'বুঝিয়ে দিচ্ছি। স্মরণই জাগরণ।" তবে কি চেতনা ঘুমায়?' হাঁ, চেতনা যখন অর্থ, বিত্ত, সংসার, স্ত্রী-পুত্র

ইত্যাদিতে স্থিত হয় তখন তার নিদ্রিত অবস্থা। এও তার দরকার তা না হলে দেহ-ধর্ম্ম সাধন হয় না। কিন্তু চেতনা যখনই আমাকে স্মরণ করল তখনই সে জাগ্রত হোল। জাগ্রত হ'লেই হোল না, জেগে উঠে সে আমাকে মনন করবে অর্থাৎ আমার সঙ্গে যোগ করবার চেষ্টা করবে। আমার সঙ্গে যোগ করলেই হোল না। আমার সঙ্গে তার বাক্যালাপ হওয়া দরকার। বাক্যালাপ না হ'লে আত্মার সম্পূর্ণ প্রতীতি হয় না। এখন শোন, স্মরণ মৎকার বা আমার কার্য্য অর্থাৎ আমার প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য সেই কর্ত্তব্য করাকেই স্মরণ বলে। জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হ'চ্ছে আমাকে স্মরণ করা অর্থাৎ আমাকে মনে করা এতে আমার অত্যন্ত সুখ হয়। আমার সন্তান আমাকে স্মরণ করবে—এই ত' আমার একমাত্র অভিলাষ। বহুলোকে শুধু আমাকে স্মরণ করে তারা আর অগ্রসর হয় না। একবার কি দু'বার স্মরণ করেই—অর্থাৎ জাগ্রত হ'য়েই আবার বিষয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে। একেই মৎকার বলে। এতেও জীবের প্রভূত উন্নতি হয়। দিনান্তে একবারও স্মরণ করলে তার সকল মালিন্য স্খালন হয়। কিন্তু বহুলোক আমাকে স্মরণ করেই ক্ষান্ত হয় না। তারা আমার সঙ্গে মনন করে অর্থাৎ আমার সঙ্গে যোগ করে, আমার গভীর সত্তাতে প্রবেশ করে আমার অনন্ত সত্তা উপলব্ধি করে। এইযে আমার অনন্ত সত্তা উপলব্ধি করা এই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ সৎকার্য্য। কারণ সে আমাকে চায় আমার প্রেমে বিগলিত হয়। আমার লীলা দেখতে চায় ও দেখতে পায়। এই যে উপলব্ধি এই হ'চ্ছে কার্য্য ও সৎকার্য্য। অনেক সৎকার্য্য আছে যেমন পরসেবা, দরিদ্রসেবা, স্নেহ দান, প্রেম দান, ভক্তি দান, বিশ্বাস দান ইত্যাদি এসবই সৎকার্য্য। কিন্তু জীবের শ্রেষ্ঠ সৎকার্য্য আমাকে মনন করা। তা হ'লে সকল কর্ত্তব্যে ও সকল সৎকার্য্যে জীবের অভিলাষ হয়। তখন জীব মহৎ হয় ও তার সমত্ব ভাব আসে। সর্ব্ব জীবে দয়া হয় ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে জীব সর্ব্বজীবে আমাকে দর্শন করে। এখন তুমি শোন, শ্রবণ হচ্ছে বৃৎকার অর্থাৎ বৃহৎকার্য্য। এ সবের উপরেও যে শ্রেষ্ঠ কার্য্য সেটা হ'চ্ছে বৃৎকার বা শ্রবণ। অতি অল্প লোক এ পথে যায়।

বহু লোক মনন করে ও মনন করেই ক্ষান্ত হয় আর অগ্রসর হয় না। কিন্তু যারা মননের পরে শ্রবণে আসে অর্থাৎ মননের পর আমার বাণী শ্রবণ করে তারা শ্রেষ্ঠতর কার্য্য করে ও আমার শ্রেষ্ঠতর সাধক। এই যে শ্রবণরূপ বৃৎকার এতে সাধকের মহাসম্পদ লাভ হয়। যত সত্য, যত ব্রহ্মজ্ঞান, যত দিব্যজ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি ও আমার সঙ্গে গভীর একাত্ম ও আমার একান্ত ভাব লাভ হয়। এইবার সম্পাদন। এইবার শোন বাণী শ্রবণই শেষ নয়। আমার বাণী শ্রবণ ও সেই মত কার্য্য করা হ'চ্ছে অতি কঠিন। কোটি কোটি লোক আমাকে স্মরণ করে আর অগ্রসর হয় না। সেই কোটি কোটি লোকের ভিতরে অল্প লোক আমাকে মনন করে কিন্তু আর অগ্রসর হয় না। তার ভিতরেও অল্প লোক আমার বাণী শ্রবণ করে। এই যে আমার বাণী শ্রবণ সেটা জগতের ভিতরে অতি সামান্য সংখ্যার লোক করে। কিন্তু আমার বাণী যারা শ্রবণ করে তাদের ভিতরে কেবল ২।১টি আমার বাণী শুনে আমার নির্দ্দেশিত কার্য্য করে ও জীবনে পালন করে। এরাই হ'চ্ছে সর্ব্বোত্তম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব। এ অবস্থায় মানব মহাজ্ঞানী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ হয়। এরূপ ব্যক্তি সংসারে ২।১জন ছাড়া জন্মগ্রহণ করে নাই। এরা আমার শ্রেষ্ঠতম সন্তান ও জগতের প্রকৃত উদ্ধার কারক। তোমার স্মরণ আছে, মনন আছে, শ্রবণও আছে এখন তোমার আমার নির্দ্দেশমত কার্য্য করার প্রয়োজন। তা হ'লে তোমার মত মুক্ত আর কেউ হবে না। আমার প্রতিটি নির্দ্দেশ শ্রবণ করে সেই মত কার্য্য কর। একটিরও যেন ব্যতিক্রম না হয়। তা হ'লে জীবন এক মহাশক্তিতে ভ'রে যাবে। অসীম ঐশ্বর্য্য ধন-সম্পদ, সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হবে। সকল মানব তোমার কাছে মস্তক অবনত করবে। মহাশক্তিধর হবে। যেভাবে সাধন করছ করে যাও। আমি তোমার সব করব। তুমি আমার চিহ্নিত শ্রেষ্ঠতম সন্তান। বিশ্বাস কর—।"

মা বড় দুষ্টু মা। আমি তোর দুষ্টু ছেলে মা। মাগো মাগো মাগো।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো আজ থেকে যে বৎসর আরম্ভ হলো সেটা হোল আমার সাধনেরই বৎসর। এই বৎসর প্রতিক্ষণে তুই আমাকে নির্দ্দেশ দিবি মা। আর অসীম বল ও প্রতিজ্ঞা দিবি মনে প্রাণে যেন তোর প্রতিটি নির্দ্দেশ পালন করে এই বৎসর তোর একান্ত হ'তে পারি মা। মা গো আমার যা হবার তাও তুই না দিলে ত আমার হবে না মা। প্রেম দে, অহৈতুকী ভক্তি দে, জীবন্ত বিশ্বাস দে, গভীরতম নির্ভর দে, গৃহ দে, বিত্ত দে, অর্থ দে, নির্ম্মল বিবেক দে, ব্রহ্মজ্ঞান দে, দিব্যজ্ঞান দে, দিব্যদৃষ্টি দে, দিব্যভাব দে, ভাগবতীতনু দে, বীর্য্য দে, তিতীক্ষা দে, ধৈর্য্য দে, সুখ-সম্পদ দে, স্বাস্থ্য দে, মহাশক্তি দে, মহা ঐশ্বর্য্য দে, দে মা তোর ভাণ্ডারে যত ঐশ্বর্য্য আছে সব আমায় দে। আমায় দিয়ে তোর মনের মত ছেলে করে নে মা আমাকে। তুই ছাড়া যেন আর কিছু জানিনা, বুঝিনা। তুই আমার সব। তুই তোকে আমায় দে মা। তুই আমার চোখের দৃষ্টিতে থাক মা; প্রাণের স্পন্দনে থাক মা; রক্তের ধারায় থাক মা, চিন্তার সূত্রে সর্ব্বক্ষণ থাক মা, মনের মানস হ'য়ে থাক মা, আমার ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ানী হ'য়ে আমার "আমির" ঘরে বাসা নে মা। মাগো তুই যে আমার সাক্ষাৎ মা গর্ভধারিণী জননী। তুই আমায় কেমন করে ভুলবি মা? আর আমিও কি তোকে ভুলতে পারি মা? তোর ধ্যান করতে করতে সব তুই হ'য়ে যা মা আমার মনে প্রাণে চোখে। তোকে ছাড়া আর যেন কিছু দেখি না মা। আমাকে এমন মহাশক্তি দে মা যাকে স্পর্শ করব সেই তোর দর্শন পাবে, যাকে স্পর্শ করব সেই রোগ মুক্ত হবে, যাকে স্পর্শ করব সেই অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই জগত তোর হবে। এই জগতের নরনারী তুই বিনা আর কিছু জানবে না বুঝবে না। পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। প্রেমে, দয়ায়, ভালবাসায়, নিঃস্বার্থে লোকের প্রাণ পূর্ণ হবে মা। এমনি ক'রে দে মা। আর যে নরনারীর দুঃখ দেখতে পারি না মা। এরা তোর সন্তান হ'য়ে তোকে ভুলেই ত' এই অবর্ণনীয় দুঃখ সাগরে ভাসছে। এদের দুঃখ

ঘুচিয়ে দে মা, এদের শান্তি দে মা, এদের ধন, বিত্ত, সম্পদ, স্বাস্থ্য দে মা। এদের তোর সন্তানের মত সন্তান করে বাঁচিয়ে দে মা। এরা যে গেল ধ্বংশ হ'য়ে। তোর সন্তান হ'য়ে কি এরা ধ্বংশ হ'য়ে যাবে? সংসারে এদের পাঠালি, যে সংসার হবে নন্দন কানন সেই সংসার হ'য়েছে এদের নরক। এদের রক্ষা কর মা। তুই রক্ষা না করলে যে এদের আর উপায় নাই। অনাচার, অত্যাচার, কুশাসন, অজ্ঞান, অন্ধতা, পরস্বাপহরণ, স্বার্থপরতা, রিপুর অধীনতা, ধৈর্য্যহীনতা, তিতিক্ষাহীনতা, দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, উৎপীড়ন, শাসকের নামে আসুরীক শক্তি, শাসনের নামে ঘোর অন্যায় কুশাসন, বিবেকহীনতা, আজ যে এদের চেপে ধরেছে মা। এমন একটা কিছু কর যাতে শাসকের চৈতন্য উদয় হয়। শাসকের আসুরীক শক্তির গর্ব্ব খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ধূলায় মিশে যাক্ মা। এরা যে ঘোর দুর্ব্বিনীত হ'য়ে উঠেছে। এরা মানবের মানবত্ব, দেবত্ব, মানুষের মনুষ্যত্বকে হেয়, হীন করেছে, পদদলিত করেছে অহঙ্কারে অজ্ঞানে। দে মা এদের সকল জারীজুরী ভেঙ্গে একদিনে। শিখুক এরা যে তোর শক্তির কাছে এরা কীটানু কীট্। উচিৎ শিক্ষা দে মা। এ কি ঘোর অরাজকতা মা। এমন হৃদয়হীনতা ত' আজ পর্য্যন্ত ভারতে আর হয় নাই মা। এর কি কোনও পথ নাই মা? তুই পথ দেখিয়ে দে মা। আর যে থাকতে পারছিনা। উপকার ত' কারুর করতে পারছিনা মা। দু'চারটি পয়সা দিলেই কি কারুর উপকার হয়? এ যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। সব যে ডুবে গেল মা। তুই এবার আয় মা। ধর হাল টেনে ধর। ভারতের নৌকা যে মাঝনদীতে ডুবতে বসেছে কতগুলো পশুর তাণ্ডবে। এদের উচিৎ মত শিক্ষা দে মা। তুই থাকতে ভারত ডুববে? তুই থাকতে বাঙ্গালী ডুববে? এবার এমন ভেল্কি লাগা মা যে পশুগুলোর তাক্ লেগে যাক্। ভ'য়ে পালাক্। এরা পশুর থেকেও অধম। এমন ক'রে শিশু, বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রীলোক ও সমস্ত মানব সমাজকে এরা ঘৃণা করতে সাহস পায়, তাদের অনাহারে রাখতে সাহস পায়? মা গো তুই আয় মা। আবার মহা ভীষণা মূর্ত্তিতে আয় মা অসুর নিধনে। তোর ভীষণা

মূর্ত্তি না দেখলে এরা শান্ত হবে না। আয় মা, আয় মা, আয় মা। মাগো আমার ডাকে আয় মা। আর কি কর্ত্তব্য বলে দে মা। মাগো মাগো মাগো।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "জীব দুঃখ পায় কিসে জানিস্? জীব দুঃখ পায় কামনায়। কামনার অর্থ কি জানিস্? "কা'' "মনা" বা "কাম" "না"। মনকে অকারন্তরে পয্যবসিত করলে সে হয় আপ্ত বাক্য। "ম" প্রত্যয়ে "ন" ধাতু আকারন্তর হ'লে অপ্রত্যয়। "মন" হ'চ্ছে প্রত্যয় আর মনা হ'চ্ছে অপ্রত্যয়, সুতরাং যা তোমার অপ্রত্যয় তাই তোমার কামনা। আর "কাম" "না'' অর্থে হ'চ্ছে যা তোমার কার্য্য না সেই কামনা। আর "ন" প্রত্যয়ে "ম" ধাতু যোগ হ'য়ে মনন হয়। মনন হ'চ্ছে মনের স্বাভাবিক গতি। এই যে স্বাভাবিক গতি এই হ'চ্ছে কর্ত্তব্য বা কার্য্য করবার সহায়ক ও শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা। বিষয় কার্য্য কর, আত্মার কার্য্য কর বা আমার অর্থাৎ পরমাত্মার কার্য্য কর সবই এই 'মনন'। কিন্তু করবার অভিলাষ, উন্নতি করবার ইচ্ছা, কোনও জিনিষ গড়বার ইচ্ছা, কোনও বিশেষ জ্ঞান লাভের ইচ্ছা, অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছা ইত্যাদি প্রকার ভেদে মননের সাহায্যে হয়। এই মনন যত গভীর হবে তত কৃতকার্য্যতা। এইভাবে তুমি অর্থ লাভ করবে, এইভাবে তোমার এ কার্য্য করা প্রয়োজন তা' হ'লে তোমার ব্যবসায়ের উন্নতি হবে, এইভাবে তোমার কারখানার উন্নতি করবার পদ্ধতি চিন্তা করে কাজ করলে এসব মনন। এই যে মনন এই মনন কর্ম্মপদ্ধতি, কর্ম্মপন্থা বা সংস্থান ঘটায়। কি পদ্ধতিতে অর্থের সম্প্রসারণ হ'তে পারে, কি ভাবে ব্যবসায়ে অধিক অর্থ সমাগম হ'তে পারে তার পদ্ধতি চিন্তা বা তাকে কার্য্যে পরিণত করার সহায় 'মনন"। এই হ'চ্ছে তোমার ধর্ম্ম। তোমার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্যে অর্থের প্রয়োজন ও সে অর্থ কিভাবে উপার্জ্জিত হ'তে পারে তার পথ অনুসন্ধান ও তার ব্যবস্থা করার একমাত্র সহায় মনন। মনন যত গভীর তত তোমার সেই দিকে উন্নতি। এই যে কর্ম্মে ক্রমোন্নতি

তাতে যখন যা প্রয়োজন হবে সেটা করবে। প্রয়োজন যখন হবে সে তখন আপন তাগিদে তোমার কাছে আসবে ও সেটা তোমার সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি যদি মনে মনে ভাব যে আমি এইভাবে কোটিপতি হব, অনেক দাস দাসী হবে, এইভাবে সকল হবে ও করবে, ছেলে হবে, মেয়ে হবে, স্ত্রী হবে, তারা এই ভাবে চলবে, তাদের এই ভাবে রাখব, তারা কত ভাল ভাল কাপড় জামা পরবে ও এইরূপ নানা ভবিষ্যতের স্বপ্ন বা ফল লাভের আশা কর সেটা হ'ল "কামনা"। ছেলেকে শিক্ষা দিচ্ছ, তার যাতে উপযুক্ত শিক্ষা হয়—তাই প্রয়োজন। কিন্তু ছেলেকে শিক্ষা দিচ্ছ তোমার বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে অর্থ উপার্জন করে খাওয়াবে অথবা তার অতি উচ্চ ঘরে বিবাহ দেবে, তাকে ধনী করবে ইত্যাদি চিন্তা নিয়ে যদি শিক্ষা দাও তবে সেটা তোমার কামনা। এই যে কামনা এর যখন ছেদ হয় অর্থাৎ কামনার মত যদি ফল লাভ না হয় তখন তোমার অন্তর দুঃখে অতিশয় বিমর্ষ হয়। সুতরাং এই কামনাই অর্থাৎ ফল লাভের আশাই যখন মনে থাকে তখনই জীব দুঃখ পায়। আমাকে লাভ করবার তোমার আকুলতা হ'ল, সাধন করতে আরম্ভ করলে। কিন্তু সাধন করে যদি তুমি আমাকে কামনা কর তবে তোমার দুঃখ হবে আমাকে না পেলে। তুমি সাধন করবে, আমাকে পেলে কি পেলে না, পাবে কি পাবে না সেটা তোমার দেখবার দরকার নাই। শুধু সাধন করাই তোমার কর্ত্তব্য। সাধনের ভিতর যদি আমাকে লাভ করবার কামনা থাকে তবে সাধন করতে করতে আমাকে না পেলে তোমার অন্তর বিষাদগ্রস্থ হ'য়ে পড়বে ও তুমি নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়বে। সেটা তোমার পক্ষে ও সাধনের পক্ষে ক্ষতিকর। একটা আম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটা খুব পুষ্ট পাকা আম গাছের খুব উচুডালে দেখে তোমার সেটা পাবার জন্যে মনে কামনা হোল। অতি কষ্টে নানা চেষ্টায় সে ফল তুমি পাড়লে। কিন্তু পেড়ে দেখলে যে সে ফলের যে দিকটা তুমি দেখেছ সে দিকটা দেখে সেটা অতি পুষ্ট ও ভাল আম বলে মনে হ'য়েছে নীচে থেকে। কিন্তু পাড়বার পরে দেখলে সেটার অন্য দিকটায় পাখীতে খেয়ে রেখেছে। তখন

তোমার মনে কত কষ্ট হয় ও তুমি ভাব তলা থেকে এটাকে এত পুষ্ট ও ভাল ব'লে মনে হ'ল, কত কষ্ট করে এটাকে পাড়লাম, এখন দেখছি ফলটা একেবারে খাবার অযোগ্য। অন্তর তোমার মুষড়ে যায়। এও তাই যদি তুমি ওই ভাবে বিষয় সুখ চিন্তা কর তবে হয়ত তোমার সেই সুখ চিন্তা দুঃখে পরিণত হবে। আর যদি সেই চিন্তা না ক'রে গাছে উঠে সব গুলো পুষ্ট আম পেড়ে ফেল ও তার ভিতরে যেটা সবচেয়ে পুষ্ট সেটা গ্রহণ কর তবে তোমার শ্রম সার্থক ও তোমার অন্তর সুখী হবে। তুমি কর্ত্তব্য ও চেষ্টা করে যাবে যখন তার ফল তোমার কাছে আসবে তুমি তাকে আনন্দ অন্তরে আমার আশীর্ব্বাদ মনে করে গ্রহণ করবে। তুমি যদি এটা হবে ওটা হবে এই ভেবে কাজ কর ও এটা ওটা যদি না হয় মন তোমার বিষাদগ্রস্থ হ'য়ে পড়বে ও তুমি দুঃখ পাবে। সুতরাং কামনা হ'চ্ছে "কাম না, অকাম।"

তোমাকে এক সময় বলেছি দেহজাত কাম থেকেই আমার প্রতি কামনা জাগে। এই যে আমার প্রতি কামনা এই কামনায় মনে যখন সংসার সুখে, দেহের সুখে অথবা রিপুর সুখে অপ্রত্যয় হয়—বা বৈরাগ্য আসে তখন মন আমার দিকে ধাবিত হয়। কাঃ মনা? অর্থাৎ অপ্রত্যয় কি? এই প্রশ্ন যখন মনে আসে তখনই সাধন অবস্থা আরম্ভ হয়। আমার প্রতি কামনার এ অর্থ নয় যে তুমি সাধন করলে পরমার্থ রূপ ফল তোমার হস্তগত হবে। তোমার সাধনই শ্রেষ্ঠ তাতে আমি তোমার হস্তগত হব কি না হব, অথবা আমি তোমাকে দর্শন দেব কি দেব না সেটা তোমার বিচার্য্য বিষয় নয়। আমাকে পাবে এই চিন্তা করে সাধন পথে গেলে তোমার কামনা থাকে তাতে অভিপ্সিত ফল অর্থাৎ আমাকে লাভ না হ'তে পারে ও তাতে তোমার সাধনের বিঘ্ন হবে। সাধনই তোমার কর্ত্তব্য, আমি ত্রিকালজ্ঞ বলে আমার শুভ ইচ্ছার উপরে তোমাকে আত্মসমর্পন করতে হবে। এ জ্ঞান অতি উচ্চ ভাবের। এখনও যদি তোমার কাছে পরিষ্কার না হয় পরে আবার বলব।"

আমার মা অপার করুণাময়ী মাগো।

২০শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ চাড়াপুল। কাচড়া পাড়া।

আজ সকালে ৯ টায় চারাপুলে ছোড়দার বাড়ীতে আমার দীক্ষা গ্রহণ। পৃথিবীতে আমার গর্ভধারিণী জননী আমার গুরু। আমি ক'দিন আগে আমার পরম জননীর নির্দ্দেশ পেলাম যে আমাকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে মার কাছে। তাই প্রস্তুত হ'য়ে সকলে মিলে ছোড়দার বাড়ী চাড়াপুলে যাই শুক্রবার দিন।

সকালে উঠে আমি প্রাতঃকৃত্য শেষ করে, দাড়ি কামিয়ে জল খাবার খেয়ে স্নান সেরে নিই। আমার বিয়ের গরদের জোড় প'রে নববিধান অঙ্কিত পতাকা নিয়ে ৯ টায় উপাসনায় বসি। পতাকা ময়না তৈরী করেছে ও পুতুল যে ভাবে তৈরী করতে বলেছে সেই ভাবে হ'য়েছে। গৈরীক কাপড়ের চৌকো চারধার বর্ডার দিয়ে সেলাই করে মাঝখানে নববিধান লেখা ও তার চারপাশে একটু এম্বর্ডারী করা। আমি গৈরীক ধারণ করি নাই।

আমরা সকলে অর্থাৎ মা, ছোড়দা, ছোটুদি, বড়দি, ময়না, অঞ্জলী, বাবুল, চন্দন, পুতুল, রাহুল উপাসনায় বসলাম। ছোড়দা গান ধরলেন "অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষালয়ে হব মোরা অগ্নিময়—"। তারপর মা পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করলেন। দ্বিতীয় গান হোল, আমিই ধরলাম "ধন্য-ধন্য-ধন্য-আজি দিন আনন্দ কারী" তারপর মার হ'য়ে আমি আচার্য্যের প্রশ্ন ও আমার প্রতিজ্ঞা পাঠ করলাম। মা আমাকে মহা-আশীর্ব্বাদ করলেন ও আমাকে পরম জননীর হস্তে সমর্পন করে দিলেন। আমার ধর্ম্ম জীবন যাতে মহাপ্রসার লাভ করে তার জন্যে পরম জননীর করুণা ভিক্ষা করে উপাসনা ও আমার দীক্ষা গ্রহণ শেষ হোল। শেষ গান ছোড়দা ধরলেন "দাও মা সাজায়ে দীন সন্তানে"। সকলেই গাইলাম।

এই যে উপাসনা হোল এর ভিতরে আশ্চর্য্য দর্শন হোল। যেন বিদেহী বহু ভক্তবৃন্দ, আমার পিতা সকলে মিলে যেন এক মহা-সম্মিলনে যোগ দিতে এসেছেন। সকলেই যেন অত্যন্ত ব্যস্ত। আমার দীক্ষা যেন একটা মহা-গম্ভীর

ও অত্যন্ত তাৎপর্য্য পূর্ণ মহা-কর্ত্তব্য ও সেটা সমাধা হওয়াতে তাঁরা যেন অত্যন্ত আনন্দিত ও স্বস্তি অনুভব করছেন। যেন এখন থেকে আমি প্রকৃত সাধন পথে প্রবেশ করলাম ও আমার পূর্ণ বিকাশ এখন থেকে সুরু হোল। একটা খুব উচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশ। সেখানে প্রভাত সূর্য্যের আলোকের মত আরও উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত। সেখানে আমার পরম জননী ব'সে আমার দীক্ষা গ্রহণ অবলোকন করছেন। আর তার অনেকটা নীচে একটা শ্বেত পর্ব্বতের উপরে আলোকের দেশে সকল ভক্ত বৃন্দ আনন্দে ও ব্যস্ত হ'য়ে আমার দীক্ষা গ্রহণ বিশেষ আগ্রহে দর্শন করছেন। এ যেন এই ভাব "শেষ পর্য্যন্ত দীক্ষা কার্য্য যে সুসম্পন্ন হোল ও ওর আরব্ধ কর্ত্তব্যের জন্যে যে ও প্রস্তুত হ'তে পারল এই আমাদের অনেক ভাগ্য"। এ যেন আরও অনেককেই এঁরা এ কর্ত্তব্যের জন্যে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেছেন অতীতে কিন্তু মোহ বিকারে সে অন্য পথ নিয়েছে ও এঁরা নিরাশ হ'য়েছেন। আমার দীক্ষা হ'য়ে যাওয়াতে যেন এঁরা মহাস্বস্তি অনুভব করলেন। যেন এবার পৃথিবীর প্রতি এঁদের যে কর্ত্তব্য তা আমার মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। মাকে বললাম এই সব দর্শন হোল। মা আমাকে পুষ্প দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। গুরুজনদের ও মাকে প্রণাম করলাম। আজ নিরামিষ আহার করলাম। আর প্রায় সব সময় গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করলাম। আজ থেকে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি আমার স্বভাবে। যেন গম্ভীর হ'য়ে গেছি। আমার পরম জননী যেন আমার অতি নিকটে এসেছেন। আমার মাতৃ আশীর্ব্বাদ সম্বল।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আত্মার বিকাশ হয় কিসে মা? মা বললেন "আত্মার বিকাশ হয় নির্ভরে। নির্ভর হ'ল অচিন্তনীয় মহাভাব। এই নির্ভর ভিন্ন জীবাত্মার-অন্ত-গতি নাই।" নির্ভর কেমন ক'রে হয় মা? "নির্ভর হয় বৈরাগ্যে। এই বৈরাগ্যই নির্ভরের সোপান। বৈরাগ্য মানে সন্ন্যাস নয়। বৈরাগ্য মানে বীতিরাগ। বিষয় লিপ্সা পরিত্যাগকেই বীতিরাগ বলে। বিষয় অনুশীলন করবে কর্ত্তব্য হিসাবে। বিষয়

অর্থে, অর্থ, সংসার প্রতিপালন, বিত্ত, সম্পদ, সেবা, দান, গৃহ, অর্থ উপার্জনের জন্যে কর্ম্ম, সমাজসেবা, দীনসেবা, জীবসেবা, সর্ব্বজীবে দয়া, সম্মান লাভ, বিদ্যালাভ, শিক্ষা ইত্যাদিকে বিষয় বলে। মানব জীবনে এ সব আবশ্যকীয় যতদিন দেহ ধারণ আছে। দেহ পাতে এই বিষয় অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। আত্মা শুধু এই সব কার্য্যের প্রভাব নিজ মার্গে গহণ করে। এই সব কার্য্যের ভিতর যদি তোমার অহঙ্কার বা আমিত্ব থাকে বা তাতে অহংজ্ঞান থাকে তবে তাকে রাগ বলে। এই রাগ তিন প্রকার যেমন মোহরাগ, ভয়রাগ ও অনুরাগ। মোহরাগ হোল যে ওই সব কার্য্য তুমি কর একটা মোহের বশবর্ত্তী হ'য়ে। আমি করছি, আমি ছাড়া হবে না, আমিই একমাত্র এই কার্য্য করতে পারি, বুঝতে পারি, আমি বড়, আমার স্থান সকলের চেয়ে উঁচুতে, আমি একজন লোকের মত লোক, আমাকে কত লোকে চেনে ও আমাকে সম্মান করে ইত্যাদি রূপ 'আমির' প্রকট স্বরূপ হোল মোহরাগ। আর ভয়রাগ হোল, এ সব না করলে লোকে কি বলবে, এ না করলে যে খেতে পাব-না, এ না করলে যে ভীষণ লোকসান হবে, এ ভাবে যদি বিদ্যা গ্রহণ না করি তবে আমি সকলের নীচে প'ড়ে থাকব, এই ভাবে সমাজ সেবা না করলে লোকে বলবে কি—এই সব হোল ভয়রাগ। আর অনুরাগ, এ আমার ভাল লাগে তাই করি, এ আমাকে সুখ দেয়, তাই করি, এ করলে আমার মহানন্দ হবে ইত্যাদি অনুরাগ। বিষয়ের প্রতি এই তিনটি অথবা যে কোনও একটা থাকে তাকে রাগ বলে ও তিনটিকেই পরিত্যাগ করাকেই বীতিরাগ বা বৈরাগ্য বলে।

প্রথমে এই বৈরাগ্যই প্রয়োজন। বৈরাগ্য না এলে বিষয়ের প্রতি রাগ যায় না। বৈরাগ্য অর্থে কর্ত্তব্য জেনে বিষয় সম্পাদন করা। কোনও রূপ মোহ, ভয়ে বা অনুরাগে বিষয় কর্ত্তব্য সম্পাদন না করা। বৈরাগ্য এলেই এই মনে হবে যে আমি যা করছি সবই "তাঁর" কাজ, তিনিই করাচ্ছেন ও আমাকে যে কর্ত্তব্য করতে দিয়েছেন তাই করছি এতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র, যিনি করাবার তিনিই করাচ্ছেন। এই বৈরাগ্যই উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান

লাভের সহায়। এই বৈরাগ্য এলেই হোল না। বৈরাগ্য যদি ধৈর্য্যধর্ম্মী না হয় তবে বৈরাগ্য দেহ-বিকারে প্রকাশ পায়। মানুষ কপটচারী হয়, ও তার প্রভূত হানি হয়। একটা কাজ করতে করতে যদি কৃতকার্য্য না হও ও ধৈর্য্যহীন হ'য়ে পড় ও মনে মনে বিষয় চিন্তা কর যে আর পারা যায় না। এ সব করে কি হবে? এতদিন করলাম কিছুত' হোল না। আরও আমায় দুঃখে, দারিদ্রে ঘিরে ধরেছে। ওরা কেমন সব ভাল ভাল পড়ছে, ভাল ভাল খাচ্ছে আর আমি এই ভাবে কষ্ট পাচ্ছি। থাকগে সব ছেড়ে দিয়ে দশজনে যা করছে তাই করি তবে বৈরাগ্য মর্য্যাদাহীন বিকারে পরিণত হয়। সুতরাং বৈরাগ্য ধৈর্য্যধর্ম্মী। এই ধৈর্য্যধর্ম্মের অনুশীলনে আস্তে আস্তে নির্ভর আসে। তখন সব কিছু আর তোমার থাকে না। সব "আমার" হ'য়ে যায়। যা কর সব "আমার"। তখন "আমি" ভিন্ন জীবাত্মা আর কিছু চিন্তা করে না। আমার একান্ত হ'য় ও আমার সকল বিচারের উপর তার পূর্ণ আস্থা হয়। সে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হ'য়ে পূর্ণজ্ঞানী হ'য়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে-ও আমার দর্শন পায়। এখন বুঝলে?" হ্যাঁ, মা, বেশ ভাল করে বুঝেছি। আমি যা জানতে চাই তাইত তুমি আমাকে জানাও। কত যে ভালবাস তার অন্ত নাই।

মাগো আমার মা।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে জিজ্ঞাসা করলাম পূর্ণজ্ঞান কি মা? মা বললেন "পূর্ণজ্ঞান হ'চ্ছে সংসারকে অসার জ্ঞান না করা।" আমি বললাম সে কি মা? যত যত সাধুভক্তগণ সংসার অসার বলে গেছেন আর তুমি সংসারকে সার বলছ এ কেমন হোল বুঝিয়ে দাও মা। মা বললেন, "শোন, তাঁরা আমাকে দেখেছেন, কিন্তু সংসারের ভিতরে আমাকে দেখেন নাই। সংসার আমি আর আমিই সংসার। যে জ্ঞান দ্বারা ভক্ত সংসারকে আমাময় ও সংসারই আমি এই উপলব্ধিতে আসে সেই জ্ঞান হ'ল পূর্ণজ্ঞান। আমাকে দর্শন করে আমার সৃষ্ট জগত সংসার যাঁরা অসার ভেবে গেছেন তাঁরা অপূর্ণজ্ঞানী। তাঁদের জ্ঞান পূর্ণ হয় নাই। আমি

এ সব সৃষ্টি করেছি কেন? এই জন্য যে এই সব সৃষ্টির ভিতরে ও এই সব সৃষ্টিতে আমার দিব্যরূপ অনুভব বা দর্শন করবার জন্যে। এই উপলক্ষ্য দিয়েছি পূর্ণলক্ষ্যে পৌছাবার জন্যে। এই সব উপলক্ষ্যের ভিতর দিয়ে আমারূপ চিরন্তন লক্ষ্যে পৌছানোই হ'চ্ছে পূর্ণজ্ঞান লাভ। সাধক যদি সংসারের ভিতরে আমার বিচিত্র লীলা প্রকট্ দেখে ও সংসারের প্রতিটি কার্য্যে, দর্শনে, চিন্তায়, ভাবে, অবস্থায় আমার পূর্ণ ইচ্ছা বা আমার নিগুঢ় সত্ত্বা উপলব্ধি করে তবে সে পূর্ণজ্ঞানী ও ব্রহ্মজ্ঞানী। তা ছাড়া সকল জ্ঞানই অপূর্ণ।

মাগো এ তোমার কি ভাব মা?

২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মাগো তোমার লীলা কি? মা বললেন "অন্তর মন্থনই আমার শ্রেষ্ঠ লীলা। তোমাদের চোখে যে ঘোর দুর্বিনীত, অপরাধী, নরহন্তাকারী—তার অন্তর যখন আমার ভক্তের মাধ্যমে আমার স্পর্শ পায় ও তার অন্তর উদ্বেল হ'য়ে উঠে আমার প্রতি—সেই আমার শ্রেষ্ঠ লীলা। জীব অন্তরই আমার লীলা নিকেতন। বাহিরের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের ভিতরে আমার যে লীলা সে লীলার প্রকাশ জীব-অন্তরেই হয়। জীব-অন্তর যদি আমার বাহিরের লীলার প্রকাশ অন্তরে অনুভব বা ধারণ করতে না পারে তবে যে আমার বাহিরের সকল লীলার প্রকাশ মূল্যহীন হ'য়ে যায়। ঘোর হিংস্র ব্যাঘ্র মানব-শিশুকে নিয়ে সন্তানবৎ পালন করে, ঘোর নরহত্যাকারী এক নিমেষে অশ্রুজলে প্লাবিত হ'য়ে আমার একান্ত শরণাপন্ন হয় এর চাইতে শ্রেষ্ঠ লীলা আমার আর কি আছে? জীব-অন্তর আমার লীলা নিকেতন। সেই অন্তর মন্থনই আমার শ্রেষ্ঠ লীলা বলে জানবে।

মাগো কোনও কথা ত' তোমার অসত্য নয় মা। এ যে আমার সত্য মা। মাগো তুমি আমার সর্ব্বসত্য।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন "তুমি শ্রেষ্ঠতম আত্মা। এ কথা বিশ্বাস

কর। অতীতে যে সকল শ্রেষ্ঠভক্ত, জ্ঞানী, সাধক জন্মগ্রহণ করেছেন ও আজ যত মানব পৃথিবীতে জীবিত আছে সকলের চাইতে তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা।" আমি মাকে বললাম. এ কেমন করে হয়? আমি সংসারে অতি সাধারণ লোক। আমার দেহজাত রিপু প্রবল ও রিপুর প্রভাবে আমি কত অন্যায় করেছি ও করছি। আমার না আছে ধন, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেক, ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভর। আমার ত কিছুই নাই তবে কি করে আমি শ্রেষ্ঠতম আত্মা হ'লাম? কত মহা মহাজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করে তোমাকে কতবার দর্শন করেছেন, কত মহাঐশ্বর্য্য লাভ করেছেন ও তোমার ব্রহ্মজ্ঞানে মহাজ্ঞানী হ'য়ে গেছেন তাদের চাইতে আমি শ্রেষ্ঠ এ কথা কেমন করে বিশ্বাস করি? মা বললেন "এ কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে। অনন্ত জীব-জন্মের পরিক্রমা পার হ'য়ে তুমি এসেছ যুগ যুগ ধরে। তুমি আমার চিহ্নিত শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ও শ্রেষ্ঠতম সন্তান যার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন হবে। তোমার বিষয় তুমি কি জান? পৃথিবীর লোক তোমার বিষয় কি জানে? তোমার দেহ দেখে তারা তোমাকে অতি সাধারণ জ্ঞান করে। কিন্তু তোমার আত্মাকে তারা ত আর দেখতে পায় না। আর তুমি কে তারাই-বা তোমাকে জানবে কি করে? আমি ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ, আমার চাইতে ত' আর কেউ তোমাকে বেশী জানে না। সুতরাং আমি যখন বলছি তুমি শ্রেষ্ঠতম আত্মা সেটা তুমি বিশ্বাস কর। ভবিষ্যতে তুমি কি হবে ও তোমার কি মহাশক্তি হবে তারাও জানে না। আর তুমিও জান না। জানি আমি ও জানি বলে তোমাকে শ্রেষ্ঠতম বলছি। এই বিশ্বাস দৃঢ় কর তবে অন্তরে মহাশক্তি লাভ হবে। তোমার মহাবিকাশ হবে। কিন্তু অহংকার যেন না হয়। তোমার সপ্তম বর্ষে যে দৈববাণী শুনেছিলে গিরিডিতে "হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল" এই হোল তোমার বীজমন্ত্র। দেখ তোমার জপের মধ্যে "হরি" আছেই। তোমার অজানিতে তুমি হরিনাম করবেই। তোমাকে কোনও অন্যায় স্পর্শ করবে না জানবে। তুমি এমন একটি আত্মা যে বহুকালের

মহাতপস্যায় আমার সর্ব্বশ্রেষ্ট প্রিয় পাত্র হ'য়েছ। তুমি যে বিদেহী ভক্ত ও সাধকদের দর্শন লাভ করেছ সে হ'চ্ছে তাঁরা সব জানেন যে তুমি তাঁদের চাইতে শ্রেষ্ট তাই তারা তোমাকে দেখতে এসেছেন ও তোমার সাধন যাতে পূর্ণ হয় তাই তাঁদের কাম্য। এজন্য তোমাকে আমি স্বর্গে তোমার কি মর্য্যাদা তা' তোমাকে দেখিয়েছি ও সাধক ভক্তগণ যে তোমাকে অভিষেক করে স্বর্গ থেকে সংসারে বিদায় দিয়েছিলেন সেটা তোমাকে তাঁরা জানেন বলেই। আমি তোমাকে আমার দর্শন কতবার দিলাম। তোমাকে কত সব অলৌকিক দৃশ্যও সকল ব্রহ্মাণ্ড দেখালাম, গোলক, ব্রহ্মলোক, মধ্যমণি, সৃষ্টিতত্ত্ব, এ সব মহা অলৌকিক দৃশ্য দেখালাম্। এর কারণ তুমি নিজেকে জাগ্রত কর। দেহ ধারণ হ'লেই স্থূল বিষয়ে মানুষ সব বিস্মৃত হ'য়ে যায় ও তার কর্ত্তব্য ভুলে যায়। এ সব দেখাবার উদ্দেশ্য যে তোমার কর্ত্তব্য, তুমি কি ও তুমি কে এ সব যাতে তুমি জানতে পার ও সেইমত কাজ কর। তোমাকে যা দেখিয়েছি আজ পর্য্যন্ত কোনও মানব এ সকল সব দর্শন করে নাই। কেউ হয়ত একটা দিক্ দেখেছে আর একটা দিক দেখে নাই। এই যে তুমি দেখলে যে তোমাকে আমি কোলে নিলাম। সেই যে দেখলে আমি পূজায় বসে আছি আর তুমি উলঙ্গ শিশু হ'য়ে আমার কোলে এসে আমার কোলে মাথা রেখে শুলে, এ সবের উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি আমার সব চাইতে আদরের। আমি তোমাকে সকলের চাইতে বেশী ভালবাসি। যে সব দৃশ্য তুমি দেখেছ মনে রেখ প্রত্যেকটির এক একটা মহা উদ্দেশ্য আছে ও সেই উদ্দেশ্যই হচ্ছে তোমাকে জানান যে তুমি আমার শ্রেষ্ট সন্তান ও তোমাকে আমার মহাকর্ত্তব্য সম্পাদন করতে হবে এই সংসারে। এই সময়ের জন্যই তোমার জন্ম এবং তুমি এ সময়ের মহা-অরাজকতার মধ্যে আমার শ্রেষ্ট ধর্ম্ম যে "আমাকে দর্শন করা" সেটা সকলকে করাবে। তোমার যে কি মহাশক্তি ও ঐশ্বর্য্য আসছে তা তুমি এখনও জান না। তুমি ভবিষ্যতে সব জানতে পারবে। সাধন করে যাও যেমন ভাবে করছ। তোমার সাধনের যা পদ্ধতি এ সব আমারই যোজনা জানবে। যাতে তোমার মহাশক্তি হয় ও

সাধনে মহাসিদ্ধি হয় তার জন্য তোমার জপের পদ্ধতিরও ব্যবস্থা আমিই করেছি। তোমার কিছুর জন্যই চিন্তা করতে হবে না। শুধু তুমি আমার উপরে নির্ভর করে জপ করে যাও। অচীরে মহাজ্ঞান, মহাশক্তি ও মহাঐশ্বর্য্য লাভ হবে। বিশ্বাস দৃঢ়তম কর। আমাকে নিত্য ভজনা কর। তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত।"

মা আমার অপার করুণাময়ী। মাগো আমি তোর বড় ডানপিটে ছেলে মা। আমাকে শক্তি দে মা।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন "সত্য কি জানিস্? সত্য হ'ল যাহা স্থিত। আমি সত্য ও আমার সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু সত্য। সংসার সত্য, এ জগত সত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবই সত্য। অলীকই মিথ্যা। যেমন এই একটা বাড়ী আছে। তুমি যদি বল কই বাড়ীত নাই সেই হবে মিথ্যা। সংসার সত্য কেমন? আমার সৃষ্ট বলে। আমি সত্য বলে আমার সৃষ্ট সংসারও সত্য। জন্ম, মৃত্যু, জীবন, দেহজাত ও বিদেহী সকলই সত্য। সত্যের মহারূপ ও কঠিনরূপ। এই মানব জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সংসার সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মৃত্যু হ'লেই সব মিথ্যা হয়ে গেল বা সংসারে মায়া, মোহ, কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, ইত্যাদি থাকলেই কি সংসার মিথ্যা হয়ে যাবে? এসকল বৃত্তি ত আমিই সৃষ্টি করেছি ও প্রত্যেকটির নিজ নিজ উদ্দেশ্য আছে ও কর্ত্তব্য আছে। আমি ছাড়া যদি সত্য না থাকে তবে আমার সৃষ্ট সব কি করে মিথ্যা হয়? আমি কেবল সত্য নয়, সত্যাশ্রয়, সত্যস্রষ্টা—এ-যদি তোমরা জান তবে সংসারকে বা রিপুর প্রভাবকে জগতে মিথ্যা আখ্যা কেন দেবে? এ মহাভুল এই ভুলের জন্যেই আজ অবধি সংসার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হ'তে পারে নাই। আমার আকর্ষণে ভক্ত, সাধক, ব্রহ্মজ্ঞানী যাঁরা আমাকে দর্শন করেছেন, জেনেছেন, তাঁরা আমাকেই জেনেছেন। আমার অপরূপ রূপলাবণ্যও মহাশক্তিতে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে কোথায় দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছেন সেটা ভুলে গিয়ে আমাতে মগ্ন হ'য়ে আর সকল মিথ্যা বলেছেন। যেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে অবলোকন

করেছেন সেটাও যে আমার কোল, সেটাও যে আমি সেই রূপকে ধারণা করেন নাই। তাঁরা করছেন আমাকে প্রজ্ঞালোকে দর্শন, জ্ঞানালোকে দর্শন, ভক্তিলোকে, প্রেমালোকে, বিশ্বাসালোকে আমাকে দর্শন করেছেন। কিন্তু আমাকে তাঁরা সংসারালোকে দর্শন করেন নাই। সংসারালোকে দর্শন হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ দর্শন। আপনার অস্তিত্বের ভিতরে থেকে সেই অস্তিত্বের স্রষ্টাকে দর্শন করা। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎকে উপলব্ধি করা। সত্যে দাঁড়িয়ে মহাসত্য দর্শন করা। সুতরাং সবই সত্য। মহাপ্রজ্ঞালোক উদ্ঘাটিত হবে যদি সংসার সত্য উপলব্ধি করে আমাকে উপলব্ধি কর। জ্ঞানের পরিধি মহাপ্রসার লাভ করবে। আমার যা শিক্ষনীয় তা' সবই এই সংসারের ভিতরে। সংসারকে সত্যাশ্রয় জানবে তবেই গভীর ও অভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। সংসারই আমার ব্যক্ত লীলা ক্ষেত্র ও এ ক্ষেত্র জ্ঞান মহাপ্রসারিত ও শ্রেষ্ঠতম। তুমি সংসারকেই তোমার সাধন আসন কর। সংসার সাধন আসনে যখন আমার দর্শন পাবে তখন তুমি অপার ব্রহ্মজ্ঞানীও শ্রেষ্ঠতম সাধক হবে। এ বড় কঠিন সাধন। নানারূপ চিন্তা, ভাবনা, কামনা, বাসনা, ভাব, অভাব, অভিযোগ, জন্ম, মৃত্যু অর্থ, বিত্ত, কাম, ক্রোধ, হিংসা স্বার্থ ইত্যাদির ভিতরে প্রতিষ্ঠিত থেকে সাধন মহাসাধন। পদ্মের মত পঙ্কে তোমার দেহ প্রতিষ্ঠিত থাক আর আত্মা মহাজ্যোতি উপভোগ করুক। তাই বলে আমি ও সবকে পঙ্ক বলছি না। এখানে পঙ্ক অর্থে যে আধার থেকে তুমি অদ্ভুত হ'য়েছ ও তোমার স্থিতি হ'চ্ছে। মৃণানলকে পঙ্ক থেকে টেনে উঠালে যেমন পদ্ম শুকিয়ে মরে যায় তেমনি তুমিও যদি সংসারের ওই সব থেকে তোমাকে টেনে তুলে নিয়ে বাইরে চলে যাও তবে তোমার সাধন শুষ্ক হ'য়ে যাবে। সে সাধন হ'চ্ছে স্বার্থান্ধ সাধন। নিস্বার্থ সাধন হ'ল সংসারে সকল কর্ম্মের ও সকল ভাব অভাবের ভিতর থেকে সাধন করা। সংসারে থেকে যোগ সাধন হ'চ্ছে বিয়োগের নামান্তর। জনন প্রবৃত্তির ভিতরেও আমি, অর্থের ভিতরেও আমি, বিত্তের ভিতরেও আমি, কামনা বাসনার ভিতরেও আমি, ক্রোধের ভিতরেও আমি, হিংসার ভিতরেও আমি এই সবকে আত্মিক

সাধন অগ্নিতে দাহ্ন করে বা তাকে নিত্যানন্দের পাদপদ্মে সমর্পন ক'রে তোমার যা কিছু সব আমার সব আমি মূর্ত্ত এই জ্ঞানে বিশ্বাসী হ'য়ে সাধন করবে তবেই প্রকৃত জ্ঞান হবে। ব্রহ্মজ্ঞানের ধন ভাণ্ডার এই সংসারে। বিবেক থাকবে, বৈরাগ্য থাকবে, ভক্তি থাকবে, বিশ্বাস থাকবে ও নির্ভর থাকবে. তার সঙ্গে থাকবে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্যজ্ঞান। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান যখন বিশ্বাস বৈরাগ্য, বিবেক, ভক্তি, নির্ভরে এক যোগে যুক্ত হবে তখন তোমার মহাসিদ্ধি লাভ হবে ও তেমন সিদ্ধি আজ পর্য্যন্ত কোনও মানব লাভ করতে পারে নাই। এই সাধনই আমি তোমাকে শেখাচ্ছি। এই জন্যেই তোমার প্রয়োজন হ'য়েছে। বহুযুগ ও কল্পান্তর তোমাকে পার করে এনেছি এই সাধনের জন্যে ও এই বার্ত্তা সকলের কাছে দেবার জন্যে। এই সাধনে সিদ্ধ তুমি হবেই ও তোমার মহান্ ঐশ্বর্য্য লাভ হবে। বিশ্ব সংসার আমার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। তুমি সাধন করে যাও। অবিরত আমার পদ্ধতিতে জপ করে যাও। মহাশক্তি ও মহাব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। তুমি শ্রেষ্ঠতম আত্মা এই বিশ্বাস দৃঢ়তম কর ও সদা সকল কার্য্যে জাগ্রত থাক ও আমাকে দর্শন কর।''

জয় মা আনন্দময়ী মার জয়। জয় ব্রহ্মময়ী জ্ঞানদায়িনীর জয়।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্মমন্দিরে সুমনাদির উপাসনা ও আমার সঙ্গীত ছিল। আরাধনার সময় মা বললেন, "আমি হচ্ছি তোমাদের আসল মা। তোমাদের আত্মার জন্ম আমার থেকে। তোমাদের দেহের জন্মও আমারই থেকে তবে স্থূল বলে পিতার ঔরষে ও মাতার জঠরে তোমরা স্থূল মূর্ত্তিতে জাত হও। তোমাদের সংসারে জন্মের জন্যে পিতা-মাতার প্রয়োজন। এঁরা তোমাদের জন্মের উপলক্ষ্য। কোন্ পিতা-মাতার পুত্র ও কন্যা কে হবে ও কি হবে সে সব আমার ইচ্ছাধীন ও আমার জ্ঞাত বস্তু। কোন্ পুত্র ও কোন কন্যা কোন্ পিতা-মাতার দ্বারা সংসারে জন্মগ্রহণ করবে তাও আমার ইচ্ছাধীন ও আমার জ্ঞাত বস্তু। সেই জন্যে আমার পরেই পিতা-মাতার স্থান। পিতা ও মাতা আমার প্রতিভূ। নারী

মাতা হ'লে ও নর পিতা হ'লে তাদের ভিতরে যে অপত্য স্নেহের উন্মেষ হয় সেও আমার স্নেহের এককণা। জীব সকল এই অপত্য স্নেহের ধারক ও সেই ধারা বংশ পরম্পরা ক্রমিক গতিতে চলেছে। প্রতি মাতার সেই একই স্নেহ ও প্রতি পিতার সেই একই স্নেহ সন্তানের জন্যে। পৃথিবীতে কত মাতা কত পিতা জন্মগ্রহণ করেছেন ও তাদের কত সন্তান জন্মগ্রহণ করছে কিন্তু পিতা ও মাতার স্নেহ সেই একই রূপধর্ম্মী। এই স্নেহ যদি আমার স্নেহের বা ভাবের অংশ না হ'ত তবে পিতা মাতার অন্তরে স্নেহ থাকত না বা এক এক পিতা-মাতার এক এক রূপ ব্যবহার হ'ত তাদের সন্তানের উপরে। আমার সকল সত্ত্বা স্থিত বলে আমার যে স্নেহ সেও এক ধর্ম্মী, অপার ও শাশ্বত, তাই তার পরিবর্ত্তন নাই। তার পরিবর্ত্তন নাই বলেই তার অংশ যেটা মাতা-পিতার মধ্যে বর্ত্তায় তাও দেশ, কাল, উচ্চ নীচ—জীব নির্ব্বিশেষে একধর্ম্মী, শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয়। জীবসকল এই মাতা ও পিতার স্নেহের আবেষ্টনের ভিতর থেকে "আমি যে পরম পিতা ও মাতা সেই উপলব্ধি লাভ করে"। এই জীবজন্ম পরিক্রমা আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ বিধান যার উপলব্ধির দ্বারা জীব আমাকে জানবার চেষ্টা করে। মানব বালক ও বালিকা বয়স থেকেই অন্তরে অন্তরে প্রশ্ন করে— "আমার মাতা-পিতার কি মাতা-পিতা ছিল?" কৈশোরে এই প্রশ্নের তার মিমাংসা হয় ও যে জানতে পারে তার পিতা-মাতারও পিতা-মাতা ছিল। যৌবনে সে আরও গভীর ভাবে চিন্তা করে যে এই যে ধারাবাহিক পিতা-মাতা এদের জন্ম উৎস কোথায়। এই প্রশ্নই হোল জ্ঞানধর্ম্মী আত্মজিজ্ঞাসা। এই আত্ম জিজ্ঞাসা দেবার জন্যই সংসারে আমার মাতা-পিতার সৃষ্টি। সাক্ষাৎ প্রতিভূ হওয়াতে মানবের অন্তরে আত্ম জিজ্ঞাসার জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হয় ও তখন মানব জ্ঞান মার্গে আমাকে জানতে চায়। তখন তার ভক্তি ও বিশ্বাসে, নির্ভরে ও প্রেমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে মানব জীব জগতের অপার রহস্য ও আমার অস্তিত্ব জানতে পারে। কেহ কেহ

আমাকে দর্শন করে। সংসার ক্ষেত্র, পিতা-মাতা উপলক্ষ্য ও আমি উদ্দেশ্য। সাধনেও আমাকে লাভ করবার ও আমাকে জানবার শ্রেষ্ঠতম পথ হোল সাক্ষাৎ যোগে পিতা মাতাকে আমার প্রতিভূ ভাবা ও তাঁদের জন্ম উৎসের প্রশ্ন আত্মগত করা তবেই আমার অস্তিত্বের সম্যক জ্ঞান বিকাশ হবে। তুমি এই ভাবে সাধন করে যাও। তোমাকে আরও জ্ঞান দেব।"

মা আমার অপার জ্ঞানদায়িনী।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো অর্থের জন্যে বড় বিব্রত হ'য়েছি। চারিদিকে লোকে শুধু বলে দাও দাও। আমার পক্ষে এ যে মহা কলঙ্ক মা। সর্ব্বেশ্বরী, রাজ রাজেশ্বরীর পুত্র হ'য়ে এমনি অভাবে কাটাতে হবে? এ আমার কি হোল মা? মাগো সাধনও হোল না, অর্থও হ'ল না। না হোল আমার অর্থ না হোল আমার পরমার্থ সাধন। মন যে বড় উৎসাহহীন হ'য়ে পড়ে মাঝে মাঝে। তুই আমাকে সাহস না দিলে ত এতদিন ডুবে যেতাম মা। বিষয়ে মাঝে মাঝে সাধনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। মিথ্যা বলি, নানারূপ ছল, প্রতারণা করি এই সামান্য স্থূল অর্থের জন্যে। সংসারটা যদি আমার না করতে হ'ত তবে এ সব ফেলে দিয়ে তোর চরণে একান্তে প'ড়ে থাকতাম এই যখন ভাবি তখন তুই আমাকে বলিস্ "সেই জন্যেই ত তোকে সংসার দিয়েছি শ্রেষ্ঠ সাধন ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধির জন্যে। এর ভিতরে বীতরাগ হ'য়ে সংসার করবি ও সাধন করবি। সাধন করবি ও সংসার করবি। কোনও অন্যায় তোকে স্পর্শ করবে না। আমাতে একাগ্র ও পূর্ণ নির্ভর রাখ। বিশ্বাসের বায়ু প্রতিনিয়ত গ্রহণ কর। বল আমি মুক্ত, আমি সিদ্ধ, আমি পরিশুদ্ধ ও সদানন্দ। বল তুমি মহাশক্তিধর ও আমার শ্রেষ্ঠ সন্তান। নিজ কর্ত্তব্য সদা স্মরণ কর। অন্তরে স্থিত হও। বৈরাগ্য সাধন কর। সংসারকেই আশ্রয় কর। মনে রেখ আমি আশ্রয়ের আশ্রয় দাতা। আর আশ্রিতের সর্ব্বার্থ বিধান করি। জ্ঞানালোকের স্পর্শ অনুভব কর। সাধনের মহাউচ্চ বৃক্ষে আরোহন কর। তবে দেখবে এ সব অতি ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে। কাছে থেকে বিষয়

বিকারে, দেহ বিকারে স্থূল পরিবেশে যে সব প্রকাণ্ড বলে মনে হচ্ছে আসলে তারা প্রকাণ্ডই নয়। তারা অকিঞ্চিৎকর ও ছোট। যত উর্দ্ধে যাবে তত এরা তোমার চক্ষে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হ'য়ে যাবে। এ সবের জন্যে ভয় কি? বিমুক্ত আত্মা হও। শুদ্ধাচারী মনে হবে। পবিত্রতা রক্ষা করবে বাক্যে, মনে, চিন্তায়, আচরণে, ব্যবহারে, স্পর্শে, দৃষ্টিতে, সংলাপে। বিদ্বেষ পোষণ করবে না কারুর প্রতি। কাউকে ছোট ও হীন মনে করবে না। মিতাহারী হও। কর্ণকে শাসন কর, জিহ্বাকে শাসন কর। দৃষ্টিতে আমাকে ছাড়া আর কিছু দেখবে না। অর্থের জন্যে চিন্তা ত্যাগ কর। প্রভূত অর্থ আসছে তোমার। সুখ, সম্পদ, গৃহ, বিত্ত সব তোমার প্রভূত হবে। কিন্তু তোমার চিত্ত স্থির থাকবে একমাত্র তোমার মহান্ কর্ত্তব্যের দিকে। আমার সান্নিধ্য সর্ব্বসময় উপলব্ধি কর। প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, মায়া, জ্ঞান, বিশ্বাস, নির্ভর, দয়া, ক্ষমা, সবকে এক ক'রে এক মহা নির্য্যাস প্রস্তুত কর। সেই পান কর, তার সেবা কর, তার পথে চল, তবেই তোমার অলৌকিক নিষ্ঠা, পরাবিদ্যা, পরাভক্তি ও মহাশক্তি লাভ হবে। নিরাশা ও নিরুৎসাহ জীবনের প্রভূত অকল্যাণ করে। দৃষ্টি দিব্য-দৃষ্টি হোক্, জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হোক্। জয় হোক্ তোমার আদর্শের, জয় হোক্ তোমার সাধনার, জয় হোক্ তোমার সকল কার্য্যের। আমার আশীর্ব্বাদ মস্তকে বহন করে অগ্রসর হও। অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। প্রভাত সূর্য্য করুণায় তোমার দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'চ্ছে। এইবার তোমার জাগ্রত হওয়ার সময়। এখন ঘুমিয়ে পড়ো না তবে ঘোর অমঙ্গল। আমি আছি ভয় নাই। মাভৈঃ, মাতৃমন্ত্র গায়ত্রী উচ্চারণ কর সর্ব্বসময়। সব মেঘ কেটে যাবে।"

মাগো আমি যা বলতে যাই অমনি তুই এসে আমাকে কত কথা বলিস্ মাগো। আমার মা স্নেহময়ী জননী আমার—।

৩রা মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম আমাকে কিছু জ্ঞানের কথা বল মা। মা

বললেন "মন স্থির কর ও শোন। আজ তোমাকে "অন্তর্ধর্ম্ম"-এর কথা বলব। কিন্তু এ অতি উচ্চ জ্ঞানের কথা। এখন হয়ত ভাল করে বুঝতে পারবে না।" আমি বললাম তুমিত আমাকে কত সোজা করে বুঝিয়ে দাও কত সময় তেমনি করে বুঝিয়ে দাও না। আচ্ছা আজ সেইভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন। জীব অন্তরে দুইটি মাত্র মৌলিক স্পৃহা আছে। সে স্পৃহা হ'চ্ছে কর্ম্ম স্পৃহা। একটি সকাম কর্ম্ম আর একটি নিষ্কাম কর্ম্ম। সকাম কর্ম্ম যেমন অর্থ উপার্জ্জন, পরসেবা, দান, সম্মান লাভ, দেব-সেবা, তীর্থ-দর্শন, বিদ্যালাভ, জ্ঞানার্জ্জন, অধ্যয়ন, শাস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্রবিদ্যা' সংযম-অভ্যাস, ব্রহ্মচর্য্য, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ, সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, খাদ্যদান, অর্থদান, বিত্তদান, দেশ-সেবা দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা, শ্রাদ্ধ, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, গ্রহ-শান্তি, উৎসব, প্রীতি ভোজন, ইত্যাদি বহুবিধ কর্ম্ম হোল সকাম কর্ম্ম। আর নিষ্কাম কর্ম্ম হোল, আমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভর, প্রেম, নিষ্ঠা, আমার সঙ্গে যোগ, আমার সঙ্গে মনন, আমার উপাসনা, আমার ধ্যান, আমার জ্ঞান, যা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ, দিব্য-জ্ঞান লাভ, দিব্যদৃষ্টি লাভ, দিব্য-ভাব লাভ, আমার নাম জপ ও আমাতে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পন সে যে ভাবেই হোক্ না কেন। তবে এই যে সব নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বললাম তাতে যদি আমাকে লাভ করবার স্পৃহা নিয়ে অগ্রসর হও তবে সেটা সকাম কর্ম্মের কিছু স্পর্শ পায়। তাতে খুব যে ক্ষতি হয় তা নয়, তবে শ্রেষ্ঠতম সাধন হয় না"।

মা এযে মহাসমস্যায় ফেললে আমাকে। সকাম কর্ম্ম তুমি যা যা বললে তার বেশীর ভাগই ত' আমি নিষ্কাম কর্ম্ম বলে জানতাম যেমন জ্ঞানার্জ্জন, শাস্ত্রবিদ্যা, পর-সেবা, দেশ-সেবা, তীর্থ দর্শন, দান, শ্রাদ্ধ, ব্রহ্মচর্য্য, ধর্ম্মানুষ্ঠান, দেব-সেবা এই সব।

"না এ সব নিষ্কাম কর্ম্ম নয়। কেন নয় তা বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই সকল কর্ম্মে মানব অন্তরে কিছু লাভের আশা থাকে। যেমন ধর শ্রাদ্ধ কর কেন? পারলৌকিক আত্মার শান্তি বিধানের জন্যে। সুতরাং আমার ভজনার ভিতর

দিয়ে করলেও তার ভিতর আশা থাকে বলে সেটা সকাম কর্ম্ম। দেব-সেবা, করা হয় পুণ্য হবে মনে করে, পর-সেবা করা হয় পুণ্য হবে, আত্ম তৃপ্তি হবে, (আত্মতৃপ্তিতে অহঙ্কার থাকে) লোকে ধন্য ধন্য করবে ইত্যাদির আশা নিয়ে। দেশ-সেবা, দীন-সেবা ইত্যাদিও সেই পর্য্যায় পড়ে। জ্ঞানার্জ্জন কর যে হেতু তুমি জ্ঞানী হবে, দশজনে তোমাকে জ্ঞানী বলবে, তুমি দশজনের একজন হবে ইত্যাদির আশা নিয়ে। ব্রহ্মচর্য্য পালন কর কেন? তাতে তোমার ইন্দ্রিয় সংযম হবে, আমার সাধনা করবার সুবিধা হবে, এই ভেবে তোমাকে স্বনিষ্ঠ হ'তে হয় ও যখন তুমি স্বনিষ্ঠ হ'লে তখনই তোমার অন্তরে শ্লাঘার উদ্রেক হোল। তুমি একজন ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রে অন্য দশজনের উর্দ্ধে উঠেছ, এই সব মনোভাব তোমাতে বর্ত্তায় ও সকাম হ'য়ে পড়ে। এই ভাবে প্রতিটি বিষয়ে তুমি যেখানে তোমার আত্ম প্রতিষ্ঠার একবিন্দু ইচ্ছা বা আশা রাখলে সেই খানেই তুমি সকাম কর্ম্ম করলে। এ সব অতি সুউচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। তোমার আরও সাধন হোক্ পরে আরও সরল করে বুঝিয়ে দেব।

এখন শোন, সাধন পথে অগ্রসর হ'লে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতরে অন্তরে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। সকাম কর্ম্ম এমনই নাছোড়বান্দা যে সে তোমাকে কিছুতেই ছাড়বেনা। সে তোমাকে বলবে কে বলেছে তোকে এ সকাম কর্ম্ম, এ যে সব নিষ্কাম কর্ম্ম। তুই আমাকে গ্রহণ কর তোর অনেক সম্মান, বিদ্যা, জ্ঞান, অর্থ, বিত্ত হবে। একেই মহম্মদ্ ও খৃষ্ট বলেছেন "সয়তান"। বেদের ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি, মুণিগণ একে বলেছেন "অবিদ্যা বা ত্রৈগুণ্য—সত্ত্বঃ, রজঃ, তম। যদিও সত্ত্বগুণ গুণের ভিতরে শ্রেষ্ঠতম গুণ তবুও এ সকাম গুণ বলেই অবিদ্যার পর্য্যায় পতিত। এই সকল কর্ম্ম তোমাকে অনুসরণ করবে ক্রমাগত। যতই তুমি উর্দ্ধে যাবে বা অগ্রসর হবে সে তোমাকে অনুসরণ করবেই। তুমি তার প্রতি যদি স্নেহ-পরবশ হও তবেও তোমার সাধনে হানি হবে। আবার যদি তাকে দেখে ভীত হও তবেও তোমার সাধনে হানি হবে। তার প্রতি কঠিন হবে ও তাকে প্রশ্রয় দেবেনা। তুমি যদি আমার একান্ত শরণাপন্ন হয়ে

আত্মাগত প্রাণ হ'য়ে নিষ্কাম সাধনে অগ্রসর হও ও সকাম কর্ম্মের প্রতি কঠিন হও তবে সে আস্তে আস্তে তোমার অনুসরণ ছেড়ে দেবে ও তুমি মহাসিদ্ধি লাভ করবে। আমাকে দর্শন পাবার উদ্দেশ্যে বা সিদ্ধি লাভ করবার উদ্দেশ্যে আমাকে ভজনা বা আমার সাধন সকাম কর্ম্ম। সুতরাং সেটা তোমার পরিত্যাগ করতে হবে। আমার সাধন করে যাও, আমাকে নির্ম্মল বিশ্বাস ক'রে, অহৈতুকী ভক্তি করে, আমাকে ভালবেসে, তোমার সিদ্ধি, বা আমার দর্শন হবে কি না হবে সে দিকে তুমি দৃষ্টি দেবে না। সংসারে নিষ্কাম কর্ম্ম সাধন খুব কঠিন হতে পারে। কিন্তু সংসারে থেকে এই পথে সাধনে অগ্রসর হ'লে এ-সাধন অত্যন্ত সহজ সাধন হয়। যে কাজ তুমি করছ সেটা আমারই কাজ এই ভাব নিয়ে যদি সংসারে সকল কর্ম্ম কর তবে অনুশোচনা আসবে না ও নিষ্কাম কর্ম্ম সাধনে সিদ্ধ হবে। কর্ত্তব্য যা আসবে, যে কোন কাজ আসবে তোমার কাছে সব করবে আমার দেওয়া কাজ মনে করে। সে কাজে কৃতকার্য্য কি অকৃতকার্য্য হবে তার বিচার করবে না। কর্ত্তব্য বা কার্য্য যা তোমার করণীয় কখনও উপেক্ষা করবে না বা অলসতার দ্বারা ফেলে রাখবে না। জানবে অতি সামান্যতম কার্য্যের পিছনে মহান্ সম্ভাবনা লুকিয়ে রাখি। সামান্য কার্য্য মনে করে যে কাজ তুমি করলে না সেটা যে কত বড় অন্যায় করলে বা আমার দানের মর্য্যাদার কতটুকু হানি করলে তা তুমি জান না। সুতরাং সংসার বন্ধনের ভিতরে কোনও কার্য্য বা কোনও সামান্যতম কর্ত্তব্যও উপেক্ষা করবে না। এবং আমার প্রেরিত কার্য্য বলে সাদরে গ্রহণ করবে তবেই তুমি শ্রেষ্ঠতম মানব হবে। এই বিশ্বাস দৃঢ়তম কর। পরে আরও বলব।"

মা আমার একমাত্র সহায়—মাগো।

৩রা মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, জীবনের ব্রত কি মা? মা বললেন "অহিংসাই মানব জীবনের একমাত্র ও শ্রেষ্ঠতম ব্রত। আমি এই বিশ্বে বহু রকম জীব সৃষ্টি করেছি। সেই জীবের গতি পথ নানা স্বভাব দিয়ে নিরূপণ করেছি। সেই

সকল জীবের স্বভাবের ভিতরে হিংসা প্রবৃত্তি কিছুনা কিছু দিয়েছি। কিন্তু মানবকে সৃষ্টি করেছি অহিংস করে। তার ভিতরে যখন হিংসা আসে তখন সে মানবেতর জীবের সমতুল্য হয়। এই হিংসা মানব স্বভাব জাত নয়। এই হিংসা মানব গ্রহণ করে পারিপার্শ্বিক, পরিদৃশ্যমান মানবেতর জীবের চরিত্র থেকে। ছোট শিশু যেমন যে পরিবেশে জন্মলাভ করে ও যে আচার ব্যবহার শিক্ষা করে সে সেই মত হয়। মানবও শ্রেষ্ঠ জীব হ'য়েও পারিপার্শ্বিক নিম্নতর জীবের আচার ব্যবহার দেখে সেই আচার ব্যবহার অনেকাংশে প্রাপ্ত হয়। মনে কর একটি মাংস বিক্রেতার ছেলে সে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসে যে তার পিতামাতা জীব হত্যা করে। সুতরাং সে স্বভাবতই জীব হত্যাকে দোষণীয় বলে মনে করে না। আবার একটি বৈষ্ণবের ছেলে দেখে যে তার পিতামাতা সর্ব্বজীবে দয়া করে জীবহত্যা করে না, নিরামিষ আহার করে, সে স্বভাবতই জীবের প্রতি দয়া পরবশ হয় ও জীব হিংসা থেকে বিরত থাকে। মানব অন্তরে একটি মহাশক্তি আছে সে শক্তি হোল তার ইচ্ছা শক্তি। এই মহাশক্তির সাহায্যে সে গ্রহণ ও বর্জ্জন যা তার অভিলাষ সে তাই করতে পারে। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে এই ইচ্ছা শক্তির প্রভাব কমে যায় ও মানব দুর্ব্বল-চেতা হ'য়ে পড়ে। তুমি দেখবে ছোট শিশুগণ স্বভাবতই অহিংস হয়। তারা হত্যা দেখলে ভীষণ দুঃখ পায়, ভয় পায় ও ক্রন্দন করে। তার অর্থ হ'চ্ছে সেটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু প্রতিদিন যদি তার সামনে জীব হত্যা করা যায় তবে আস্তে আস্তে সে সেই কার্য্যকে বা সেই কার্য্যের প্রভাবকে নিজ স্বভাবে গ্রহণ ক'রে ক্রমে সেই স্বভাব প্রাপ্ত হয়। দেখ গাভীর স্বভাব অহিংস। কিন্তু তার নিজ ক্ষতি অথবা তার সন্তানের ক্ষতি বা তার অন্য কোনও আকর্ষণের ক্ষতি যদি হয় তবে সে হিংস্র হ'য়ে উঠে। ব্যাঘ্রের স্বভাব হিংস্র। মনে তার স্বভাবই অন্য অহিংস পশুদের ভিতরে হিংসা বৃত্তির প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করে। ব্যাঘ্রের সঙ্গে বন্য গাভীর অথবা মহিষের যুদ্ধ হয় এই জন্যই যে ব্যাঘ্র হিংস্র। মহিষের সঙ্গে গণ্ডারের বা মহিষের সঙ্গে গাভীর যুদ্ধ হয় না। কারণ কেউ

কাউকে হিংসা করে না। তুমি বন্য মহিষকে হিংস্র মনে কর তার অর্থ তুমি তাকে হিংসা কর বলে। বনের ভিতরে তুমি গেলে একটি মহিষ তোমাকে তাড়া করে। আবার সেই মহিষ কোনও সাধু যোগীকে কিছুই করে না। হিংসাই হিংসাকে জাগ্রত করে। তুমি যদি মনে প্রাণে অহিংস হও তবে সেই ভাব আমার সকল সৃষ্ট জীবই বুঝতে পারে। এবং তোমাকে তারা আর হিংসা করবে না। আর যদি তুমি সামান্য হিংসা মনে পোষণ কর তবে তোমাকেও তারা হিংসা করবে। এর অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অরণ্যে অনেক সন্ন্যাসী বাস করেন একাকী। দিনে রাত্রে শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে তাঁরা নির্ভয়ে বিচরণ করেন। কোনও হিংস্র জীব তাঁদের হিংসা করে না—কারণ তাঁরা সম্পূর্ণ অহিংস। আর তুমি অরণ্যে গেলেই চারিদিক থেকে সেই সব হিংস্র জন্তু তোমাকে হিংসা করে কারণ তুমি অহিংস নও। সকল মানবেতর জীব আমার দ্বারা সৃষ্ট বলে ও প্রত্যেকের আত্মা মানব আত্মার সমপর্য্যায় ভুক্ত বলে স্বভাবগত প্রকৃতিতে তারা উপলব্ধি করতে পারে কে তাদের হিংসা করে আর কে করে না। একটি সাধুকে একটি পাখী ভয় পায় না। কিন্তু একটি ব্যাধকে দেখলে সে তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায়। সুতরাং হিংসা বৃত্তি হিংসাবৃত্তিকে জাগ্রত করে। এক জাতি আর এক জাতিকে হিংসা করে বলেই দুইয়ে যুদ্ধ বিগ্রহ হ'য়ে থাকে। এক শ্বেতকায় মানব এক কৃষ্ণকায় মানবকে হিংসা করে বলেই সেই কৃষ্ণকায় শ্বেতকায়কে ক্ষমা করতে পারে না ও হিংসা করে। মানবেতর জীবজগতের পরিবেশে অবস্থান ব'লে মানব অন্তরে যে হিংসার বৃত্তি জাগ্রত হয় সেই হিংসা অন্য মানবের প্রতি ধাবিত হয়। হিংসার স্বভাব হিংসা চরিতার্থ করা। হিংসা কখনও হিংসাকে চরিতার্থ না করে শান্তি পায় না। আজ যে এই জগতে দাবানলের আসন্ন সম্ভাবনা হ'য়েছে তার মূলে রয়েছে হিংসা চরিতার্থের লোভ। এই হিংসা লোভ কেহই পরিত্যাগ করতে পারছে না। ফলে ঘোর অমঙ্গল উপস্থিত হ'য়েছে। এর একমাত্র ঔষধ হচ্ছে সম্পূর্ণ অহিংস হওয়া। তোমার অন্তর থেকে হিংসা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ কর।

তোমার অন্তরে যদি সামান্যতম হিংসা প্রবৃত্তি থাকে তবে তোমার কথা কেউ গ্রহণ করবে না। তুমি মনে, প্রাণে, আচার-ব্যবহারে, ইচ্ছায়, বাক্যে কার্যে যদি সম্পূর্ণ অহিংস হ'তে পার তবে সকলে তোমার পদতলে পতিত হ'য়ে হিংসা পরিত্যাগ করবে। তোমার দ্বারাই আমি আমার এই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সম্পাদন করাব জানবে। এক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই হিংসাকে জয় করা সম্ভব। ব্রহ্মদৃষ্টি, ব্রহ্মভাব ও দিব্য স্বভাব দ্বারাই হিংসার অপনোদন হয়। সেই জন্যেই একদিন তোমাকে মৎস, মাংস পরিত্যাগ করতে বলেছিলাম। তোমাকে ওই সব পরিত্যাগ করতে হবে। না হ'লে যে তুমি আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পারবে না। এই কথা মনে রাখবে অহিংস হ'লে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত সাধন হয় ও সেই ব্রত সাধনে সিদ্ধ হ'লে মহাশক্তি ও মহা বীর্য্য লাভ হয়। মানবের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হিংসাশূন্য হওয়া। সম্পূর্ণ অহিংস হ'লে শ্রেষ্ঠতম সাধন হয়। সুতরাং তুমি সম্পূর্ণ অহিংস হও ও সেই সাধনে অগ্রসর হও। ব্রহ্মজ্ঞান যত প্রসার লাভ করবে তত তুমি এ সব বুঝতে পারবে ও তোমার বিচারশক্তি প্রখর হবে। তখন তুমি এই সাধনে সিদ্ধ হবে। সাধন করে যাও, আমি সব করাব। চিন্তা নাই—।"

মা আমার একমাত্র সহায়—।

৫ই মে, রবিবার, বিকাল ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

এইমাত্র মনে মনে ভাবছি যে আমার ত কিছুই হোল না—আমিত ক্লীব হ'য়ে রইলাম। এই কথা চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে তীব্রভাবে ভৎর্সনা করলেন, বললেন, "একি তোমার হীন বৃত্তি? তুমি এইভাবে নিজেকে কখনও হীন ভাববে না। তুমি না সংগ্রাম সিংহ? তুমি সামান্য অর্থভাবে ঋণের জন্যে নিজের এত বড় ক্ষতি করছ, নিজেকে ক্লীব ভেবে। তোমার যে কত বড় মহান্ সম্ভাবনা রয়েছে আমার প্রহেলিকার ভিতরে, তোমার যে কত মহান্ ঐশ্বর্য্য রয়েছে তা কি তুমি জান? সেই প্রহেলিকা যখন উন্মুক্ত হবে তখন যে তোমার অর্থে-পরমার্থে, পরমার্থে-অর্থে, একাকার হ'য়ে এক মহান্ বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে তোমার অন্তরে ও সারা বিশ্বজনের অন্তরে। পৃথিবীর সকল রাজ-ঐশ্বর্য্য এক করলেও সে ঐশ্বর্য্যের কাছে নগণ্য হবে। তোমার সম্ভাবনা মহত্তম। নিজেকে

হীন ভাবলে মনের দৈন্য আসে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠতম সন্তান, যোগী, ঋষি, সাধক ভক্ত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব তুমি একথা অন্তরে বিশ্বাস কর। এই বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ়তম কর। সদা সর্ব্বদা অন্তরকে জাগ্রত রাখ, আমার একান্ত শরণাপন্ন হও, আমার গতিতে গতিমান হও, আমার চিন্তায় চিন্তামান হও, আমার ভাবে বিভোর হও ও আমার কার্য্যে কর্ম্মী হও। সব আমার কাজ। যা করাচ্ছি মনে রাখবে আমিই করাই। বিফলতার পিছনে যে কত বড় মহান্ সফলতা অর্জ্জিত হ'য়ে আছে তা তোমরা জান না। এ কথা মনে রাখবে কিছুই কোনও দিন বিফল হয় না। দীনতায় দীনতা আনে, হীনতায় হীনতা আনে, ক্লীবত্বে ক্লীবত্ব আনে, বীরত্বে বীরত্ব আনে, সংযমে সংযম আনে, শৌর্য্যে শৌর্য্য আনে, বিশ্বাসে বিশ্বাস আনে, প্রেমে প্রেম আনে, শক্তিতে শক্তি আনে, ভক্তিতে ভক্তি আনে, ও সেই মত প্রত্যেক কার্য্যের সম্যক উপলব্ধিতে সিদ্ধি হয়। একাগ্রতাই প্রত্যেক কার্য্য সিদ্ধির একমাত্র সহায়। একাগ্র হবে যখন যে কার্য্য করবে। যখন যে কার্য্য করবে সেই কার্য্যে তখন একাগ্র মনা হয়ে যাবে আর অন্যচিন্তা করবে না তবেই কৃতকার্য্য হবে। তুমি কি তীরে এসে নৌকা ডুবাবে? তোমার যে মহাসিদ্ধির সময় নিকটবর্ত্তী এখন তোমার অন্তরে ক্লীবত্ব কি শোভা পায়? আমি যে তোমার মুখ চেয়ে আছি। আমার দিকে চেয়েও কি তুমি তোমার অন্তরকে সুদৃঢ় ও উন্মুক্ত করবে না? তোমার জন্য যে এত পরিশ্রম সব কি তুমি আমার নস্যাৎ করে দেবে? উঠ, জাগ, সুদৃঢ়মনা হও। মহাশক্তি বুকে নিয়ে কার্য্যে অগ্রসর হও। এ সামান্য অর্থের জন্য, এ সামান্য ঋণজালের জন্য তোমার মত বিরাট ও ও মহত্তম আত্মা নিষ্ক্রিয় হবে? কেন নিরুৎসাহ হ'চ্ছ? আমি যে তোমাকে হাতে ধরে নিয়ে চলেছি। আমার মুখের দিকে তাকাও আর কিছু দেখবে না। ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর। ওঠ সংগ্রাম কর। মহাবীর্য্য দিয়ে তোমার জন্ম। তুমি মহাবীর্য্যবান মহাশক্তিধর সর্ব্বেশ্বরীর সন্তান। তোমার কি অনুশোচনা করা শোভা পায়? নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি মেলে ধর; দেখ কি মহান্ সম্ভাবনা

সেখানে রয়েছে। কি ভয় ? সংসারে ভয় করবার কিছু নাই। একা খালি হাতে জগৎ সংসার জয় করবে—তুমি। তুমি মহাশক্তিধর। শক্তি সঞ্চয় করতে যদি কিছু সময় লাগে তবেই তুমি নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়বে ? এযে তোমার শিক্ষার সময়, এযে তোমার সাধনার সময়, এযে তোমার গতির সময়, এযে তোমার তীর্থের পথ পরিক্রমা। অনন্ত সম্ভাবনা, অনন্ত শক্তি, মহাশক্তি, মহান্ ঐশ্বর্য্য, প্রচুর সাংসারিক অর্থ, মহা পরমার্থ তোমার জন্য রয়েছে; বিশ্বাস দৃঢ়তম কর, আমার একান্ত বিশ্বাসী হও ও আমার প্রত্যেক কার্য্যে নির্ভরশীল হও। চিন্তা কর কে তুমি। চিন্তা কর কি তুমি। চিন্তা কর কেন তোমার জন্ম। চিন্তা কর কি তোমার কর্ত্তব্য। চিন্তা কর কার সন্তান তুমি। চিন্তা কর কে তোমায় শিক্ষা দিচ্ছে। চিন্তা কর কে তোমাকে দীক্ষা দিয়েছে। চিন্তা কর তুমি সর্ব্বশক্তিময়ী ব্রহ্মময়ীর একমাত্র চিহ্নিত পুত্র ও মহাশক্তিধর, নিরহঙ্কারী, মহাবীর্য্যবান, মহাসিংহ, যে সকল অন্যায় দূর করবার জন্য এই পৃথিবীতে আমার ইচ্ছায় আমার কার্য্যে জন্মগ্রহণ করেছ। ওঠ, জাগ, অন্তরকে হীনতা শূন্য কর। ক্লীবত্ব পরিত্যাগ কর। যেভাবে সাধন করছ করে যাও মনে প্রাণে। মানে, অপমানে, সুখে দুঃখে, নিস্পৃহ থাক। শুধু আমার ভজনা কর; আমার একান্ত শরণাপন্ন হও, আমার একান্ত ভক্ত হও ও আমার রূপ দর্শন কর। কি তোমার চাই ? যা চাইবে তাই পাবে। এমন শক্তি হবে যে মুখ থেকে যে কথা বার হবে তাই সাক্ষাৎ সত্য হ'য়ে যাবে। মহাশক্তি তোমার ভিতর আমিই দেব। দেব বলেই ত পরীক্ষা, শিক্ষা, দীক্ষা, অভাব, শ্রম, সব দিয়ে তোমাকে সর্ব্বভাবে পরীক্ষিত ও সর্ব্ববিষয়ে তোমার মহান্ অভিজ্ঞতা বিধান করছি। সর্ব্ববিষয়ে যে আমি ছাড়া কিছু নাই সেই বিশ্বাসে তোমাকে এমন দৃঢ় করব যে তোমার আর কোনও চিন্তা থাকবে না। চল, চল, চল, মহাশক্তি নিয়ে মায়ের ছেলে হ'য়ে মার শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে সংসার যুদ্ধে অগ্রসর হও। তোমার সিদ্ধি, তোমার জয় সুনিশ্চিত।"

জয় মা আনন্দময়ীর জয়—।

জয় মা ব্রহ্মময়ীর জয়—জয় জয় জয়।

৮ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো দীক্ষা নিলাম কিন্তু শিক্ষা ত হোল না। বিষয়ের পাথর এত শক্ত যে ঘসে ঘসেও ক্ষয় হ'তে চায় না। থাক্ না বিষয়। বিষয় থাকতে চায় থাক্ না এক কোণে প'ড়ে। তা না এসে লাফালাফি করে। সব খালি স্থান দখল করতে চায়। ওই সেই উটের মতন। আগে নাক গলায় তারপর গলা, তারপর সামনের পা' দু'খানা, তারপর আর্দ্ধেক শরীর, তারপর পেছনের পা দু'খানা, তারপর বলে তুমি বেরও এ আমার জায়গা। যতই একে আস্কারা দিই ততই ঘাড়ে চেপে বসে। একে গালি দিলে হাসে ও বলে, "ওঃ মস্ত বড় সাধু হ'য়েছিস্, না? এমন সঙ্কটে ফেলব যে তখন তোর জারীজুরী ছুটে যাবে একদিনে। তোর 'মা' 'মা' করে কি হবে? সে কি তোর খাওয়া, পড়ার ভার নেবে? এই দেখ্ আমি তোর সব দিচ্ছি।' দুটো মিথ্যা কথা বল্, অমনি দেখ্বি দু'হাজার টাকা এল। একটু কথার মার প্যাঁচ্ করলি অমনি একটা মস্ত বড় ব্যবসার অর্ডার পেলি। একটু কথার খেলাপ করলি অমনি মস্ত বড় একটা কাজ পেয়ে গেলি। এতে আর দোষ কি? এত সকলেই করছে। এ করলে ভাল খেতে পরতে পাবি, গাড়ীঘোড়া চড়বি; বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ, সুখ, সম্মান পাবি। দশজনে তোর কত সুখ্যাতি করবে। সকলে তোর কাছে জোড় হাতে থাকবে। তুই মস্ত বড় লোক হবি। এ সব চাস্ না কোথায় তোর-মা তাকে ডাকছিস্"।

মাগো দেখলে তো? কেমন তোমাকে ফাঁকি দিতে চায়। তুমিই যাকে সৃষ্টি করলে সেই কিনা তোমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়ালো। তুমি তাকে সৃষ্টি করলে তোমার সাধনের পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্যে। আর সে কিনা তোমাকে একেবারে কোণঠাসা ক'রে নিজেই তোমার জায়গায় আসন গেড়ে বসেছে। একে তাড়াই কি করে মা বলে দে। জপ-ত করছি তবুও এ যে আমাকে পাগল করছে। আজ ক'দিন ভেবেছি দেখি ওর কত বড় জোর। আমার চারদিকে ঘোর অশান্তি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আমার অন্তরকে একচুলও টলাতে পারে

নাই। তোমার হাতে আমাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্পন করেছি। বিষয়ের সাধ্য কি যে সে আমাকে কষ্ট দেয়? তার কান মলে দিয়ে দেখাব যে যা কিছু দেবার মালিক তুমি ছাড়া আর কেউ নাই মা। মাগো আমায় বাঁচা, মাগো মাগো মাগো আমার—মা।

৮ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমার কে? মা বললেন "এই দেখ্ আমি তোর কে।" দেখলাম আমি শিশু সন্তান আর মাতৃস্তন্য দুগ্ধ পান করে বেঁচে আছি। আমার কোনও শক্তি নাই যে নিজে কিছু করি। মা কোলে করে রয়েছেন আমাকে। আমি মার কোলে উলঙ্গ শিশু ও শুধু মার স্তন্য খেয়ে বেঁচে আছি। এখন বুঝলাম মা ভিন্ন আমার আর কিছু নাই। আমার কোনও ক্ষমতা নাই। কোনও কৃতিত্ব নাই। সব কিছু আমার মায়ের। যা করছেন সব আমার মা। এ এক আশ্চর্য্য দর্শন। এ যে মহা দর্শন। মা—সন্তানকে দর্শন। আমাকে আর আমার মাকে আবার আমিই দেখছি। মা হাসছেন কেন বুঝলাম না। মাগো আমাকে বুঝিয়ে দে মা কেন তুই হাসছিস্ মা। এ আমার কি ভাব মা? আমিই তোর কোলে আবার আমিই তোকে আর আমাকে দেখছি। এ কি রহস্য মা? মা বললেন "এ গুহ্যতম ব্রহ্মজ্ঞান বা মাতৃজ্ঞান। এ জ্ঞান যারা পায় তারা শ্রেষ্ঠতম মানব। এই জ্ঞান অতি অল্প সাধক ২।১ টি ছাড়া কেউ পায় নাই। তোকে এই জ্ঞান দিলাম কেন জানিস্? তোর দৃষ্টিকে মহাপ্রসারতা দেবার জন্যে। দৃষ্টির প্রসারই একমাত্র সত্য যে সত্যে মহামানব পরম গুহ্যতম ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়। এই জ্ঞানের অধিকারী হবে আমার শ্রেষ্ঠতম সন্তান যার দ্বারা মহান্ কর্ত্তব্য ও আমার বিশেষ নির্দ্দেশ পালিত হবে সকল বিশ্বের জনগণের মহামুক্তির জন্যে। এই মহামুক্তির অর্থ প্রত্যেকের দৃষ্টিতে আমি সমুজ্জ্বল থাকব। আজ যে মোহান্ধকার জনগণকে তন্দ্রাতে অভিভূত করে রেখেছে সেই মোহান্ধকার থেকে মুক্তি হবে। একে বলে মোহমুক্তি। আজ এই মোহমুক্তির—মহাসন্ধিক্ষণ উপস্থিত। মানবগণ

অচীরে মোহমুক্ত হবে। এই মোহমুক্তির বাণী মহা-সাধকের মাধ্যমে হবে। সেই সাধক তুমি। বিশ্বাস কর। তোমার মহান কর্ত্তব্য সমুপস্থিত। তুমি প্রস্তুত হও। সময় সমাগত। একটা অলৌকিক বিবর্ত্তন ও মহা-পরিবর্ত্তন অচীরে আসছে ; তাই আমার পরিবেশ ও সেই পরিবেশে তুমিই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ও মুক্তি-মন্ত্র দাতা হবে"।

মাগো আমার মা।

১০ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

ক'দিন আগে মা আমাকে বলেছিলেন যে "তোমার সাধন যতই অগ্রসর হ'বে ততই তোমার আত্মাকে দেহরূপে তোমার সামনে দেখতে পাবে।" আমি বলেছিলাম, মা আমাকে দেখাও আমার আত্মাকে। কিন্তু দেখতে পাই নাই এ ক'দিন। আজ বাড়ীতে শুক্রবারের উপাসনায় আরাধনার সময় দেখলাম আমি বৃদ্ধ ও একটি আসনে বসে উপাসনা করছি। আমার দেহ অনাবৃত। আমার শশ্রু প্রায় শ্বেত, আমার গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি। একটি বনের মত অতি শান্ত পরিবেশে আমি বসে ভজনা করছি। এর যে তাৎপর্য্য আছে তা' মা বুঝিয়ে দিলেন। মা বললেন "দেহের পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও সাধনও পরিপক্কতা লাভ করে। জ্ঞান ও সাধন পরিপক্ক না হ'লে সাধনে বিকার ও জ্ঞানে অবিদ্যা থেকে যায়। আত্মাকে দর্শন করতে হ'লে আত্মার পূর্ণ অবস্থায়ই দর্শন সম্ভব। আত্মার পূর্ণ অবস্থা না হ'লে আত্মা দেহীর কাছে দর্শনের অযোগ্য। দেহীর সাধনে পূর্ণ অবস্থা হ'লেও আত্মার দর্শন হয় না। দেহ বিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান বৃদ্ধত্ব না পেলে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। শৈশব, কৈশোর, যৌবন প্রৌঢ়ত্ব, সকল অবস্থায় সম্যক জ্ঞান লাভ হয় ও সেই সেই অবস্থার বিচার হয় বৃদ্ধত্বে। তখন বৃদ্ধ মানব জীবনের প্রকৃত ধারা, ক্রম বিকাশ, ত্রুটি বিচ্যুতি, লাভালাভ, ভাল-মন্দ সকল বিষয় সম্যক জানতে পারে। এ যেমন দেহের পক্ষে সত্য তেমনি আত্মার পক্ষেও সেই সেই অভিজ্ঞতা লাভ সত্য। কারণ আত্মা দেহারূঢ় হয়ে বিচার

করে চলে। আত্মাও তখন সেই জীবনের পূর্ণ বিচার ক'রে সেই জীবনের বিষয়ে যতটুকু জ্ঞান লাভ করা দরকার তাহা লাভ করে। মানব যদি পরমাত্মার সাধন করে ও আত্মাশ্রয়ী হয় তবে সে তার নিজ আত্মাকে দর্শন করতে পারে। অতি অল্প মানব শৈশবে বা কৈশোরে বা যৌবনে আপন আত্মাকে দর্শন করে থাকেন। একরূপ যাঁহারা দর্শন করেন তাঁদের জ্ঞান বহুজন্মে পূর্ণতা লাভ করেছে, তাঁরা পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী ও পূর্ণ মানব। এমন মানব অতি অল্প সংখ্যক। এক জন্মে বা দুই বা ততোধিক জন্মে পূর্ণতা লাভ হয় না। দেহ যেমন সংসারে শৈশব থেকে বৃদ্ধ হয় আত্মাও তেমনি শৈশব থেকে বৃদ্ধ হয় বহু কোটি জন্মান্তর পরিক্রমা পার হ'য়ে। এ পরিক্রমা আত্মার কাছে অতি সামান্য সময়। আত্মা কালগর্ভে পতিত হয় দেহাবস্থাতেই। আত্মা আমার দেহান্তর জাত বলে কালাতীত জীবচৈতন্য। সে যদি কালাতীত জীবচৈতন্য না হ'ত তবে আমার মত কালাতীত মহাকালের ক্রোড়ে কি করে পরা-গতি লাভ করত। সুতরাং আত্মার পূর্ণ অবস্থা আত্মার বৃদ্ধত্ব যদিও আত্মা কখনও বৃদ্ধ বা জরাগ্রস্থ হয় না। সে অবস্থায় আত্মাকে জ্ঞানবৃদ্ধ বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলা হয়। এই কাল-গর্ভ দেহাবস্থায় আত্মার মঙ্গল বিধানের জন্যই করা হয়। আত্মাকে যাঁরা দর্শন করেন ও আত্মাতে যাঁরা লিপ্ত থাকেন তাঁদের জীবজন্মান্তর পরিক্রমার সাধনে সিদ্ধি। তখন তাঁরা আত্মালোকে বা পরলোকে পরমাত্মার সাধনে লিপ্ত থাকেন। এ রকম বহু পুন্যাত্মা আছেন যাঁরা আত্মিক লোকে আমার সাধনে লিপ্ত আছেন। তাঁদের জীবজন্ম পরিক্রমা পূর্ণ হ'য়েছে ও তাঁরা আর মর-জগতে দেহ ধারণ করেন না। তাঁদের গতি ক্রমে উর্দ্ধে। দেহাবস্থায় সাধনে কি আমার দর্শন হয় না? তাও হয়—। কিন্তু আমার দর্শনই পরা-মুক্তি নয়। পরা-মুক্তি হ'ল জীব চৈতন্যের আমার সঙ্গে একত্রে সখ্যভাব। জীবাত্মা তখন আমার সঙ্গে মিলিত হ'য়ে চির আনন্দ লাভ করে। সেই হ'চ্ছে জীবের পরম কাম্য। এ সব জীব জানতে পারে বহু জন্মের তপস্যার ফলে। এমন মানব ২।১টি আছে। তুমি আমার শ্রেষ্ঠতম সন্তান বলে তোমার কাছে এ সব জ্ঞান

সাধনলব্ধ। তুমি সাধনে ক্ষান্ত হ'য়ো না। তোমার মহান্ কর্ত্তব্য আছে।"

মা আমার অপার করুণাময়ী।

১০ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ আফিসে যাবার সময় ট্রামে যেতে যেতে মা বললেন "শোন, সকল জগত সংসারে আমার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না। একটা ধূলি কণা পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছা ভিন্ন স্থান চ্যুত হয় না। আমি সর্ব্বইচ্ছাময়ী পরাপ্রকৃতি। আমার ইচ্ছার লীলাই এই জগত সংসারে, ইহলোকে ও পরলোকে। ওই দেখ আমার ইচ্ছায় মুনি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ট স্বর্গলোকে থেকেও আমার ভজনা করছেন।" দেখলাম, একটি চন্দ্রের মত গোলাকার জ্যোতি তার ভিতরে দাঁড়িয়ে পূর্ব্বদিকে হাত জোড় করে এক বৃদ্ধ, পরিধানে শ্বেত বস্ত্র, গাত্রে শ্বেত উত্তরীয়, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, মস্তকের কেশ গ্রীবা পর্য্যন্ত লম্বিত, শ্বেত শশ্রু-বিলম্বিত মূর্ত্তি, ভজনা করছেন। মা বললেন "ইনি মুনিদিগের ভিতরে শ্রেষ্ঠ হ'য়েও এখনও আমার ইচ্ছা পালন করছেন। ইনি রিপুজয়ী মহাভক্ত। তোমরা যা ইচ্ছা কর সে ইচ্ছা যদি আমার ইচ্ছা না হয় তবে তোমরা সে ইচ্ছামত কাজ করতে পার না। এ হোল ইচ্ছাযোগ। তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছার সঙ্গে মনন ক'রে যে কার্য্য সাধন হয় সেই ইচ্ছাযোগে হয়। এই ইচ্ছা যোগ সাধন বড় কঠিন সাধন। কিন্তু যদি একবার সাধনে সিদ্ধ হও তবে এর মত সহজ সাধন আর কিছু নাই। আমার প্রতিটি নির্দ্দেশ যদি পালন করতে অভ্যাস কর তবে আস্তে আস্তে আমার কি ইচ্ছা সেটা তোমার কাছে অতি স্পষ্ট হ'য়ে যাবে ও তখন সেই ভাবে সকল কার্য্য আমার ইচ্ছায় তুমি করবে—। তুমি যে কোনও কার্য্য কর আমার ইচ্ছা আছে বলেই সে কাজ তুমি করতে পার। এ কথা আগেও তোমাকে বলেছি। তোমার দেহ যদি অশক্ত হয় তবে তুমি ইচ্ছা করলেও করতে পার না। তার অর্থ আমার ইচ্ছা যে তোমার দেহ অসক্ত বলেই আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি সে কাজ কর। সকল ব্রহ্মাণ্ডের সকল কার্য্য আমার ইচ্ছাধীন। তুমি জাননা কিন্তু আত্মা তোমার ইচ্ছাকে আমার ইচ্ছার কাছে আদেশ

নিয়ে তার কার্য্য করায়। এ এক মুহূর্ত্তের বিষয়। সকল জীবের আত্মাই পরমাত্মা (আমার) সঙ্গে সদাযুক্ত আছে ও সর্ব্বসময় সংলাপন করে। অন্যায় হোক্ ন্যায় হোক্ আমার ইচ্ছা ভিন্ন কোনও কার্য্য সম্পাদিত হ'তে পারে না। আমার ইচ্ছা সর্ব্বথা মঙ্গলময়। আপাত দৃষ্টিতে জীবকুল যে দুঃখ পায়, অন্যায় করে তার পশ্চাতে আমার মঙ্গল ইচ্ছাই থাকে জীবের পরা-গতিতে উন্নত করবার জন্যে। সুতরাং তুমি ইচ্ছা যোগ সাধন কর তবে তুমি আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ পালন করে কৃতকার্য্য হবে আর দুঃখ পাবে না। তুমি সাধনে অগ্রসর হও। মনে রাখবে প্রতিটি কার্য্য যা হ'চ্ছে তার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে ও আমার একমাত্র ইচ্ছাই সে তাৎপর্য্য আনয়ন করে।

মা আমার সহায়—

১১ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো সংসারে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান কি? মা বললেন "আত্মজ্ঞানই সংসারে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। জীবাত্মাই জীবচৈতন্য। জীবত্মা আমার অংশ ও আমাকে লাভ করবার শ্রেষ্ঠতম সোপান জীবাত্মা। জীবাত্মার যখন আত্মজ্ঞান লাভ হয় তখন সে আমার অর্থাৎ পরমাত্মার প্রতিটি নির্দেশ বুঝতে পারে। মোহগ্রস্তজীব আত্মতত্ত্ব ভুলে থাকে ও জীবদেহের শ্রেষ্ঠতম শক্তি যে আত্মা তার বিষয় অজ্ঞাত থাকে ব'লে তাকে অবিদ্যায় বা অজ্ঞানে অধিকার করে। তখন জীব মোহান্ধ হ'য়ে যায়। তার দৃষ্টি সঙ্কুচিত ও স্থূল হ'য়ে যায়। দৃশ্য বিষয়ভূত বস্তু ছাড়া সে আর কিছুই ভাবতে বা বুঝতে পারে না। এই অবস্থা জীবের অজ্ঞান অবস্থা। এই অবস্থায় জীবের মৃত্যু হ'লে তার জন্ম পরিক্রমা মহাক্রমিক হ'য়ে থাকে। যে পর্য্যন্ত জীবের আত্মজ্ঞান লাভ না হয় সে পর্য্যন্ত জীব এই মহাক্রমিক জন্ম পরিক্রমায় জন্ম, মৃত্যু, ভূলোক, ভর্বলোক ঘূর্ণিত হ'তে থাকে। তার আত্মার প্রসারতা থাকে না বলে মহাসম্প্রসারিত উচ্চ উচ্চতর ও উচ্চতম স্বর্গরাজ্যে তার গমন হয় না। আত্মার উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম স্বর্গে গমন না হওয়াতে আত্মার স্থূল বিষয় মোহ স্খালন হয় না। সেই জন্যে সাধুসঙ্গ,

ভক্তসঙ্গ, জ্ঞানীসঙ্গ, পূজা, উপাসনা, আমার নাম কীর্ত্তন, নামগান, নামজপ, নাম সাধন, যোগ সাধন ইত্যাদির প্রয়োজন যাতে আত্মা বিষয়ে থেকেও আপন ভাগ্যের সম্প্রসারণ করতে পারে। আত্মজ্ঞান তাকেই বলে। এই আত্মজ্ঞানের নিয়ত অনুশীলনে উচ্চ অবস্থা ও উচ্চ জ্ঞানের উন্মেষ হয়। এই আত্মজ্ঞান লাভ হ'লে আমার নির্দ্দেশ জীব সম্পূর্ণ বুঝতে পারে। আমার নির্দ্দেশ বুঝলেই তার জ্ঞানালোক বা প্রজ্ঞাচক্ষু উন্মেলিত হয়। তখন তার সর্ব্বজীবে, সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বভাবে, সর্ব্ব অবস্থায় সমত্ব হয়। এই সমত্ব ভাবই মহাজ্ঞান দান করে ও জীবাত্মা উচ্চ থেকে উচ্চতম মার্গে গমন করে। এই আত্মজ্ঞানই জীবের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। এই আত্মজ্ঞানেই জীব ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হয়। তুমি আত্মজ্ঞানের নিয়ত অনুশীলন কর। আত্মাকে সব সময় নিজের চোখের সামনে ধারণ করবে ও সর্ব্ববিষয়ে সমত্ব রক্ষা করবে।" মাগো আমার সকল ভার তুমি গ্রহণ কর মা। তুমি আমার আত্মজ্ঞান, তুমিই আমার ব্রহ্মজ্ঞান, তুমিই আমার সব।

১১ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো সংসারে শ্রেষ্ঠতম আশ্চর্য্য কি? মা বললেন, "জীব পরিক্রমায় মানবগণ আমার জঠরে জন্মলাভ ক'রে, আমার দ্বারা সংসারে লালিত-পালিত হ'য়ে ও মৃত্যুতে আমার কোলেই আশ্রয় লাভ ক'রেও দেহজাত অহংকার লাভ ক'রে আমাকেই অস্বীকার করে ইহাই শ্রেষ্ঠতম আশ্চর্য্য। জন্ম যখন তার ইচ্ছাধীন নয়, মৃত্যুও যখন তার ইচ্ছাধীন নয়, তবে সংসার যাত্রার কার্য্য সকল কি ভাবে তাদের ইচ্ছাধীন হবে? তারা মনে করে তারা সংসারে যে সকল কার্য্য করছে সবই তার নিজেদের ইচ্ছায় করছে। জীবের এই মোহই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠতম আশ্চর্য্য। যে জীব এক মুহূর্ত্তে মোহকে খণ্ডন করতে পারে সে শক্তি তার অবগত থাকা সত্ত্বেও সে নিজ দেহাত্ম অহংজ্ঞানে নিজেকে নিজ ইচ্ছাধীন মনে ক'রে অন্তরে স্থূল প্রসাদ লাভ করে। জীবের এই বিভ্রান্তিই শ্রেষ্ঠতম আশ্চর্য্য এই সংসারে।"

আমার মা অপার জ্ঞান দায়িনী জগত জননী। মাগো আমাকে তোর পায়ে একেবারে ধরে রাখ মা। আমার যেন আমিত্ব না থাকে মা।

১১ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মীমাংসা কি মা? মা বললেন, "বিশুদ্ধ-চৈতন্যই" দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদের পূর্ণ মীমাংসা। জীবচৈতন্য পরমচৈতন্যে, পরমচৈতন্য জীবচৈতন্যে একাত্ম সংযোগই "বিশুদ্ধ-চৈতন্য"। ভেদে অভেদাত্ম। আপাত দৃষ্টিতে ভেদ প্রতীয়মান হ'লেও পরমচৈতন্যই জীব-চৈতন্যের জন্মদাতা। আবার জীবচৈতন্যের পূর্ণ বিকাশ পরম চৈতন্যের সংযোগেই হ'য়ে থাকে। জীবচৈতন্য না থাকলে আমার লীলার প্রকাশ অর্থহীন হয়। আবার পরমচৈতন্যের সংযোগ না হ'লে জীবচৈতন্য মূল্যহীন হ'য়ে পড়ে। সুতরাং সদ্‌চিদানন্দ পরম চৈতন্য একাত্মভাবে জীবচৈতন্যের নিত্য-যোগে বিশুদ্ধ চৈতন্য রূপ মহাভাব বা মহাচৈতন্যের মহানন্দরূপ লীলায় নিত্য লীলাময় হন। সুতরাং দ্বৈত নয় অদ্বৈতও নয় আসলে "বিশুদ্ধচৈতন্যই মহাসত্য" ও ইহাই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের পূর্ণ মীমাংসা। এ মহাসত্য বলে জানবে"।

মাগো আমাকে এ কি সব জ্ঞান দিচ্ছিস্ মা?
মাগো তোর চরণ আমার এক মাত্র ভরসা।

১৭ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পূর্ণতা হয় কিসে মা? মা বললেন "দেহ ও আত্মার সংযোগেই পূর্ণতা আসে। শুধু দেহতেও পূর্ণতা হয় না বা শুধু আত্মাতেও পূর্ণতা হয় না। আত্মা দেহারূঢ় হ'য়ে দেহের সকল ভোগ যখন সমাপ্ত করে ও আমকে অভিলাষ করে তখন সে পূর্ণতা লাভ করে। সেই জন্যেই দেহের সৃষ্টি। এ সৃষ্টি নিরর্থক নয়। দেহ, সাধনের প্রকৃষ্টতম সোপান। দেহ ধারণ না হ'লে পূর্ণতা হবে না বা আমার কোন লাভ হবে না। যত চেষ্টাই করনা কেন কিছুই হবে না। অনেক সাধক বলেন "আর যেন দেহ ধারণ না হয়। দেহ ধারণ বড় কষ্টের"। আরে বাবা স্থূল দেহের আকাঙ্ক্ষার পরে কষ্ট

আছে বলেই ত বীতরাগ হয়। স্থূল দেহের ভোগের সাধনে বীতরাগ না এলে যে আমার প্রতি ভক্তিরাগ হবে না। সাধন কর। তোর খুব উচ্চ অবস্থা"।

আমার মা অপার জ্ঞান দায়িনী।

১৭ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো কেন অর্থের প্রতি এত টান আসে? মা বললেন, "স্থূলতাই দেহীর পথে আকর্ষণের বস্তু। অর্থ, বিত্ত, কামিনী, কাঞ্চন যার স্থূল রূপ আছে বা যে কোনও স্থূলরূপ বা বিকাশ বা লোভ্য তাই দেহীর পক্ষে আকর্ষণের বস্তু। এ যে খারাপ তা নয়। এ সব আমার দান ও এ সব সাধনের পথেই অগ্রসর হবার সোপান। কারণ এ সবের উপভোগ না হ'লে পরমানন্দ কি তার স্বাদ লাভ হয় না। এ সব ভোগ করবার পর যখন আত্মার শান্তি আসে না তখন ইহার বাইরে কি আকর্ষণ আছে তার সন্ধান চায়। যখন পরমানন্দের সন্ধান পায় তখন সে বোঝে যে কত মহৎ আনন্দ তাতে আছে। তখন আত্মা বিচার করে যে যা সে উপভোগ করে এসেছে এর তুলনায় তাহা অতি নগন্য। তখনই সে ব্রহ্মভূমায় ব্রহ্মময়ীর কোল লাভ করে। কোনও আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষকে ভোগের দ্বারা তৃপ্ত করবে। যদি বিন্দুতম আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ থাকে মনে তবে আমাকে সম্পূর্ণ লাভ করতে পারবে না। আমাকে সম্পূর্ণ লাভ করতে হ'লে সকল আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এই আকাঙ্ক্ষা যখন বিষয় মুখিন্ সেও আমার সাধান আবার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ নিবৃত্তির পরে পরমানন্দ লাভ করবার নির্ব্বেদ সাধন ও আমার সাধন। বিষয় সাধন পূর্ণ হ'লেই তবে পরমার্থ সাধন পূর্ণ হবে। তার আগে মুক্তি নাই। তার আগে আমার দর্শন হয় না। তার আগে আমার প্রতি একান্ত অনুগত হওয়া যায় না। সুতরাং বিষয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর আমামুখিন্ থেকে। যখন বিষয় আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে তখন তুমি নিজেই পরমানন্দ খুঁজবে। সাধন কর সব হবে ভাবনা কি? আমার মঙ্গল ইচ্ছা তোমার প্রতি সর্ব্বদা সজাগ আছে।"

মাগো তুমি আমার সহায়।

১৭ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বললেন যে আত্মার একটি ছিদ্রপথ আছে তার ভিতর দিয়ে আত্মা পরলোক দর্শন করেন। এর তাৎপর্য্য কি বুঝিয়ে দাও না। মা বললেন, তাঁর বলার ভুল আছে। আত্মার কোনও ছিদ্রপথ নাই। ছিদ্রপথ আছে দেহের। সেই ছিদ্রপথের নাম প্রজ্ঞাচক্র। সেই প্রজ্ঞাচক্ররূপ ছিদ্রপথে আত্মা ভূমা দর্শন করেন। দেহের যেমন স্থূল দৃষ্টি আত্মার তেমনি ভূমা দৃষ্টি। আত্মার অবলোকন ভূমায়। এই ভূমার-দৃষ্টিতে আত্মা পরম সুখলাভ করেন।"

মা দেবভাব কি? মা বললেন, "দেবভাব হোল দিব্যভাব। দেবভাব অর্থে দেবতার অনুরূপ ভাব না। দিব্যভাব হোল শ্রেষ্ঠতম ভাব। এই শ্রেষ্ঠতম ভাব কি? মহত্তমভক্তি, মহত্তম বিশ্বাস ও মহত্তম নির্ভর। দিব্য বা শ্রেষ্ঠতম ভাবকে শুদ্ধতম ভাবও বলা হয়। ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর যখন পূর্ণতা লাভ করে ও সেই দেবভাব। অনন্ত জ্ঞান সমুদ্র মন্থন করলেও এই তিনটি শ্রেষ্ঠতম ভাব লাভ হয় না। ইহা লাভ করতে হ'লে আমার প্রতি একন্ত শরণাপন্ন হ'তে হয়। আমাকে সর্ব্ব সময়, সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব ভাবে, সর্ব্ব কার্য্যে ও সর্ব্ব চিন্তায় আমার সঙ্গে যোগে এই দিব্যভাব লাভ হয়। আর এই দিব্যভাব লাভ হ'লে মানবের কাছে জ্ঞান সমুদ্র প্রকট্ হয় ও মানব শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান অর্থাৎ আমার দিব্যজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। তুমি সর্ব্বদা আমার যোগে মগ্ন হও। তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে ও মহাশক্তি লাভ হবে। এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি হবে শিগ্রই ও সে পরিবেশে তুমি মানব সমাজে তোমার সেই ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে প্রকট্ হবে। এ আমার কার্য্য বলে জানবে। সেই পরিবেশে তোমার প্রচুর অর্থ লাভ হবে ও তোমার সকল সাংসারিক অর্থের চিন্তা চিরতরে ঘুচে যাবে। তোমার মহা সাধনে তুমি অগ্রসর হবে ও তোমার মহান্ কর্ত্তব্য সাধিত হবে, বিশ্বাস কর। আমি যুগে যুগে কত অলৌকিক লীলা করেছি এই মানব সমাজের মুক্তির জন্যে।

আবার এখন সময় এসেছে আমার শ্রেষ্ঠতম অলৌকিক লীলার প্রকাশ করব।"

আমার মা মাগো তুই আমাকে দিয়ে কি করতে চাস্ মা ? তুই আমার একান্ত ভরসা।

১৭ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো চিন্তা কি ? মা বললেন, "চিন্তা বিষয় দৃষ্টি। যে কোনও বিষয়ে দৃষ্টি হ'লেই চিন্তা আসে। দৃষ্টি যে কেবল চক্ষু দিয়েই হয় তা নয়। শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ইত্যাদির সংস্পর্শেও চিন্তার উৎপত্তি হয়। আমার চিন্তা যখন চিন্তার নামান্তর হয় তখন সে চিন্তাও বিষয়-চিন্তা। কারণ আমার নাম করলে পুণ্য হবে, স্বর্গবাস হবে, দুঃখ দূরে যাবে এই ভাব থেকেই আমার প্রতি চিন্তা আসে। কিন্তু সেই চিন্তা যদি প্রগাঢ় ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরের দ্বারা প্রবাহিত হয় তখন তাকে সাধন বলে। সাধনের ভাব এলেই যোগ হবে। যোগ এলেই আমাগত অবস্থা আসে ও তারপর নিত্যানন্দ লাভ হয়। এ নিত্যানন্দ পরমানন্দ। সাধক যখন সকল স্পৃহা ত্যাগ করে আমাতে আত্ম সমর্পন করে ও আমাগত হয় তখন তার পরমানন্দ অবস্থা। এ অবস্থায় সাধক যা চায় তাই পায়। না চাইলেও পায়। কারণ তার স্পৃহা নাই। স্পৃহা না থাকলেই প্রাপ্তি যোগ হয়। স্পৃহা থাকলে তার পরমানন্দ লাভ হয় না বা প্রাপ্তি যোগ হয় না। আনন্দের মহান্ আকর্ষণ আত্মানন্দ। আত্মানন্দ যখন নির্ব্বিকার তখন পরমানন্দ। পরমানন্দ যখন গূঢ়তম কারণ অন্বেষণ করে তখন তার সঙ্গে আমার অহর্নিশ যোগ ও বাক্যালাপ হয়। ঊর্দ্ধ, অধঃ পরিপূর্ণ যে কল্পলোক সাধক তখন সে কল্পলোক পরিত্যাগ করে মহাকল্প ব্রহ্মভূমায় ব্রহ্মময়ীর দর্শন ও তাঁর বাণী শ্রবণ করেন। কার্য্য তার শ্রবণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তখন সে মহা সাধক। তোমাকে সেই সাধক করবার জন্যেই আমার এত প্রচেষ্টা। তুমি মনে প্রাণে সাধন কর। আমাগত হও ও আমার ভূমায় সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা বিচরণ কর। অতি শিঘ্র তোমার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হবে।"

মাগো কি হবে জানিনা। জানি তোকে আমার মা বলে।

১৮ই মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে ৮টায় ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে নিয়ে গেলেন আমার বন্ধু প্রবর শ্রীঅখিল চট্টোপাধ্যায় তার ফার্ণ রোডের বাসায়। ব্রহ্মানন্দ এলেন প্রায় সাড়ে আটটার পরে। পূর্ণ যুবক, বলিষ্ঠ গঠন। মাথায় লম্বা চুল বেনী করে মাথার উপর বাঁধা। মুখে দাড়ি ও গোঁফ আছে। ভ্রূযুগলের মাঝখানে একটি ছোট্ট ঈষদ্ কালচে ফোঁটা। পরনে গোলাপী রংয়ের পাঞ্জাবী ও পায়জামা। ডান হাতের মধ্যমাতে একটি পাথর বসানো আংটি আছে। পায়ে দেন হরিণের চামড়ার জুতা। বেশী কথা বলেন ও চাঞ্চল্য আছে। আমি তার কাছে বসলাম অখিল বাবুর অনুরোধে। বললাম কিছু বলেন। তিনি বললেন, কি বলব? বলে আর কি হবে? অনুভব করতে শিক্ষা করুন। অখিল বাবু ও তার অন্য সব বন্ধুরা আমাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন কোনও প্রশ্ন করবার জন্যে। আমার ইচ্ছা ছিল না যে কোনও প্রশ্ন করি। কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে একটি প্রশ্ন করলাম। "দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মীমাংসা কি?" তিনি বললেন, "অদ্বৈতবাদই দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের মীমাংসা।" আমি বললাম আমার অনুভূতিতে "বিশুদ্ধ চৈতন্যই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের পূর্ণ মীমাংসা। পরম চৈতন্য যখন জীবচৈতন্যে একাত্ম লাভ করেন তখন বিশুদ্ধ চৈতন্যের উদ্ভব ও তাই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের মীমাংসা।"

অখিল বাবুর বন্ধু বানীপ্রদ দত্ত প্রশ্ন করলেন তাঁকে "ব্রহ্মচর্য্য কি?" তিনি বললেন, "আমার সময় কম। ৯টা ২০ মিনিটে আমার ট্রেন ধরতে হবে। এত অল্প সময়ের ভিতরে এর কি উত্তর দেব? তবে সোজা করে বলি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ইত্যাদিকে সংযত করাই ব্রহ্মচর্য্য। সকলেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারে। বিবাহিত ব্যক্তি কি ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারে না? সেও পারে ইত্যাদি।"

আমার যেন কেমন মনে হ'ল। এই কি সদুত্তর হল? না। বাড়ী এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "ব্রহ্মচর্য্য কি মা?" আমাকে খুব সহজ করে বুঝিয়ে দাও না। মা বললেন, "ব্রহ্মচর্য্য অতি কঠিন সাধন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সংযত করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে না। ইহা ব্রহ্মচর্য্য লাভের সবচেয়ে নিম্নতম সোপান। ইহাকে সংযম বলে। এই রিপু সকলকে পূর্ব্বের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বলে গেছেন, 'যম' অর্থে কৃতান্ত অর্থাৎ হানীকারক বা বুদ্ধের ভাষায় "মার।" সেই কৃতান্ত যা দেহকে ঈশ্বর বিমুখ করে তাকে সং অর্থে "যম্" অর্থে একযোগে করা। এই দেহজাত রিপুগণকে একযোগে বা এক ব্রহ্মযোগে নিবদ্ধ করাই 'সংযম' এই একযোগে অর্থাৎ—একাগ্রতার দ্বারা দেহজাত রিপুগণকে আমা মুখিন্ করবার যে সাধনা তাকে "সংযম" বলে। এই সাধন দ্বারা ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না।। কিন্তু এই সাধনের পরম উৎকর্ষে ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়। যখন সাধক সংযমকে আকর্ষণ ক'রে, তার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে ব্রহ্মভূমায় ব্রহ্মময়ীর চর্য্যা অর্থাৎ আমার সেবাতে তনুমন সমর্পিত করেন তখন ব্রহ্মচর্য্য। আমার সেবা কি? আমার শ্রেষ্ঠ সেবা হোল আমাকে স্মরণ, আমাকে মনন, আমার বাক্য শ্রবন ও আমার নির্দ্দেশমত কর্ত্তব্য সম্পাদন। এই আমার শ্রেষ্ঠ সেবা। সেই শ্রেষ্ঠতম সেবা কি করে লাভ হবে? আমার একান্ত শরণাপন্ন হওয়া, আমাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা ও অনন্য গতি হ'য়ে আমাকে সকল সমর্পণ ও সেই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য অতি সুকঠিন। পূর্ব্বে ঋষিবালকগণ যে ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রত সে হ'চ্ছে গার্হস্থ ব্রহ্মচর্য্য। সে হ'চ্ছে দেহের রিপুকে সংযত ক'রে পরিচালিত করবার ক্ষমতা লাভ। যাতে আত্মবল লাভ হয় ও রিপুর উপর অন্তরের প্রভাব উৎপত্তি হয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য যদি সাধক গ্রহণ করে তবে তার চরম উৎকর্ষের সাধনায় আত্ম নিবেদন ক'রে নিরালম্ব হতে হবে। তোমাকে এ বিষয় আরও পরিষ্কার ক'রে পরে বুঝিয়ে দেব।"

আমার মা সহায়।

১৯শে মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে লেকে বেড়াতে বেড়াতে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমার কাছে কি চাও? মা বললেন, "আমি তোমার কাছে চাই ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভর, প্রেম, দয়া"। আমি বললাম, তুমি আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভর, প্রেম, দয়া যদি না দাও তবে তুমি সে গুলো আমার কাছ থেকে চাইবে কি ক'রে? তুমি আমাকে দেবে তবে ত' চাইতে পার? এই নিয়ে মার সঙ্গে ভীষণ তর্ক করলাম। মা হাসতে লাগলেন। আমি বললাম, হাসলে চলবে না। বললাম একটা রফা কর মা। তুমি আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভর দয়া. প্রেম, অর্থ, বিত্ত, সম্পদ, গৃহ, বৈরাগ্য, বিবেক, জ্ঞান, শক্তি এই সব দাও প্রচুর আর তার বদলে তোমাকে আমি আমার আত্মা, দেহ, মন সব সম্পূর্ণ সমর্পন করি। কি রাজি আছ? মা বললেন, "তাই হবে"। বাড়ীতে ফিরে এসে, কাঁদলাম। মা বললেন, "কাঁদছিস্ কেন?" আমি বললাম, কেন কাঁদছি সে কি তুমি জান না? কাঁদছি "ডেকে দেখা পাইনে তোমার, আমার জীবন গেল কাঁদতে"। মা বললেন, "কেন, তোকে ত' অনেকবার দর্শন দিয়েছি। এখন আর দর্শন নয়। এখন আমি তোর সঙ্গে নিত্য থাকব জীবন্ত রূপে। এখন আমার নিকট সান্নিধ্যই তোমার প্রপ্তি। তোমার সব কিছু আমাগত হ'য়ে যাবে ও তোমার সঙ্গে আমি ছায়ার মত থাকব"।

২১শে মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাধনের মার্গ কয়টি? মা বললেন, "সাধনের মার্গ মাত্র দুইটি—ভক্তি মার্গ ও জ্ঞান মার্গ। ভক্তি মার্গের সোপান বিশ্বাস ও নির্ভর। আর জ্ঞান মার্গের সোপান বিচার। ভক্তি মার্গে সাধনায় ভক্তি ও জ্ঞান দুই লাভ হয়। আর জ্ঞান মার্গের সাধনায় শুধু জ্ঞানই লাভ হয়। তোমাদের জ্ঞান আংশিক ও অপরিপূর্ণ তাই তোমাদের বিচারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। জ্ঞান মার্গে সাধনায়, আমিরূপ নির্ব্বেদ পরমাত্মার সত্বার বিচারই হয়, আমার বিষয় জ্ঞানলাভ হয়, কিন্তু আমাকে মানব অন্তরের নিকটতম গৃহে

লাভ হয় না। আমার সঙ্গে একাত্ম যোগে যুক্ত হওয়া যায় না। জ্ঞান মার্গের সাধনায় আমি সাধকের কাছে মহাবিস্ময়, মহা প্রহেলিকা, মহাঊর্দ্ধ, মহাগূহ্যতম অপার অগম্য নির্ব্বেদ পরমাত্মা। আর ভক্তি মার্গে সাধনায় আমি মাতা, বন্ধু, সখা, ও মানব অন্তরের নিকটতম গৃহে নিত্যলীলাময়ী সারৎসারা। ভক্তি মার্গের সাধনার সোপান বিশ্বাস ও নির্ভরে সাধক আমাকে অতি নিকটতম পরিব্যপ্ত, জীবন্ত সর্ব্বময়ী মাতা, পিতা, বন্ধু সখা রূপে দর্শন করে। এই অবস্থায় সাধক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও ভক্তি দুইই লাভ করে। ভক্তি মার্গে সাধনায় সাধক আমার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যায়। আমার সত্ত্বা বা অবস্থিতি অন্তরে ধারণ ক'রে প্রেমে বিগলিত হয় ও আমাকে শ্রেষ্ঠতম রূপে অন্তরে আকর্ষণ করে। আমি সাধকের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। ভক্তি মার্গের সাধনা শ্রেষ্ঠতম সাধনা। তোমাকে আমি সেই পথে দীক্ষা দিয়েছি ও সাধন শেখাচ্ছি। সাধন কর আরও সাধন কর, তোমার মহা সম্ভাবনা নিকটতম। তুমি শ্রেষ্ঠতম আত্মা। তোমার কর্ত্তব্য মহান্। অগ্রসর হও। সব আমার উপরে ছেড়ে দাও। সব আমি করাব।

মা আমার অপার করুণাময়ী।

২১শে মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মার্গ কি? মা বললেন, "অন্তর সম্বন্ধ যোগই মার্গ"। অন্তর আত্মার লোক। সেই লোকে যখন আত্মা স্থিত হ'য়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রতে চেষ্টা করে সে ভক্তির পথেই হোক আর জ্ঞানের পথেই হোক্ সেই হ'ল মার্গ। এই মার্গের স্তর আছে। স্তরের পর স্তর পার হ'য়ে উত্তম মার্গে আত্মা যখন পৌঁছায় তখন তার জীবন্মুক্ত অবস্থা। জ্ঞান মার্গে এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় আত্মা অপার অসীম সত্তায় অবলোকন ক'রে নির্ব্বিকল্প লাভ করে ও তার প্রশ্নের মিমাংসা হয় না। আর ভক্তি মার্গে আত্মা আমাকে নিগূঢ়রূপে জেনে সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পন ক'রে আমার অভাবনীয় স্পর্শ ও সান্নিধ্য লাভ ক'রে অশ্রুজলে অন্তর লোক প্লাবিত করে।

এই মার্গে তার সকল প্রশ্নের মিমাংসা হয় আমার সঙ্গে একাত্ম যোগে। ভক্তি যোগ-মার্গ শ্রেষ্ঠতম মার্গ ও এই মার্গে তোমার সাধনা হ'চ্ছে। ভক্তি আরও সাধন কর।"

মা আমার অপার করুণাময়ী —।

২৬শে মে, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

ক'দিন হোল মা আমাকে বারে বারে বলছেন, "তুমি আমার শ্রেষ্ঠতম আত্মা। তুমি সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠতম আত্মা। তোমার মহান্ অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েছে আমার প্রসাদে ও তুমিই একমাত্র আমার শ্রেষ্ঠতম কার্য্য সম্পাদনের যোগ্য ব্যক্তি এই বাণী সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করবে"। আমি বললাম কেমন যেন খটকা লাগছে মা। আমি যে বড় দুর্ব্বল চেতা, একটুকুতেই লোভের পথে যাই, কি করে আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা হ'লাম। মা বললেন, "ওর জন্তে চিন্তা নাই, ও দেহের স্থূল বিকার একটু আধটু থাকবেই। কিন্তু যখন ক্ষেত্রে তোমাকে নামিয়ে দেব তখন তুমি মহাসিংহ, অহঙ্কারশূন্ত পরিমুক্ত আত্মা, প্রেমে এই ভুবন জয় করবে। বিশ্বজয় ক'রে বিশ্বজয়ী হ'য়ে তুমি বিশ্বের দীনতম সেবক হবে তবেত তোমার ভিতর দিয়ে আমার আদর্শ—মানব রাজ্য, মানব পরিবার, প্রেম-পরিবার, ও বিশ্বাসী-পরিবার গঠিত হবে। শোন সূর্য্য সকল গ্রহ উপগ্রহকে আলোক বিতরণ করে আমার নির্দ্দেশে। সেই আলো যে নক্ষত্র যতটুকু গ্রহণ করতে পারে সে সেই টুকু আপনাকে জগতের কাছে প্রকট করে। তার ভিতরে চন্দ্রের গ্রহণের ক্ষমতা সবার চাইতে বেশী সে যে কারণেই হোক্। সূর্য্যের থেকে তার দূরত্ব অন্যান্ত গ্রহের থেকে কম, তার মানে সে নিকটতম ও তার প্রাকৃতিক পরিবেশ এমন ভাবে গঠিত যাতে তার উপরে যে অগ্নিময় রশ্মি পতিত হ'চ্ছে সেই রশ্মিকে সে স্নিগ্ধ আলোকে পরিবর্ত্তিত করে জগতকে দান করছে। তেমনি সাধকত লক্ষ লক্ষ আছেন। মানব বা জীব জগতে প্রত্যেক জীবই সাধক ও প্রত্যেকের উপরেই আমার প্রেম-কিরণ পতিত হ'চ্ছে। সে কিরণ যতটা যে গ্রহণ করতে পারে ততটা সে প্রকট।

আর তোমাকে যদি আমি চন্দ্র করি তার অর্থে তুমি আমার নিকটতম, সাধন যাত্রায়, জীব পরিক্রমায় ; তাই তোমার উপরে যে আমার প্রেমালোক পূর্ণরূপে পতিত হ'য়েছে সে প্রেমালোক তুমি গ্রহণ ক'রে জীবজনের মঙ্গলের জন্য, মহারক্ষার জন্য, মহাপ্রেম পরিবার গঠন করবার জন্য বিতরণ করবে। এর ভিতরে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র আমিই সৃষ্টি করেছি। তাদের শক্তি আমিই দিয়েছি। আমি যদি তোমাকে সৃষ্টি ক'রে তোমাকে একটা মহাশক্তি দান করি তাতে সন্দেহ করবারই বা কি আছে আর অবিশ্বাস করবারই বা কি আছে। তোমার আত্মা যখন বহু কল্প কল্পান্তর পার হ'য়ে কত জীব-জন্ম ও মানব-জন্ম পার হ'য়ে এসেছে আমার চিহ্নিত হ'য়ে, আজ এই যুগে এই মহাপুণ্য কার্য্য, মহা-রক্ষা কার্য্য করবার জন্যে, মহা-কর্ত্তব্য পালন করবার জন্যে, আমার শ্রেষ্ঠতম অভিলাষ জয়যুক্ত করবার জন্যে, তখন তোমার বারে বারে সন্দেহ করবার কিছুই নাই। বিশ্বাস দৃঢ়তম কর, তুমি শ্রেষ্ঠতম আত্মা। অগ্রসর হও। মহা সন্ধিক্ষণ সমাগত। তোমার সময় শিগ্র উপস্থিত হবে।"

মা আমার একান্ত সহায়।

১লা জুন, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন, "তোমার জীবন সমর্পনের জীবন। তোমার সব আমাকে সমর্পন কর। আমার কাছে নিজেকে ও তোমার স্থাবর অস্থাবর, দেহ, জ্ঞান, বিদ্যা, চিন্তা যা কিছু তোমার বলতে আছে সব আমাকে সমর্পন করলে তোমার কিছুর অভাব থাকবে না। যদি নিস্বার্থ হ'য়ে সব আমাকে সমর্পন করতে পার তবে ধারণার অতিরিক্ত ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ লাভ হবে তোমার"।

আমি মাকে বললাম তাই হোক্। আজ থেকে তোমার হাতে সব উঠিয়ে দিলাম। আমার আর আমার বলতে কিছুই থাকল না। সব আমার মায়ের। মায়ের সংসার মায়ের দান, মায়ের দয়া, মায়ের গাড়ী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আফিস,

ব্যবসায়, কারখানা যা আছে সব আজ থেকে আর আমার বলব না। যা এতদিন মায়েরই ছিল তা মায়েরই রইল। আমি শুধু মাঝখানে দেহ বিকারে অন্ধ হ'য়ে সব আমার আমার বলেছি। এবার মায়ের ছেলে হ'য়ে মায়ের সংসারে আছি। আমি বালক, আমি অজ্ঞান নই আবার জ্ঞানীও নই। খালি বুঝি আমার মাকে। মা আমাকে যা বোঝান তাই বুঝি। মা আমার সকল ভার নিয়েছেন। মা আমার সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ আছেন। খেতে বসে মাকে দেখি সামনে বসে আছেন। বেড়াতে গেলে দেখি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছেন। গাড়ীতে চলতে দেখি মা আমার পাশে বসে আছেন। রাত্রে শোবার সময় দেখি আমার দিকে চেয়ে হাসছেন। আবার সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি তেমনি আমার দিকে চেয়ে হাসছেন। মার আমার নিদ্রা নাই। সর্ব্বক্ষণ মা শুধু আমাকে চোখে চোখে রাখেন। কামার্ত্ত হ'য়েছি, মাকে বললাম আমার কিছু হবে না ছেড়ে দে আমায়। মা বললেন "ও কিছু নয়। দেহ থাকলে বিকার হবেই। তার জন্যে ভাবনা কি? কাম ভাব বেশী হ'লে ভোগের দ্বারা শান্ত কর। তা না হ'লে ভোগও হবে না সাধনও হবে না। সাধন যদি করতে চাও তবে ভোগের দ্বারা রিপুগণকে শান্ত কর। মনের ভিতরে ভোগ বাসনা বা কামের ভাবনা আসাও যে কথা যে কোনও নারীর সঙ্গে সঙ্গমে কাম চরিতার্থ করাও একই কথা। ভোগের দ্বারা এমন চরিতার্থ হওয় চাই যে আর সে ভোগ বাসনা মনেই আসবে না।"

আজ থেকে আমার "মা" আমার সর্ব্বময়ী কর্ত্রী থাকবেন। আমার মা সহায়। মাগো আমাকে ভাল করে দে মা।

২রা জুন, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

পরমার্থ কি মা? মা বললেন, "ভক্তির মহাপ্লাবনে আত্মার অবগাহনে অচ্যুদানন্দ প্রাপ্তিই পরমার্থ।"

মোক্ষ কি মা? মা বললেন, "মোহ মার্গ থেকে মুক্তিই মোক্ষ। মোহ মার্গও দেহের সাধন। এই সাধন সর্ব্ব নিম্নস্তরের। কিন্তু এই সাধনই উচ্চ

মার্গে সাধনার সোপান। উচ্চ মার্গের সাধনে পরমার্থ লাভ হ'লেই মোহ সাধন থেকে মুক্তি হয় ও সেই পরমমোক্ষ।"

পরমার্থের স্বরূপ কি মা? মা বললেন, "অরূপ মহাজ্যোতির আনন্দ প্রস্রবণই পরমার্থের স্বরূপ। মোহ সাধনরূপ অজ্ঞান তিমির মুক্ত হ'য়ে জীবাত্মা পরমাত্মার আনন্দ প্রস্রবণের ধারায় এসে পতিত হয়। এই ধারার একাগ্র প্রস্রবণই পরমমোক্ষ লাভের সহায়। শেষে জীবাত্মার সর্ব্ববিকার খণ্ডন হয় ও নিত্যানন্দে চির আনন্দ প্রাপ্ত হয়। আত্মার নিত্য আনন্দ প্রাপ্তিই পরমার্থের স্বরূপ দর্শন।

২রা জুন, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

বন্ধন কি মা? মা বললেন, "মোহই বন্ধন। স্থূল বিষয়ে একাগ্র মনো-বিস্তারই মোহ বন্ধন। এই অবস্থায় আত্ম জিজ্ঞাসা থাকে না। শুধু থাকে উগ্র দেহ-বিকার ও বিষয় বুদ্ধি।"

মুক্তি কি মা? মা বললেন, "আত্ম জিজ্ঞাসাই মুক্তির সোপান। মনো-রাজ্যে আত্মগত হ'য়ে দেহজাত বিষয় সকলকে বিচার করবার অবস্থাই মুক্ত অবস্থা। যখনই আত্মা উপলব্ধি করল যে দেহ বিকার জড়তা, বিষয় দেহের স্থূল সাধনের নিম্নস্তরের সোপান মাত্র তখনই তার মুক্ত অবস্থা। আত্মবিচারই—মুক্তি।"

৭ই জুন, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

গতি কি মা? মা বললেন, "বিক্ষুব্ধ চিত্তে সমত্ব লাভই গতি। চিত্তের অবল্য নাশ হয় আত্মদর্শনে। আত্মদর্শনের উপলব্ধি স্থির হ'লে প্রজ্ঞালোকে ব্রহ্মভূমার অবলোকন হয়। এই অবস্থায় চিত্ত সর্ব্ব বিষয়ে সমত্ব লাভ করে ও তাই হ'চ্ছে গতি। গতির বিশ্লেষণ নাই। গতিই পরম আর পরমই গতি। সাধক অনন্ত ব্রহ্মভূমায় ব্রহ্ম দর্শনের মুক্ত পক্ষ বিস্তার ক'রে যখন সচলমান সেই ত গতি। তার আবার বিশ্লেষণ কি? আমিই গতি আর গতিই আমি।"

৭ই জুন, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

তুমি কে মা? মা বললেন, "আমি নিত্যানন্দ আনন্দ। আমিই একমাত্র আনন্দ ও আনন্দই একমাত্র আমি। আমি ভিন্ন আনন্দ নাই। আনন্দ ভিন্ন

আমি নাই। আমি আত্মানন্দ ও পরমানন্দ। আমি পরাপ্রকৃতি আনন্দময়ী। সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে এক আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যা দেখ, শোন, ভোগ কর, উপভোগ কর, যা কিছু হয় সবই আনন্দ। আনন্দই বীজ। এই আনন্দ ভিন্ন গতি হয় না। আনন্দ আছে বলেই গতি আছে। গতি আছে যে হেতু আনন্দই গুহ্য। এই গুহ্য আনন্দই পরমানন্দ ব্রহ্মভূমা ও আমিই সেই পরমানন্দ। আনন্দই সর্ব্বস্থানে পরিব্যপ্ত। ও আমিই গুহ্যাতি গুহ্য পরমানন্দ ব্রহ্মময়ী। আমাকে ভজনা কর সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে।"

২২শে জুন, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল সকালে মা বললেন, "মনই সব। ওই খানেই সব কিছুর জন্ম হয়। দেহত একটা আধার মাত্র। মন একে যে ভাবে চালাবে সেই ভাবে চলবে। মনে পাপ, মনে পুণ্য, মনে স্বর্গ, মনে নরক। মনকে চিনতে হবে। মনকে সর্ব্ব অবস্থায় অনুসন্ধান করতে হবে সে কি ভাবে, কি করে, কোথায় যায়, কোথায় থাকে, সব সময় তাকে দেখতে হবে। একে ঠিক ভাবে চালিত করতে পারলে, একে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে যা কিছু চাওয়া যায় সব পাওয়া যায়। দেহকে প্রভাবিত করে মন। যে কোন সামান্যতম কার্য্য মন না বললে দেহ করে না। মনে যাতে কোনও অন্যায় চিন্তা না আসে সে দিকে দৃষ্টি রাখা মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এই যে সকল রিপু এরা সব মনোরিপু বা মনোবিকার বা ভবরোগ। ভূরোগ হোল দেহের যত রোগ আর ভবরোগ হোল রিপু সঞ্জাত মোহবিকার। এই ভবরোগ খণ্ডন হয় আমার সঙ্গে যোগ স্থাপনে। জপের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগ স্থাপন সহজতম পন্থা। রিপুকে সংযত করবার শ্রেষ্ঠতম উপায় হ'চ্ছে আমার প্রতি মনঃ সংযোগ ও নাম জপ করা। নাম জপের সময় যাতে অন্য দিকে মন বিক্ষিপ্ত না হয় তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। মনকে একাগ্র করবে। এই ভাবে যোগ সাধন করলে মনে আর কোনও রিপুর প্রভাব আসবে না। মনে চিন্তা করাও যা দেহের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পাদন করাও একই ফল প্রসব করে। মনকে সংযত করাই দেহকার্য্য সংযত ভাবে

সম্পাদন করার মূল স্বরূপ। মনোরাজ্যই আসল রাজ্য। এই রাজ্যই সর্ব্বময়, সর্ব্বব্যাপী ও সংসারের দৃশ্য অদৃশ্য যা কিছু হ'চ্ছে সকলই এই মনোরাজ্যের অন্তর্গত।"

আমার মা সহায়।

২৩শে জুন, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মন ভীষণ কামাতুর হ'য়েছে। নানা নারীর দেহের দ্বারা মনের ভিতরে কল্পনার সাহায্যে কি ভাবে কাম চরিতার্থ করব তাই ভাবছি। যেন পর্ব্বতের উচ্চ শিখরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ নিম্নে পতিত হ'য়েছি। ভীষণ স্থূলতা মনকে অধিকার ক'রেছে। হঠাৎ কাপড় খুলে ফেললাম। জননেন্দ্রিয়কে দেখলাম উত্তেজিত হ'য়েছে। কিসের স্পর্শে? মনের ভিতরে কামস্পর্শ এসেছে তাতে দেহের উপর তার অধিকার প্রবল হ'য়েছে। উলঙ্গ হ'য়ে ধ্যানে বললাম। মা এমন ভাবে পা দু খানির আসন করে দিলেন যে সে আসন আমি জীবনে কখনও করি নাই ও তাতে আমার জননেন্দ্রিয়কে একেবারে দেখা যায় না। তারপর মা বলতে আরম্ভ করলেন, "দেখ্ তোর দেহকে দেখ্। এর শিরা, উপশিরা, পাকস্থলী, বক্ষ, কটিদেশ"। এমনি করে সব আমাকে দেখালেন। আমি দেখছি 'আমাকে'—একটি নগ্ন, জ্যোতির্ম্ময় মুণ্ডিত মস্তক দেহ, ধ্যানে বসে আছি। আবার বললেন, "নারী দেহ দেখ্‌বি? এই দেখ্" বলে কালীরূপ ধরে আমার মানস নেত্রের সামনে মূর্ত্ত হ'লেন। বললেন, "আমি সাবীলল নগ্ন প্রকৃতি, অথবা আমার নগ্নরূপই সাবীলল প্রকৃতি আর মাতৃরূপা জগদ্ধাত্রী জননী। এই দেখ্ আমার জঙ্ঘা"—যেন মহাব্যোমে পরিব্যপ্ত হ'য়ে সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে সেই জঙ্ঘা ধারণ করে আছে। অগণিত জীবগণ সেখানে আশ্রিত। "এই দেখ, আমার যোনীদ্বার"—এক গভীর উন্মুক্তরাজ্য দিগন্ত বিস্তৃত পথ লক্ষ কোটি জীবচৈতন্য পরিব্যাপ্ত মুহূর্ত্তে নামছে উঠছে। "এই দেখ আমার ডিম্ব-কোষ বা মাতৃজঠর বা ভ্রূণস্থান দুইদিকে"—যেখানে জীবচৈতন্য গুপ্ত, নিদ্রিত, অনন্ত তার ব্যাপ্তি, বিশ্ব সংসার তার ভিতরে অবস্থিত এক মহাপ্রহেলিকা। "এই

দেখ আমার স্তন"—যেন ছুইটি বড় বড় স্তনের ভিতরে বক্ষের পার্শ্ব থেকে কেটে ভাগ করা হ'য়েছে। বক্ষের ভিতরের অস্থি মজ্জা সব দেখা যাচ্ছে ও স্তনের উপরিভাগ দেখা যাচ্ছে। বললেন, "এই দেখ আমার স্তন চক্ষু। এই স্তন চক্ষু জীব সকলকে সর্ব্বদা নিরিক্ষণ করে। এই নিরিক্ষণই পালন সমান ও এই নিরিক্ষণই স্তন দুগ্ধ যা পান করে বিশ্ব সংসারের সকল জীব জীবিত থাকে। এই নারী মূর্ত্তিকে কাম ভাবে কি তোমার কামনা করা শোভা পায় ?" এই বলে আমার মাতৃ জননী হ'য়ে সাদা একখানা সরুপাড় শাড়ী প'রে গলায় শ্বেত পুষ্পের মালা প'রে আমার পাশে চৌকিতে এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে বসলেন। এ এক অপূর্ব্ব উপদেশ এতে আমার কাম ভাব একেবারে চলে গেল। বললেন, যদি সামান্য এক মুহূর্ত্তের উপভোগ স্পৃহায় সাধনের মহাফলকে নষ্ট করতে চাও তবে শুধু তোমার নয় এই সংসারের ভীষণ ক্ষতি হবে। তুমি শ্রেষ্ঠতম আত্মা ও তোমার উপরে যে গুরুভার ন্যস্ত করেছি তাতে তুমি এই সব দুর্ব্বলতা ত্যাগ করে মহাশক্তিমান হও ও জাগ্রত হও— ।"

আমার মা সহায়— ।

২৩শে জুন, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "দেহরূপ মহারূপ। এই রূপে জীবসকল সংসারে মহাউন্নতি সাধন করতে জন্মলাভ করে। জন্মান্তর হ'চ্ছে পুণ্য কক্ষ। এই কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে জীব দেহরূপ সাধন মন্দিরকে নিয়ে নিত্য সচলমান। ধ্যান ও যোগের সাহায্যে এই দেহকে সম্পূর্ণ উদ্বেগহীন করতে হয় ও সেই হ'ল সাধন। দেহ উদ্বেগহীন হ'লে সাধনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হয়। সকল জীবদেহের বিন্যাসের ভিতর মানব দেহ বিন্যাস শ্রেষ্ঠতম। এই দেহে মূলাধার থেকে ব্রহ্মকেন্দ্র পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ শিরা উপশিরা বর্ত্তমান। ত্বক্ তিন স্তরে বিভক্ত; অস্থি, মজ্জা, পাকস্থলী, বক্ষ, ইত্যাদি রয়েছে ও তাতে দেহকে সচল সক্রিয় ক'রে রেখেছে। আসলে দেহস্থূল হ'লেও এ এমনভাবে সৃষ্ট যে প্রাণ কেন্দ্র থেকে বায়ুর শক্তিতেই এ জীবিত। এই প্রাণ বায়ু দেহের সকল কার্য্যকে সচলমান

রাখে। মূল শিরা,—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই মূল শিরা থেকে লক্ষ লক্ষ, শিরা, উপশিরা গাছের শিকর জালের মত দেহের সকল স্থানে ব্যপ্ত হ'য়ে আছে। মূল ধমনী ও তার থেকে শিরা, উপশিরা। মূল ধমনী নীল, শিরা কেউ কেউ লাল ও কেউ কেউ সাদা। এই রক্তকণিকা প্রত্যেকটি জীবন্ত প্রহরী হ'য়ে দেহকে রক্ষা করে। রক্ত কণিকাও কেউ লাল, কেউ সাদা। এদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করতে হয়। দেহ যতক্ষণ প্রাণ বায়ু গ্রহণ করতে পারে ততক্ষণ সে জীবিত। এই জীবিত অবস্থায় মনের গতি অনুসারে দেহ সমূহ কার্য্য সম্পাদন করে। প্রাণ বায়ু গ্রহণ ও বর্জ্জনের এক স্বাভাবিক ধারা আছে। এই স্বাভাবিক ধারা প্রত্যেক মানবের ভিন্ন। কিন্তু সেই দেহের গ্রহণ বর্জ্জনের স্বাভাবিক ধারায় রক্তকণিকার গতিও স্বাভাবিক ও রক্তকণিকার স্বাভাবিক গতি হওয়াতে পরিপাক শক্তি স্বাভাবিক। পরিপাক শক্তি স্বাভাবিক হ'লে দেহ সুস্থ থাকে। মন দেহকে আপন ইচ্ছায় চালিত করে। মনের উদ্বেগই দেহের সকল ব্যাধির সৃষ্টি করে। মন উদ্বেগশূন্য হ'লে দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় সচলমান থাকে। তোমাদের দেহজাত রিপুর বিশেষ অর্থ আছে। এই রিপু আছে বলে মন সময়ে যে কোনও রিপুর ভাবে ভাবুক হ'লেই সেই রিপু দেহকে উত্তেজিত করে। এই উত্তেজনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বায়ুর ক্রিয়ার তারতম্য ঘটে ও সঙ্গে সঙ্গে ধমনীর শিরা, উপশিরা, রক্ত কণিকা উত্তেজিত হ'য়ে স্ব স্ব প্রণালীর ভিতরেই স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অধিকতর বেগে ধাবিত হয় ও সেই সঙ্গে সেই রিপুর কার্য্য দেহ সম্পাদন করে। যেমন ক্রোধ রিপু। এর বিশেষ তাৎপর্য্য আছে মানব দেহে। একটি অন্যায় দেখলে; তখন তোমার দেহে যদি ক্রোধের সঞ্চার না হয় তবে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ তুমি করতে পারবে না। যেই ক্রোধ এল অমনি প্রাণ বায়ু ঘনতর হ'ল, রক্তপ্রবাহ উত্তেজিত হ'য়ে ব্রহ্ম কেন্দ্র আশ্রয় করল। দেহের সকল শিরা, উপশিরা, রক্ত কণিকা উত্তেজনায় অস্বাভাবিক বেগে ধাবিত হ'ল। কামও তেমনি ও অন্য সব রিপুর প্রভাবে দেহে অস্বাভাবিক অবস্থা আনয়ন করে। এই দেহের

ভিতরে প্রাণ বায়ু ও রক্ত প্রবাহ এমন তীব্র সজাগ যে অতি সামান্যতম মনো বিকার এদের চঞ্চল ক'রে অস্বাভাবিক অবস্থায় ক্ষণতরের জন্য হ'লেও নিয়ে আসে। এই দেহের চঞ্চলতা—এর যখন সম্পূর্ণ অপনোদন হয় তখন দেহ শান্ত ও মন দেহ-সমাহিত হয় ও তখন আমার সঙ্গে যোগদৃষ্টি হয়। দেহ এমনভাবে সাধনের জন্য প্রস্তুত যে সামান্যতম চঞ্চলতা থাকলে যোগদৃষ্টি মুক্ত হয় না। তোমাদের অনেকের জীবনে ব্রহ্মদর্শন হ'য়েছে। তার কারণ কোনও এক সময়ে তোমাদের অজানিতে মন যখন সম্পূর্ণ উদ্বেগশূন্য ছিল ও দেহ যখন অনুত্তেজিত ছিল সেই সময় ব্রহ্মদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মদর্শন হ'য়েছে। দর্শন হয়েছে বলেই যে তোমরা সিদ্ধ হ'য়েছ তা নয়। ব্রহ্মদর্শন হ'লে সাধনায় দেহকে আরও অগ্রসর করায়। তখন সাধক দেহ ও মনে উদ্বেগশূন্য হ'তে চেষ্টা করেন। রিপুর প্রভাবমুক্ত হ'লে দেহ উদ্বেগশূন্য হয়। এর অভ্যাস প্রয়োজন। অভ্যাসের দ্বারা দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ উদ্বেগশূন্য করা যায় ও সেই অবস্থায় সাধক আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একযোগে এক দৃষ্টিতে যুক্ত থাকে ও সেই হ'ল সিদ্ধ অবস্থা।

প্রথম ধ্যান। ধ্যানে বসে মনকে সম্পূর্ণ উদ্বেগশূন্য করতে হবে। কোনও চিন্তা সেখানে থাকবে না। স্থির সংযত মন নিয়ে পাঁচ মিনিট, তার পরদিন ছয় মিনিট এমনি করে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে ধ্যানের অভ্যাস করতে হবে। ধ্যানের ভিতরে আমাকে যেভাবে তোমার দেখবার ইচ্ছা আছে সেইভাবে যা রূপে আমার সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করতে হবে। এই ধ্যানযোগে দেহের প্রাণবায়ুর, রক্তকণিকার, মেদের, অস্থির, রোমের, রোমকূপের অর্থাৎ দেহের সর্ব্বস্তরের প্রতিটি অনুপরমাণু শান্ত ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক গতিতে সচলমান থাকে। যখন সর্ব্বদেহের এই অবস্থা সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত হয় সেই সময় আমার দর্শন হয়। সামান্যতম উদ্বেগ দেহে ও মনে থাকলে দেহের প্রতিটি অংশ অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে ও আমার দর্শন হয় না। সাধন আর কিছুই নয় শুধু দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ উদ্বেগহীন, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় আনবার প্রয়াস। অনেকে বহু বৎসর সাধন ক'রে সিদ্ধিলাভ করে না। আবার অনেকে

সামান্য কিছুদিন সাধন ক'রেই সিদ্ধিলাভ করে। এর কারণ, যে যত তাড়াতাড়ি মন ও দেহকে সম্পূর্ণ স্থিত, সমাহিত ও উদ্বেগশূন্য করতে পারবে সেই তত শিঘ্র সিদ্ধিলাভ করবে। আমার দর্শনই সিদ্ধি নয়। সিদ্ধি দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ক'রে যোগ ও ধ্যানের দ্বারা এমন অবস্থায় আনা যাতে রিপুর স্পর্শেও দেহের কোনও উদ্বেগ না হয়। সম্পূর্ণ সমত্ব অবস্থা। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। দেহের সকল অনুপরমানু নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে সাধকের ইচ্ছায় স্বাভাবিক অবস্থায় চালিত হয়ে থাকে। মন তখন একাগ্র, একচিত্ত ও সাম্যভাবযুক্ত। মন তখন নির্ব্বেদ, একমুখীন্ পূর্ণ স্বভাবজাত স্বাভাবিক প্রকৃতির অন্তর্গত। এই অবস্থায় মন দেহকে আপন ইচ্ছাধীন রেখে সাধনে সহায়তা করায় ও সিদ্ধির দিকে নিয়ে চলে। দেহ ভিন্ন সাধন হয় না। দেহ ভিন্ন আমার সঙ্গে যোগ হয় না। দেহের সাধন আত্মিকলোকে পূর্ণ শান্তি বিধান করে। দেহ পূর্ণ ও মন পূর্ণ। দেহ ও মন সম্পূর্ণ তবেই সিদ্ধি। তুমি সাধন কর, চিন্তা নাই।

আমার মা সহায়।

২রা জুলাই, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল লেকে বেড়াতে বেড়াতে মা বললেন, "দেখ, দেহ এক মহা সম্পদ। এ সম্পদ বর্দ্ধিত করা চলে। সাধনাই একমাত্র রাস্তা যার দ্বারা দেহ সম্পদ মহা সম্পদে পরিণত করা চলে। দেহের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার ধারা বা গতি আছে। কর্ত্তব্যজ্ঞানে সেই গতির পথ নির্দিষ্ট। আকাঙ্ক্ষা যখন কর্ত্তব্যচ্যুত হয় তখন দেহতত্ত্ব জড়ত্বগ্রস্থ হয়। এই কর্ত্তব্যজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না হলে পূর্ণভাবে উপলব্ধি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ নিষ্ঠা এই দেহ কর্ত্তব্যকে নির্দ্ধারণ করে দেয়। রিপু আছে, ও থাকবে। তাকে কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রয়োজনবোধে প্রয়োগই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নিরোধ ত নয়ই আবার উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ রিপু প্রবণতাও নিকৃষ্ট পথ। সংসারে নিত্য কর্ত্তব্যবোধে যে রিপুর যে প্রয়োজন তাকে সেই সেই

ভাবে প্রয়োগ সাধন পথের সহায়ক। সাধন অবস্থার প্রথমে রিপুর উদ্দামতা সাধন পথ থেকে বিচ্যুত করে। মনকে সঙ্কুচিত বহুপথমুখিন্ করে ও সাধন বিঘ্নিত হয়। আর সাধনের মধ্যপথে রিপুর প্রাবল্যে সাধন পথকে বহু কষ্টসাধ্য ও বহুদূরগামী ক'রে তোলে। আর সাধনের শেষ পর্য্যায় ও সিদ্ধির পূর্ব্বে রিপুর প্রাবল্যে সাধনভ্রষ্ঠ করে—একেই বলে যোগভ্রষ্ট। এই অবস্থায় সাধক তার সারাজীবনের সাধনকে তীব্রভাবে ব্যাহত করে ও আবার সেই পূর্ব্ব সাধন অবস্থায় আসা তার পক্ষে সুকঠিন হয়ে পড়ে। সিদ্ধি হ'লে রিপুর বিকার থাকে না ও রিপু তখন সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ হয়। তুমি সাধন কর। কোনও চিন্তা নাই। আমি তোমাকে সকল নির্দ্দেশ দেব। ভয় করো না, এগিয়ে চল। আমি আছি।"

মা আমার অপার করুণাময়ী।

৩রা জুলাই ১৯৫৭ খৃঃ কলিকাতা।

আজ লেকে বেড়াতে বেড়াতে মা বললেন, "তুমি যে জপ করছ তাতে যে তোমার কি মহাশক্তি লাভ হ'চ্ছে তা তুমি জান না।" আমি বললাম, আমার মত ও আমার চাইতে বহুগুণ বেশী জপ করে এমন লোক অগণিত আছে। তাদের মহাশক্তি লাভ হচ্ছে না কেন? মা বললেন, "তাদের জপ ও তোমার জপে সহস্রগুণ পার্থক্য আছে। তোমার ব্রহ্মদর্শন প্রথম হয়েছে। দর্শনের পরে যে জপ হয় সে জপে মহা-মনন হয় ও এই মহা-মননে শরীর ও আত্মার মহাশক্তি লাভ হয়। এই মহাশক্তি লাভ হবার প্রথম দিকে সাধক ভীষণ স্বক্রোধী হয়। যদি সে ক্রোধরিপুর অধীন হ'য়ে পড়ে তবে তার সাধনে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। সামান্য অন্যায় দেখলে ভীষণ ক্রোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং ক্রোধকে সংযত করতে হবে প্রথম থেকে ও আস্তে আস্তে তাকে একেবারে অপনোদন করে শান্ত সমাহিত হতে হবে। আত্মবিচার ও আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা ক্রোধকে শান্ত করতে হবে। এই সময় শরীরকে পানাহারে বিশেষ সংযত রাখতে হবে যাতে শরীরের কোনওরূপ উত্তেজনা না হয়। এই

সময় ক্রোধের সঙ্গে কামের উত্তেজনা ভীষণ প্রবল হয় ও অন্যান্য রিপুও ভীষণ সক্রিয় হয়ে উঠে। সিদ্ধির অব্যবহিত পূর্ব্বেও এ অবস্থা হয়। যদি সাধক রিপুর বশবর্ত্তী হ'য়ে পড়ে তবে সে ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে। আর যদি চিত্ত সমাহিত রেখে উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারে তবে সিদ্ধ হয়। তুমি খুব সাবধানে জপ সাধন কর। তোমার সিদ্ধির অবস্থা অতি নিকট।"

মা আমার সহায়—

মা আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি।

৩রা জুলাই, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ লেকে সকালে হাঁটবার পরে অভ্যাস বশতঃ পূর্ব্বদিকে ছোট লেকের একটা বেঞ্চিতে বসে প্রায় ২০।২৫ মিনিট ধ্যান করি সূর্য্যের দিকে চোখ বন্ধ করে। এ অভ্যাস করেছি আজ প্রায় ২।৩ মাস। যে লেকে ছেলেরা সাঁতার কাটে সেই লেকের কথা বলছি। আজ কদিন এই ভাবে ধ্যান হয় নাই। তার কারণ মেঘে সূর্য্যদেব ঢাকা ছিলেন। আর একটা কারণ হ'চ্ছে শ্রীদেবব্রত গুহ মহাশয়ের নিকট ছাতা না থাকায় ও একটু একটু বৃষ্টি থাকায় তাকে এই দুই দিন আমার ছাতা দিয়ে Lansdown রোডের মোড় পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়েছি।

আজ এসে বেঞ্চে বসলাম। আর একজন ভদ্রলোক বসে ছিলেন। আমি যখন বসলাম তখন সূর্য্যদেব মেঘে ঢাকা ছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে মেঘ সম্পূর্ণ অপসারিত হল ও পূর্ণ তেজে প্রভাত সূর্য্য উদ্‌ভাসিত হ'লেন। আমি চোখ বন্ধ করেই দেখতে পাচ্ছি যে সূর্য্যদেব পূর্ণভাবে উদিত হ'লেন। কিন্তু অন্যান্য দিনের মত আমার ধ্যানলোক স্থির শান্ত নয়। আজকের ধ্যানলোক যেন অস্থির ও অশান্ত। যেন কাঁপছে (flickering)। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম এমন হ'চ্ছে কেন আজ? মা বললেন, "এ হ'চ্ছে রশ্মি প্রলয়। সূর্য্যের দেহে বহুস্থানে রশ্মির ঘন প্রাচুর্য্য আছে। অর্থাৎ সেই সেই স্থানে রশ্মি বহু ঘনতর হ'য়ে জমা হ'য়ে আছে। প্রাকৃতিক নিয়মেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন সেই

ঘনতর রশ্মিক্ষেত্রগুলির সম্পূর্ণ অবস্থা হয় (matured) তখন সেইগুলির বিস্ফোরণ হয়। এক একটি বিস্ফোরণের পরে প্রায় ৬।৭ দিন সূর্য্যরশ্মির কম্পন সারা সূর্য্যদেহে চলতে থাকে। যদি এইরূপ বিস্ফোরণ একবারে অথবা পর পর হ'তে থাকে তবে চারিদিকে রশ্মির কম্পন বিক্ষিপ্ত ও এলোমেলো ভাবে হয় এই বিক্ষেপ ও কম্পনকেই রশ্মিপ্রলয়-বলা হয়। এই রশ্মি প্রলয়ের জন্যে সূর্য্যের দৈহিক কোনও ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয় না। কারণ সেই ঘনতর রশ্মি. বিস্ফোরণের পরে সূর্য্যদেহে ছড়িয়ে পড়ে ও সমুদ্রে বাহিরের জল পড়বার মত মহারশ্মির সাগরে ওতপ্রোত হ'য়ে মিশে যায়—। এই বিস্ফোরণের সময় এর কম্পন ও রশ্মি প্রলয় যে কয়দিন থাকে সেই কয়দিন সৌর জগতে সৌর আলোকের গতি সামান্য বর্দ্ধিত হয় ও সেই বর্দ্ধিতগতি জাগতিক প্রকৃতিকে কম্পিত করে (Shaking দেয়)। এতেও জগতের কোনও ক্ষতি হয় না। সূর্য্যের পূর্ণতা এখনও হয় নাই। যখন এই সব—ঘনতর রশ্মিখণ্ড সকল বিস্ফোরণের দ্বারা নিঃশেষ হ'য়ে যাবে তখন সূর্য্য পূর্ণতম অবস্থায় আসবে। এ অতি ধীরে ধীরে হ'চ্ছে ও হবে ও সেই কারণে সৌর জগতের তাপমাত্রা বর্দ্ধিত হ'চ্ছে ও হবে এবং তার জন্যে সৌরজগতের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সামান্য ভাবে অনুভূত হবে। এই পরিবর্ত্তন ঋতুর পরিবর্ত্তনের অর্থাৎ প্রত্যেক ঋতুর ভিতরে কিছু কিছু অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হবে। তাতে সৌর জগতের কোনও ক্ষতি হবে না। পরে আরও বলে দেব তোমাকে।"

মা আমার অপার করুণাময়ী। মা আমার জ্ঞানদায়িনী জননী। আমার মা সহায়—।

১২ই জুলাই, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "মাতৃমন্ত্র যে লাভ করে সে মাতৃগত প্রাণ হয়। দেহ, বিবেক, পূর্ণজ্ঞান, সাধন, দীক্ষা, ইচ্ছা, জড়ত্ব, পূর্ণতা, বিষয়, সংযম-সাধন ইত্যাদি যা কিছু আছে সকলের মহা-স্থিতি বা মহাপূর্ণতা লাভ হয়। মাতার সঙ্গে জীবের সহজতম সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে জীবকে অতি সহজ, সরল ও স্বাভাবিক

করে। মাতৃভাবে সাধন শ্রেষ্ঠতম সাধন। এই সাধনে জীব যত শিঘ্র সিদ্ধি লাভ করে অন্য ভাবে সাধনে তা হয় না। যেটা স্বাভাবিক ও যে পথ সব চাইতে স্বাভাবিক সেই পথে সাধন শ্রেষ্ঠতম। সন্তানের সঙ্গে মাতার অতি নিকটতম সম্বন্ধ। মাতা সন্তানকে যতটা বোঝেন, সন্তানও মাতাকে ততটা বোঝে। শিশু অবস্থায় দেখ মাতা ও সন্তান একাত্ম। মাতা সন্তান ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখেন ও সন্তানও মাতাকে না দেখলে কেঁদে আকুল হয়। এখানে মাতারও স্বার্থ বুদ্ধি নাই বা সন্তানেরও স্বার্থ বুদ্ধি নাই। আছে মহা নিকটতম স্বাভাবিক আকর্ষণ। এই আকর্ষণকে যদি ধরে রাখা যায় বা এই সহজতম আকর্ষণের যদি অনুশীলন করা যায় শিশু অবস্থা থেকে তবে মানব পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী হ'য়ে ব্রহ্মময়ীর দর্শন ও কৃপা লাভ করতে পারে। এই পথ সহজতম। এই পৃথিবীর এমন সামাজিক নিয়ম করতে হবে বা সমাজে এমন অবস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে মানব শিশু যখন বড় হ'য়ে উঠবে তখন সে এমন সরল, স্বাভাবিক ও সহজতম পথে বড় হবে যাতে রিপুর প্রাবল্য অতি সংযত থাকবে। সে মাতৃভাবে ও মাতৃ পরিবেশে বড় হ'য়ে উঠবে। দেখবে এই পৃথিবীতে মাতৃ জাতির সংখ্যা বহুলাংশে বর্দ্ধিত হবে। নরের থেকে নারীর সংখ্যা অনেক গুণ বেশী হবে। এর কারণ মাতৃ ভাবই একমাত্র কাম্য হবে ও মাতাগণ মানবগণের সাধনে সহায় হবেন। সাধন কর আমি আছি।"

১৩ই জুলাই, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "সাধক যখন যোগে ব্রহ্মদৃষ্ট হয় তখন তার অনন্ত জীবাত্মা রূপ মহাকাশ পরম চৈতন্যরূপ ব্রহ্মভূমার দ্বারা পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হ'য়ে পড়ে। তখন সাধক ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই দেখেন না। এক পরিপূর্ণ ব্রহ্মসত্তায় ব্রহ্মাণ্ডের সকল জীবাত্মা সঞ্চরণশীল জাগ্রত। পরম চৈতন্যের মহা-আবির্ভাবে জীবচৈতন্যের মহা-জাগরণ। এই যে একাত্ম বা দৃষ্টি-যোগ এই হোল পূর্ণ যোগাবস্থা। তখন জীবাত্মা আর পরমাত্মা একাত্ম ও নির্লিপ্ত। মহানন্দে একে অন্যকে দর্শন করেন। ব্রহ্ম রূপ ভূমায় জীবাত্মার এই দর্শনে আর জন্মান্তর হয় না"।

১৩ই জুলাই, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সারাৎসার পরব্রহ্ম নিরাকার। দেহেতে যেমন আত্মা নিরাকার ব্রহ্মাণ্ডে তেমনি ব্রহ্মময়ী নিরাকার। আত্মা দেহতে না থাকলে দেহ মৃত। কিন্তু এই মৃত দেহও ব্রহ্মময়ীর কোলে স্থিত। এ কোল এক মহা আধার। এই মহা আধার বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে। নিরাকার বলে সর্ব্বত্র তাঁর বিচরণ। স্বেচ্ছায় তাঁর রূপ পরিবর্ত্তন। নিরাকার বলেই সাকার রূপ পরিগ্রহ করবার ক্ষমতা বর্ত্তমান। যে সাধকের যে রূপে সাধন প্রয়োজন তাকে সেই রূপের দৃষ্টি যোগে সাধন শেখান। এ এক অপূর্ব্ব প্রহেলিকা। কোনও সাধক বলেছেন তিনি পূর্ণ নিরাকার। আবার কেউ বলেছেন তিনি সাকার। আবার কেউ বলেছেন তিনি সাকার ও নিরাকার। প্রতি সাধকের জীবজন্ম পরিক্রমায় প্রতি জন্মের সাধনায় পথে যে ভাবে তার মুক্তি নির্দ্ধারিত আছে সেই সন্ধান ও সেই নির্দ্দেশে সেই সাধক সেই পথে ধাবিত হ'চ্ছে। বৃত্তি বিভিন্ন হ'লেও গন্তব্যস্থল এক ও অখণ্ড। ব্রহ্মময়ী রূপ-নির্ব্বিকার নিরাকার বলেই পরমানন্দ। পরমানন্দ আত্মচেতন সম্ভূত মহাবুদ্ধি। জীবাত্মা যখন চেতনের মহাস্তরে বিচরণ করতে থাকে তখন তার মহা-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়। সেই মহা-জিজ্ঞাসা জীবচৈতন্যকে এক পরম বিস্ময়ের অসীম আনন্দে নিয়ে যায়। তখন জীবচৈতন্য মহাবুদ্ধির মহাস্তরে ব্রহ্মময়ীর পরমানন্দ লাভ করে। এই হোল মহাযোগ বা পরমানন্দে অবগাহন। নিরাকার বলেই জীবাত্মার আত্মিক দেহ এই অবগাহনে সুশিতল হয় ও জীবাত্মা মহানন্দ লাভ করে। নিরাকার পরমানন্দ তখন জীবাত্মার কাছে মহা-পরমানন্দ হ'য়ে সকল আকাঙ্ক্ষার পরম নিবৃত্তি সাধন করেন। একেই গৌতম বুদ্ধ বলে গেছেন নির্ব্বাণ।"

২২শে জুলাই, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার নিজের দৈহিক স্বাস্থ্য বিষয়ে আমি চিন্তিত হ'য়ে নানা চিন্তা করছি। বিকালে আফিস থেকে এসে বিছানায় শুয়ে জপ করছি তখন মা

আমাকে বললেন, "দেখ তোমার দেহ সাত্ত্বিক দেহ, স্নিগ্ধতাই তোমার প্রকৃতি। খাদ্যের বিষয় তুমি বিশেষ সাবধান হও। তোমার কোনও উত্তেজক খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। আমিষ আহার, পেঁয়াজ, রশুন, ঝাল, মশলা, গরম কোনও পানীয় ইত্যাদি তোমার দেহের ও সাধনের পক্ষে ক্ষতিকর। সাধন পথ আরম্ভ হ'লে আমার শক্তি অতি ধীরে ধীরে আত্মার ভিতর দিয়ে দেহে সঞ্চারিত হয়। এর গতি অতি মৃদু। কিন্তু মৃদু গতি হ'লেও এর স্থিতি অপরিবর্ত্তনীয় ও ক্রমবর্দ্ধমান। এ গতিতে যতই চল্‌তে থাকবে ততই এর উৎকর্ষ ও শক্তি বর্দ্ধিত হবে। দেহই একমাত্র ধারক। এই দেহের সর্ব্বস্তরকে এই গতির পরিপন্থি করলে সাধনে মহা বিঘ্ন হবে। কি করে হয় তাই বলছি। দেহ প্রকৃতিজাত ও স্বভাবজাত। প্রকৃতি ও স্বভাবের অনুকূলে দেহকে চালিত করলে দেহবিকার হয় না। এই প্রকৃতিজাত দেহকে সাধন মুখিন্ করা আর কিছুই না, ইহাকে ও ইহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় আনবার প্রচেষ্টা। রক্তের গতি, দৃষ্টির গতি, শ্রবণের গতি, আস্বাদের গতি, স্পর্শের গতি, ঘ্রাণের গতি, বচনের গতি, পরিপাকের গতি ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে হবে। যাতে এই সকল গতি বাহিরের কোনও আঘাতে বা ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় স্বভাবের পথ থেকে ভ্রষ্ট না হয়। দেহকে প্রথমে খাদ্যের দ্বারা স্নিগ্ধ করতে হবে। তারপর চিন্তার সমতা পরিচর্য্যা করে সকল প্রকার উত্তেজনার হাত থেকে একে রক্ষা করতে হবে। উত্তেজক খাদ্যে দেহের উত্তেজনা হবে ও সেই উত্তেজনায় চিন্তা উত্তেজিত হ'য়ে দেহকে বিষম উত্তেজিত ক'রে দেহের স্বাভাবিক অবস্থাকে খণ্ডন করে। আবার চিন্তার উত্তেজনায় দেহের মহা উত্তেজনা হয় ও তাতে দেহের সমূহ ক্ষতি সাধন হয়। যত প্রকার রোগ দেহের হয় সব রোগের মূল উত্তেজিত দেহ। এই উত্তেজনার মূল চিন্তা ও খাদ্য। চিন্তা যদি দুঃচিন্তা হয় দেহের রোগ অনিবার্য্য। আবার খাদ্য যদি অখাদ্য হয় দেহের রোগ অনিবার্য্য। সেই জন্যে দুঃচিন্তা ও অখাদ্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। পাদপ যেমন শুধু শিকড় দিয়ে রস আহরণ করেই

জীবিত থাকে না, সে রৌদ্র, জল, বায়ু ইত্যাদি থেকে তার খাদ্য আহরণ করে জীবিত, তেমনি মনুষ্য দেহও বা জীবদেহও শুধু তার জৈব খাদ্যেই জীবিত থাকে না। সেও জল, বায়ু, রৌদ্র থেকে তার শরীরের সকল আহার্য্য সংগ্রহ করে। দেহ যদি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় তবে তার জৈব খাদ্য অতি সামান্য প্রয়োজন। এক মুষ্টি তণ্ডুলেই তার আহার্য্য পূর্ণ হয়। সে তখন বাহিরেরর প্রকৃতি থেকে তার উপযুক্ত আহার্য্য সংগ্রহ করে। বহু মহাপুরুষ এখনও দীর্ঘ জীবন লাভ করে বেঁচে আছেন শুধু একটি মাত্র ফল দিনান্তে আহার করে। তাঁদের দেহের স্বাস্থ্য অপূর্ব্ব। সাধন অর্থই দেহ ও মনকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় আনা। আমি পরমস্বভাব তখনই হৃদয়ে আবির্ভূত হই যখন দেহ ও মন পূর্ণ স্বভাব ধর্ম্মী। এই সাধনের সময় আমার স্নিগ্ধ ও মৃদু শক্তির উৎস অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করে আত্মার ভিতর দিয়ে। রোগ হয় সাধনের সময়, তার অর্থ সাধন ঠিক হ'চ্ছে না। সাধন করলে রোগ হবে না ও দেহ কান্তি বর্দ্ধিত হবে। সেই রোগের সময় ঔষধ সেবন করলে সাধনের মৃদু শক্তিকে দেহতন্ত্রি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঔষধেও আমি বা আমার শক্তি বর্ত্তমান। যে রোগের দ্বারা দেহ অধিকৃত হ'ল তার চাইতে উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট ঔষধ প্রয়োগ না করলে রোগ নিরাময় হয় না। আমারই আর একটি উগ্র শক্তি বিশিষ্ট দ্রব্যকে দেহে প্রবিষ্ট করিয়ে আমার স্নিগ্ধ মৃদু অথচ মঙ্গলময় সাধন ধারাকে ব্যাহত করা হয়। দেহ স্থূল বলে স্থূলরূপী আর একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন দ্রব্যকে প্রবিষ্ট করিয়ে স্বাভাবিক গতিকে ক্ষুব্ধ করা হয়। তাতে হয়ত সাময়িক রোগ নিরাময় হয় কিন্তু দেহের স্বভাবজাত ধর্ম্ম নষ্ট হ'য়ে যায় ও পরবর্ত্তীকালে নানারূপ উগ্র রোগ জন্মে ও দেহকে সাধন বিমুখ ক'রে তোলে। তুমি ঔষধ আর খাবে না। নিজের দেহকে উত্তেজনার বশবর্ত্তী করো না কোনও রকমে। সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনাকে পরিহার করবে ও সাধনে স্থিত হবে। তবেই সাধনে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। সাধন কর ও আমার কথা মত চল। সব হবে। ভয় নাই—।"

মা আমার অপার করুণাময়ী—।

২৩শে জুলাই, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে জিজ্ঞাস করলাম, কি কি পানাহার দেহের পক্ষে মঙ্গলকর ও সাধনের পথে সহায়ক ? মা বললেন, "সকল প্রকার পক্ক ফল। ফলের অনেক প্রকার আছে। যে ঋতুতে যে ফল বেশী মাত্রায় পাওয়া যায় সেই সব ফল খাওয়া বিধেয়। তবে সকলের দেহের পক্ষে সব ফল খাওয়া বিধেয় নয়। যার দেহের পক্ষে যে ফল উপযুক্ত সে সেই ফল খাবে। এর বিচার প্রত্যেকের নিজের উপরে। সকলে আম্র ফল খায়। কিন্তু কারু কারু আম্র ফল সহ্য হয় না। সুতরাং তার পক্ষে আম্র ফল বিষতুল্য ও পরিত্যজ্য। ফলের ভিতরে বাদাম জাতীয় ফল উত্তেজক ও পরিত্যাগ করা উচিত। মূল জাতীয় খাদ্য, পত্র জাতীয় খাদ্য বিধেয়। দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য বিধেয়। কিন্তু অতি উষ্ণ খাদ্য কোনও প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নয়। অতি উষ্ণ ও অতি শীতল কোনও খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত নয়। আমিষ আহার সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। পান ও সুপারী ইত্যাদি অতি পরিমিত খাওয়া দরকার। কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য গ্রহণ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য : পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল সম্ভবমত পান করা বিশেষ উপকারী। হরিতুকী, অমলকী, বহেড়া, তেঁতুল খাওয়া দেহের পক্ষে উপকারী। কোনও প্রকার উত্তেজক খাদ্য দেহের ও সাধনের পক্ষে ক্ষতিকর।"

মা আমার সর্ব্বজ্ঞান দায়িনী—।

২৮শে জুলাই, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজকের অভিজ্ঞতা আরও আশ্চর্য্য। আজ ব্রহ্মমন্দিরে শচীদার উপাসনা ও মৃনালদের সঙ্গীত ছিল। উপাসনায় বসে যোগ হোল ও ঊর্দ্ধে সেই আলোকের রাজ্যে গিয়ে স্থিত হলাম। কিছুদিন হোল একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে কপালের ঊর্দ্ধে একটা চন্দ্রের মতন গোলাকার জ্যোতির মণ্ডল হয় ও সেখান থেকে Search light এর মত একটি জ্যোতির দণ্ড ঊর্দ্ধে উঠে যায় যেন কি খুঁজে বেড়ায়। যেখানে সে খুঁজে বেড়ায় সেখানটা মহা অনন্ত সমুদ্র বেলাভূমির মত জায়গা ও প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের আগের মত আলোকে উদ্ভাসিত একটু

রক্তিম আভাযুক্ত। কিছুক্ষণ এইভাবে যোগে নিবিষ্ট আছি হঠাৎ যেন মনে হ'ল আমি একটি জল পদ্মের কুঁড়ি। অনন্ত মহাসাগর থেকে একটি মৃনাল জলের উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার মাথায় একটি পদ্ম কোড়ক ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে। কোড়কটি গোলাপী রংয়ের কিন্তু তার মুখটি রক্তিম। এই যে পদ্ম কোড়ক সে মহাভূমায় সাগরের মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে আছে। মৃনালের একেবারে গোড়ায় যেখানে পঙ্ক থেকে মৃনালের জন্ম হ'য়েছে সেখানে আমার বাবা ও মা দুইদিকে বসে আছেন একেবারে মৃনালের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে যেন তাঁদের সত্ত্বাথেকে মৃনালটির জন্ম হ'য়েছে। আরও যেন দু'চারিটি মনুষ্যদেহ সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। কুঁড়িটির উপরে মুখের কাছে রক্তাভ ও সে উর্দ্ধ মুখ করে ঈষৎ আন্দোলিত হ'চ্ছে। মহাভূমা থেকে একটি আলোক এর উপরে পতিত হ'চ্ছে। মাকে জিজ্ঞাস করলাম, এ কি? মা বললেন, "তোমার ঐ আত্মা আমা মুখিন্ হ'য়েছে, এ এখনও কুঁড়ি, এর সৌরভ এখনও আরম্ভ হয় নাই। যখন এ পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবে তখন তোমার পূর্ণ বিকাশ হবে। মৃনাল তোমার দেহ ও তার জন্ম তোমার পিতা মাতার মহাযোগে ও আর আর মনুষ্য দেহ তোমার ভ্রাতা-ভগ্নিগণ। তাঁরা তোমার সহায়। যোগে আমার প্রতি আকুল আকাঙ্খায় যখন তোমার আত্মারূপী কোড়ক প্রস্ফুটিত হবে তখন তুমি মহাবিশ্বে মহামানবের কল্যাণে ও সকল জীবের কল্যাণে নিয়োজিত হবে। তখন তোমাকে বিশ্বমানব খুঁজে বার করবে। সেই সময় আমি তোমায় প্রকট করব ও তোমার কর্ত্তব্যের পূর্ণ অবস্থা। তুমি মহাসাধন কর তোমার সিদ্ধির সময় অতি নিকট।"

মা মা মাগো এ তুই আমাকে কি করছিস্? শক্তি দে, বল দে, মহাশক্তি দে যাতে তোর কর্ত্তব্য আমি সাধন করতে পারি।

৩০শে জুলাই, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

কালকে প্রায় ১২টার সময় চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও বহুবাজার ষ্ট্রীটের কাছে আমার গাড়ীতে ধাক্কা খেয়ে পতিত পাবন রায় বলে একটি ১০।১২ বছরের

স্কুলের ছেলে আহত হয়। মাথা সামান্য কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছিল। সঙ্গে ferrum phos ছিল লাগিয়ে দেওয়াতে রক্ত বন্ধ হ'য়ে যায়। আমার সঙ্গে Mr. A. Mozumdar, Inspector, Director of Industries. ছিলেন। তাঁকে নিয়ে আমরা আমার কারখানা inspection এ যাচ্ছিলাম। পণ্ডিতকে আমার গাড়ীতেই Medical college, Emergency-তে নিয়ে গেলাম। সেখানে দেখা গেল যে মাথার আঘাত তেমন গভীর নয় ও সামান্য। তবে একদিকের কলার bone ভেঙ্গে গেছে Simple fracture। তার কাছ থেকে তার বাড়ীর ঠিকানা ও বাবার নাম ইত্যাদি নিয়ে ১৪নং ফিয়ারস্ লেনে তার বাবাকে খবর দিয়ে বহুবাজার পুলিশ স্টেশনে গেলাম। সেখানে শ্রী কীর্ত্তনীয়া Sub-inspector মহাশয়ের কাছে report দিয়ে প্রায় ২॥• নাগাত আপিসে ফিরলাম। কারখানা inspection হ'ল না। শ্রী কীর্ত্তনীয়া accident-এর সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিকালে আফিস ফেরৎ পণ্ডিতকে দেখে ও তার বাবা কাকাদের সঙ্গে দেখা করে আমার অন্যায় স্বীকার করে এলাম। আজ সকালে মাকে বললাম, তুমি আমাকে জগতের মানব কল্যাণে সাধন শেখাচ্ছ, তবে কেন আমার দ্বারা লোকের ক্ষতি হয়? এ অন্যায় কেন আমি করি? তা' হ'লে আমার সাধন হচ্ছে না। এ কেন হোল? মা বললেন, "দেখ, তোমাকে একদিন বলেছি বিষয় চাইলে বিষয়ও পাবে না, আমাকেও পাবে না। আর যদি আমাকে চাও তবে বিষয়ও পাবে ও আমাকেও পাবে। তোমাকে আরও বলেছি যে তোমার সমর্পনের জীবন। এখন বলছি তোমার সংযোগের জীবন। সমর্পন ও সংযোগ নীতিগত অর্থে এক পর্য্যায়ভুক্ত। তুমি সর্ব্বক্ষণ আমার সঙ্গে সংযোগ রাখবে। আমার সঙ্গে যখনই তোমার সংযোগ আত্ম-অহঙ্কারে ব্যাহত হবে তখন তোমার উপর বিপত্তি আসবে। আমার গ্রহগণ আমার নীতির দাস। তারা যতক্ষণ আমার প্রবাহ তোমার ভিতরে চলবে ততক্ষণ তোমার বিপত্তি উৎপাদন করতে পারবে না। কিন্তু যেই তুমি আত্ম চেতনা বিস্মৃত হ'য়ে বিষয়

মৃথিন্ হ'য়ে পড়বে ও আমার সঙ্গে সংযোগ রাখবে না তখনই তারা তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করে বিপত্তি আনবে"। কিন্তু তোমার থেকে আমি কি করে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি—তুমি ত' ওতপ্রোত আমার ভিতরে বর্ত্তমান। মা বললেন "হ্যাঁ, সে কথা অতি খাঁটি। কিন্তু তুমি জীবচৈতন্য ভোগ বিলাসে নিদ্রিত আর আমি পরম চৈতন্য সদা চৈতন্যময়। তুমি নিদ্রিত তখনই যখন তুমি স্থূল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়াভূত। এই নিদ্রাকে বলা যেতে পারে অহংজ্ঞান। তুমি জীব চৈতন্য আমার সত্তায় ওতপ্রোত থেকেও একটা স্বাধীন সত্তা নিয়ে বিচরণ করছ। এই স্বাধীনতা আমার ইচ্ছাতেই পেয়েছ। কিন্তু এর গূহ্য অভিব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই হয়। আমার সত্তা থেকে জীবচৈতন্য বিচ্যুত হয় না ঠিক, তবে স্থূল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিকারে অহংজ্ঞানে তার চৈতন্যের উপরে একটি অবলেপন এসে যায় তাতে আমার সক্রিয় প্রভাব অনুভূতির বাইরে থাকে। যেমন একটা ঘরে একট পরদা আছে। পরদার এদিকে একটা আলো আছে ও অন্যদিকে তুমি আছ। আলোর কিছুটা আভাস পেলেও আলোর পূর্ণ প্রকাশ তোমার কাছে ধরা পড়ে না। তেমনি স্থূল কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পরদার মত একটা আবরণ আমার ও জীবচৈতন্যের ভিতরে এনে দেয়। তাকেই বিচ্যুত বলতে পারে। এই হ'চ্ছে জীবচৈতন্যের নিদ্রা। সকল জীবই যোগীও সাধক। যে কোনও কর্ম্মই সাধন বা যোগে হয়। কিন্তু নৈষ্কর্ম্ম যা স্থূল কর্ম্ম থেকে পৃথক বা স্থূল কর্ম্মের উন্নততম অবস্থা তাকে পরম সাধন বা পরম যোগ বলে। এই পরম সাধন যখন আরম্ভ হয় তখন জীবচৈতন্য আমাগত হয় ও আমি স্থূল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আবরণ ভেদ করে, সাধককে আমার পথেই পরিচর্য্যা করাই। এই অবস্থায় সাধক যদি আবার কোনও বিষয়াভূত কর্ম্মে লিপ্ত হয় অর্থাৎ সদা জাগ্রত অবস্থা থেকে নিদ্রিত হ'য়ে পড়ে তখন আমার কর্ম্ম তাকে ধাক্কা দেয়া বা জাগান। স্থূল দেহ বলে নানা স্থূল উপসর্গে এই ধাক্কা প্রকট হয়।

তোমার গাড়ীতে ছেলেটি ধাক্কা খেয়েছে এ কার্য্য আমার ইচ্ছাকৃত হ'য়েছে।

কারণ তুমি তোমার সাধন থেকে বিষয়াকৃত অপমার্গে এসে আমার সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলে বলে, এ একটা জাগরণের ধাক্কা। এই অবস্থায় পড়ে তোমার মনের যে গতি হ'য়েছে তাতে তুমি বুঝতে পারছ যে তোমার আমার সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'য়েছিল। এখন থেকে তুমি আরও সতর্ক ও সজাগ থাকবে। তোমাকে অতি অল্প সময়ের ভিতরে সাধনে সিদ্ধ হ'তে হবে। কারণ তোমার কর্ত্তব্য মহান্। এই জন্যেই তোমাকে আমার এই পরীক্ষায় ফেলেছি। দেখ তোমার বেশী ক্ষতি বা পতিতের বেশী ক্ষতি হয় নাই। তাকে কষ্ট দিলাম তোমার উন্নতির জন্য। কারণ তোমার উন্নতিই হ'চ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।" আমি বললাম, যে যাই হোক্ আমি স্থূল দেহধারী হিসাবে এই যে একটি জীবকে দেহ-কষ্ট দিলাম এতে ত আমার অন্যায় হোল। সাধনের যে উদ্দেশ্য "মানবের কল্যান" সেই উদ্দেশ্য থেকে আমি বিচ্যুত হলাম নাকি? এ অন্যায় ত' আমায় বর্ত্তাবে। মা বললেন, "না, এ অন্যায় তোমায় বর্ত্তাবে না। জগত্জনের মহৎ কল্যাণের জন্য এই যে তোমার সাধন তার জন্য এই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল বলেই হ'য়েছে। তোমার সাধন জগতজনের কল্যানের জন্য ও তোমার কল্যানের জন্যই এই পরিস্থিতি। এতে তোমার জাগরণ—স্থিত হবে ও তোমার সাধণ অগ্রসর হবে। সুতরাং এতে তোমার কোনও অন্যায় হবে না।"

আমার মা আমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে সাধণ সেখাচ্ছেন। জয় মা আনন্দময়ী।

১১ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার আত্মা যে কাঁদছে। কেমন যেন একটা ভাব। কিছু ভাল লাগে না। লোকের কাছে গেলে ভাল লাগে না। ভাবি নির্জ্জনে থাকলে ভাল লাগবে। আবার নির্জ্জনে থাকলে লোকসমাজে যেতে মন ব্যাকুল হয়। কি যেন চাই পাই না। কি যেন আমার অতি আপন নিজস্ব পাই নাই। এ রোগ আমার কিছুদিন হোল হ'য়েছে। সাধুসঙ্গ করতে ইচ্ছা হয়। মার

কাছ থেকে যা পেয়েছি তা সকলকে দিয়ে, জানিয়ে আনন্দ পেতে চাই। কিন্তু মা বলেছেন, "না, এখন নয়, সময় এলে ও সব হবে। এখন সাধন কর।" মাকে আমার নিজের একার করে নিতে মন চায়। আমি বড় স্বার্থপর। যে মা জগতের জননী, যে মা সকলের মা তাঁকে আমার একলার ক'রে কি ক'রে পাব? মা যে আমার একলারটি হ'তে রাজী নন। আমাকে একটু দেখা, একটু কথা, একটু হাসি দিয়ে ভুলিয়ে রাখছেন। কিন্তু আমার আত্মা যে অনন্ত ব্রহ্মভূমায় মাকে নিত্য আকুল হ'য়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ আকুলতা কেন এল? বেশ ত ছিলাম সংসারকে আঁকড়ে ধরে, বিষয়ে মগ্ন হয়ে, স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে ব্যবসায় নিয়ে মত্ত হ'য়ে ছিলাম। সে খেলা কে ভেঙে দিল? বিষয় সংসার কঠিন কর্ত্তব্য ছাড়া আর কিছু নয় এ কথা কে আমাকে বলল। বলল যদি তবে আমাকে আড়াল করে কেন রাখল? একটু দর্শন, একটু হাসিতে যে আর পেট ভরছে না। এখন যে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা সারা অন্তরকে আলোড়িত ক'রছে। চাই পূর্ণরূপে আমার আমিত্বের ভিতরে। আমাকে আমি মার কোলে একান্তে দেখতে চাই। সেখানে আমি আর আমার মা আর কেউ থাকবে না। তাই ত' আমি আমাকে স্বার্থপর বলছি। এ ভাব আমার এবার একান্ত হ'য়েছে। এ ভাব কি আমার অন্যায়? মাগো বলে দেনা? মা বললেন, "এ ভাব তোমার অন্যায় নয়। সংসারই আকর্ষণ আবার সংসারই বিকর্ষণ। সংসারকে আকর্ষণ কর সংসার তোমাকে ডুবিয়ে রাখবে। আবার সংসারকে বিকর্ষণ কর বৈরাগ্য আসবে। এই সংসারে থেকে কর্ত্তব্য পালন ক'রে আমার ভজনা মহা-সাধন, শ্রেষ্ঠতম সাধন ও পূর্ণতম সাধন। সংসারকে যেমন কর্ত্তব্যবোধে চাইবে আমাকেও তেমন কর্ত্তব্যবোধে চাইবে। সংসারের যা তা সংসারকে দেবে আর আমার যা তা আমাকে দেবে। সংসারের দেয় না দিয়ে আমার প্রতি কর্ত্তব্য পূর্ণ হবে না। আমাকে যা দেয় তা না দিলে আমার প্রতি ও সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য হয় না। আমাকে আপনার ক'রে চাইবে সত্য কিন্তু আমাতে সম্পূর্ণ মজে গিয়ে উদাসীন যোগী

হ'লে সংসার যে রসাতলে যাবে। সেইজন্য পাবে আমাকে যতটুকু পাওয়া তোমার দরকার। আমি আসব ততটুকু যতটুকু আমার আসা দরকার তোমার কাছে। আমার প্রতি আকুলতাই আমি চাই। কিন্তু আমাকে সর্ব্বক্ষণ তুমি নিয়ে থাকবে তা চাই না। সেইজন্যই আমার এ লীলা তোমার সঙ্গে। সাধন কর মুক্ত হও।"

জয় মা দয়াময়ী জননী আমার।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "সাধণের ভিতরে শ্রেষ্ঠ নাম-জপ। নাম জপে, সকল অন্যায়, সকল মলিনতা, অলসতা, দুর্ব্বলতা, রোগ, ভোগ, অশান্তি, শারীরিক ক্লান্তি, গ্লানি, সকল দুর্গতি ও সকল অবসাদ বিদূরিত হয়। দেহ ও মন আনন্দে ভরে যায়। দেহ কান্তি বর্দ্ধিত হয়। আত্মদর্শন হয়। আত্মিকলোক দর্শন হয়। মাতৃদর্শন হয়। মহাশক্তি দেহে ও আত্মায় পরিলক্ষিত হয়। মানব মহা সাধক হয়। জপ দুই প্রকার। মাতৃদর্শনের পূর্ব্বে জপ আর মাতৃদর্শনের পরে জপ। মাতৃদর্শনের পূর্ব্বে জপ করলে দেহ সাত্ত্বিক হয়। দেহক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। দেহের চাঞ্চল্য দূরিভূত হয়। দেহ পূর্ণস্বভাব ধর্ম্মী হয়। মন স্থির হয়। রিপুর প্রাবল্য দূর হয়। সর্ব্বজীবে দয়া হয়। সমত্ব উপলব্ধি হয়। মন আত্মস্থিত হয় ও মাতৃদর্শনের জন্য দেহ ও আত্মা উদ্‌গ্রীব হয়। আত্মিকলোক দৃষ্টিগোচর হয়। সাধু ভক্তদের দর্শন হয়। সাধন ত্বরান্বিত হয়।

আর মাতৃদর্শনের পরে জপে মোহান্ধকার দূর হয়। সাধক ব্রহ্মভূমায় বিচরণ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়। সর্ব্বজীবে ব্রহ্মদর্শন হয়। মহাসমত্ব লাভ হয়। সাধক পূর্ণ অহিংস ও পূর্ণ জ্ঞানী হয়। ত্রিকালজ্ঞ হয় ও আত্মপর ভেদ বিলুপ্ত হয়। মাতৃদর্শনের পরে যে জপ সে হোল মহা-জপ। এ জপের তুলনা নাই। জন্মান্তর ক্ষয় হয়। আত্মা ব্রহ্ম সহবাসে সদা বিচরণ করেন।"

মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, যোগেতে শ্রেষ্ঠ আসন কি মা? মা বললেন, যোগেতে শ্রেষ্ঠ আসন "শবাসন"। শবাসনে পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে শুয়ে হাত ও পা যেভাবে স্বাভাবিক ভাবে থাকে সেই ভাবে রাখতে হবে। মাথার উপাধান রাখলেও চলে না রাখলেও চলে। এইভাবে শুয়ে আত্মস্থিত হ'য়ে মনকে প্রজ্ঞাচক্রে অবলিপ্ত করে জপ চলবে। এ অবস্থায় যদি যোগনিদ্রা আসে তাতে ক্ষতি নাই। এই যোগনিদ্রা অতীব প্রয়োজনীয়। এই যোগনিদ্রায় আত্মা, মন ও দেহ একযোগে আত্মিকলোকে ব্রহ্মভূমায় বিচরণ করে। আত্মার ভিতর দিয়ে দেহে দিব্যভাব সঞ্চারিত হয়। শবাসনে যোগনিদ্রা এক মহা-সাধন-যোগ। যোগনিদ্রায় দেহের শ্রান্তি বিদূরিত হ'য়ে দেহ আত্মার কার্য্যের মহা সাহায্য করে। মন একাগ্র হ'য়ে পরে—ও আত্মার কার্য্যের মহা সাহায্য করে। আত্মা নিজ কার্য্যে ব্রহ্মদর্শনের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, ব্রহ্মদর্শন পান ও ব্রহ্মসত্বায় নিমগ্ন থাকেন। এ যোগনিদ্রা যতক্ষণ হবে ততই সাধন অগ্রসর হবে। তুমি শবাসনে সাধন কর। এতে তোমার সাধনের সিদ্ধি অতি নিকটবর্ত্তি হবে। একাগ্র হও ও নাম জপ যেমন করছ তেমনি করে যাও। আমি তোমার ভার নিয়েছি, চিন্তা নাই, আমি আছি।"

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "আমি সর্ব্বমঙ্গলময় জগতজননী। আমার সকল কার্য্য মঙ্গলময়। মঙ্গলই আমার কার্য্য। আমি মঙ্গল ছাড়া কিছুই করিনা। তোমাদের কাছে যা অমঙ্গল বলে মনে হয় তা অমঙ্গল না। যেটা তোমাদের কাছে অমঙ্গল বলে প্রতীয়মান হয় তার পিছনে মঙ্গলই আছে। ব্যক্তিগত জীবনেও যেমন সমষ্টিগত বা জাতীগত জীবনেও তেমনি মঙ্গল কার্য্য লক্ষিত হয়। মহাসমর, মহামারি, বন্যা, প্লাবন যত সব নৈস্বর্গীক অমঙ্গল মানবজীবনে মহাজীবক্ষয় নিয়ে আসে তার পিছনে আরও মহা মঙ্গল নিহিত আছে। জীবের জীবন ও মৃত্যু আমার কাছে একই পদবাচ্য। জীব জানে না যে দেহে যত সুখ দেহান্তে তার চাইতেও কত আনন্দ। দেহবিমুক্ত

আত্মা যে কি মহানন্দ লাভ করে সে সংবাদ দেহীর কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। শুধু ব্রহ্মজ্ঞানী যারা তারা ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। এই দেহে যতদিন আমার অভিপ্রায় ততদিন আমি জীবকে রক্ষা করি। যাদের দেহ রক্ষা করি তাদের দেহ ধ্বংস করে এমন শক্তি আমি ছাড়া আর কারুর নাই। আবার আমি যদি জীবদেহ ধ্বংস করি এমন কোনও শক্তি নাই যে তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে। তবে জীব নিজ কর্ম্মদোষে আপনার অপমৃত্যু ডেকে আনে। যখন তার কর্ম্ম বিপথগামী হয় তখন তার মঙ্গলের জন্যই তার দেহত্যাগ মঙ্গলজনক ও আমার ইচ্ছায় তা হয়ে থাকে। শোক করো না। শোক বলে সংসারে কিছু নাই। কার জন্যে শোক করবে? যার জন্যে শোক করছ সে ত দেহ ও দেহ ত আত্মার আবাস। দেহের জন্যে শোক নিষ্প্রয়োজন। আত্মা চির উন্নতিশীল মহা স্বাধীন ও মুক্ত। তার চির মঙ্গলই আমার কাম্য, তার জন্যে যদি তার কোটিবার দেহত্যাগ হয় তবুও মঙ্গল। মৃত্যু মঙ্গলের আলয় ও মৃত্যু আত্মার চির উন্নতির সোপান এই বিশ্বাস দৃঢ় কর।" জয় মা জয় মা জয় মা আমার।

১৬ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মা বললেন, "পরমচৈতন্য সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত ব্যাপ্ত। সর্ব্বভূতে বিদ্যমান অসীম ব্যাপ্তি ও আপনাতে আপনি লীলায়িত। এতে আমার স্বার্থকতা নাই সেইজন্যেই জীবচৈতন্যের সৃষ্টি। মাতার মাতৃত্বের যে ভাব পরম-চৈতন্যেরও সেই ভাব। এই জীবচৈতন্য আমারই ওতপ্রোত অংশ হয়েও আপন সত্ত্বা নিয়ে বর্ত্তমান। তার আপন সত্ত্বা যদি না দিতাম তবে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে সে আমাকে জানবে ও আমি আর সে মহালীলায় নিত্য লীলা করব। আমার যেমন ইচ্ছা তেমনই তাকে নিয়ে খেলা করব। তাকে আমার অস্তিত্ব জানিয়ে নিজেকে অপাঙ্গে রেখে তাতে আমাতে নিত্যলীলা চলবে। এইত স্বভাব, এইত প্রকৃতি, এইত মহাসত্য। মাতৃগর্ভজাত শিশু যেমন এও তেমনি। মাতা শিশুকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে নিজের

ইচ্ছামত তার সঙ্গে খেলা করেন। আমার লীলা জীবের সঙ্গে ঠিক তেমনটি। আমার লীলা অতি সূক্ষ্ম বলে তোমরা ধরতে পার না। সমুদ্রে বাষ্প হ'য়ে মিঠে জলটাই আকাশে মেঘ আকারে যায়। আবার যখন সমুদ্রে নানাভাবে আসে মিঠে জল হ'য়েই আসে। সমুদ্রের জলের ভিতরেও সেই মিঠে জল তার নিজস্ব সত্ত্বা নিয়েই থাকে। আমাকে যে মানব পরমচৈতন্য ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ীরূপে নিরাকার অব্যয় চৈতন্যরূপে ভজনা করে তার সঙ্গেও আমার লীলা চলে। আবার যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে আমার ভজনা করে তার সঙ্গেও আমার লীলা চলে। যেমন সমুদ্রের ধারে বসে তুমি কি অনুভব কর? এই অনুভব কর যে কি মহান লবণাক্ত জলরাশির ব্যাপ্তি। এর জল আমার কোনও অধিকারে বা কোনও কাজে লাগছে না। এর বিরাটত্ব আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করছে। কিন্তু তুমি জান যে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে মিষ্টিজল সে এই জলরাশির অংশ ও এ থেকেই সৃষ্ট। সেই মিষ্ট জলরাশী পৃথিবীর যত নিম্ন গর্ভেই থাকনা কেন তার সঙ্গে একটা মহাযোগ আছে এই সমুদ্রের জলরাশির। সমুদ্রে জোয়ার হ'লে সেই জোয়ার নদীতেও হয়। কিন্তু নদীর জল মিষ্টই থাকে। আর যদি কেউ খানিকটা সমুদ্রের জল নিয়ে জ্বাল দিয়ে নিল তবে সে পেল কিছু লবণ। বিগ্রহ ভজনাও তাই। সাধনের জ্বালে কোনও বিগ্রহকে আমাময় ভাবে ভজনা করলে সেই বিগ্রহের আর জীবচৈতন্য থাকে না। সে তখন সাকাররূপ পরমচৈতন্যরূপে ভক্তের কাছে বিরাজ করে। সেই লবন যেমন তোমরা ভোগ কর তেমনি ভক্তের কাছে আমিও তেমনি ভোগ্য হ'য়ে যাই। তখন ভক্ত যা চায় আমিও তাই হই। কোথায় কোনও পার্থক্য বা বিবাদ—ত নাই।

আমি পরমচৈতন্য অপার নির্ব্বিকার বলে সর্ব্বভূতে বিরাজমান ও মহান্ ধৃতি। এই মহান্ ধৃতির ভিতরে জীবচৈতন্যই নিজ সত্ত্বা নিয়ে জাগ্রত যদিও আমারই অংশ। জীব যখন জীবন্ত তখনও সে জীবচৈতন্য নিয়ে আমারূপ পরম চৈতন্যে বিচরণশীল। আবার সে যখন মৃত তখনও তার দেহ

পঞ্চভূতে অর্থাৎ আমারূপ পরমচৈতন্যেই মিশে যায়। তার আত্মা আমারূপ পরমচৈতন্যেই বিচরণশীল, যেমন মিষ্ট জল সমুদ্রের জলে গিয়ে মিলিত হয়। এর ভিতরে একটু পার্থক্য আছে—রূপক, জীব-চৈতন্য আদি আমার অংশ, মধ্য দেহধারী লীলাসহচর—ও অন্তে আমার অংশ। তবে পার্থক্য কর্ম্মফল বা লীলাফল। এখানে অংশ অর্থে সে আমার গর্ভজ ও সৃষ্ট। আমি সূক্ষ্ম পরম চৈতন্য বলে, জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে জীবচৈতন্যের স্বাভাবিক সখ্যতা আমার সঙ্গে থাকে। আর দেহধারণ হ'লে দেহাত্মবোধে বা অহংজ্ঞানে সে প্রায়শই আমাকে ভুলে থাকে। কিন্তু কর্ম্ম বা গতি তার দেহধারণেও যা দেহত্যাগেও তারই প্রভাব আমার ইচ্ছায় জীবাত্মাকে প্রভাবিত ক'রে উচ্চস্তরে নিয়ে যায়। কর্ম্মগুণ মহাগুণ, এ গুণ হতে জীবাত্মার নিষ্কৃতি হয় না। এ কর্ম্মের গুণ ক্ষয় হয় কোটি কোটি জন্মে, তারপর মানব জন্মে ও তারপর মানব জন্মেরও সপ্তম জন্মে সকল স্থূল ধর্ম্মের ক্ষয় হ'য়ে জীবাত্মা সূক্ষ্মধর্ম্মী হ'য়ে আমার সান্নিধ্য লাভ করে। এই ক্রমিক যে গতি, এ গতির প্রয়োজন আমার ইচ্ছাতেই আমার লীলা সম্ভাবনায়। আমি যেমন মহান, আমার লীলাও তেমনি অনন্ত। জগত সংসারের কোটি কোটি জীব নিয়েও এই আমার শ্রেষ্ঠ লাভ। চাইনা আমি কিছুই শুধু আমার প্রতি একটু টান—তাকে ভক্তিই বল, বিশ্বাসই বল বা নির্ভরই বল, যাই বল—সেইটুকুই আমার ভিক্ষা জীবের কাছে। তার দেবার কি আছে? সবই ত আমার। তাকে দিয়ে দেখি সে আমাকে একটু মনে করে কিনা। তোমাকে নিয়ে যে লীলায় আমি মেতেছি সেও আমারই প্রয়োজনে। আমার কি প্রয়োজন? জগতের জীবের দুঃখ বিমোচন এখন আমার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন তোমাকে দিয়ে সাধব বলে তোমাকে সাধন মার্গে নিয়ে লীলা করছি। আমার কথামত চলবে ও আমার শরণাপন্ন হবে।"

জয় মা জগৎজননী মা দুর্গা আমায় সিদ্ধি দে মা, তোর কাজ সমাধা করি মাগো।

১৭ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম "জীবনের স্বরূপ কি মা? মা বললেন, "দয়াই জীবনের স্বরূপ। মানব জীবনের প্রতিপাদ্য-জ্ঞান। এই জ্ঞান দুই প্রকার—এক স্থূলধর্ম্মী আর এক সূক্ষ্মধর্ম্মী। বিষয় মুখিন্ বা বিষয় সম্ভূত যে জ্ঞান তাকে জড় জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলে। আর আত্মা সম্ভূত যে জ্ঞান তাকে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বলে। মানব মনের চক্ষু হ'ল বুদ্ধি। এই বুদ্ধি যদি বিষয় নিয়ে মনকে আলোড়িত করে বা বিষয় দৃষ্টি খুলে দেয় তবে মানব জড়বুদ্ধিগ্রস্থ হয়। আর বুদ্ধি যদি আত্মা বা পরমাত্মার লীলায় মনকে আলোড়িত করে বা আত্মদৃষ্টি খুলে দেয় সে জ্ঞান হ'ল পরজ্ঞান, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। জড়-জ্ঞান বা বিজ্ঞানে মানব মনকে স্থূলধর্ম্মী করে দেয়। এতে সে সম্পূর্ণ দেহসর্ব্বস্ব হয় অর্থাৎ দৃষ্টি তার বদ্ধ হ'য়ে যায়। স্থূলেরই আরাধনা করে ও স্থূলকেই সে জীবনের স্বরূপ বলে মনে করে। তার দৃষ্টি স্থূল সংসার বা স্থূল বিষয় ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। এতে সে স্বার্থপর বা দেহ সর্ব্বস্ব হয়। নিজেরটি বা নিজের স্থূল স্বার্থই তার একমাত্র লক্ষ্য হয়। এতে যত অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও শেষে সংসারে অরাজকতা এনে দেয় ও মানবে মানবে মহা সঙ্ঘাত আসে। বুদ্ধি যদি আত্মজ্ঞান ধর্ম্মী হয় তবে জড়ত্ব—খণ্ডিত হয়। দৃষ্টি প্রসারিত হয়। এতে মানব অন্তরে সমত্ব এনে দেয়। সর্ব্বজীবে এক মহান্ আত্মা, যে আত্মা পরমাত্মার অংশ এই ভাব মানবের অন্তরে উদিত হয়। এই জ্ঞানে মানব স্বার্থহীন ও উদার হয়। তার মনের মহান্ প্রসার ব্রহ্মজ্ঞান দৃষ্টিতে মহান্ স্থিতি লাভ করে। এই অবস্থায় সর্ব্বজীবে দয়া হয়। এই দয়া মানবকে অহিংস করে। এই অহিংসা মনের সকল মালিন্য দূর করে। মনের সকল মালিন্য দূর হ'লে ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। এই অবস্থার নাম সিদ্ধি। দয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। দয়াতেই জীবের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং দয়াই মানব জীবনের স্বরূপ। তুমি দয়া ধর্ম্ম মনে প্রাণে পালন কর তবে তোমার সিদ্ধি অনিবার্য্য।

আমার পথে চল, আমার কথা মত কাজ কর তবে তোমার অনন্ত উন্নতি।"

জয় জয় আনন্দময়ী দয়াময়ী মা আমার। আমায় দয়া দে মা।

১৭ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "মানবের দেহ হ'ল আত্মীয় ও আত্মা পরমাত্মীয়। দেহকে পরিচর্য্যা করবে যাতে দেহের কোনও প্রকার বিক্ষেপ না হয়। দেহ যাতে দেহ ধর্ম্মী, দেহর্ব্বস্ব না হয়। দেহে যাতে বিকার না আসে। দেহে যাতে রোগের উৎপত্তি না হয়। দেহ যাতে স্নিগ্ধ থাকে, অনুত্তেজিত থাকে, স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে সেই দিক দিয়ে দেহের পরিচর্য্যা করবে। কিন্তু দেহকে অযথা বিলাসে, লোভে, ও অত্যন্ত আরামে জড়াগ্রস্থ ও স্থূল করবে না। দেহের জন্য যা কর্ত্তব্য তাই করবে। কোনও প্রকার আতিশয্যে দেহকে বিকারগ্রস্থ বা আয়েসী করবে না। দেহকে কোনও স্থূল বিষয়ের দাস করবে না ও কোনও স্বার্থ বা কোনও স্থূল বিষয়ের প্রতি একান্ত ভাবে জড়িত করবে না। দেহকে সর্ব্বকালে আত্মামুখিন্ করে রাখবে ও আত্ম চেতনাতে দেহকে সদা সর্ব্বদা জাগ্রত রাখবে। আর এই দেহ দিয়ে আত্মাকে পূর্ণরূপে পরিচর্য্যা করবে। দেহকে যদি শুদ্ধ ও সাত্বিক রাখ তবে আত্মা দেহের পরিচর্য্যা গ্রহণ করবেন। আত্মা অভিমানী। দেহের সামান্য অশুদ্ধ ভাব মনকে অশুদ্ধ করে ও আত্মা সে পরিচর্য্যা গ্রহণ করেন না। আত্মা চিরশুদ্ধ ও পরিমুক্ত বলেই শুদ্ধতাই তার চির কাম্য। দেহ মন শুদ্ধ হ'লে আত্মা দেহে যুক্ত হ'য়ে মননে আমার সান্নিধ্য লাভ করেন ও অনন্ত আনন্দের অধিকারী হন। এই আনন্দ দেহের পক্ষে মহা আনন্দের বস্তু। এই সংসারে এই আনন্দ দেঁহকে পূর্ণ শান্তি ও পূর্ণ আনন্দ দান করে। এরূপ আনন্দ দেহ অন্য কোনও বিষয় ভোগে পায় না বা পেতে পারে না। দেহ ও আত্মা একসঙ্গে মহা আনন্দের অধিকারী হ'য়ে পরম সম্পদ লাভ করেন। তুমি সাধন কর, মুক্ত আত্মা হও, শুদ্ধ চেতা হও ও দেহকে শুদ্ধ কর, সিদ্ধি নিশ্চিত।"

মা মা মা মা আমার —।

১৭ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো তুই যে আছিস তার প্রমাণ দিতে পারিস মা? মা বললেন, "আমি যে আছি তার প্রমাণ তুমি। সন্তান যখন আছে তখন এটা নিশ্চিত সত্য যে তার মা আছে। মাতা না থাকলে সন্তান কি করে আসবে? তোমার দেহ যেমন তোমার ধরণীর মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হ'য়ে জাত হয়েছে এই সংসারে তোমার আত্মা সেইরূপ আমার গর্ভজাত হ'য়ে অনন্ত মহাকালরূপ সংসারে বিচরণ করছে। দেহ সৃষ্টিতে যেমন পিতার ঔরস ও মাতার গর্ভ প্রয়োজন আত্মার সৃষ্টিতে তেমনি আমার ঈক্ষণই একমাত্র সেই কার্য্য সাধন করে। গভীরভাবে যদি তুমি ব্রহ্মজ্ঞানে ধাবিত হ'য়ে দিব্যদৃষ্টি সম্প্রসারিত কর তবে দেখতে পাবে পিতার ঔরস—ও মাতার গর্ভ এক ইচ্ছারই নামান্তর। এক ইচ্ছাই পিতার বীর্য্যপাত করাচ্ছে ও মাতার গর্ভ সঞ্চার করাচ্ছে। এই দুই ইচ্ছা একই ধর্ম্মী। ইচ্ছা যদিও পিতার অন্য প্রকার মনে হয় ও মাতার অন্য প্রকার মনে হয় কিন্তু আসলে দুই ইচ্ছাই সেই এক সৃষ্টিরই ইচ্ছা। এই এক সৃষ্টির ইচ্ছা স্থূলতায় পিতা ও মাতারূপ বিভিন্ন দেহধর্ম্মীর স্বভাবে দুইটি বিভিন্ন ব'লে প্রতীয়মান হয় তোমাদের কাছে। কিন্তু এর সূক্ষ্মতম সত্ত্বা বিশ্লেষণ করলে তোমরা দেখতে পাও যে একই ইচ্ছা দুইজনের অন্তরে ক্রিয়া করছে। আমি সেই ইচ্ছাময় ও তাই আমার ইচ্ছায় জীবাত্মার সৃষ্টি। স্থূলভাবে আমার ইচ্ছাকেই আমার বীর্য্য বা আমার গর্ভ বলে মনে করতে পার তাতে ক্ষতি নাই। পিতার ইচ্ছা সৃষ্টি ও মাতার ইচ্ছা ধারণ ও পালন। এই তিনটি ইচ্ছাকে একিভূত কর ও এই তিন ইচ্ছা আমা থেকেই জীব পেয়েছে। তবে বুঝতে হবে আমাতে, সৃষ্টি, ধারণ ও পালন সবের একিভূত শক্তি বর্ত্তমান। সুতরাং আমি এক হ'য়ে সৃষ্টিও করছি, ধারণ ও পালন করছি, আমি পিতাও মাতাও। তাই বলছি তুমি যে আছ এই আমার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য যে আমি বর্ত্তমান। আমাকে ভজনা কর মন প্রাণ দিয়ে। তোমাকে দেব সব।"

মা আমার অপার করুণাময়ী।

১৭ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "কি জ্ঞান চাও? যা চাইবে তাই পাবে। তোমার যে কোনও প্রশ্নের মীমাংসা আমি করে দেব। কিছু তোমার কাছে অজ্ঞাত থাকবে না। ব্রহ্মজ্ঞান, দিব্যজ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি, ঐশ্বর্য্য, মহা ক্ষমতা, সকল দুর্গতির নাশ, সব হয় শুধু আমার একান্ত শরণাপন্ন হ'লে ও আমার বাধ্য হ'লে। আমার যারা বাধ্য তাদের আমি খুব আদর করি। বাধ্যতাই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমি যা বলি সেইমত চললে সংসার আজ মহাপ্রেম পরিবার হবে। সংসারে শোক ও দুঃখ থাকবে না। সকলেই আমার কথামত চলবে। আমি নির্লিপ্ত হ'য়েও জীবচৈতন্যে একাত্মভাবে লিপ্ত। এই আমার শ্রেষ্ঠ কার্য্য। জীবচৈতন্যে লিপ্ততাই আমার একমাত্র কার্য্য ও আমি চাই জীব আমার প্রতি একান্ত লিপ্ত থাকে। তুমি আমার প্রতি পূর্ণভাবে লিপ্ত হও তোমার মহাসম্পদ হবে।"

জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার।

১৮ই আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "জানবে ব্রহ্মজ্ঞানই ব্রহ্মসত্ত্বা। আমার যে সত্ত্বা সে জ্ঞানদ্বারা আবৃত। এই আবৃত জ্ঞানে জীবচৈতন্য যখন প্রবেশ করে তখন তার মহান আত্মানুভূতি হয়। তখন সে ভাবে আমি কে? যখন সে ভাবল আমি কে তখনই আমি তার পাশে এসে দাঁড়ালাম ও বললাম তুমি আমার সন্তান। এই যে ব্রহ্মাণ্ড এর যে সৃষ্টিকর্ত্তা সেই তোমারও সৃষ্টিকর্ত্তা। তখনই সে আমার দিকে ধাবিত হয়। আমি কে এই চিন্তা তাকে আলোড়িত করে ও সে আত্মস্থিত হ'য়ে আত্মজিজ্ঞাসারূপ মহাঅভিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করবার জন্যে লালায়িত হয়। এই থেকেই তার বৈরাগ্য, নির্ভর, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, দয়া ইত্যাদির উন্মেষ হয় ও সাধন আরম্ভ হয়। সাধনে সে যতই অগ্রসর হয় ততই সে আমার বিরাটত্ব উপলব্ধি করে ও ক্রমে আমার ভিতরে প্রবেশ করে। আমার ভিতরে সে যখন প্রবেশ করে তখন সে আমার বর্ত্তমানতার প্রকৃষ্ট

প্রমাণ পায় আপন আত্মায়। তখন তার ব্রহ্মজ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি ও মহাবিদ্যা আসে। তখনই সে ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ অবলিপ্ত। ব্রহ্মজ্ঞানেই ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি আবার ব্রহ্মসত্তায়ই ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি। আত্মার যোগদৃষ্টি উন্মুক্ত হয় ও আত্মা সদা ব্রহ্মসত্তায় সঞ্চরণশীল হয়। জীবাত্মার এই অবস্থা সিদ্ধিযোগ। এ অবস্থায় জীবাত্মার ভিতরে আর কোনও মোহ থাকে না। সে পূর্ণ বিশ্বাসী, পূর্ণ জ্ঞানী পূর্ণ মানব হ'য়ে আত্মায় ও পরমাত্মায় পরম সখ্যতা নিয়ে বিরাজ করে। এই সখ্যতা তার আর মোচন হয় না।সে আপন আত্মায় আমার সত্তাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করে অনাস্বাদিত আনন্দ উপভোগ করে। এই আনন্দ এত আনন্দময় যে সংসারের শ্রেষ্টতম আনন্দ এর কাছে অকিঞ্চিৎকর। তাই বলছি ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হও ও আমার সত্তায় নিমগ্ন থাক। সেই ত তোমার সিদ্ধি।"

মাগো একি বলছিস্ মা ?

২০শে আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে Salvation Army (মুক্তি ফৌজের) সঙ্গে আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনা সভা ছিল। এই দিনে General William Booth স্বর্গারোহণ করেন। আমরা তার সাম্বাৎসরিক পালন করে থাকি প্রতি বছর. প্রথম শ্রীরবীন্দ্রনাথের "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকের" ইংরেজী অনুবাদ গীত হ'ল। Dr. Mrs. Bani Chatterjee আমি ও আর সকলে মিলে গাইলাম। Dr. S. K. Chatterjee প্রার্থনা করলেন। Dr. Mrs. Bani Chatterjee একটি ভাষণ দিলেন। তারপর Army পক্ষ থেকে একজন প্রার্থনা করে সঙ্গীত আরম্ভ করলেন। General Booth-এর লেখা সঙ্গীত হ'ল। তারপর তিনি ভাষণ দিলেন। এই সময় দেখতে পেলাম মন্দিরের সদর দরজা দিয়ে একজন সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ অতি ধীরে ঢুকছেন। এই সময় আমি যোগে ছিলাম চক্ষু মুদ্রিত করে। পুরুষটি স্থূলকায়। মাথায় কাঁচাপাকা চুল খুব ছোট ছোট করে কাটা। দাড়ি মস্ত বড়—পাকাই বেশী, দু'চারটে কাঁচাও আছে। গোঁফ ছোট ছোট করে ছাঁটা। খৃষ্টান পাদ্রীগণ উপাসনার সময়

যে ধরণের বুক খোলা আজানুলম্বিত আলখাল্লা পরেন (Gown) তেমনি একটি আলখাল্লা তাঁর পরিধানে। কিন্তু তার রং যেন সাদা নয় অনেকটা ফিকে গেরুয়া রংয়ের। গলায় একটা কালো কোড়ের সূতায় একটা Cross ঝোলানো সেটা তাঁর ঠিক বক্ষস্থলে রয়েছে। তিনি ঢুকে প্রায় আধ মিনিট রইলেন। কিন্তু তাঁর নির্গমন দেখতে পেলাম না। মা বললেন, "ইনি William Booth আজ তিনি মহাব্যস্ত। পৃথিবীর যেখানে যত সভায় তাঁর প্রচারিত পথে উপাসনা সভা হ'চ্ছে প্রত্যেক জায়গায় তিনি একবার করে উপস্থিত হচ্ছেন।"

এখানকার অনুষ্ঠান অতি ভাবব্যঞ্জক ও সুন্দর হোল। শেষে Dr. Mrs. Bani Chatterjee আমাদের নিয়ে "নমোদেব, নমোদেব"-এর ইংরেজী অনুবাদ গাইলেন। জয় মা আনন্দময়ী মাগো তুমি যে কি করছ আর কি করাচ্ছ আমরা তার কতটুকু বুঝি ?

২১শে আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন, "পৃথিবীর জনসাধারণের মানসিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক রোগ নিরাময় করবার উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধাই দেব। কিন্তু ঐশ্বর্য্য ও সিদ্ধাই বিষয় সম্ভূত। সেই জন্য তার যখন যেমন প্রয়োগ করবে সে আমার ইচ্ছায় হ'চ্ছে মনে করবে ও আমি সব করাচ্ছি মনে করবে। ক্ষণকালের জন্যেও তুমি কখনও মনে করবে না যে সে তোমার শক্তি। তা হ'লেই তোমার ভিতরে সে শক্তির ক্ষয় হ'তে থাকবে। তুমি আমার দাস হ'য়ে আমার কার্য্য সম্পাদন করবে, মনে কোনও গর্ব্ব রাখবে না। অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি হবেই ও সেই সময় তোমাকে প্রকট করব। তোমার মহান্ সম্ভাবনা। তুমি সদা প্রস্তুত হও। তোমার সকল ভার আমার হাতে। তোমার কোনও চিন্তা নাই। অগ্রসর হও। নির্ভিক হও।"

মা আমার সদানন্দময়ী মা।

২১শে আগষ্ট, খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো, তোমার হাতে আমাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্পন করলাম। আর আমার বলে যেন কিছুই না থাকে। আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, বিষয়, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ব্যবসায়, আমার দেহ, মন, আত্মা, আমার টাকাকড়ি, আমার সকল ইচ্ছা, কর্ম্ম সব তোমার হাতে সমর্পন করলাম। শুধু আমাকে ভক্তি ও নির্ভর দাও। আমি যে এখনও ভক্তি ও নির্ভর শিখলাম না। কত উপদেশ, কত আশ্বাস, কত দয়া দিচ্ছ আমার তবুও ত কিছু হ'চ্ছে না মা। আমাকে অর্থ দাও দরিদ্রের সেবায়, আমায় শক্তি দাও অশক্তের সেবায়, আমায় দয়া দাও দুঃখীর দুঃখ দূর করবার জন্যে, আমায় প্রেম দাও সর্ব্বজীবে প্রেম বিতরণ করবার জন্যে। মাগো তোর ভাণ্ডারে কত সব মণিমুক্তা আছে যার একটার দাম পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্য দিয়ে কেনা যায় না। এমন ধনী মায়ের সন্তান হ'য়ে কিনা অর্থ কষ্ট থাকবে? অর্থের যে অর্থ নাই মা। বিষয় অর্থ যে অর্থহীন্ মা। তোর ভাণ্ডারের কিছু অর্থ আমায় দে মা। বিষয় অর্থ না হ'লে কেহ চলতে পারে না সংসার চলে না। আর তোর ভাণ্ডারের অর্থ না হ'লে আত্মা চলে না, সারাৎসারার রাজ্য চলে না মা। দে মা কি দিবি দে। আমি বড় লোভী। লোভই আমার বড় অপরাধ। এই লোভ আমার দূর করে দে মা। তুই যা দিবি তা যেন মাথা পেতে নিতে পারি মা। তোর যা দেবার তা—তুই আমার জন্যে মেপে রেখেছিস্ মা। তবে কেন দাও দাও করি? এ-অবিশ্বাস মা। এতেই ত মরলাম। বিশ্বাস দে। জলন্ত বিশ্বাস, জীবন্ত বিশ্বাস। যেন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তুই আমার সামনে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠিস্ মা। মাগো আমি বড় কাঙ্গাল। আমায় দয়া কর মা।

২১শে আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মনরে সদা মাতৃমন্ত্র জপ কর। মা ছাড়া আর গতি কি? মা যার আছে তার সংসারে সব আছে। সম্পদে বিপদে মা নাম সার কর। কোনও ভয় থাকবে না, কোনও ভাবনা থাকবে না। অর্থ চাও অর্থ হবে, বিত্ত চাও বিত্ত হবে, যা

চাও তাই পাবে মাতৃ নামে। এ নামের বড় গুণ। যাকে একবার যদি প্রাণ খুলে ডাক সে মা না এসে থাকতে পারেন না, পারেন না, পারেন না। এ কথা মনে প্রাণে অন্তরে গভীর ভাবে বিশ্বাস কর। মা কি সন্তানের ডাকে না এসে পারেন? দেখতে হয়ত নাও পেতে পার। কিন্তু জানবে তিনি তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ মা যে তোমার গর্ভ ধারিনী জননী তোমার ডাকে কি না এসে পারেন? মাগো এসো, এসো মা, হৃদয় পূর্ণ করে দাও, বিপদ দূর করে দাও।

২২শে আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে বললাম আমার এ লেখা লেখি দিয়ে কি হবে মা? তোর দেখাই যদি অহর্নিশি না পেলাম তবে আমার এ লেখা দিয়ে কি হবে? মা আমাকে বললেন "কি বলছিস্? এই লেখা দিয়ে তুমি পৃথিবী কিনবে। এই জগতের সকল নর নারী তোমার এই লেখায় ক্রীত হবে। তারা ধন্য হবে, তুমি ধন্য হবে, আমার কার্য্য ধন্য হবে ও আমার জয় জয়কার হবে এই সংসারে। কাকে দিয়ে কি করাই তোমরা জান না। অজ্ঞকে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী করি, অসম্ভবকে সম্ভব করি ও পথের ভিখারীকে সম্রাট্ করি। মহাদানবকে শ্রেষ্ঠতম সাধক করি। আমি অন্তর সলিলা ব্রহ্ম পয়োনিধি। আমার গতি জীব অন্তরে। অন্তরের গতি যে দিকে দুর্নিবার হয় জীবের কর্ম্মপ্রবাহ সেই দিকে ধাবিত হয়। অন্তরের গতি যদি পরিবর্ত্তিত না হয় তবে জীবের দ্বারা কোনও কার্য্যই সম্ভব হয় না। মহান্ কর্ম্মীর মহা কর্ম্মপ্রবাহ তার অন্তরে অবস্থিত। অন্তর চেতনা পেয়েছে বলেই তার বাহিরের কর্ম্মপ্রবাহ সর্ব্ব জগতে প্রচারিত। আত্মদৃষ্ট হও, মহা উৎসের সন্ধান কর। তোমার অন্তরে মহা উৎস রয়েছে। তোমার অন্তরে মহত্তম প্রবাহ রয়েছে। সে প্রবাহকে যদি একবার জাগ্রত করতে পার তবে তার স্রোতে সকল মহাবিঘ্ন ও সকল বাধা সম্পূর্ণ অপসারিত হবে। বিষয় লোভে আজ জগতের জনসাধারণ ব্যাধিগ্রস্থ। তারা বিষয়ের জন্যে কত প্রকার কষ্ট ভোগ করছে। কত অন্যায়, কত অবিচার, কত অত্যাচার করেছে—শুধু এই

বিষয়ের জন্যে—ভুলে গেছে তার অন্তরের স্নিগ্ধ প্রবাহকে। আজ যদি জনসাধারণ আত্ম-মুখিন্ হয় ও আত্ম-সাধন স্পর্শ পায় তবে তাদের বিষয়ও হবে ও মহাশান্তিও পাবে। মহাশান্তি এই জগতে নেমে আসবে। মহা আনন্দের উৎস মুখ খুলে যাবে। মানব তখন দেবতার চাইতেও মহৎ হবে। এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। তোমার উপরে সেই ভার দিলাম। তুমি সাধন কর।"

মা আমার অনন্ত করুণাময়ী।

২২শে আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে কিছুক্ষণ লেখবার পরে মাকে বললাম, আমি শ্রেষ্ঠতম আত্মাও না, আর আমি কিছুই না। সাধন করছি, কিছুই হ'চ্ছে না। কাম ভীষণ প্রবল, হিংসা প্রবল, লোভ প্রবল, মিথ্যা কথা বলি, লোকের নিন্দা করি, লোককে কটু কথা বলি, লোক ঠকাই। এই যদি আমার স্বরূপ হয়, তবে আমি কি করে শ্রেষ্ঠতম আত্মা হ'লাম? আমার দ্বারা কি তোমার এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদিত হবে? আমার না আছে অর্থবল, না আছে লোক বল, না আছে সম্পদ আর না আছে কোনও বিদ্যা। কি করে আমি এই সারা পৃথিবীর জনগণকে তোমার একান্ত করি? কি করে তোমার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্টিত করি? আমার দ্বারা কি করে সম্ভব হবে? আজ আমার স্ত্রী বললেন, 'যতই সাধন করনা কেন শ্রীরাম কৃষ্ণের মত বা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের মত ত' আর হ'তে পারবে না"। সত্যইত' আমার কি আছে যে আমি তাঁদের পায়ের যোগ্য হ'তে পারি? তাঁরা মহা-সাধন করে গেছেন। আমার তেমন সাধন কোথায়? সারাদিন অর্থ, অর্থ ক'রে ঘুরে মরি। কই তোমার কথা ত' মনে হয় না। তবে আমাকে দিয়ে তোমার কি হবে? মা বললেন, "কেন এ সব চিন্তা করছ? তুমি যতটুকু সাধন করছ, তাতেই তোমার কাজ হ'চ্ছে। তোমার সংসারের যা কাজ বা কর্ত্তব্য সেও আমারই নির্দ্দেশে হ'চ্ছে। যা করছ, সব তোমার মহান অভিজ্ঞতার জন্যই হ'চ্ছে। তোমাকে বলেছি যে তোমার উপর কোনও অন্যায়ই বর্ত্তাবে না।

তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা ও তোমার পূর্ব্ব জন্মাকৃত সাধন মহাসুকৃতি অর্জ্জন করেছে ও তোমার কোনও অন্যায়ই সে সুকৃতিকে পরিম্লান করতে পারবে না"। এই বলে মা আমাকে নিয়ে-মহাশূণ্য পথে হেঁটে চলতে লাগলেন। আমার মা যেমনটি রূপ ধরেন তেমনি সাধারণ মাতার বেশে আমার হাত ধরে নিয়ে চললেন। নীচে অসীম দিগন্ত। কত দেশ, কত সমুদ্র, কত নদী, কত পর্ব্বত, কত বন পার হ'য়ে মহাশূণ্যে মার সঙ্গে উড়ে চলেছি। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আরও ২।৩ বার হ'য়েছে। আমাদের গতি প্রচণ্ড। মহাবেগে ধাবিত হ'চ্ছি। এসে পড়লাম একটা অতি মনোরম স্থানে। এই স্থানটি পূর্ব্বদিকে। এরও পূর্ব্বদিকে একটা গৈরিক পর্ব্বত। তার চারদিক শ্বেত ও রক্তিম রংয়ে ঢাকা। পূর্ব্ব দিগন্তে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন রক্তিম আভায় পূর্ণ হয় ও তার আশে পাশে যদি শ্বেত মেঘ থাকে তাদের উপরে সেই রশ্মিজাল প'ড়ে যেমন অপূর্ব্ব শোভা হয় এর শোভা তার চাইতেও সহস্র গুনে অপূর্ব্ব। চারিদিকে ফুল ও ফলের গাছ। এই বৃক্ষগুলির অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য। একটি শ্বেত বর্ত্ম সেই পর্ব্বতের দিকে চলে গিয়েছে। সেই শ্বেত বর্ত্মের দুই পাশে বহুজনসমাগম হ'য়েছে। বর্ত্মটি উন্মুক্ত ও তার দুই পাশে সকলে সারি করে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রায় ছয় ফুট একটি অতি উজ্জ্বল আলোকের দণ্ড যেন আমাদের দিকে এগিয়ে এল। নিকটে এলে দেখলাম একজন পুরুষ, তাঁর সারা দেহ উজ্জল রৌপ্য বর্ণ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম মাকে এনি কে? মা বললেন "ইনি হ'লেন দেবর্ষি নারদ"। ইনি যেন আমাদের দুইজনকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিতে এসেছেন। সম্মিলিত জনগন যেন আমাদের আগমন প্রতিক্ষায় এতক্ষণ অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ছিলেন। এবার সারিতে দাঁড়িয়ে সকলে আমাদের দিকে অত্যন্ত উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। আমি মাকে বললাম, নারদ ত' কুচক্রি বলে খ্যাত। তিনি তোমাকে অভর্থনা করবার ভার নিয়েছেন? মা বললেন, "সে কি কথা, যিনি ব্রহ্মাণ্ডে আমার নাম গান করে সকলের অন্তরে আমার নাম মন্ত্রবীজ পরিবেশন করেন তিনি কি সামান্য আত্মা"? মা হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে দুই সারি লোকের

ভিতর দিয়ে চলতে লাগলেন ও বলতে লাগলেন "দেখ, একে নিয়ে কি করি বলত? এর উপরে এত বড় ভার দিয়েছি, সাধন শেখাচ্ছি, তবুও এর অন্তর থেকে অবিশ্বাস যাচ্ছে না। ও শুধু শুধু বলছে — ও, শ্রেষ্ঠতম আত্মা না আর ওর দ্বারা কিছু হবে না—এই সব। তোমরা সকলে ওকে একটু বুঝিয়ে বলত, যাকে আমি হাত ধরে—নিয়ে চলছি, যার সকল ভার আমি গ্রহণ করেছি—তার আর কি কোনও চিন্তা আছে?" মহাসম্মানিত অতিথি এলে যেমন সংসারে জনগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎসুক নয়নে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে আমাদের দিকেও সেই মহাজনসমাগম তেমনি করে দৃষ্টিপাত করছেন। তাঁরা নিজেরা নিজেদের ভিতরে আমাদের উপলক্ষ্য করে কি সব বলাবলি করতে লাগলেন ও এমন বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন যেন আমি ও মা এক মহা-দর্শনীয় বস্তু। আমি যে আজ তাঁদের কাছে শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ সেটা তাঁদের মুখের ভাব দেখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি মার এত আদরের যেন তাঁরা আমাকে দেখবার জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। এবার মা আমাকে এক এক—জনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কত মুণি, ঋষি, যোগী, সাধক, বিজ্ঞানী, পূণ্য শ্লোক নরপতি, পূণ্যাত্মা। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য দুর্ব্বাসা, বশিষ্ট, বাল্মিকি; অষ্টাবক্র, বেদব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম, কর্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, রাবণ, মৈত্রেয়ী, গার্গী, দধিচী, রাজর্ষি জনক, এমনি করে এক এক জনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। এঁদের ভিতরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলাম। শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ, শ্রীমুষা, শ্রীযিশুখৃষ্টকে দেখলাম। এঁদের পিছনে অগণিত জনতা। সকলেই জ্যোতির্ম্ময় দেহে এসেছেন। আমার বয়স হবে প্রায় ৮।১০ বছর। আমার মস্তক মুণ্ডিত ও গায়ে একটি নীল জামার মতন (যেটা আমি কখনও পছন্দ করি না বা জীবনে নীল জামা বোধ হয় কখনও পড়ি নাই)। আমার নগ্নপদ। আমার পরিধানে একটি শ্বেত ধুতি। মা খুব আনন্দিত ও হাসছেন যেন খুব মজা পেয়েছেন। হাসিতে মার মুখ মণ্ডল উদ্ভাসিত। এ যেন আমাকে শ্রেষ্ঠতম প্রমান করবার জন্যই এই প্রস্তুতি।

যাতে আমার মনে গভীর প্রতীতি জন্মে যে আমি শ্রেষ্ঠতম আত্মা সেই জন্যেই মার এই সম্মিলন আহ্বান। এ এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। এ আমি কি দেখছি? একি সত্যি? না, এ আমার অন্তরের কল্পনা? না কল্পনা ত নয় কারণ শ্রীকৃষ্ণকে দেখলাম চাপ দাঁড়ি গোঁফ, গায়ের বর্ণ আম্র বৃক্ষের কচি পল্লবের মত, বলিষ্ঠ গঠন উচ্চ গ্রিবা, মাথায় বড় বড় চুল পরিপাটি করে বাঁধা, পরিধানে রাজকীয় পরিচ্ছদ, কপালে শ্বেত চন্দনের প্রলেপ। শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে দেখে বললাম, এই কি শ্রীকৃষ্ণ? মা বললেন, "হ্যাঁ, এই শ্রীকৃষ্ণ. মহাযোগী, মহাভক্ত ও মহাক্ষমতাশালী আত্মা।" ভীষ্মদেব প্রায় শ্রীকৃষ্ণের মতন দেখতে তবে তাঁর বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, উচ্চতায় শ্রীকৃষ্ণ থেকেও বেশী, দাঁড়ি, গোঁফ, চুল সব পক্ক কিন্তু অতি যত্নে বিন্যস্ত। তাঁর দাঁড়ি প্রায় French Cut-এর মত। চক্ষু মস্ত বড় বড় ও দীপ্তি প্রভায় উজ্জ্বল। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখলাম, বুক খোলা কোট প'রে আছেন, কোটটা উল্টো করে পরা বলে মনে হ'ল, পরিধানে সাদা ধুতি, চাপ দাঁড়ি, গোঁফ। শ্রীঅরবিন্দকে দেখলাম শুধু একটি সাদা ধুতি পরিধানে, খালি গা। শ্রীবেদব্যাস দেবকে দেখলাম একটি দোহারা চেহারার ব্যক্তি, মাথায় বড় বড় চুল, ঘাড় পর্য্যন্ত পড়েছে, মাথার সামনের দিকে চুল কম টাকের মতন, দাড়ি গোঁফ বড়, ঘন ও পাকা। এক হাতে একটি পুস্তক ও আর এক হাতে একটি লাঠি, যেন চলেছেন দক্ষিণ গগণের দিকে দৃষ্টি মেলে। গায়ের রং উজ্জ্বল তাম্রবর্ণ, গায়ে একটি চাদর ও ঈষদ্ গেরুয়া রংয়ের ধুতি, পরিধানে। যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁর আগে দেখা চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত মিলে গেল। কপিলমুণিকে দেখলাম অত্যন্ত শ্যামবর্ণ. খালি গা, চুল ছোট ছোট করে কাটা, মুখে দাড়ি-গোঁফ নাই, পরিধানে সাদা থান ধুতি। এমনি করে মা সকলকে দেখালেন ও আমার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এ এক অভাবনীয় পর্ব্ব। আমি একটি বালক। কিন্তু আমি গম্ভীর ও মার সঙ্গে সঙ্গে চলেছি মার হাত ধরে। সকলের মুখ দেখে মনে হ'ল আমার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে ও আমিই যেন

সবার শ্রেষ্ঠ। সকলে যেন বিনীতভাবে আমাকে গ্রহণ করছেন ও মাতার এত আদরের বলে আমাকে যেন বলছেন, "তোমার কি? কার সঙ্গে এসেছ ও কার করুণা লাভ করেছ তাকি জান না? তোমার মত সৌভাগ্যবান্ সংসারে কে আছে?" তারপর কখন যে সেখান থেকে চলে এলাম জানিনা। বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে গিয়েছি। এ-রকম অভূতপূর্ব্ব দর্শন অচিন্তনীয়।

আমার মা, আমার মা, আমার মাগো। তুমি আমায় ধরে থাক মা। জীবনে, মরণে, আশায়, নিরাশায় আমায় ধরে থাক। তোমার কর্ত্তব্য আমার দ্বারা করিয়ে নাও মা। মাগো ব্রহ্মময়ী মা আমার।

২৫শে আগষ্ট, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্মমন্দিরে ভাদ্রোৎসবের সমস্তদিন ব্যাপী উৎসব ছিল। সকালে অক্ষয়দা উপাসনা করলেন। দাদার সঙ্গে আমিও সঙ্গীতে যোগদান করলাম। ৮টার, কিছু আগে আমি মন্দিরে যাই। ময়না (আমার স্ত্রী) বাবুল ও পুতুল অসুস্থ থাকায় যেতে পারল না।) রাহুল আমার সঙ্গে গেল।

আরাধনায় মগ্ন হয়েছি। আলোকের রাজ্যে স্থির দৃষ্টি মেলে আছি। কত দৃশ্য নয়নের সামনে আসছে। কত মনোরম দৃশ্যপট, পটের পর পট পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে। এমনি করে এলাম সেই গৈরিক পর্ব্বতের কাছে যেখানে মা আমাকে ২২।৮।৫৭-তে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা পাথরের ঘর। ঘরটির চারিদিকে কোনও দেওয়াল নাই। ছাতটি flat বা সমান্তরাল। কতকগুলো শ্বেত থাম্বা দিয়ে ছাতটিকে রক্ষা করা হয়েছে। এই ঘরটি দক্ষিণ পশ্চিম মুখো—শ্বেত কিন্তু একটু গৈরিক আভা আছে। একটি উচ্চ স্থানের উপর এই ঘর। এর চারিদিকে শ্বেত পর্ব্বতশ্রেণীর সঙ্গে দিকচক্রবালের অপূর্ব্ব আলিঙ্গন। এই ঘরের চত্বরে দাঁড়িয়ে আছেন একটি জ্যোতির্ম্ময় বিরাট্ পুরুষ। তাঁর দাড়ি গোঁফ আছে। একটা সাদা আলখাল্লার মত পরিধানে—সেটার বুক খোলা। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে সামনে অগণিত জনতার দিকে চেয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। অনেকক্ষণ তাঁর বক্তৃতা শুনলাম। কি যে

শুনলাম কিছুই মনে নেই। ইনি মহাত্মা যীশুখৃষ্ট। কিছুক্ষণ অনিমেষ নয়নে সেইদিকে তাকিয়ে আছি, দেখি সেখানে অপরূপ রূপসজ্জায় সজ্জিত একটি অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি। অপূর্ব্ব তাঁর সজ্জা। তাঁর চারিদিকে অপরূপ আলোক মণ্ডল। সেই আলোক মণ্ডল অনেকটা যেন প্রতিমার সঙ্গে যে চালা করা হ'য়ে থাকে সেইরকম। তিনি উচ্চ একটি আসনে বসে আমার দিকে দুইবাহু প্রসারিত করে আছেন। স্মিতহাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। আমি যে মন্দিরে আছি সেই দিকে দুইবাহু প্রসারিত করে আছেন। আমার প্রথম মনে হ'ল মা এসেছেন আমাকে কোলে নেবেন বলে। কিন্তু পরক্ষণেই আমার মনে হ'ল যে যদি যাই তবে সংসারে ফিরে নাও আসতে পারি। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে সেই মাতৃমূর্ত্তি মুহূর্ত্তে অন্তর্হিতা হ'লেন। পরে আমার খুব অনুশোচনা হোল। মা আমার আজকে এসেছিলেন আমাকে কোলে নিতে। কিন্তু এ কি আমার বিষয় বুদ্ধি যে আমি মার কোলে যেতে চাইলাম না। মাগো আমার এ অন্যায় তুমি ক্ষমা করো মা। আমাকে ছোট অজ্ঞান শিশু বলে ক্ষমা ক'রো মা।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকাল থেকে বিষয় চিন্তায় ও অবিশ্বাসে মনকে জর্জ্জরিত করে রেখেছে। তার কারণ নানা জায়গায় যে সব টাকা পাওয়ার কথা ছিল সেগুলো এখনও পাওয়া যায় নাই। কারখানার Water tax অনেক দিন বাকী Connection কেটে দিতে এসেছিল। সোমবার পর্য্যন্ত সময় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু টাকার যোগাড় নাই। কারখানার বাড়ীভাড়া, কর্ম্মচারিদের বেতন ইত্যাদি অনেক বাকী। সোমবার দেবার কথা ছিল। অর্থাভাবে দেওয়া হয় নাই। মাকে বললাম এ ভাবে কি করে চলবে? যদি কর্ম্মচারীরা কাজ ছেড়ে দেয় তবে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। রবারের নূতন কাজ ধরেছি আজ প্রায় একবৎসর। কিন্তু কোনটায় কৃতকার্য্য হয় নাই। কারখনায় যা ধরছি একটা না একটা বাধা উপস্থিত হ'য়ে সে কাজ পণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে। Import

Licence যা দেবার কথা ছিল তা দিচ্ছে না। নানা গোলমালে কি করে চালাব? মা বললেন, "কোনও চিন্তা নাই। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। আরও একটু ধৈর্য্য ধারণ কর। এই কারখানা থেকেই তোমার প্রচুর অর্থাগম হবে। আমার উপরে সব যখন ছেড়ে দিয়েছ তখন আর তোমার ত' কোনও চিন্তার কারণ নাই। তুমি শুধু আরব্ধ কর্ম্ম পরিচালনা করে যাবে। সব হবে ও সব আমি দেব সময়ে। কোনও গোলমাল হবে না। তবুও পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলাম না। দেহ বিকার ও স্থূল বিষয়ের এমন চাহিদা যে সে সকল বিশ্বাসকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ও এমন প্রকট্ হয়ে দাঁড়ায় যে সব ভুলিয়ে দেয়। সাধে কি সংসারের মানুষ সব বিশ্বাস টিশ্বাসের ধার ধারে না। ছলে বলে কৌশলে অর্থাগম করে ও তার জন্যে মনকে সংসারের খুঁটিতে বেঁধে ফেলে ও ঘুরপাক খায়—। এখানে আমি বোকা, আমার ঈশ্বর বিশ্বাস তাদের কাছে বোকামী ঈশ্বর নির্ভর তাদের কাছে ক্লিবত্ব—। তারা বলবে পরের টাকা না দিয়ে বা ফাঁকী দিয়ে সাধু অনেকেই সাজে। সত্যই ত' এ সাধুতার মূল্য কি? যদি আমার কথা রাখতে না পারলাম, তাদের দৈনন্দিন খরচের টাকা না দিতে পারলাম তবে আমার সাধু হয়ে কি ফল? কারখানা এখন ছাড়তেও পারছি না আর চালাতেও পারছি না। আর মা বলছেন "ওই কারখানা থেকেই তোমার প্রচুর অর্থাগম হবে।" এমন কোনও রাস্তা নাই যে মার কথা বিশ্বাস করি। কিন্তু এ অবধারিত সত্য। মার কথা কখনও মিথ্যা হয় না। বিশ্বাস আমাকে করতেই হবে। রাত্রে মাকে বলছিলাম যে আমাকে প্রচুর অর্থ দে যাতে আমার যেখানে যা ঋণ আছে সব শোধ করে মুক্ত হই। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যি তুই মনে প্রাণে এ কথা বলছিস্? আমি বললাম হ্যাঁ, মা সত্যি এ আমার অন্তরের একান্ত কামনা। আমি এখন চাই যেন কেউ আমার কাছে একটা পয়সাও পাওনা হিসাবে না পায়। সবাইকে তাদের পাওনা কড়ায় ক্রান্তিতে পরিশোধ ক'রে আমি মুক্ত হ'তে চাই। আমার এ অর্থ চিন্তায় সাধন হচ্ছে না। সাধন ভীষণ ব্যাহত হ'চ্ছে। মাগো আমার এ

বাসনা কি পূর্ণ হবে ? আমি যে প্রতিদিন তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যে আমায় ঋণ মুক্ত কর। মা বললেন, "তাই হবে এই বিশ্বাস কর। সাধকের, ভক্তের আকুল ও সরল মনোবাঞ্ছা আমি কখনও অপূর্ণ রাখি না। সাধু ইচ্ছার পুরস্কার আমি দেবই। তা' যদি না দিই তবে সাধুতার কিছুই মূল্য থাকে না। সাধু ইচ্ছা যদি সরল ও একান্ত হয় তবে সে ইচ্ছা আমি পূর্ণ করবই। এ নিশ্চিত সত্য। অসাধু ইচ্ছায় যেমন মানব দুঃখ পাবেই তেমনি সাধু ইচ্ছায় মানব সুখ পাবেই। এ আমার অমোঘ নিয়ম। আপাতঃ দৃষ্টিতে যাই প্রতিয়মান হোক না কেন সাধু ইচ্ছার মূল্য সেই ইচ্ছার জয়। তোমার যখন সেই ইচ্ছা তখন জানবে তুমি তোমার সকল ঋণ পরিশোধ করবে ও অচীরে ঋণ মুক্ত হবে। সব সময়ে হবে। ধৈর্য্য ধারণ কর। সব হবে। চিন্তিত হয়ো না। আমার উপর গভীর বিশ্বাসে আমার উপর পূর্ণ নির্ভর করে থাক। যা চাইলে তা পাবেই—আমি দেবই।"

মা আমার সক্ষাৎ দয়াময়ী। এমন মা কে পায়। আমার মা মা গো কত কত অন্যায় করছি কত তোমার অবাধ্য হচ্ছি তবু দুর্ব্বল বলে আমায় নিত্য ক্ষমা করছ—মাগো।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মন আমার ভীষণ বিষয় মুখিন্ হ'য়েছে। ধ্যানে গভীরতা নাই। জপে আনন্দ নাই। কেন এমন হোল ? রোগ হ'য়েছে। তাই মাকে ধরেছি, তুই ত আমার ডাক্তার আমার এ রোগ সারিয়ে দে মা। মা বললেন, "এ রোগের ঔষধ হ'ল আমার প্রতি আরও শরণাপন্ন হওয়া আরও একান্ত মনে জপ করা। এমন জপ করবি যে তার মধ্যে যেন কোনও ফাঁক না থাকে। ফাঁক পেলেই সেইথান দিয়ে বিষয় ঢুকে পড়বে। যাতে বিষয় চিন্তা কোনও রকমে জপের ফাঁক দিয়ে না ঢুকতে পরে তার দিকে সজাগ থাক। তোমার চারিদিকে জপের আবরণ সৃষ্টি কর। এই আবরণ এমন কঠিন হবে যে বিষয়ের সাধ্য থাকবে না যে তোমার মনকে স্পর্শ করে। জপ ধ্যানে মনকে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ

রাখ। নিমিত্ত মাত্রেও মনকে বিষয় চিন্তায় ছাড়বে না। যদি ছাড় তবে সে একটার পর আর একটা করে এমনি বিষয় জাল সৃষ্টি করবে যে তোমার অন্তর পূর্ণ বিষয় মুখিন্ হয়ে আমার জপে, ধ্যানে মননে চিন্তনে নিবৃত্ত করবে ও শুষ্কতা এনে দেবে। এই বিষয় জাল ছিড়ে তোমার পক্ষে বাইরে বেড়িয়ে এসে আবার আমার প্রতি মন একাগ্র করতে বিশেষ কষ্ট করতে হবে। শক্তি যখন সাধনের রাস্তায় অন্তরে আসতে থাকে তখন—সাধন বিরুদ্ধ চিন্তা সাধন শক্তিকে ক্ষয় করে। সাধন আরম্ভ হ'লে অন্তর নির্ম্মল ও নিরুপদ্রব হয়। নির্ম্মল ও নিরুপদ্রব হয় বলেই বিষয় চিন্তা প্রকট্ হয় ও সকল অন্তর অধিকার করে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে—। ক্ষেত্র উপযুক্ত কর্ষিত হ'লে যেমন শস্য সজীব হয় তার সঙ্গে আগাছাও সজীব হয় তেমনি সাধনযুক্ত অন্তর উপযুক্ত কর্ষিত ক্ষেত্র যেখানে সাধন যখন থাকে সেও সজীব আবার বিষয় চিন্তা এলে সেও অত্যন্ত সজীব হ'য়ে উঠে। সংসারে সাধনে, সাধন ও বিষয় চিন্তা পাশাপাশি জন্মায়। সাধন গভীর বা ঘন হ'লে বিষয় চিন্তা বিশেষ কিছুই করতে পারে না। আর বিষয় চিন্তা যদি একবার সাধনকে ঘিরে ফেলে তবে সাধন শুকিয়ে যায় ও সাধক সাধন ভ্রষ্ট হয়। ঠিক ক্ষেত্রে শস্য গাছ ও আগাছার মত। আমার প্রতি সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হ'লে সাধন অতি দ্রুত অগ্রসর হয়। নাম জপ বা আমার মহিমা জপ হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম সাধন। সংসারে আমার অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে সাধন আরম্ভ হবে জপে ও শেষ হবে জপের মাধ্যমে ধ্যানযোগে। তোমার যে ভাবে সাধন হ'চ্ছে আমার ইচ্ছায়ই হ'চ্ছে। তুমি সর্ব্বদা সজাগ থেকে এই ভাবে সাধন কর। তোমার সাধন মহাসাধন হবে। তুমি আমার হবে ও আমি তোমার একান্ত হব। অগ্রসর হও ভয় নাই আমি আছি।"

জয় মা আনন্দময়ী—।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মা বললেন, "পূর্ণতাই সাধনের প্রকৃষ্ট অন্তর। পূর্ণ যোগদৃষ্টিতে সাধন পরিপুষ্ট হয়। পূর্ণ যোগদৃষ্টি হ'ল যখন যোগদৃষ্টি মেলবে তখন সম্পূর্ণ আমার

প্রতি একাগ্র ও একান্ত শরণাপন্ন হবে। এই একাগ্র ও একান্ত শরণাপন্নতাই বিষয় বাসনাকে পূর্ণ সাধন অন্তরে প্রবেশ করতে দেয় না। তখন সাধন পূর্ণতারূপ অন্তর পায় ও আপন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সাধন অন্তর যত পূর্ণ হবে ততই সাধন উচ্চ মার্গে ধাবিত হবে। আমার বাক্য শ্রবণ হবে ও আমার আদেশমত কার্য্য হবে। সাধনের জন্যে অন্তর প্রস্তুত করতে হ'লে পূর্ণতাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। এই পূর্ণতা যত বিস্তৃত হবে সাধন তত অগ্রসর হবে। আমি পরিপূর্ণ বলে পূর্ণতা ছাড়া আমার সাধন হয় না। যেভাবেই সাধন করনা কেন পূর্ণতা চাই। ক্ষণেকের পূর্ণতাও সাধনের পক্ষে সহায়ক ও অতি ধীরে ক্ষণ বিস্তৃত হ'য়ে মহাধারা সর্ব্বদা অন্তরে বিরাজ করে। সাধন কর আমি আছি।"

জয় জয় মা দয়াময়ী জননী আমার।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে মাকে বললাম, মা কিছু উচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বল। মা বললেন, "শোন একটা হচ্ছে "অবলুপ্ত" আর একটা হ'চ্ছে "অবলিপ্ত" "অ" আদ্যাক্ষর ও অক্ষয়। স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের ভিতরে "অ" ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। আর "ব" এই বর্ণ হ'চ্ছে ব্রহ্ম। "ব" এর উচ্চগ্রাম "ব্র" অথবা "ব" যখন বৃহৎ তখন সে "ব্র" অক্ষয় ব্রহ্মে লিপ্তই হ'চ্ছে অবলিপ্ত। "লিপ্ত" হ'চ্ছে অধিকার আর লুপ্ত হ'চ্ছে গ্রহণ। সাধনের সময় ব্রহ্মতে সাধক লিপ্ত। অর্থাৎ অক্ষয় ব্রহ্মতে লিপ্ত। অর্থাৎ অক্ষয় ব্রহ্মকে সে অধিকার করবে। আর সাধকের সিদ্ধ অবস্থায় সে অক্ষয় ব্রহ্মতে লুপ্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম গ্রহণ তার পূর্ণ। জলপান কর অর্থাৎ জল তুমি অধিকার কর। এর অর্থ জলে তুমি লিপ্ত বা তোমাতে জল লিপ্ত। আর জল যদি তোমাকে গ্রহণ করে সেখানে তুমি লুপ্ত। নদীতে গিয়ে যখন স্নান কর তখন তুমি জলে লিপ্ত আর যখন ডুব দাও তখন তুমি লুপ্ত। তুমি যখন সাধনে তখন তুমি লিপ্ত আর যখন সিদ্ধ তখন তুমি লুপ্ত। এটা মনে করো না যে লুপ্ত অর্থেই সত্ত্বার বিনাশ। জীব সত্ত্বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। তবে জীবসত্ত্বার ব্রহ্মে অবলুপ্তি ঘটতে পারে

মহাসাধনে। সেটা অবলুপ্তির অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও জীবচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্য হ'য়ে যায় না। তখন পরমচৈতন্য জীবচৈতন্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থা। বিলুপ্তি অর্থে "বি" "বৃহৎ" এই বৃহৎ লুপ্তি হয় না। জীবচৈতন্য তখন পরমচৈতন্যের মহান গভীরে নিমজ্জমান থাকেন ও পরমচৈতন্যের মহা আনন্দ সুধা পান করেন। কিন্তু এ আমার অভিপ্রেত নয়। কারণ জীবচৈতন্যের দেহ ধারণ, সংসার পালন, কর্ম-সাধন ইত্যাদি বিষয় কর্মরূপ পরিক্রমা আছে। তার কর্মই হবে প্রেম কর্ম পুণ্য কর্ম, সদ্ কর্ম ও এদের দ্বারা জীবগণ সংসারের কর্ম পরিক্রমায় থাকবে ও আমাকে সংসারের সকল কর্মের ভিতরে সাধনে অবলোকন করবে। আমাকে সর্ব্বঅবস্থায় স্মরণ করবে এই আমার অভিপ্রায়—। কিন্তু জীবচৈতন্যের গূহ্যতম অন্তর্নিহিত অভিলাষ হোল আমাতে অবলুপ্ত হওয়া। কারণ জীবচৈতন্যের যে জন্মক্ষণ আমা থেকে ঘটে সে জন্মক্ষণের মহা আকর্ষণ জীবের অন্তরে গূহ্যতম প্রদেশে নিহিত থাকে ও সে চায় আবার আমার সান্নিধ্যে ওতপ্রোত হ'য়ে থাকতে। তোমাকে খুব সরল ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছেলে মায়ের গর্ভজাত। ছেলে যখন শিশু থাকে তখন মা ও ছেলে একাত্মা। মা ছেলেকে না দেখলে থাকতে পারে না আর ছেলেও মাকে ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু ছেলে যখন বড় হোল লেখাপড়া শিখে লোক সমাজে পরিচিত হোল তখন ছেলে যদি সেই শিশুবেলার মত মায়ের আঁচলে থকেতে চায়, কোথাও যাবে না, কাজ কর্ম করবে না শুধু মাকে ধরে থাকবে, সে অবস্থা কি কোনও মা পছন্দ করেন? মা চান ছেলে দশ জায়গায় যাবে, সমাজে সম্মান লাভ করবে, কাজকর্ম করবে, গুণী, মানী, বিদ্বান হবে। কিন্তু মাকে সব সময় মনে রাখবে, মাঝে মাঝে মার কাছে থাকবে ও মার কাছে বসবে। তেমনি আমারও সেই ভাব। আমি জীবচৈতন্যের জন্ম দিয়েছি, সে আপনার কর্মপন্থা নির্ব্বাচন করবে, সদ্‌কার্য্য করবে, সাধন করবে, সংসার করবে, কিন্তু আমাকে মনে করবে। আর দেহান্তে আমার কাছে এসে কদিন থাকবে। আবার সংসারে যাবে ও কর্ম করবে। আমাতে ডুব দিয়ে আপন সত্ত্বা হারাবে না। মা যেমন আঁচলে আঁচলে ঘোরা

ছেলেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন না তেমনি আমাতে সাধক জীবন সমর্পন করে লুপ্ত হলেও আমি তার সে সমর্পনকে গ্রহণ করি। তাতে জীবের পরম আনন্দ ও শ্রেষ্ঠতম আনন্দ। আমারও আনন্দ হয়। কিন্তু সেটা জীবচৈতন্যের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ নয়। অনেক সাধক সেইটাই শ্রেষ্ঠতম বিকাশ বা পরমপ্রাপ্তিই জীবচৈতন্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে স্থির করে গেছেন। কিন্তু তা নয়। জীব-চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হোল চৈতন্যের মহান্ প্রসারতায় মাতৃ নির্দ্দেশে ও মাতৃভাবে সর্ব্বদা যুক্ত থেকে কর্ম্মের ভিতরে মগ্ন হওয়া। এ গভীর জ্ঞানের বিষয়। তোমাকে পরে আরও বলব। তুমি, তোমার যে সাধন কর্ম্ম তাকে সংসারের কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করে মহাজ্ঞান আরহণ কর ও আমাতে মনকে সদা যুক্ত রাখ। সাধন কর আরও গভীর জ্ঞান দেব। আমি আছি চিন্তা নাই। সিদ্ধি নিশ্চিত।"

মাগো আমায় ছাড়িস্ নে মা।

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন "শোন সংসার হচ্ছে জীবচৈতন্যের শ্রেষ্ঠতম বিকাশক্ষেত্র। এখানে এসে যে সৎকর্ম্ম করবে। যশ, বিদ্যা, জ্ঞান, সাধন লাভ করবে ও দশজনকে সে জ্ঞান বিতরণ করবে। আমার বিষয় যে সকলে ভুলে গেছে সেটা স্মরণ করিয়ে দিবে। ছেলে বড় হ'য়ে বিদেশে গিয়ে কুসংসর্গে প'ড়ে মাকে যদি ভুলে যায় ও মার একটি সৎ ছেলে যদি তাকে তার মার কথা পরিবারের কথা বলে "তুমি এইসব কুকাজ করছ? তোমার মা, তোমার পিতা, তোমার পরিবার এত উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত আর তুমি কি কুহকে প'ড়ে আজ এইভাবে জীবন যাপন করছ? যদি সে সৎপরামর্শ শোনে তবে আবার মার কাছে ফিরে এসে চোখের জলে ক্ষমা চায় ও ভাল হয়। আর যদি না শোনে তবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংসারও তেমনি। সকলে বিষয়ের ঘোর কুহকে প'ড়ে আমাকে ভুলে কত কুকর্ম্ম করছে। কত কত সৎছেলে তাদের কুহক ভেঙ্গে দিতে চায়। যারা শোনে তারা আমার একান্ত হয়। আর

যারা না শোনে তারা মহাদুঃখ পায় ও সংসারের কুহকে বদ্ধ হ'য়ে মৃত্যুর পরেও আমার কথা মনে করে না ও মহাদুঃখের ভিতরে কাল যাপন করে—। যখনই আমার-কথা মনে করে তখনই তার দুঃখের দশা থেকে মুক্তি ও আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে কোলে নিই। তাই সংসারে জীবকে পাঠাই তার মুক্তির জন্যে কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়ে সৎকার্য্যের মহা প্রেরণার ভিতরে সে দশজনের একজন হবে এই আমার একান্ত বাসনা। তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর। তোমার যখন আমার প্রতি গভীর আকর্ষণ হ'য়েছে তখন জানবে তোমার আর কোনও চিন্তা নাই। আমি তোমার সকল আকাঙ্ক্ষা সার্থক করব। কোনও চিন্তা ক'রো না। সাধন কর জয় সুনিশ্চিত।"

জয় মা আনন্দময়ী অভয় দায়িনী জননী আমার।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, আমার ঋদ্ধি, সিদ্ধির কিছুর দরকার নাই। শুধু তোমার কাছে আমি থাকব। যোগ বিভূতি দিয়ে আমার কি হবে? আমি চাই তোমাকে। সারাক্ষণ তোমার কাছে কাছে। মা বললেন, "ও সবেরও প্রয়োজন আছে। ও সব না হ'লে যে আমার কাজ সম্পন্ন হবে না। আমি তোমাকে সংসারে প্রকট করব। আর তুমি সংসারে আমাকে প্রকট করবে। আমি আর তুমি জগত সংসারে জনগণের পরিত্রাণের মহাসাধন করব।" আমি বললাম, তা করতে গিয়ে যদি আমি নানা গোলযোগে প'ড়ে যাই। লোকের মহা আনাগোনার মধ্যে পড়ে গিয়ে যদি তোমাকে হারিয়ে ফেলি। মা বললেন, "সেকিরে? সেকি কখনও হয়? আমি যে তোর সঙ্গে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তোর হাত ধরে সব জায়গায় নিয়ে যাব ও সব কাজ করব। কোনও চিন্তা নাই। সাধন কর সব হবে।"

জয় জয় মার জয় আমার কিছু নাই—সব আমার মায়ের।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে একবার মনে হ'ল আমার যে সব লেখা সেগুলো যদি কোনও

প্রকাশকের দ্বারা ছাপাই তবে এই নূতনতম আদর্শ-দর্শন লোক সমাজে সমাদৃত হবে ও আমার প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে মাতৃ প্রতিষ্ঠা হবে—। এই চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে বিরত করলেন। বললেন, "তোমার কি শক্তি আছে নিজকে প্রকট করবার। তুমি হাজার হাজার জ্ঞানের কথা লিখলেও লোকে তোমাকে বা তোমার মত গ্রহণ করবে না, যদি না আমার ইচ্ছা হয়। আমার ইচ্ছা হ'লে এই সকল জ্ঞান ভাণ্ডার এক নিমিষে মূর্ত্ত ও প্রকট্ হবে, সর্ব্ব জগতজন তোমার মতবাদ গ্রহণ করবে ও আমার নিত্য প্রতিষ্ঠা হবে। এখন তোমার কিছুই করবার নাই। আমিই তোমাকে ও তোমার মাধ্যমে আমার শ্রেষ্ঠতম অভিলাষ পূর্ণ করব। সময় এলে সব হবে। আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করে থাক।";

জয় মা আনন্দময়ী জগতজননী—।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে হঠাৎ মা বললেন "তোমার মহাসাধন হ'চ্ছে। সর্ব্বক্ষণ আমার দেওয়া মন্ত্র জপ করে যাও। সিদ্ধি নিশ্চিত ও নিকটবর্ত্তি।" আমি বললাম, আমার সিদ্ধি ঋদ্ধি দিয়ে কি হবে? সিদ্ধি হ'লে কি আমার মাথায় দুটো সিং গজাবে? আমার এই ভালো বেশ আছি মা আর ছেলে। সর্ব্বক্ষণ তোমার কাছে আছি। তোমার নানা কথা, নানা উপদেশ, নির্দ্দেশ শুনছি। এই ভাবেই যেন বিভোর হ'য়ে থাকতে পারি। মা বললেন "সে কি কথা, সিদ্ধি না হ'লে যে আমার মহান্ কার্য্য সিদ্ধ হবে না। যে মহামন্ত্র তোমাকে দিয়েছি, সেই মহামন্ত্র সর্ব্বসাধারণ গ্রহণ করবে, তাদের মুক্তি ও মাতৃদর্শন হবে ও আমি প্রত্যেকের অন্তরে চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হব। তোমাকে যে মন্ত্র দিয়েছি সে মন্ত্রকে তুমি সাধনের দ্বারা মূর্ত্ত ও জাগ্রত করলেই তবে সে মন্ত্রের মহাশক্তি বিচ্ছুরিত হবে। তুমি যার কানে এই মন্ত্র দেবে সেই আমাকে জীবনে ধারণ করবে ও আমি এই জগতে সকলের অন্তরে লীলা করব। সিদ্ধি হোল আমার শক্তির, আমার লীলায় স্থিতি। আত্মার

ভিতর দিয়ে সাধনের দ্বারা যে শক্তি দেহে ও মনে সঞ্চারিত হয় সাধনের সময় সে শক্তি একবার আসে একবার যায়। যেই তুমি আমার প্রতি একাগ্র হ'য়ে সাধনে প্রবৃত্ত হ'লে অমনি তোমার ভিতর শক্তি এল। আবার যেই বিষয়ের চিন্তা এল অমনি সে চলে যায়। সেই জন্যে জপ সাধন নিরবিচ্ছিন্ন হওয়া দরকার। যাতে শক্তি ক্রমাগত আসবেই আসবেই ও যাতে জপের ফাঁকে বিষয় চিন্তা এসে সেই শক্তির উৎসকে ছিন্ন করে না দিতে পারে। এই আমার মহাশক্তি-উৎস যখন ক্রমাগত যাতায়াত করতে থাকে তখন দেহ ও মন মহাধারক রূপে ক্রমেই রূপান্তরিত হয়। একটা সময় আসে যখন দেহ ও মন পূর্ণ ধারক হ'য়ে আমার মহাশক্তিকে ধৃত করে রাখে। তখন দেহ ও মন পূর্ণ মাধ্যম হ'য়ে আমার মহাশক্তিকে আপন অন্তরে অবলীলায়িত দেখে; এই অবস্থা হল সিদ্ধি। এই অবস্থার পরে আর অবিশ্বাস, সন্দেহ, মোহ, মায়া, বিষয়, কিছুই আর দেহ ও মনকে কোনও প্রকারে ক্লান্ত করতে পারে না বা সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করতে পারে না। সিদ্ধি অর্থই আমার মহাশক্তির পূর্ণ ধারণ। আমার মহাশক্তি সাধকের দেহ মন পূর্ণ অধিকার করে বলেই সে যা করে তাই সত্যি হয় ও তাই লোকে গ্রহণ করে। তার প্রতি কথা, প্রতি কার্য্য আমা-প্রেরিত হয় বলে মানবগণ সে সব গ্রহণ না করে পারে না। অবলীলায়িত অর্থে—"অ" অক্ষর, 'ব' বৃহদ্ বৃত্তিতে "ব্রহ্ম"। অক্ষর ব্রহ্ম যখন সাধকের অন্তরে চির লীলায়িত হন সেই হোল সিদ্ধির অবস্থা। তোমাকে সিদ্ধি লাভ করতেই হবে। আমার দেওয়া মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ—জপ করে যাও। তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত সত্য।" কিন্তু আমার যে সর্ব্বক্ষণ—জপ হয় না। আপিসে কাজে জপ হয় না। রাত্রে নিদ্রা যাই সে সময় জপ হয় না। মা বললেন, "যে সময় যতটুকু পাও আমার জপ কর। তোমার জপে ফল উৎপাদন করবে। যতক্ষণ জপ করতে পারলে না তার জন্যে যে অন্তরে বেদনা অনুভব কর তাতে সেই যতক্ষণ যতবার জপ করতে পারলে না ও সেই সময় যে কয়বার জপ করলে যে ফল তোমার লাভ হ'ত তার চাইতে দ্বিগুণ ফল লাভ হয়। আসলে

তোমার মন প্রাণ ও দেহকে আমাতে সর্ব্বক্ষণ সমর্পন করে রাখ। সিদ্ধি ঋদ্ধি তোমার সব হবে ও তোমার মাধ্যমে আমার মহাকার্য্য এই সংসারে সম্পন্ন হ'বে জানবে—।"

জয় জয় জয় মা মা মা আমার মা জগতের জননী। মা সকলকে উদ্ধার করবেন।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সন্ধ্যাবেলা আপিস থেকে এসে বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করছি। জপ চলছে। একটু একটু তন্দ্রার মত ভাব হ'য়েছে। মনে হোল দক্ষিণ দেশীও কোনও একটি মন্দির প্রাঙ্গণে আমি গিয়েছি। একটা পুস্তক খোলা রয়েছে আমার সামনে। তাতে সব লেখা দেখতে পাচ্ছি। কি কি ভাষায় লেখা তা' দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু বহু সংস্কৃত শ্লোক আমার মুখ থেকে নির্গত হ'চ্ছে। শ্লোকগুলো এমন ভাবে আসছে যেন সেই পুস্তক আমি পড়ছি। আমার সত্ত্বার ভিতরে যেন পুস্তকের অক্ষরগুলো ওতপ্রোত হয়ে একাকার হয়ে গেছে। চক্ষের সম্মুখে স্পষ্ট হ'য়ে অক্ষরগুলো রয়েছে। অনেক সস্কৃত শ্লোক তখন মনে এসেছিল। উহার কতগুলোর কথা মনে ছিল। এখন প্রায় সব ভুলে গেছি। একটার একটু মনে পড়ছে। "সুন্দরং প্রেম সুন্দরং। বুদ্ধিবৃত্তি সমার্কীনা আনন্দং পরমাদ্ভুতং"।

আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা। জয় মা আনন্দময়ী জননী।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "সংসার আধার, দেহ পুষ্প, আত্মা গন্ধ, আর পরমাত্মা সৌরভ। অন্তর্মুখিন আনন্দ লোকে যখন আত্মা মগ্ন তখন দেহ একনিষ্ট হ'য়ে আত্মাকে সাহায্য করে। পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'য়ে ঘ্রাণই বিতরণ করে। আত্ম-মগ্ন যে ঘ্রাণ তা দেহের বিকাশেই সম্ভব। তখন মহা সৌরভময় পরমাত্মা ঘ্রাণ ও পুষ্পের সৌরভে মূর্ত্ত। পুষ্পের সৌন্দর্য্যও ঘ্রাণ মিলিত হ'য়ে তার সৌরভ। দেহ আত্মার মিলিত সাধনে পরমাত্মা প্রকট। এ সাধনের

শ্রেষ্ঠতম আধার বা স্থান সংসার। ব্যবহারিক কর্ম্ম দেহের, অন্তর্মুখিন কর্ম্ম আত্মার আর এই দুয়ের সংমিশ্রনে যে সাধন সেটি পরমাত্মার। ভগবৎ সত্ত্বা লুকায়িত নয় এ সত্ত্বা দেহ ও আত্মার ভিতর দিয়ে সংসারে নিত্য দৃশ্যমান।"

জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, আমার সাধনে বড় বিঘ্ন হ'চ্ছে। মা বললেন, "চিন্তা নাই, আমি তোমার সঙ্গে সাধন করছি।" তুমি আবার কি সাধন কর নাকি? "হ্যাঁ, আমিও সাধন করি। গুরু যেমন অপটু শিষ্যকে সাধন মন্ত্র দিয়ে নিজে সাধন ক'রে শিষ্যের সাধনায় সক্রিয় সাহায্য করেন ও শিষ্যের সকল দুর্ব্বলতা ও সকল ভার নিজের মস্তকে ধারণ ক'রে শিষ্যের মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটান তেমনি আমিও তোমার সকল ভার গ্রহণ ক'রে তোমার সাধন আমিই করছি। তা না হ'লে তোমার সাধ্য কি যে তুমি সাধনে অগ্রসর হও। যা কিছু করছ সবই আমার দ্বারা সংযোজিত হ'চ্ছে। তোমার যখন আমার প্রতি অনুরাগ হয় তখনই আমি তোমার প্রতি অনুরক্ত ও একাগ্র হই ও সেই হ'চ্ছে তোমার জন্যে আমার সাধন। তুমি এটা সর্ব্বসময় মনে রাখবে তোমার সকল ভার আমি নিয়েছি। এমন ভাগ্যবান্ এই সংসারে কয়জন জন্মগ্রহণ করেছে যারা এমন সৌভাগ্য লাভ করতে পেরেছে? মানব গুরু মানবকে সাধন পথে মন্ত্র দীক্ষা দেন। আমি যার গুরু তার আর কি কোনও ভাবনা আছে? আমি ত্রিলোকের গুরু ও আমি যাদের নিজ হাতে দীক্ষা দিই ও যাদের সাধন ভার নিজ মাথায় বহন করি তারা জগৎ গুরু হয়। তারা সংসারে সকল গুরুর গুরু হয়। তাদের দ্বারাই আমার মহান্ কর্ত্তব্য সাধিত হয়। মহা কল্যাণের জন্যেই এ ব্যবস্থা আমার গ্রহণ করতে হয়। তুমি ও আমি একযোগে সাধন করছি। নিত্য নিত্য ভাবে সাধন চলবে। সংসারের সকল প্রকার কর্ম্ম প্রবাহের মধ্যে সকল প্রকার মোহ, মায়া ও ভেদ বিভেদের

মধ্যে এ সাধন—এযে মহত্তম সাধন। এমন সাধন কি উপেক্ষা করতে পার? এ সাধনে সিদ্ধি মহত্তম সিদ্ধি।"

মা আমার সর্ব্বজ্ঞানদায়িনী—জয়—মা।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, তোমার কি ঘৃণা নাই যে রোজ যখন আমি পায়খানায় বসি তখন তুমি আমার কাছে যত কথা বল। এ তোমার কি? মা বললেন, "দেখ শৌচ অশৌচ, সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ, আশা, নিরাশা, জীবন, মরণ, আমার কাছে কিছুই না। এসবের আমি অতীত। অশৌচের মধ্যে তোমার মন যদি আমার প্রতি একাগ্র হয় তখনই তুমি আমার স্পর্শ পাবে—। তোমার মধ্যে এসবের তারতম্য যাতে না থাকে সেইজন্যে আমার এ প্রয়াস। এ সংসারে কিছুই ঘৃণ্য নাই—। আমার সৃষ্ট মাত্রেই পূর্ণ শুদ্ধ। আজ যা তোমার কাছে ঘৃণ্য কাল তার দ্বারাই তোমার মহৎ উপকার সাধিত হ'চ্ছে। সুতরাং অশৌচ বলে কিছু নাই। মুখ থেকে যে বিষ্টা নির্গত হয় তা কি গুহ্যদ্বার থেকে যে বিষ্টা নির্গত হয় তার চাইতে উন্নততর? না, দুইয়ের একই পর্য্যায়? তোমার বিষ্টা যদি অশৌচ হয় তবে গাভীর বিষ্টা অশৌচ নয় কেন? তবে বুঝলে যে গাভীর বিষ্টা যদি অশৌচ না হয়, তোমার বিষ্টাও অশৌচ নয়। তোমরা জাননা যে প্রত্যেক প্রাণীর বিষ্টায় এক একটি প্রাণ নাশকর ব্যাধির ঔষধ আছে। মানবের বিষ্টায়ও এক মহাব্যাধির ঔষধ আছে। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এ সব তোমার অন্তরে সমপর্য্যায় ভুক্ত হবে। সর্ব্বসময় সর্ব্বঅবস্থায় আমার স্মরণ করবে। ঘৃণা, ভয়, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি পরিত্যাগ কর। এ সব বিষয়ে পূর্ণ উদাসীন হবে তবে তোমার সম্যক পূর্ণতা আসবে। আমি তোমার কাছে মূর্ত্ত যখন, যেখানে যে ভাবে আমাকে স্মরণ করবে। অন্তর নির্ম্মল কর। অর্থ, বিত্ত, প্রচুর আসছে। আমার শরণাপন্ন হও। আমার সাধন কর। মুক্ত হও। বন্ধনকে সর্ব্বদা ত্যাগ—কর।

মা আমার আনন্দময়ী—।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "শম্বুক যেমন সমুদ্রের বারি গ্রহণ ক'রে সেই বারি সমুদ্রেই উৎক্ষেপণ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে সে সমুদ্রকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছে তেমনি মানবগণ নিজ নিজ জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তায় অহঙ্কারী হ'য়ে মনে করে যে সে আমাকে সম্পূর্ণ জ্ঞাত হ'য়েছে। মানব অন্তরের যেটুকু পরিধি তাতে আমার অপার জ্ঞান খণ্ডের এক বিন্দুতম কণাও সে আজ পর্য্যন্ত জ্ঞাত হয় নাই। আমার স্বরূপ সাকার কি নিরাকার দ্বৈত কি অদ্বৈত এই সব নিয়ে তর্ক শুধু অজ্ঞানীরাই করে থাকে। এই ধূলিকণা সদৃশ পৃথিবীতে কীটতম আকৃতিতে জন্মগ্রহণ ক'রে মনুষ্যগণ আমার অপার অগম্য ধৃতির চেতনা কি করে লাভ করবে? কোটি কোটি লক্ষ কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে ধারক "আমি" ও এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি ধূলি কণার অন্তরের অতি সূক্ষ্মতম আকাঙ্ক্ষা যে আমার অন্তরে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হ'চ্ছে ও তাদের প্রত্যেকের সকল ভার আমার উপর সম্পূর্ণ সমর্পিত আছে সেই "আমির" কতটুকু মানব জ্ঞানে ধৃত হ'য়েছে? মনে রাখবে আমি কৃপা করে যেটুকু জ্ঞান দিয়েছি সেটুকু মানবের যতটুকু পরিধি সেইমত। শ্রেষ্ঠতম মানবের যে জ্ঞান তাও আমার এককণা কৃপায় এসেছে ও সে জ্ঞান আমার অপার জ্ঞানের এক সামান্যতম কণিকা মাত্র। আমার কৃপা ভিন্ন কিছুই হয় না। এনিয়ে তর্ক বাতুলতা। আমার বিচারে যেওনা। আমার প্রতি ভক্তিমান হও, নিরহঙ্কারী হও, সরল হও, সম্পূর্ণ শরণাপন্ন হও। তুমি কিছুই নও এই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান। এ জ্ঞানে আমি কৃপা করি। আমার কৃপাই জীবের একমাত্র ভরসা ও তাই জীবের সকল লাভের ভিতরে শ্রেষ্ঠ লাভ। কতটা জ্ঞানী হ'তে চাও? যতই জ্ঞানী হও না কেন তোমার জ্ঞান রেণুকণা থেকেও ক্ষুদ্রতম। এ নিয়ে অহঙ্কার করো না। সকলের পদতলে প'ড়ে সেবা কর তবেই আমার কৃপালাভ হবে।

জয় মা আনন্দময়ী জয় জয় মা।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ছিরুর মৃত্যুদিন (আমার মধ্যম শ্যালক শ্রীশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়) ১৯৫৩ খৃঃ এই দিনে সে মহাপ্রয়ান করেছে। আপিস থেকে এসেছি প্রায় ৫৷৷০ টার সময়। চেয়ারে বসে চোখ বুজে গায়ত্রী জপ করছি। জপ করতে করতে কখন হঠাৎ আপিসের নানা অর্থাচন্তা মনকে কোন অজ্ঞাতসারে দখল করেছে টের পাই নাই। হঠাৎ দেখি একটি হাত, আট কি দশ বছরের একটি মেয়ের হাত, শুধু সেই হাতখানা আমার থুতনিতে সজোরে আঘাত করল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমার জপ আরম্ভ হ'ল। চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেলাম না। কিন্তু থুতনিটি কে যে উপরের দিকে ঠেলে আঘাত করেছে সেই আঘাতের স্পর্শ ও বেদনা তখনও তীব্র ভাবে অনুভব করছি। এ কি লীলা? এমনি করেই কি আমাকে মা সাধন শেখাবেন? বিষয় চিন্তা করতে দেবেন না? বলেন "বিষয় চিন্তার দরকার নাই। সব দেব শুধু আমার জপ কর সব হবে।"

মা আমার অপার করুণাময়ী জননী। মাগো এলে কিন্তু ধরা দিলে না।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে নানা চিন্তা করছি হঠাৎ মা বললেন, "দেখ যা পাও নাই তাই নিয়ে চিন্তা করা নিষ্ফল। জানবে যা পেলে না তা তুমি পাবে না বলেই পাও নাই। যদি তোমার পাবার থাকত নিশ্চয়ই তা তুমি পেতে। যেহেতু সে সব তোমার পাওনা ছিল না বলেই পাও নাই। দেখ, আমার নিয়মে, শৃঙ্খলায় ও বিধানে কোথায়ও কোন ফাঁক নাই। যেটা তোমার যখন পাওয়া দরকার সেটা তুমি তখন ঠিক পাবে। আর যেটা তোমার পাওয়া দরকার নয় সেটা তুমি শত চেষ্টা করেও পাবে না। তুমি জানবে কোনও সামান্যতম কর্ম্ম ও চিন্তাও নিষ্ফল হয় না। ভাল কর্ম্ম, ভাল চিন্তা, ভাল ফল উৎপাদন করে। আর অন্যায় চিন্তা, অন্যায় কর্ম্ম, দুঃখের ফল উৎপাদন করে। তোমার কারখানায় যে তোমার এত পরিশ্রম সে কি নিষ্ফল হবে? কখনই না। তার ফল

ফলবেই। সে ফল কখন ফলবে সে আমার হাতে। ঠিক উপযুক্ত সময়ে ফলবেই। গৃহ তোমার হ'তে পারত, হয় নাই। কিন্তু হবে। আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রেখে কর্ম্ম করে যাও, সাধনে এগিয়ে চল, আরও অগ্রসর হও, তোমার সব হবে। কোনও চিন্তা নাই। আমি যার সাধন ভার ও সকল ভার গ্রহণ করেছি তার আবার চিন্তা কি? আমি যার গুরু, সে যে জগত গুরু হবে। তোমার সব হবার পূর্ণ ভার আমার হাতে। তোমার সাধন হ'চ্ছে ও সিদ্ধি নিকটবর্ত্তী। সিদ্ধি হ'লে, তোমাকে মহা-সাধন শেখাব ও সেই মহা-সাধনে তোমার মহা সিদ্ধি হবে। দেহ, মন, আত্মার একযোগে সাধনই হোল একান্ত প্রয়োজনীয়। তোমার আত্মা আমার প্রতি পূর্ণ যুক্ত, মন ও দেহ এখনও সেই যোগের অন্তরায় সৃষ্টি করছে। তোমার মন ও দেহ যখন আত্মার পূর্ণ সহায়তা করবে তখন তোমার পূর্ণ "বিকাশ',। সে অবস্থা তোমার নিকটবর্ত্তী। দেখ এখন কিছুদিন নারীগণ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এ অহেতুক আকর্ষণ তাদের তোমার প্রতি হবার কারণ যে তুমি সাধন করছ ও সাধনে অগ্রসর হ'য়েছ। এ অবস্থায় তোমার দেহের রূপলাবণ্য ও এমন একটি চিত্তাকর্ষক জ্যোতি হবে যাতে সকল অবস্থার সকল স্তরের ও সকল বয়সের নারীগণই তোমার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ অনুভব করবে। এরকম সময় বা অবস্থা আসতে পারে যখন কোনও নারী তোমার কাছে এসে আত্মসমর্পন করবে ও তাকে উপভোগ করবার জন্যে সে তোমাকে প্ররোচিত করবে। এই অবস্থা সাধনে ঠিক সিদ্ধির আগে হয়। যদি তুমি নিজকে সংযত করে মাতৃভাবে তাকে দেখতে পার তবে তুমি এই পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হবে। আর যদি না পার তবে তোমার সাধন অবার বহু কষ্ট সাধ্য হ'য়ে পড়বে ও তোমার সিদ্ধি অনেক দূরবর্ত্তী হবে। এই কথা মনে রেখে সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রেখে চলবে। জপ সাধন বড় শ্রেষ্ঠ সাধন। অন্য যে কোনও প্রকার সাধন আছে সবের শ্রেষ্ঠ হ'ল জপ সাধন। এতে তোমার তনু, মন, আত্মা একিভূত হ'য়ে আমাতে একাকার হ'য়ে যায়। মানবের ভাগবতী তনু লাভ হয়। নাম জপের সাধনে

অতি ধীরে সর্ব্ব গ্লানি, সর্ব্ব অহঙ্কার, সর্ব্ব রিপু, সর্ব্ব রোগ অপনোদন হয় ও অতি ধীরে দেহ, মন, আত্মা আমার একান্ত হয়। অন্যপ্রকার সাধনে যদি দশ বৎসরে সিদ্ধি হয় নাম জপ সাধনে এক বৎসরে, এক বৎসরে কেন, এক মাসে সিদ্ধি নিশ্চিত জানবে। নাম জপ সাধন যদি আমার প্রতি পূর্ণ একাগ্র হ'য়ে লক্ষবার কর তবে তাতেই তোমার সিদ্ধি হবে। যতটা একাগ্র হবে তত শিঘ্র সিদ্ধি। নাম জপের এমনই মহিমা যে পূর্ণ আশক্তিপূর্ণ মনকে সে অতি ধীরে ধীরে আমার দিকে একাগ্র করে। অন্য যে কোনও বিষয় চিন্তার ভিতরেও যদি নাম জপ সাধন কর তাতেও তোমার মনকে আস্তে আস্তে তোমার অজ্ঞানিতে আমার দিকে নিয়ে যাবে ও পরে একাগ্র করবে। এই যুগে সংসারের সর্ব্ব স্তরের নরনারীর পক্ষে নাম জপ শ্রেষ্ঠ সাধন। এই সাধন তুমি তাদের ভিতরে ঢেলে দেবে যাতে প্রত্যেকেই এই সাধন শেখে ও মনে প্রাণে করে। এতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হবে। সব পাওয়া যায়। অর্থ, বিত্ত, সুখ, সম্পদ, ও পরমার্থ সব এই নাম জপের দ্বারা পাওয়া যায়। যে মহামন্ত্র তোমাকে আমি দিয়েছি তার যে কি মহাশক্তি তা তুমি এখনও জান না। জানবে পরে ও যখন জানবে তখন তুমি অবাক হ'য়ে যাবে। আসলে এই মন্ত্র জপের ভিতর দিয়ে তুমি ও তোমার সাধন যখন পূর্ণ প্রাণবন্ত হবে তখন এই মন্ত্র এক মহাশক্তি ধারণ করবে। তখন এই মহামন্ত্র তোমার দেহ, মন ও আত্মার সর্ব্বস্তরের অনু-পরমাণুকে জ্যোতির্ম্ময় করে তুলবে ও তোমার দেহ দিব্য জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হবে। সেই সময় এই মহামন্ত্রে তুমি মহাশক্তি লাভ করবে ও নিত্য আমার ভিতর বিহার করবে। তোমার মনের আকুলতা আমি জানি ও তার জন্যে আমার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু ধৈর্য্যহারা হ'য়োনা। জানবে এ যে সাধন করছ তার ফল ফলছেই ও ফলবেই। সাধন করে যাও। ঠিক সময়ে আমি তোমায় সব দেব। চিন্তা কি? আমি তো তোমার গুরু, আচার্য্য। আমি তোমায় শিক্ষা দিচ্ছি। এর চেয়ে ভাগ্য আর কি কিছু আছে? এ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর রেখে সাধন পথে অগ্রসর হও। আরও

নিমগ্ন হও, জপ সাধনে অচিরে তোমার ফল প্রাপ্তি ঘটবে। কোনও শঙ্কা ক'রো না, আমি সর্ব্বদা তোমার কাছে জাগ্রত আছি জানবে।

মা, মা, মা, মা কৃপাময়ী জননী আমাকে তুমি ছেড়োনা। আমি তোমারই।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাকে বললাম এই যে এত কথা সব আমাকে বলছ এ সব কি তোমার কথা না আমার মনের কল্পনা বা চিন্তা? মা বললেন, "তোমার কি সাধ্য আছে এই সব উচ্চ জ্ঞানের কথা চিন্তা বা কল্পনা করার। একদিন ত তোমাকে বলেছি এ সব তুমি আমার বাক্য শ্রবণ করছ। এ সবই আমার বাক্য, তার অনেক প্রমাণ তোমাকে দিয়েছি তোমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে। আমার বাক্য না হ'লে দিনের পর দিন নানা ভাবে নানা কথায় তোমার কাছে যা বলছি সে সব ত অলীক হ'য়ে যেত। এ সব কথা এ সব বাক্য আমার প্রত্যক্ষ সত্য যার দ্বারা আমি তোমাকে সাধনে নিত্য অগ্রসর করাচ্ছি। মনে কখনও সংশয় রেখো না। যদি আমার কথামত কার্য্য কর তবে আমি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠব তোমার কাছে অচিরে। সাধন কর, শ্রবণ কর ও অগ্রসর হও। নির্ভয় হও নিশংসয় হও।"

জয় জয় মা দয়াময়ী—অপার করুণাময়ী—জননী আমার—।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ কলিকাতা।

আজ ক'দিন হোল ধ্যানে যখন বসি তখন মনে হয় আমার মস্তক ও তারপর সর্ব্বদেহ জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে গেছে ও আমার সেই দেহ অতি বৃহৎ হ'য়ে উর্দ্ধে মহাশূন্যে উঠে গেছে। প্রজ্ঞাচক্রের ভিতর দিয়ে একটি জ্যোতির দণ্ড আমার দেহ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধে উঠে যায় ও সেই জ্যোতির দণ্ড একটি আলোকের অপরূপ পারাবারে স্থিত হয়। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ আবার কি? মা বললেন, "তোমার মহাসাধন হ'চ্ছে। যে ভাবে তুমি দ্রুত সাধন করে যাচ্ছ তাতে কখন যে তোমার সিদ্ধি হবে কিছু ঠিক নাই। যে সময়

তোমাকে বলেছি তার আগেই হয়ত আমার বাধ্য হ'য়ে তোমাকে দর্শন দিয়ে সিদ্ধি দান করতে হবে।"

মাকে বললাম সে কি, তুমি স্বেচ্ছায় না এসে, বাধ্য হ'য়ে আসবে —একি কথা! মা বললেন, "হ্যাঁ, এ কথা সত্যি। সাধককে যে টুকু সাধন আমি করতে বলি সে যদি তার চাইতেও কঠোর সাধনা করে তখন তার নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্তির অনেক পূর্ব্বেই আমাকে বাধ্য হ'য়ে দর্শন দিয়ে তাকে সিদ্ধ করতে হয়। মানবকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি ও তার ভিতরে যে শক্তি আছে তাতে সে আমাকে স্বর্গ চ্যুত করতে পারে"। সেকি কথা! তোমাকে স্বর্গচ্যুত কি করে মানব করবে? মা বললেন, "দেখ, যে সাধক মহা সাধন করে তার অন্তর মহাশক্তি লাভ করে ও সেই অনাবিল অন্তরই স্বর্গে পরিণত হয়। আমার স্থিতি তখন সেই অন্তররূপ স্বর্গে হয়। আমি স্বর্গ বলে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকি না। যেখানে অনাবিল প্রেম, ভক্তি, নিষ্ঠা, দয়া, বিশ্বাস, নির্ভর থাকে সেই স্থান আমার ও সেই স্থান যখন আমার আবাস হয় তাই স্বর্গে পরিণত হয়। স্বর্গচ্যুত অর্থে আমার ভূমা মহান্ ব্যাপ্তির স্থানে থেকেও আমি সাধকের অন্তর রাজ্যেও স্থান করে নিই। আমি মহান ব্যাপ্তি বলে লক্ষ কোটি সাধক এক সঙ্গে তাঁদের স্ব স্ব অন্তরে আমাকে প্রতিভাত দেখে। এ আমার "**অপূর্ব্ব-প্রকাশ**"। আমি স্বপ্রকাশ বলেই অনন্ত ব্যাপ্তিতেই আমি সচলমান। সাধক ভক্ত যোগেই আমি ব্যাপ্তিতে স্বপ্রকাশ।" দেখলাম একটি জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী নেমে আসছেন। মহাশূন্য থেকে সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত করে নেমে আসছেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমার হাতে একটি জ্যোতির তরবারি দিলেন। আমাকে বললেন," আজ থেকে তুমি আমার সেনাপতি। এই বিশ্বে মহা-মোহরূপ মহিষাসুর সকল জনগণের অন্তরকে মথিত, পদ দলিত করে নীতি, ধর্ম্ম, পরজ্ঞান, বিশ্বাস, নির্ভর, দয়া, ভক্তি, প্রেমকে মানব অন্তর থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছে। এই মোহরূপ মহা-পাপ মহিষাসুরকে তোমার এই "দিব্য ভক্তিরূপ" তরবারি দ্বারা নিপাত কর। তোমাকে আমি

মহাশক্তি প্রদান করলাম। এ আমার কার্য্য জানবে, আমিই করছি তুমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। শঙ্কা করো না। জয় তোমার সুনিশ্চিত। জানবে মহিষাসুর বলে তেমন কোনও কায়িক অসুরকে তোমাদের কল্পিত দুর্গামূর্ত্তি ধরে আমি কখনও নিধন করি নাই। মহাগ্লানি যখন যে সময় এই বিশ্বে নেমে এসেছে সেই সময়ই আমার দুর্গতি নাশিনীরূপ মহাসাধকের অন্তরে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে ও সেই সাধকের ভিতরে থেকে আমি সেই মহাগ্লানিরূপ মহিষাসুরকে নিধন করেছি। অসুরের ভিতরে মহিষাসুর ভীষণতম অসুর যদি হয় তার সঙ্গে মহাগ্লানিরূপ মোহকেই তুলনা করা চলে। এই মহাগ্লানি যখন নেমে আসে সে তখন ভীমনাদে মহিষাসুরের মত সকল মানবকে তার পরাক্রমে স্তব্ধ ও পরাজিত করে—ও মানব তখন নিঃস্ব হ'য়ে যায়। এই সময়ে দেব-ভাব-গ্রস্থ যে সকল সাধক ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন তাঁরা আকুল প্রার্থনা করেন আমার কাছে যাতে এই মহা-মোহগ্লানি অচিরে অপনোদন হয়। তখনই আমি আমার মাধ্যম খুঁজে তার ভিতর দিয়ে মহাশক্তির লীলা প্রকট করি ও মানবের মোহকে শুদ্ধ করে আবার প্রজ্ঞার আলোক বিতরণ করি। শ্রীচণ্ডীর আখ্যায়িকা রূপক হ'লেও শাশ্বত ভাবেরই দিব্য প্রেরণা প্রদান করাই তার উদ্দেশ্য। এই রূপকের অন্তর্নিহিত অর্থ একমাত্র সাধকগণ উপলব্ধি করতে পারেন। সাধারণ মানবগণ সেই রূপককে গ্রহণ ক'রে আয়োজন ও অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে আমার এই রূপক মূর্ত্তির পূজা করছে। কিন্তু জ্ঞান আহরণ করছে না। নিজ নিজ মোহদ্বারা মোহান্ধ হ'য়ে যে অনুষ্ঠান করছে তাতে তাদের মোহদূর হ'চ্ছে না। মোহ গ্রস্থ হ'য়ে যে রূপককে আজ পূজা করে মোহমুক্ত হ'চ্ছে না, মোহ অপনোদন হ'লে সেই রূপকপূজা মহাশক্তির পূজা হ'য়ে দাঁড়াবে ও প্রতি আত্মায় মহা-প্রেরণা, মহাভক্তি ও মহাজ্ঞান বিকশিত হবে। মহাবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হও। জয় তোমার সুনিশ্চিত। আমি তোমার সহায় — ।"

জয় মা আনন্দময়ী - মা দুর্গা দুর্গতি নাশিনী

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ; কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে কি হয়? "ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে সাধন পথ দৃষ্টির সামনে খুলে যায়। আমি কে, আমার কি কার্য্য, কি আমার লীলা, কি ভাবে আমাকে লাভ করা যায়, কোন পথে গেলে আমাকে পাওয়া যায় এই প্রকার সব জ্ঞানের বিকাশ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান আমাকে পাওয়ার পথ নির্দ্দেশ দিতে পারে। কিন্তু আমাকে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে ভক্তির অনুলেপনে আমাকে লাভ করা যায়। যেমন মধু আহরণ যারা করতে যায় তারা আগে খোঁজ নেয় কোথায় মৌচাক আছে, তাতে মধু আছে কিনা, গাছের কোন দিক দিয়ে উঠতে হবে ও কোন দিক থেকে মৌচাক কাটতে হবে ইত্যাদি সব খোঁজ নিয়ে গায়ে এক প্রকার তেল মেখে তবে মৌচাক কাটতে যায়। সেই তেল গায়ে থাকাতে তার গন্ধে মৌমাছি তাকে কামড়াতে পারে না। তারপর মৌচাক পেড়ে নিয়ে মধু বার করে নিজে খেয়ে তৃপ্তি পায়; বিক্রি করে বা দান করে। যারা নেয় তারাও আনন্দ পায় খেয়ে। যারা খেয়ে আনন্দ পায় তারা কিন্তু ভাবে না কি ক'রে মৌচাক পাড়া হ'ল। তেমনি ভক্তিরূপ তেল তনু, মন, আত্মায় অনুলেপন ক'রে 'আমা'-রূপ অমৃত মধু ভক্ত আহরণ করে। এই অমৃত আহরণ করবার আগে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন দ্বারা আমাকে আহরণ করবার পথ স্থির করে নেয়। ভক্তিরূপ তেল অনুলেপন করলে বিষয়রূপ অসংখ্য মক্ষিকাগণ আর ভক্তকে দংশন করতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান ভক্তির বাহন। ব্রহ্মজ্ঞান না হ'লে পূর্ণদৃষ্টি হয় না ও সংশয় যায় না। ব্রহ্মজ্ঞানের পরে ভক্তিতেই আমি লভ্য। যার ব্রহ্মজ্ঞান নাই তার শুদ্ধা ভক্তি যদি থাকে তবে আমাকে লাভ করতে পারে ও আমাকে লাভ করলে তার অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়।"

মা আমার অপার জ্ঞান দায়িনী - জননী।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা এই সংসারে কত কত মহান্ আত্মা

কত শত সৎকর্ম্ম করে গেছেন, জগতের জনগণের জন্য কত প্রাণ পাত করে গেছেন, তাঁদের মৃত্যুর সঙ্গেই তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত হ'য়ে যান কেন? তাঁদের আর দেখা যায় না ও তাঁরা আর এই জগতের জন্য কিছুই করেন না কেন? মা বললেন, "তোমার এই ধারণা ভুল। স্থূল জগত, সূক্ষ্ম জগত, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম জগত আছে। দেহান্তে জীব আত্মা সূক্ষ্ম হন ও সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করেন। তিনি সূক্ষ্ম বলেই স্থূলের সঙ্গে ওতপ্রোত হ'য়ে থাকতে পারেন। স্থূলতা বা বিষয় লোভ যাদের থাকে সেই সব আত্মা স্থূল জগতে নিয়ত সঞ্চরণশীল হ'য়ে থাকেন। এই স্থূল জগতে প্রতি নিয়ত বহু কার্য্য সম্পাদিত হ'চ্ছে যে সব সেই সূক্ষ্ম আত্মার কার্য্য। এই সব অনেক সময় লোক চক্ষের দৃষ্টিতে এসে পড়লে তারা ভৌতিক ব্যাপার বলে ভীত হয়। সেই জন্যেই আমার বিধানে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতকে আমি তাদের স্বীয় গণ্ডির ভিতরে রেখেছি। সূক্ষ্ম স্থূলকে দেখবে জানবে, নিত্য স্থূল জগতে বিচরণ করতে পারবে। কিন্তু স্থূল যে সে সূক্ষ্মকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখতে পাবেনা। স্থূল যদিও সূক্ষ্মের দ্বারাই গঠিত তবুও স্থূলত্ব চলে যাওয়ার যে ভীতি তার আছে সেটাকে মৃত্যু ভয় বলে। সেইজন্যে সাধারণ স্তরের জীবগণ সূক্ষত্বকে গ্রহণ করতে ভয় পায় ও তাকে উপলব্ধি করতে পারে না। কত মহান আত্মা এখনও এই স্থূল জগতের কত উপকার করছেন সূক্ষ্মরূপে তা তোমরা জান না। কিন্তু স্থূলরূপে সে কার্য্য হয় না বলে তোমরা বুঝতে পার না। মহাশক্তিশালী সাধক আত্মা কত অলৌকিক কার্য্য, কত মহা-উপকার করেন ও কত মহাধ্বংস থেকে জনগণকে রক্ষা করেন তা' তোমরা একেবারেই জান না। তাঁদের সঙ্গে তোমার নিত্য যোগ হয়। কিন্তু স্থূলতা থাকার জন্যে তোমাদের পক্ষে সে সব উপলব্ধি করা সহজ না। কেবল শক্তিশালী সাধুভক্তগণ, যোগী পুরুষগণ সূক্ষ্ম আত্মাগণের সান্নিধ্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন। এ তাঁদের পক্ষে সম্ভব কারণ তাঁরা "আমি" যে সূক্ষ্মতম সেই "আমি"কে যখন তাঁরা প্রাপ্ত হন তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম সব তাঁদের কাছে দৃষ্টি গোচর হয়। আমি সূক্ষ্মতম বলে যেমন আমার

ইচ্ছামত ত্রিভুবন চালিত হয় তেমনি আমার ক্ষুদ্রতম অংশ হ'লেও মানব আত্মা কর্ম্ম ফল জাত বিষয় ইচ্ছায় আবার স্থূল দেহ ধারণ করতে পারে। তার দেহ ধারণের ইচ্ছা হয় কর্ম্মফলের দ্বারা ও সেই ইচ্ছা হ'লেই আমার ইচ্ছায় তার দেহ ধারণ হয়। অনেক মহাসাধু যেমন ইচ্ছা মৃত্যু গ্রহণ করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারেন তেমনি তাঁরা ইচ্ছা জন্ম লাভ করতে পারেন। সে ক্ষমতা তাঁরা আমার সাধনেই লাভ করেন। এই স্থূলজীব দেখছ, এরা কেউ স্থূল নয়। এদের সূক্ষ্মতাই হ'চ্ছে শাশ্বত ও সত্য। সূক্ষ্মকে ঢেকে রাখে ও রাখছে স্থূলতমা এই স্থূলতার প্রয়োজন অতি বিশেষ। স্থূলের সঙ্ঘাত অতি গভীর। সেইজন্যে সাধনের উদ্দেশে স্থূল দেহ ধারণ হয়। দেহ ধারণে যে সাধন হয় সে সাধন গভীর ও আত্মা সেটা গ্রহণ ক'রে ক্রমে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর লোকে গমন করবার ক্ষমতা লাভ করে। এই দেহেই সূক্ষ্মতমের সাধন হয়। কোনও উচ্চ সাধককে জিজ্ঞাসা করো যোগে তিনি কি করেন, কোথায় যান। তিনি বলবেন "আমি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতরকে দেখতে পাই ও সেই লোকে গমন করি।" একমাত্র সাধন দ্বারাই এই সত্য উপলব্ধি হয় ও পরিশেষে সাধক "আমারূপ" মহাসূক্ষ্মতম সত্ত্বাকে জানতে পারে। স্থূলকে সূক্ষ্ম দিয়ে ঘিরে রেখেছি। এ-কথা যে মানব জানতে পারে তার আত্মজ্ঞান হয় ও ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়। শরীরের মধ্যে মনকে কি উপেক্ষা করতে পার? ইচ্ছাকে কি উপেক্ষা করতে পার? এদের শক্তি তোমার দেহের চাইতে লক্ষগুণ বেশী। প্রাণ শক্তি যদি দেহে না থাকে তবে দেহও অসার। তবে সূক্ষ্মকে তোমরা ভয় পাবে কেন? সূক্ষ্ম সত্ত্বাতেই এই ব্রহ্মাণ্ড জীবিত ও তাই স্থূলতাকে রক্ষা করছে। সুতরাং মনে রাখবে কোনও জীবের আত্মাই মৃত্যুর সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। মানব আত্মা ত মৃত্যুর পরে অত্যন্ত বলশালী ও সচলমান হয়। মহাসাধক আত্মা সর্ব্বত্র বিচরণশীল থাকেন। তবে তেমন সাধক না হ'লে আমার সূক্ষ্মতম লোকে বিচরণ করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারে না। যার যে টুকু ক্ষমতা পৃথিবীতে লাভ হয় সাধনের দ্বারা তার ততটুকু সূক্ষ্ম জগতে বিচরণ করবার ক্ষমতা লাভ হয়—। তাঁরা সব

সময় স্থূল জগতে নানা ভাবে তোমাদের সঙ্গে যোগ রাখেন—এ মহাসত্য বলে জানবে। পরে আরও বলব।"

মা আমার জ্ঞানদায়িনী জননী

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

গত কাল কাঁপাতে মাতৃদর্শনে গিয়েছিলাম। ময়না, বাবুল, পুতুল, রাহুল টুনি ও মালাকে নিয়ে গাড়ী করে যাই। মার স্নেহস্পর্শ পেয়ে জীবন ধন্য হোল। নানা রকম আহার্য্য প্রস্তুত করে খাওয়ালেন। সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ বাইরে বসে ধ্যান ও জপ করলাম। তারপর মশার কামড়ে বিব্রত হ'য়ে ঘরে গিয়ে জানালার ধারে বসে ধ্যান ও জপ করছি। আস্তে আস্তে অতিন্দ্রিয় লোকে বিশাল আলোকের রাজ্যে গিয়ে পৌছুলাম। কিছুক্ষণ পরে গোলাকার পূর্ণ চন্দ্রের মত একটি আলোকচক্র দৃষ্টি পথে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে উঠল। কিছুক্ষণ সেইদিকে চেয়ে আছি দেখি অপরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি বালক বেশে আমার দিকে চেয়ে হাস্‌ছেন। চারিদিক্ অপরূপ আলোকে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে গেছে। মূর্ত্তিটির পরিধানে নীলাভ রংয়ের অতি সুন্দর জামা ও কাপড়, গলায় শ্বেত পুষ্পের মালা আজানুলম্বিত, স্মিতহাস্যে মুখমণ্ডল উদ্‌ভাসিত। প্রায় ২।৩ মিনিট এই অলৌকিক দৃশ্য উপভোগ করলাম। তারপর সেই দৃশ্য আস্তে আস্তে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এই দর্শনের পরে আমার মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দ এল। এবার কাঁপাতে এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা হ'ল। এবার যখনই ধ্যানে বসেছি তখনই মন একাগ্র হ'য়েছে ও অনেক অলৌকিক দৃশ্য মানস্ নয়নের সামনে উদিত হ'য়েছে। যেমন, আলোকের উৎস, মহাউজ্জ্বল সমুদ্র, নয়নাভিরাম নানা অপরূপ দৃশ্যপট। আমার মনে হ'ল এখানে মা সাধন করছেন ও তাঁর তপশ্চর্য্যার শক্তি এখানে আমার মনকে স্থিত করেছে ও এসবের ভিতরে মার সাধন ফলই মুখ্যত আমাকে সাহায্য করেছে। এবারও মা বলেন সাধনের অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলা উচিত নয়। তাতে সাধনের বিঘ্ন হয়। আমরা ২রা অক্টোবর কোলকাতায় ফিরে এলাম।

জয় মা জগত জননী মা আমার। আনন্দময়ী জননী। বারে বারে এই গানটি মনে এসেছে "জয় জয় আনন্দময়ী বিশ্ব জননী।"

৮ই অক্টোবর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হ'ল। হঠাৎ মা আমার উপর অবিরাম শ্লেষপূর্ণ বাক্য বর্ষণ করতে লাগলেন। ক'দিন হোল ধ্যান ও যোগাভ্যাস করছি। মনের ভিতরে একটা তীব্র বৈরাগ্যের ভাব এসেছে। কিছুই ভাল লাগে না। সংসার, ব্যবসায়, পরিবার, ইত্যাদির আকর্ষণ ক'মে যাচ্ছে। সবসময় সাধু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য মনে কামনা করছি। কোথাও গিয়ে নির্জ্জনে সাধন ভজন করতে মন আকুল হ'য়ে আছে। সাধুদের জীবনী ও তাঁদের লীলার বই ইত্যাদি পড়তে আকুল আগ্রহ। সত্যি মনটা উদাস ও অনাশক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। শরীরে যোগের নানা সাত্ত্বিক লক্ষণ ও চিহ্ন সকল পরিস্ফুট হ'চ্ছে দেখছি। আমার মনে একটু যে অহমিকা না হয়েছে তা নয়। মা হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কারখানায় যাও না কেন?" আমি বললাম ভাল লাগে না, এই কারখানার জন্যে এত প্রাণপাত পরিশ্রম করলাম ও এরই জন্যে শেষ পর্য্যন্ত ঋণগ্রস্থ হ'লাম। এ সব আর ভাল লাগছে না। মা বললেন, "তুমি ভেবেছ, তুমি একটি মস্ত সাধু হ'য়েছ, না? কিন্তু তুমি কিছুই হও নাই। তুমি ভেবেছ এ সব সংসারের কর্ত্তব্য ছেড়ে দিয়ে তুমি সন্ন্যাসী হ'য়ে সাধন করবে, না? কিন্তু তোমার সে পথ বন্ধ। তোমার পথ হ'চ্ছে সংসারের, ব্যবসায় শত কর্ত্তব্যের ভিতরে থেকে আমাকে পূর্ণ ভাবে লাভ। আজকাল জগতের মানব সমাজকে শিক্ষা দিতে হ'লে এই ভাবে সিদ্ধ হ'তে হবে তবে লোকে তোমাকে গ্রহণ করবে। আজ থেকেই তোমার কারখানায় যেতে হবে। তোমার অর্থ প্রয়োজন, তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্ম করবে না আর আমাকে বলবে মা অর্থ দাও। এ তোমার কেমন সাধন? আমি তোমাকে যে নব পদ্ধতি ও নব ধারায় সাধন পথে নিয়ে যাচ্ছি এতে ত' তুমি সেই পথ থেকে বিচ্যুত হ'তে চলেছ। তোমাকে বলেছি কারখানা থেকে তোমার প্রচুর অর্থ প্রাপ্তি ও বিরাট

সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু একে তুমি পরিত্যাগ করছ, অবহেলা করছ। একি আমাকে অবহেলা না, আমার বাক্যের প্রতি অবিশ্বাস নয়? সংসারেই তোমাকে থাকতে হবে জানবে ও এই তোমার শ্রেষ্ঠতম সাধন ক্ষেত্র। এইখানেই তোমার মহা ঋদ্ধি, সিদ্ধি হবে ও লোক কল্যাণে তোমার সেই দান মহাফল প্রসব করবে। প্রতটি কর্ত্তব্য তোমাকে পালন করতেই হবে। আবার ওঠ, জাগ্রত হও, শক্তি সঞ্চয় কর ও আবার তোমার কারখানার জন্য সকল কর্ত্তব্য পালন কর। তোমার সাফল্যের সময় নিকটবর্ত্তী।" আমি বললাম আজ থেকে নয়, সোমবার থেকে রোজ কারখানায় যাব। তোমার বাক্য প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। মাগো তোমার কথার আর অবাধ্য হব না মা, আমাকে ক্ষমা কর মা, আমার অহমিকা এসেছে মা, মাগো আমাকে দিয়ে সকল কাজ তুই কানে ধ'রে করিয়ে নে মা। মা বললেন, "চৈতন্যদেবের মতন হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ করে একেবারে আমার জন্যে উন্মাদ হ'য়ে যদি আমার একান্ত হও তাতে তোমার কি হবে? তাতে তুমি আমার কৃপা লাভ করবে, আমার সান্নিধ্য লাভ করবে। কিন্তু তোমার সাধনত পূর্ণাঙ্গ সাধন হবে না। চৈতন্যের সেই উন্মত্ততা সত্যই আমার প্রতি মহাপ্রেমের মহাভাব। তাতে আমার শ্রেষ্ঠতম করুণালাভ হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাধন পূর্ণাঙ্গ হয় নাই। আবার তাঁকে দেহ ধারণ করে সংসারে পূর্ণ সংসার ধর্ম্ম পালন করে তাঁর সাধনকে পূর্ণ করতে হবে। তোমাদের শরীরে লিঙ্গ দিয়েছি, রিপু দিয়েছি আমি তাদের জন্যে দেহ দান করেছি। দেহের কর্ত্তব্য তুমি করবে না। তবে তোমাকে দেহ দিলাম কেন? শুধু কি কর্ম্মক্ষয় করবার জন্যে দেহ দিয়েছি? না।

তোমার জন্ম যদি তোমার পিতার দ্বারা ও মাতার গর্ভে তবে তুমি, তোমার ভিতরে যে পিতৃত্ব দিয়েছি তাকে কোন্ সাহসে উপেক্ষা করবে, আমাকে বল? যদি কর সেটা ঘোর অনাচার ও আমার প্রতি অবিশ্বাস।

বশিষ্ঠ শত পুত্রের পিতা হ'য়েও যদি আমার একজন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত, শিব পূর্ণ সংসারধর্ম্ম ক'রে, পুত্র কন্যার জন্ম দিয়েও যদি আমার একজন শ্রেষ্ঠতম ভক্ত হ'তে পারেন, তবে তোমার সংসারকে উপেক্ষা করে, তাকে ঘৃণা ক'রে তাকে অবহেলা ক'রে সাধন ক'রতে চাও একি তোমার মোহ নয়? অভুক্ত, অনাহারী, বেদনায় ক্লিষ্ট মাতাকে নিজ ঘরে উপেক্ষা করে দেশ মাতৃকার উদ্ধারের প্রয়াস যেমন ঘৃণ্য কপটাচার তেমনি সংসারের সকল কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করে, দেহের প্রতিটি আমা প্রদত্ত শক্তিকে উপেক্ষা করে সন্ন্যাস নিয়ে আমার সাধনা তেমনি কপটাচার। সন্ন্যাস তোমার মনে হবে; দেহের কর্ত্তব্যে, সংসারের কর্ত্তব্যে তোমার সন্ন্যাস কেন হবে? তাই যদি তোমার ইচ্ছা, তবে আমার সংসার সৃজনের কি প্রয়োজন ছিল? সে হবে না। এতদিন যে ভুল পথে মানব চ'লে এসেছে সে পথ পরিবর্ত্তন করতে হবে। সন্ন্যাসের পথে আমাকে লাভ হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় কিন্তু পূর্ণতম সাধন হবে না। সংসারের কর্ত্তব্য যা তার করণীয় ছিল সে গুলো না করে দেহপাত হ'লে আবার সংসারে দেহ ধারণ অবশ্যম্ভাবী, তা সে যত বড়ই সাধক হোক না কেন। তোমাকে ত' দেখিয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস আত্মিক লোকে স্ত্রীর সঙ্গে বসে সাধন করছেন। তাঁরও আবার দেহ ধারণ করতে হবে ও সেই স্ত্রীই তাঁর স্ত্রী হবেন। কারণ আমার প্রতি কর্ত্তব্য যেটুকু সেটুকু তুমি যতটুকু করলে তার জন্যে তোমার ঋদ্ধি সিদ্ধি হ'ল। কিন্তু যেটুকু করলে না তার জন্যে তোমার ক্ষমা নাই। আমার নিয়মে ব্যাতিক্রম নাই। সংসারই তোমার শ্রেষ্ঠতম সাধন ক্ষেত্র। এখানেই তোমাকে সকল কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে পালন করে আমাকে লাভ করে সাধন পূর্ণতম করতে হবে। মানব সমাজে শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও অনুপ্রেরণা আনতে হবে। সংসার অর্থেই মানব সমাজ আর মানব সমাজ অর্থেই সংসার ও আমার শ্রেষ্ঠতম লীলা ক্ষেত্র। একটিও জীবের এর হাত থেকে পরিত্রাণ নাই। তাকে সংসারের সকল কর্ত্তব্য পালন করতেই হবে। তোমার সংসার কেন মনে কর? মনে করবে আমার সংসার। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-অনাত্মীয়

সকলে একযোগে আমি। সকল কর্ম্ম আমাময়—। সংসার করবে আমার দ্বারা প্রেরিত হ'য়ে আমার নির্দ্দেশিত কর্ম্মকে কর্ত্তব্য মনে করে। কিছুতেই মোহ-গ্রস্থ হবে না। সর্ব্বসময় আমার প্রতি লক্ষ্য রেখে কর্ত্তব্য করবে। তবেই তোমার সাধন পূর্ণতম হবে। তবে শোন সংসারের কর্ম্মে নিজের সত্ত্বাকে "অবলুপ্ত ক'রো না। নিজেকে অবলিপ্ত কর তাতে ক্ষতি নাই। আমাতে "অবলুপ্ত" হ'য়ে সংসারে অবলিপ্ত হ'লে ক্ষতি নাই। তখন তোমার ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান হবে। আমার প্রতি মন থাকবে, হাত, পা, শরীর, সংসার করবে আমার নির্দ্দেশে। তখন সকল কর্ম্ম তোমার কাছে সহজ হবে। **বিবেক তোমার ধর্ম্ম, সংসার তোমার ক্ষেত্র, দেহ তোমার আধার, আমার নির্দ্দেশ তোমার ধর্ম্মাচরণ**। এই হোল প্রকৃষ্ট পন্থা। সহজ, সরল ও স্বাভাবিক বেগে চলবে, স্বভাব ছেড়ে, নিজ ধর্ম্ম ছেড়ে চলবেনা। তাতে সাধন পূর্ণতম হবে না। এখন থেকে রোজ কারখানায় যাও ও সেখানকার কাজ কর। অভাব, অভিযোগ শোন, চেষ্টা কর উন্নতির। সব আমাময় দেখ। যে কর্ত্তব্য তোমার উপর দিয়েছি তা সম্পূর্ণ কর। নিষ্ফলতা কেন আসবে? একাগ্র হও ও আমার কর্ত্তব্য মনে ক'রে কর সফল তুমি হবেই। ঋণের জন্যে চিন্তা করো না। মুক্ত তুমি অচিরে হবে ঋণ থেকে। সাধন কর। আমার প্রতি, আমার বাক্যের প্রতি ও আমার নির্দ্দেশের প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমার সিদ্ধি নিকটবর্ত্তী"।

মা মা আনন্দময়ী মা জননী দুর্গা মা আমার।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বলেন, "দেখ পৃথিবীতে জনগণ আজ মোহগ্রস্থ। স্থূলতা বা জড়তাকেই তারা আজ উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা বলে স্থির করেছে। আত্মিক দৃষ্টি নিরুদ্ধ হ'য়েছে। এই মোহদৃষ্টি যে হঠাৎ হ'য়েছে বা অল্প কয়েক বৎসরে হ'য়েছে তা নয়। শত শত যুগ ধরে আস্তে আস্তে জনসাধারণের ভিতরে এই মোহদৃষ্টি অঙ্কুরিত হ'য়ে আজ সেটা মহা-মোহরূপে সমগ্র মানব জাতিকে

অধিকার করে বসেছে। আজ জড় বিজ্ঞানের কৃতিত্ব মানব সমাজের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ও মানব জীবনের উন্নততম উন্নতির বিধান হ'য়েছে। এই জড়ত্বের ধারা এমন ধীরে মানব মনকে গ্রাস করেছে যে এ ধারাকে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। স্বাভাবিক ধারা হল মানব মনের বিকাশের মধ্য দিয়ে আত্মিক চৈতন্য সম্পাদন। এ চৈতন্য সম্পাদনে আত্মার দৃষ্টিতে আত্মপর ভেদ বিলুপ্ত হয়। প্রেমই তখন জাগ্রত সত্ত্বা নিয়ে মানব রাজ্যে বিচরণ করে। এ অবস্থায় বিভেদ ভুলে গিয়ে, আপন গৌরব, আপন পৌরুষ ভুলে গিয়ে বিশ্ব মৈত্রী মানব অন্তরে জাগ্রত হয়। মোহ নিদ্রা বহুবার মানব সমাজকে জরাগ্রস্থ করেছে। তখন আত্মিক প্রজ্ঞা নিয়ে মহা-মানবগণ এই মোহ নিদ্রা ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সাময়িক কৃতকার্য্য যে না হ'য়েছেন তা নয়। কিন্তু দেহ এত স্থূল যে মানব সমাজ গ্রহণ বর্জ্জনের ভিতরে বর্জ্জনটাই বেশী করেছে। গ্রহণ যা করেছে সেটা পোষাকী গোছের। অন্তরে আছে থাক। ভাল কথা পুস্তকে আছে পড়ি কিন্তু দুটো অসদাচরণ করে বা দুটো মিথ্যা কথা বলে যদি কিছু অর্থাগম হয় তাতে ক্ষতি কি? এই অভ্যাস লোক পরম্পরায়, বংশ পরম্পরায় ও যুগ পরম্পরায় মানব সমাজে মূলগত হ'য়ে আত্মার মহাশক্তিকে খর্ব্ব করেছে, বিবেককে ধ্বংস করেছে, প্রেমকে সীমাবদ্ধ করেছে নিজ নিজ গণ্ডিতে ও সমাজের মহাধ্বংস ডেকে এনেছে। তোমাকে কিছুদিন আগে একটা নির্দ্দেশ দিয়েছিলাম কিন্তু সেটা তুমি তখন উপলব্ধি করতে পার নাই। আজ সেটা তোমাকে বলছি। একদিন তোমার শোবার ঘরের একটা জানালা বন্ধ দেখে তুমি তোমার মেয়েকে বলেছিলে ওটা বন্ধ কেন। সে তার উত্তরে বলেছিলো যে ওই জানলার নীচে তার সব পুতুল আছে। রৌদ্রে বা বৃষ্টিতে তাদের কষ্ট হয় বলে সে ঐ জানালা বন্ধ রেখেছে। ভেবে দেখ সে তার পুতুল গুলোকে মাটির বা প্লাষ্টিকের জেনেও সেগুলোকে সে জীবন্তরূপেই দেখে ও তাদের সুখ সুবিধার জন্যে অনেক কিছু করে। সেই রকম আজ যে মানব সমাজের মোহ সে ঠিক ওই রকম অবস্থা। যেটা অধিকার করে আছে সেইটাই

আসল ও সেইটাই মুখ্য। কিন্তু যে সেটাকে অধিকার করে আছে সে আজ গৌণ অনাদৃত উপেক্ষিত ও সম্পূর্ণ অবহেলিত। এ অবস্থার বিমোচন প্রয়োজন—ও অতি সত্বর। তা না হলে মানব কুল ধ্বংশ হ'য়ে যাবে। একেই আসুরিক শক্তি বলে ও এই মহিষাসুর। এর অবস্থানে দেব শক্তি আজ হীন বীর্য্য হ'য়ে আছে। আত্ম শক্তির জাগরণ ভিন্ন এ অসুরকে পরাস্থ করা সম্ভব হয় না। বিজ্ঞান আজ তোমাদের চন্দ্র তৈরী করছে। মঙ্গল গ্রহে ও অন্যান্য গ্রহে ভ্রমনের স্বপ্নে বিভোর। সকল জীবেরই জড়ত্বের বেষ্টনী আছে। তাকে ভেদ করা সেই জড়ত্বের কার্য্য নয়। কিন্তু এই জড়ের ভিতরে যে মহা-চৈতন্য আছে যাকে জীবচৈতন্য বলে তার বেষ্টনী অসীম। সে সকল গ্রহ উপগ্রহে ভ্রমণ করতে পারে যদি সঙ্কল্প করে। তোমাকে ব্রহ্মাণ্ডের অনেক স্থানে নিয়ে গেছি। ভেবে দেখ মহা শূন্যের অমার্গ মণ্ডলে যে স্তর আছে সেই সপ্তম স্তরেও তুমি গেছ। স্থূল জগত থেকে সে সপ্তম পর্য্যায় স্থাপিত ও সেই স্তর ভেদ কোনও স্থূল পদার্থের কার্য্য নয়। সূক্ষ্মতম আত্মিক যোগ ছাড়া সেই স্তর ভেদ অসম্ভব। জড় বিজ্ঞানের সে ধারণা নাই। সেই অমার্গ মণ্ডল জীব জগতের জড়ত্বের গণ্ডি। আমি কি জানিনা যে মানব এক সময় জড় বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু নিয়ে দর্পে নিজেকে সর্ব্বজয়ী মনে করবে। সেই জন্যেই আমার অমার্গ সৃষ্টি যাতে সে জানবে তার সে সব দর্প সেখানে স্তব্ধ। তখন সে আবার আমার কাছে মস্তক অবনত করবে। আমাকে ও আমার শক্তিকে স্বীকার করতেই হবে। সেইটাই আমার শ্রেষ্ঠতম বিধান। তুমি চিন্তা করো না তোমাকে আমি মহাজ্ঞান দান করব। জগতের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী তোমার বাক্য শুনে স্তব্ধ ও বিস্মিত হ'য়ে যাবে। তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী করব আমারই শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবার জন্যে। অগ্রসর হও। যোগে একনিষ্ঠ হও, সাধন কর"—।

মা আমার অপার জ্ঞানদায়িনী জননী

১৪ই অক্টোবর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "সপ্তম মণ্ডল যেমন :—

ভূমণ্ডল—স্থাবর ভূভাগ।

অবণী মণ্ডল—জলীয় ভূভাগ।

মারুত মণ্ডল—বায়বীয় মণ্ডল—বায়ুর স্তর—।

জ্যোতি র্মণ্ডল—আলোক মণ্ডল—সকল প্রকার জ্যোতির বিকাশ —আলোক।

ব্যোম মণ্ডল—শূন্য মণ্ডল—আকাশ।

ষণ্মার্গ মণ্ডল—ভূমা, আকাশের উর্দ্ধে।

অমার্গ মণ্ডল—লুপ্ত স্তর—ভূমার উর্দ্ধে।

যোগে এই লুপ্ত স্তর ভেদ করে আরও উর্দ্ধ জগতে ব্রহ্ম দর্শন হয়। অমার্গ মণ্ডল পর্য্যন্ত যোগে সবিকল্পতা লাভ হয়। তার উর্দ্ধে পৌছিলে নির্ব্বিকল্পতা লাভ হয়। যোগীকে সবিকল্প সমাধিতে যোগস্থ হ'য়ে অমার্গ মণ্ডলে ঘন ঘন যাতায়াত করতে হবে। এই মার্গের পরিচয় ও এই মার্গে অভ্যস্ত হ'লে তবে নির্ব্বিকল্প থেকে যোগী আবার দেহে ফিরে আসতে পারেন। তা না হ'লে বা সবিকল্পতে অমার্গ সাধনে সিদ্ধ না হ'য়ে যোগী নির্ব্বিকল্পতে উপস্থিত হ'য়ে পড়লে আর দেহে প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারেন না। তুমি যোগ সাধনে খুব ধীর ভাবে—অগ্রসর হও। আমার নির্দ্দেশ প্রতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। এখনও কিছুদিন তোমার পূর্ণ যোগাবস্থা। যে উপলব্ধি ও যে আনন্দ তোমাতে এসেছে তাতে আত্মহারা হ'য়ো না। আস্তে, আস্তে, ধীরে, ধীরে, প্রতি পদক্ষেপে অগ্রসর হবে। আরও বাক্য সংযম, চিন্তা সংযম ও মনঃ সংযম কর। জপ অহর্নিশি করবে। যোগে জপ থাকলে কোনও অঘটন হবে না জানবে। তাই জপকে শ্রেষ্ঠতম ও অচ্ছেদ্য রজ্জু বলে মনে রাখবে। জপ থাকলে আত্মা দেহ ছাড়তে পারবে না। কারণ অমার্গ সাধন তোমার হ'চ্ছে ও হঠাৎ নির্ব্বিকল্পতে চলে যেতে পার। তাই জপকে একেবারে কণ্ঠস্থ কর যাতে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও যেন

জপের ছেদ না হয়। তারপর একবার নির্ব্বিকল্পতে গেলে ও ফিরে এলে তখন মহাশক্তি তোমার হবে। তখন ত্রিকালজ্ঞ হবে। তোমার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হবে। সর্ব্ব চরাচর তোমার দৃষ্টির সামনে খুলে যাবে—। এ অবস্থা বড় আনন্দময় অবস্থা। তখন তোমাতে আমাতে একাত্ম হ'য়ে যাবে। আমি তোমাতে আর তুমি আমাতে একেবারে একাকার সখ্যতা হবে। মহা-প্রেমের ধারা তোমার অন্তরে প্রবাহিত হবে। চিন্তা করো না, ভয় নাই। আমি তোমাকে সাধন শেখাচ্ছি—ঠিক সব পাবে।"

মাগো একি আমায় দিচ্ছিস্? মাগো আমি যে তোর অযোগ্য সন্তান মা

১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

মাগো মণ্ডল সম্বন্ধে যে বলেছিলে সেটা আরও ভাল করে বুঝিয়ে দে মা। মা বলেন, "প্রত্যেক গ্রহ এক একটি মণ্ডলের এক একটি স্তরে আছে। যেমন পৃথিবী আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য্য আছে জ্যোতির্মণ্ডলে, চন্দ্র আছে অবণী মণ্ডলে। এইরকম কোনও গ্রহ মারুত মণ্ডলেও আছে—যেমন মঙ্গল গ্রহ। ব্যোম মণ্ডলেও কোনও কোনও গ্রহ আছে—। সন্মার্গ ও অমার্গ মণ্ডলে কোনও গ্রহ নাই। এই দুই মণ্ডল সকল গ্রহের ঊর্দ্ধবর্ত্তী স্থান। সূর্য্য জ্যোতির্মণ্ডলে আছে সুতরাং তার ভিতরে ভূ-মণ্ডল, অবণী মণ্ডল ও মারুত মণ্ডলও আছে কিন্তু পরোক্ষ ভাবে। অর্থাৎ এদের উপস্থিতি জ্যোতির তুলনায় ক্ষীণতম। সূর্য্যের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে তার থেকে কম শক্তিশালী গ্রহ ও উপগ্রহকে শক্তি দান করা। এ—তার পরিবার। তাকে প্রথম তার আপন মণ্ডল পরিক্রমা করে অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহের মণ্ডল পরিক্রমা করে সেই গ্রহের জ্যোতির্মণ্ডলে আপনার দীপ্তিকে বিকিরণ করতে হয়। তেমনি সে শক্তিশালী কারণ তাকে মাত্র কয়েকটি মণ্ডল পরিক্রমা করতে হয়। চন্দ্র আছে অবণী মণ্ডলে। তার ভিতরে ভূমণ্ডলও আছে পরোক্ষভাবে। তাকে পরিক্রমা করতে হয়, নিজের মারুত মণ্ডল জ্যোতির্মণ্ডল ও

অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে সখ্যতা রাখবার কর্ত্তব্য করতে গিয়ে অন্যান্য গ্রহেরও সেই কয়টি মণ্ডল পরিক্রমা করে তবে সেখানে তার শক্তিকে প্রকাশ করে। এই মণ্ডলের স্থিতিই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরের দূরত্ব নির্ণয় করে। এই যে সব মণ্ডল এই সব মণ্ডলেরও প্রত্যেকের সপ্ত স্তর আছে। ভূমণ্ডলের মধ্যে সপ্ত স্তর যেমন—মৃত্তিকা, জল, খনিজ, ধাতু, প্রস্তর, রসায়ণ ও অগ্নি। অবণী মণ্ডলে যেমন—অব, ধূম্র, মেঘ, কুজ্ঝটিকা, শীতলত্ব, তুষার ও রসায়ণ। বায়ুর ভিতরে সপ্ত রসায়ণের স্তর আছে। জ্যোতির্মণ্ডলের ভিতরে সপ্ত বর্ণের স্তর আছে। ব্যোম মণ্ডলে ও যম্মার্গ মণ্ডলেও সপ্ত স্তর আছে। আবার প্রতি স্তরেও সপ্ত রসায়ণ স্তর আছে। সে সব মহা মহা জ্ঞানের বিষয় এখন তোমার ধারণা হবে না। পরে আরও তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব। এখন শোন, প্রত্যেক স্তরে প্রত্যেকের স্থিতি ও তার সীমাবদ্ধ মণ্ডলে সে তার শক্তির বিকাশ করবে। এরা সব জড় চৈতন্য। এদের চৈতন্য আছে কিন্তু এরা স্থাণুবৎ থেকে সুধু বিকিরণ করে যাবে। এদের ক্ষয় বৃদ্ধি সবই আছে। শুধু এদের নাই কোনও সঞ্চালন ক্রিয়া। সঞ্চালন ক্রিয়া অর্থে গতি আছে কিন্তু জীবের মত নিজের ইচ্ছায় নিজেকে সঞ্চালন করতে পারে না। যেমন পর্ব্বত, যেমন মৃত্তিকা ইত্যাদি। এই জড় চৈতন্য হওয়ার জন্য এদের যতই শীতলত্ব বা উষ্ণত্ব থাক না কেন জীবচৈতন্য প্রত্যেক গ্রহেই আছে। জীবচৈতন্যের এমনই ক্ষমতা যে সে ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহেই থাকতে পারে। তবে সব গ্রহে যে স্থূল দেহ নিয়ে থাকবে তার কোনও অর্থ নাই। অপ্রাকৃত সূক্ষ্মদেহে সে সূর্য্যের ভিতরেও বিচরণ করতে পারে।" আমি বললাম আচ্ছা এই যে সপ্ত মণ্ডল তুমি বললে তার প্রমান কি? এত নাও থাকতে পারে। মা বললেন, "আবার অবিশ্বাস? আমি বলছি যে সব কথা সেগুলোকে কেন অবিশ্বাস কর? তবে তোমাকে তোমার দ্বারাই প্রমান করে দিই। তুমি যখন যোগধ্যানে উপবেশন করে চক্ষু মুদ্রিত কর তুমি কি কি দেখ? তুমি চক্ষু মুদ্রিত করলেই দেখ অন্ধকার —। তারপর পরদার পর

পরদা তোমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যেতে থাকে। তারপর তুমি জ্যোতি দেখ ও সেই জ্যোতির ভিতরে সুনীল ক্ষুদ্র অক্ষি গোলাকা দেখ ও তার ভিতর দিয়ে অনন্ত ভূমায় এসে পড়। তারপর অনেক অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখ। তারপর অনন্ত শূন্য দেখ ও তারপর মহান্ নীলাভ আলোকের রাজ্য দেখ। ভূমণ্ডল সবচেয়ে জড়, তারচেয়ে সূক্ষ্ম অবণী মণ্ডল, তারচেয়ে সূক্ষ্ম মারুত মণ্ডল, তার চেয়ে সূক্ষ্ম জ্যোতি মণ্ডল, তারচেয়ে সূক্ষ্ম ভূমা মণ্ডল, তার চেয়ে সূক্ষ্ম যম্মার্গ মণ্ডল তারচেয়ে সূক্ষ্ম অমার্গ মণ্ডল ও তারচেয়েও সূক্ষ্ম ব্রহ্ম মণ্ডল। আমি অখণ্ড মণ্ডলাকার সূক্ষ্মতম মণ্ডল। অন্ধকার মহা কালের ব্যাপ্ত মণ্ডল ও স্থূলতম ভূমণ্ডলে স্থূলতম-ঘনত্ব নিয়ে বিরাজ করে বলেই প্রথম দর্শন তোমার অন্ধকার। দ্বিতীয় দর্শন তোমার অবনী মণ্ডল ধূম্রজাল ভেদ, তৃতীয় দর্শন তোমার মারুত মণ্ডল আরও একটু পরিষ্কার। চতুর্থ দর্শন তোমার জ্যোতির্মণ্ডল আলোক দর্শন। পঞ্চম দর্শন তোমার ভূমা মণ্ডল—সুনীল অক্ষি গোলাকা দর্শন। ষষ্ট দর্শন তোমার যম্মার্গ মণ্ডল—অপ্রাকৃত দৃশ্য দর্শন। সপ্তম দর্শন তোমার অমার্গ মণ্ডল অনন্ত শূন্য ও স্থিতি তোমার ব্রহ্ম মণ্ডলে বা ব্রহ্ম ভূমায় আনন্দতম লোকে মহান্ নীলাভ আলোকের রাজ্য। এখন বুঝতে পেরেছ? এখন শোন, সূক্ষ্ম যোগশক্তি ভিন্ন উর্দ্ধ মণ্ডল পরিক্রমা করা স্থূল শক্তির কার্য্য নয়। তোমাদের বিজ্ঞান এখন শুধু ভূমণ্ডল পরিক্রমা করছে। সে আরও উর্দ্ধে অবনী মণ্ডল হয়ত পরিক্রমা করবে। তার উর্দ্ধে হয়ত মারুত মণ্ডল ও পরিক্রমা করবে। তার উর্দ্ধে হয়ত জ্যোতির মণ্ডলও পরিক্রমা করবে ও তার উর্দ্ধে ব্যোম মণ্ডলও হয়ত কোনও দিন পরিক্রমা করতে পারবে। কিন্তু তার উর্দ্ধে যম্মার্গ ও অমার্গ মণ্ডল আর সে পরিক্রমা করতে পারবে না। এ তার সধ্যাতীত। কিন্তু যোগ শক্তিতে এ সব পরিক্রমা করা মানবের সাধ্যায়ত্ব এতে সন্দেহ নাই—। প্রত্যেক গ্রহে যেমন সূক্ষ্ম স্থূল হ'য়ে স্থূলতম পদার্থ পরিণত হ'য়েছে তেমনি স্থূলতম পদার্থ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতম হ'য়ে আমার মহাব্যাপ্তিতে বিরাজ করছে। সুতরাং সূক্ষ্মতা দ্বারাই স্থূলতমের সৃষ্টি। আমার দ্বারাই জীবচৈতন্যের

সৃষ্টি। আবার এই জীবচৈতন্যই আমার সূক্ষ্মতমের সখ্যতা লাভ করতে পারে—। জড় পদার্থ বা জড় বিজ্ঞান জড়ত্বকেই শ্রেষ্ঠতম বিকাশ মনে করে। জড়ত্বের কোনও শক্তি নাই। শক্তি সূক্ষ্মত্বের। সূক্ষ্ম আছে বলেই জড়ের শক্তি আছে। অত বড় পর্ব্বতের ভিতরে সূক্ষ্মতম চৈতন্য না থাকলে সে কি করে অত বড় হোত? অশ্বথের বীজের ভিতরে মহা মহিরূহ সূক্ষ্মত্বের প্রতীক। **শক্তির প্রহেলিকা জড়ত্বের অন্তর।** এই প্রহেলিকা না থাকলে জড়তা তার মহা-জড়ত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। এ কয় জন বোঝে বা বুঝবাব চেষ্টা করে? **অহমিকা বা প্রশাসন সৃষ্টির গূহ্যতম রহস্য ভেদ করতে পারে না বা সূক্ষ্মত্বের-সন্ধান পায় না। একমাত্র সরল ও অনাড়ম্বর ভগবদ্ ভক্তিই যোগবলে আমার শ্রেষ্ঠতম সূক্ষ্মত্বকে উপলব্ধি করতে পারে।** মনে রেখ এই মহান্ স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতমের পৃষ্ঠেই বিরাজ করছে ও এর অভিব্যাক্তি সূক্ষ্মের ভিতর থেকেই। বিচার করবে কি? তোমার বিচার করবার ক্ষমতা কোথায়? এক ধূলি কণার ভিতরে সকল বিশ্বের মহাশক্তির সূক্ষ্মতম অংশ আছে সেটা কি তোমরা জান? একটি ধূলিকণার ভিতরে কত শত শত রসায়নের প্রক্রিয়া আছে সে কি তোমরা জান? তবে তোমাদের এ অহঙ্কার কেন? কি তোমরা জান? কি তোমরা পেয়েছ? জ্ঞানই বল আর বিজ্ঞানই বল—ক্ষুদ্রতম একটি ধূলি কণার মর্ম্মার্থও যদি তোমরা উদ্ধার করতে না পেরে থাক তবে তোমাদের জ্ঞানের বা বিজ্ঞানের কি অর্থ আছে? মনে করলে যোগধ্যানে আমাকে উপলব্ধি করতে পারলে ও অহঙ্কারে টলমল করলে যে তুমি ব্রহ্মজ্ঞ হ'য়েছ। কিন্তু ভেবে দেখ কোটি কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা ছেড়ে দিলাম একটা ধূলি কণার বিষয় জ্ঞানও যদি তোমাদের না থাকে তবে ব্রহ্মজ্ঞ বলে এত অহঙ্কার কেন? তাই ও দিকে যেতে চেষ্টা করো না। মনে প্রানে আমার একান্ত শরণাপন্ন হও ও আমাকে যেটুকু জানতে পারলে তাতেই শান্তি পাবে। সকল অহঙ্কার সকল বিচার বুদ্ধি ও সকল অহমিকা পরিত্যাগ করে নিজেকে ধূলি কণার থেকে ক্ষুদ্রতম ও অজ্ঞান মনে করে আমাকে

ভজনা কর। **আমার শক্তি অহঙ্কারীর ভিতরে প্রকাশ পায় না ও প্রবেশ করে না।** পূর্ণ নিরহঙ্কারী হ'য়ে আমার একান্ত সেবক হ'য়ে আমার একান্ত শরণাপন্নতাই তোমার প্রাপ্যের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান লাভের শ্রেষ্ঠতম পথ। এই পথে তোমার পরিক্রমা। এই পথে জগতের জনগণকে দীক্ষা দিতে হবে তোমাকে। আমার এই নির্দ্দেশ কখনও মিথ্যা হবে না। তোমাকে এ কার্য্য করতেই হবে। অগ্রসর হও। যোগে, ধ্যানে, মননে, চিন্তনে, শ্রবনে, কার্য্যে আমাকে একান্ত কর। তোমার মহাসিদ্ধি নিকটবর্ত্তী। তোমাকে শিঘ্রই প্রকট করব জগত জনের মহা মঙ্গলের জন্য। ভয় নাই আমি আছি।"

জয় মা আনন্দময়ী জগত জননী অপার জ্ঞান দায়িনী মা আমার।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৫৭ খৃঃ. কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "দেখ মুখ থেকে যে থুতু ফেল সেও বিষ্টা আর গুহ্যদ্বার দিয়ে যা নির্গত হয় সেও বিষ্টা। গুহ্যদ্বার দিয়ে যে বিষ্টা নির্গত হয় তার গন্ধ তোমরা পাও ও সেটা তোমাদের কাছে দুর্গন্ধ মনে হয়। সেই জন্যেই তাকে অপবিত্র জ্ঞান কর। কিন্তু মুখ থেকে যে বিষ্টা যত্র তত্র ফেল তার গন্ধ তোমরা পাওনা ও সেটা মুখ থেকে নির্গত বলে অপবিত্র মনে করনা। তোমরা হয়ত জাননা যে রোগের জীবাণু জীবের শরীরের ভিতরে প্রথমে মুখেই আশ্রয় গ্রহণ করে। মুখের লালা, থুতু, কফ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার রোগের জীবাণু বহন করে। এই জীবাণু রাস্তা ঘাটে তোমরা ছড়িয়ে দাও তোমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ। কিন্তু গুহ্যদ্বার থেকে যে বিষ্টা নির্গত হয় তার এমন শক্তি যে সে রোগের জীবাণুকে নষ্ট করে দেয়। মহাকুষ্ট রোগী যদি তার নিজ গুহ্যদ্বার থেকে নির্গত বিষ্টা আপন শরীরে লেপন করতে পারে তবে সে সম্পূর্ণ নিরাময় হবে। দাদ নিরাময় হবে যদি নিজের প্রস্রাব নিজ দেহে লেপন করতে পারে। ব্রণ নিরাময় হবে নিজের নাকের কফে। জীব শরীরের রোগ সেই শরীরেই নিরাময়ের প্রকৃত ঔষধ আছে কিন্তু যেটা আপন শরীরে উপকারী সেটা অন্যের শরীরে অপকার করতে পারে। তাই বিষ্টা

ত্যাগ মন্ত্র তন্ত্র করতে হয় না এতে অন্যের অকল্যাণ হয়। আজকাল যে এত রোগের প্রাদুর্ভাব এর কারণ হ'চ্ছে একজনের মুখের বিষ্টা আর একজনে গ্রহণ করছে। সেটা খাদ্যের ভিতর দিয়েও হ'তে পারে, বায়ুর ভিতর দিয়েও হ'তে পারে, গন্ধেরদ্বারা, চামচ ইত্যাদি বা বাসন পত্রের ভিতর দিয়েও হ'তে পারে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে সময়ে মহামারী উপস্থিত হ'য়ে বহু লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়বে। এ বিষয় সকলের পূর্ণ অবহিত থাকা নিতান্ত প্রয়োজন"—।

মা আমার প্রেমময়ী জননী।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে বললাম, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধির বিষয় আমার কিছু জ্ঞান লাভ করবার ইচ্ছা হ'য়েছে। মা বললেন, "কল্প হ'চ্ছে 'বিষয়' 'যেমন' 'ধারা' অর্থাৎ স্বভাবের অন্তর্গত। 'স্বভাব বিষয়' 'স্বভাব ধারা' বা 'স্বভাব যেমন'। এই প্রকৃতি জগতে আধ্যাত্মিক মার্গের এক একটি ধারা আছে বা স্তর আছে। সেগুলো স্বাভাবিক। উচ্চাঙ্গের বিষয় সম্ভূত ধারা যা একটা সময় নিরূপন করে তাকেই কল্প বলে। এই ধারার প্রত্যেকটি এক এক কল্প। যেধারা বা গতি তোমার দেহ-সম্ভূত স্বভাবজাত—প্রজ্ঞার অন্তর্গত সেই সবিকল্প। অর্থাৎ তুমি যোগ সাধন করতে করতে একটা অবস্থায় এলে সে অবস্থাটা তোমার দেহ মন ও আত্মার স্বাভাবিক গণ্ডির ভিতরে যতটা উৎকর্ষ লাভ করা দরকার তাই হ'ল। তুমি আপনার গণ্ডির ভিতরে আপনাকে শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষে আনলে সাধনে। সেই সময় তোমার ব্রহ্ম দর্শন হবে ও সমাধি হবে। সেই হ'ল সবিকল্প সমাধি। যোগে 'অমার্গ' সাধনরূপ সবিকল্পের শেষ পর্য্যায় সাধন আছে। যে অমার্গ স্তর তোমাকে আগে বলেছি সেই স্তরের সাধন। এই স্তর-সাধন যতক্ষণ ততক্ষণ সবিকল্প সাধন। একে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ও বলা হয়। তার অর্থ সম-প্রজ্ঞায় আগত। প্রজ্ঞা যা তোমার দেহ মন ও আত্মার সমভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বা যা তোমার পূর্ণ স্বভাবজাত অধিকারের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত তাকেই

সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা বলে। একই কথা। কল্প যা এও তাই। যে ধী তোমার কল্পের ভিতরে বা তোমার প্রজ্ঞার ভিতরে আগত হ'য়ে তোমার স্বভাবের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ আনয়ণ করেছে ব্রহ্ম দর্শনের জন্যে, যার জন্যে তুমি সব ভুলে আত্মস্থ হ'য়ে ব্রহ্ম অবলোকন করছ সেই হোল সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত অমার্গ সাধনে নিবদ্ধ ও তোমার গণ্ডির ভিতরের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ। এই সাধনে দেহ পূর্ণ স্বভাব ধর্ম্মী হয় দেহের লাবণ্য বর্দ্ধিত হয়। দেবভাব জাগ্রত হয়, জড় জগতে শুধু এই ভূলোকের সর্ব্বস্থান যোগদৃষ্টির সামনে খুলে যায়। প্রত্যেক জীবকে স্বরূপে জানতে পারা যায়। ইচ্ছা শক্তির দ্বারা অনেক অসম্ভব কার্য্য সম্ভব করা যায়। দেহ ও মন রিপু মুক্ত হয়। আত্মা স্থিত ও একান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়। ভেদাভেদ দূর হয়। জীব কল্যাণে আত্ম নিবেদন হয়। মানব বিশিষ্ট ভক্তের স্বরূপ লাভ করে। একে সবিকল্প বা সমপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে জানবে। এই সাধন অবস্থায় যদি সমাধি হয় তাকে সবিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। এই পর্য্যন্ত তোমার কার্য্যের অন্তর বা তোমার স্বীয় স্বভাবজাত গণ্ডির ভিতর শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ। এ সাধনও অতি সহজ তার কাছে যে আমার নির্দ্দেশে করতে পারে। না হ'লে ভয়ানক কঠিন ও ভুল পথে গেলে দেহের সমূহ ক্ষতি সাধন হয়। এখন শোন নির্ব্বিকল্প বা অসম্প্রজ্ঞাত সাধন বা সমাধি হোল তোমার ধী-র বাহিরের বস্তু অর্থাৎ তোমার স্বভাজাত গণ্ডির বাহিরের বিষয়। তোমাকে একদিন বলেছিলাম মানবই একমাত্র জীব যে তার গণ্ডিকে চরম সম্প্রসারণ করতে পারে। এই সম্প্রসারণ তোমার এই দেহে, মনে ও আত্মায় হ'তে পারে। কিন্তু তার জন্যে কঠিন সাধন ও আত্মজয় প্রয়োজন। "অমার্গ সাধনে পূর্ণ সিদ্ধ না হলে বা সবিকল্পতে বা সম্প্রজ্ঞাততে পূর্ণ সিদ্ধ না হ'লে অর্থাৎ পূর্ণরূপ আত্মজয় বা পূর্ণ আত্মস্থ না হ'লে নির্ব্বিকল্প সাধন হয় না। এই হ'চ্ছে কল্পান্তর অর্থাৎ সম প্রজ্ঞায় আগতের বাহিরে। তোমার দেহের সঙ্গে আত্মার একটা অতি সূক্ষ্ম যোগ আছে সেটা একরূপ অচ্ছেদ্য। এই যোগসূত্র আছে বলেই দেহ জীবিত ও প্রাণবন্ত ও জীব পূর্ণ স্বভাব ধর্ম্মী। দেহের সঙ্গে আত্মা

পূর্ণ যোগ রেখে সে আমার সন্ধানে মার্গের পর মার্গে সাধনে অগ্রসর হয়। এই সব মার্গে সাধন করতে করতে আত্মা দেহতে আসা যাওয়ার গতি অতি সরল ও স্বাভাবিক করে নেয়। তখন ইচ্ছা মাত্রেই আত্মা দেহ ছেড়ে দূরে যেতে পারে ও আবার ফিরে আসতে পারে। এ কিন্তু তার অভ্যাস বশতঃ হয়। যোগাভ্যাসে এ তার অতি সহজ হয় ও সে অতি সহজে এ কাজ করে। এক পথে যদি একটি লোক বহুবার যাতায়াত করে তবে সে সেই পথে অন্ধকারেও অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে ও তার কোনও কষ্ট হয় না। তেমনি আত্মাও যোগ সাধনে এমনি সহজে এ কাজ করে যায় ইচ্ছামাত্র। নির্ব্বিকল্প হ'চ্ছে 'অমার্গ মণ্ডলের' উর্দ্ধে 'ব্রহ্মমণ্ডলে' প্রবেশ। এ তার জীবত্বের বাহিরের গতি। এখানে স্থূল স্বভাব ও অনভ্যস্থ দেহস্থিত আত্মা একবার প্রবেশ করলে তার দেহ মুক্তি হয় ও সে আত্মা আর তার দেহে ফিরে যেতে পারে না। কিন্তু যে আত্মা "অমার্গ মণ্ডলের" মধ্যে আপনাকে নিত্য অভ্যস্থ করেছে সে অমার্গ মণ্ডল পার হ'য়ে 'ব্রহ্ম মণ্ডলে' প্রবেশ করেও আবার দেহে ফিরে আসতে পারে। এ সাধন তার ইচ্ছা শক্তির সাধন—। অমার্গ মণ্ডল পর্য্যন্ত আত্মা সাধনে দেহস্থিত থাকে অর্থাৎ তার প্রাণক্রিয়া সঞ্জিবিত থাকে। কিন্তু যদি সে অমার্গ মণ্ডল পার হ'য়ে ব্রহ্মমণ্ডলে যায় তখন তার আর প্রাণক্রিয়া থাকে না। আত্মা তখন দেহের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে ফেলে। শুধু অভ্যস্থ যোগীর আত্মা আবার দেহে ফিরে আসতে পারে। এ শুধু আমার্গ সাধনে অত্যন্ত অভ্যস্থ-যোগী ভিন্ন নির্ব্বিকল্প সাধনে কেউ সিদ্ধ হ'তে পারে না। এই নির্ব্বিকল্প সাধনে অনভ্যস্থ যোগীর দেহপাত হয়। আর যদি অভ্যস্থ যোগী হন তবে তাঁর পূর্ণ সমাধি হয় ও তিনি ত্রিকালজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্ম সত্বার গভীর ভাবে নিমগ্ন থাকেন। এ সাধনে মানব শ্রেষ্ঠতম মানব হয়। তাঁর জরা থাকে না, ব্যাধি থাকে না। শোক দুঃখ থাকে না। সর্ব্ব চারচর ব্রহ্মময়, সকল জীব ব্রহ্মময়ও আপনাকে ব্রহ্মময় দেখেন। এ হ'চ্ছে মানবের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। এ বিকাশ অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। পরে তোমাকে আরও উচ্চাঙ্গের যোগাভ্যাসের

কথা বলব। এখন যা বললাম ভাল করে প্রনিধান কর। তুমি খুব ধীর ভাবে অগ্রসর হও। তাড়াতাড়ি করো না। আস্তে আস্তে যোগধ্যান কর। ভক্তি, বিশ্বাস, নির্ভর নিয়ে পূর্ণরূপে অগ্রসর হও। জপ নিরবচ্ছিন্ন করে যাও। তোমার কোনও চিন্তা নাই। আমি আছি ও তোমার সকল ভার আমার হাতে জানবে। অগ্রসর হও। সিদ্ধি নিকটবর্ত্তি।"

জয় মা আনন্দময়ী জয় জননী।

২২শে অক্টোবর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে "মায়াবাদ" সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন আসতেই মা আমাকে অনেক জ্ঞানের কথা বললেন। মা বললেলন, "তোমাকে একদিন বলেছিলাম যে "মায়াবাদ" অর্থাৎ মিথ্যাত্ববাদ কে তুমি খণ্ডন করবে। এই মায়াবাদ আমার প্রতি বিশ্বাসের বিপরিত ধর্ম্মী। আমাকে যদি বিশ্বাস কর তবে আমার সৃষ্ট জগত সংসারকেও সত্য বলে বিশ্বাস করবে। আমি যদি সত্য হই তোমার কাছে. তবে আমার সৃষ্টবস্তু কি করে মিথ্যা হবে? আমি ত' আর মিথ্যা সৃষ্টি করি না। দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোকে আকাশ অবলোকন করে সেখানে গ্রহ নক্ষত্র নাই বলতে পার না। সূর্য্যালোকে তোমার দৃষ্টি ব্যাহত হয় বলেই তুমি দিনের বেলায় আকাশে গ্রহ নক্ষত্র দেখতে পাও না। তেমনি সাধক বা জ্ঞানী আমার স্বরূপালোক অবলোকন করে আত্মহারা হ'য়ে যদি বলেন জগৎ সংসার কিছুই নাই সবই মায়া সবই মিথ্যা তবে সে সাধক বা জ্ঞানী ভ্রমাত্মক। আর তিনি যদি মনে করেন জগৎ সংসার সবই "আমি" ও "আমি" ছাড়া কিছুই নাই তবে প্রত্যেক বস্তুই আমার স্বরূপ ও সে কি করে মিথ্যা হবে বা মায়া হবে। "আমি" "মহামায়া ঠিকই—। সেই মায়া হ'ল প্রত্যেক জীবের সঙ্গে জীবের সখ্যতা ও প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে জীবের সখ্যতা। তোমার প্রয়োজনের জন্যে সারা জীব জগৎ ব্যস্ত। কি করে তোমার অন্ন আসবে, বস্ত্র আসবে, নিদ্রা হবে সুখ হবে। তোমার শরীর ও জীবন ধারণের জন্য এই যে বিশ্বজগৎ তোমার সকল প্রয়োজনীয় সামগ্রি উৎপাদন ক'রে যাচ্ছে এই হোল

মায়া গ্রন্থি। স্থূল জগতে যা দেখতে পাচ্ছ যেমন খাদ্য, বস্ত্র ও তোমার শরীর ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু সে সবের উৎপাদন হ'চ্ছে আমারই অমোঘ বিধানে ও নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে। তোমার জন্মের পূর্ব্বে মাতৃস্তনে দুগ্ধ কে দিয়েছে। যে দিয়েছে সে এই "মহামায়া আমি"। সেই মহামায়া সকল সংসারের জীবগণকে তাদের সকল ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। প্রত্যেকের জন্য এই আকর্ষণ প্রত্যেকের আছে ও সেটা সূক্ষ্মতম রূপে দেখলে দেখবে আমি আমার সেই "স্তন চক্ষুর" দৃষ্টিতে সকলের সকল অভাব নিবারণ করছি। যে আধারে, আত্মা, মন, বুদ্ধির সাহায্যে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান উপলব্ধি করছ, যা শাশ্বত সত্য বলে নিজে জানছ ও সংসারে প্রচার করছ সেই আধারকে মায়া বা মিথ্যা বলছ? তোমার ভিতরের জাগ্রত প্রজ্ঞা যদি সত্য হয় যে আধার থেকে সেই জগ্রত সত্যকে উপলব্ধি করলে তাকে তুমি মায়া বা মিথ্যা কখনও বলতে পার? নিজের সত্বাকে অস্বীকার করে তুমি ব্রহ্ম সত্বাকে ধ্রুব বলছ। কিন্তু তোমার সত্বাও যে ব্রহ্ম সত্বা সেটা ভুলে যাও কেন? আমি সত্য ও আমার সৃষ্ট জগৎ সংসার ও সকল রূপ, ভাব, কর্ম্ম সবই সত্য। এ সব সত্য বলেই এ সবের প্রতিক্রিয়া হয় অর্থাৎ ফল উৎপাদন করে। বায়ুতে আঘাত করলে শব্দ হয় না। কিন্তু দুইটি পাথরে আঘাত করলে শব্দ হয়। এ সকল কর্ম্ম, চিন্তা, ভাব সত্য বলেই এ সবের ফল জাত হয়। সংস্কারগত সেই ফল স্বরূপগত হ'য়ে ধীরে ধীরে মানবকে মোক্ষের দিকে অগ্রসর করায়। আকাশে মেঘ হ'লে নানা বিচিত্র বর্ণের নানা দৃশ্য তোমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়। এই সব দৃশ্য প্রত্যেকটি তোমরা উপভোগ কর। সেগুলো কি সত্য নয়? তারা ক্ষণিক হ'লেও সত্য। মেঘের রং এক। কিন্তু সূর্য্য ও প্রাকৃতিক কিরণ দ্বারা নানা রংয়ের দৃশ্য মেঘে দৃশ্যমান হয়। তেমনি জীবচৈতন্য মেঘ স্বরূপ এক কিন্তু নানা ভাবে, নানা রূপে ইহার ব্যাপ্তি সংসারে আমারূপ-কিরণ সম্পাতে। আমার কিরণই জীবচৈতন্যের বিচিত্র-লীলা। ভয়ঙ্করও হয় আবার অতি মনোরম ও হয়। আমি জীবচৈতন্যে অবলীলায়িত ও নিত্য লীলাময়ী হ'য়ে সকল জগত

সংসারকে সত্য বলে পরিচিত করছি যাতে আমার সত্য পরিচয় তোমরা পাও। আমার স্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্তেই আমি জগত সংসার সৃষ্টি করেছি। এই সত্য স্বরূপের ভিতর দিয়ে তুমি মহাসত্য স্বরূপে অবগাহন করবে ও আমার একান্ত হবে। "মায়াবাদ" বা "মিথ্যাত্ববাদ" নিরিশ্বরবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার মহান্ কর্ত্তব্য এই মায়াবাদ ও মিথ্যাত্ববাদ খণ্ডন করা। তোমাকে আমি সেই জন্তে সাধনে প্রস্তুত করছি। সাধন কর ও আমার মহাশক্তি আহরণ কর। সময়ে তোমাকে আমি সকল জগত জনের কাছে ব্যক্ত করব জগতের মঙ্গলের জন্তে। যে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছ তাকে ভুলে যেও না। আকাশের দিকে চেয়ে মনে করো না যে তুমি শূন্তে দাঁড়িয়ে আছ। তবে সেই হবে তোমার মিথ্যাত্ববাদ। নিজ সত্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে অবলোকন কর ও মনে কর আমারই সত্তায় তুমি ওতপ্রোত।"

জয় মা জগত জননী, জ্ঞান দায়িনী জননী আমার

২৯শে অক্টোবর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল সকালে প্রায় ১০টার সময় একটি লোক পরিধানে গেরুয়া, গায়ে গেরুয়া জামা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ী, কাঁচা পাকা দাড়ি আছে, একটি একতারা নিয়ে অতি সুমিষ্ট স্বরে একটি ভজন গান গাইতে গাইতে আমাদের বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে আসছিলো। তাঁর সঙ্গে একটি আধ বয়েসী কৃষ্ণাঙ্গী নারী ছিলেন। তাঁর পরণে লাল পেড়ে শাড়ী গায়ে জামা ও কপালে একটি বড় সিন্দুরের টিপ ছিল। তিনিও মাঝে মাঝে গান গাইছিলেন। ভিক্ষা যা পাচ্ছেন গায়কের ঝুলিতে ঢেলে দিচ্ছেন। গানটি এত মধুর ও মন মাতানো যে আমাদের পাড়ার প্রায় সকলেই এই গান উপভোগ করছিলেন। আমি বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বাড়ীর কাছে আসতেই তিনটি পয়সা তাঁদের দিলাম। যে গানটি একতারা বাজিয়ে করছেন সেটা একটি মীরার ভজন। গানের সকল কথা বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমার প্রাণের ভিতরে একটা ভক্তির বন্তা বইতে লাগল। আমার চক্ষু সজল হ'ল যেন কোন

অপার্থিব আনন্দে আমি মগ্ন হ'য়েছি। অপূর্ব্ব সঙ্গীত মূর্চ্ছনা। আমি যেন একেবারে আত্ম বিস্মৃত হ'য়ে গেছি। মা বললেন, "তুমি, মাঝে মাঝে এখন ভাবছ যে তোমার ভিতরে যে ভক্তির ভাব ছিল সেটা বুঝি শুকিয়ে গেছে যোগধ্যানে। কিন্তু তা যে যায় নাই সেইটা বুঝবার জন্তে আজ আমার এই পরিবেশ সৃষ্টি। তোমার অন্তরে যে মহাভক্তির অনাবিল ফল্গুধারা প্রবাহিত আছে তাকে আমি আমার ও তোমার প্রয়োজনে বন্ধ করে রেখেছি। সেই ভক্তির ধারা যদি একবার খুলে দেই তবে তোমার সব ভেসে যাবে। তোমার সংসার, বিষয়, বিষয়-কর্ম্ম, ব্যবসায়, স্ত্রীপুত্র কন্যা সব সেই মহাভক্তির বন্যায় ভেসে যাবে। তোমার সংসারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হবে না। তাই সেই ভক্তির মহাস্রোতকে আমি বন্ধ করে রেখেছি ও যতদিন না তোমার কর্ত্তব্য পূর্ণ হবে ততদিন তোমার সেই ধারাকে তোমার ভিতরে মুক্ত করব না। আমার প্রয়োজন লোক শিক্ষা। সংসারের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেও মহাভক্তি লাভ হয় ও আমাকে লাভ হয় এইটাই তোমার জীবনে প্রকট ক'রে লোক শিক্ষার একটি প্রকৃষ্টতম আদর্শ স্থাপন আমার বিশেষ প্রয়োজন। এই এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম। তোমার ভিতর দিয়ে সেই আদর্শ প্রচার আমার বিশেষ ও একান্ত প্রয়োজন। জীব সৃষ্টি যেমন আমার বিধান তেমনি সেই জীবের জীবন সৃষ্টি ও জীবনের পরিবর্ত্তনও আমার সৃষ্টির গূঢ়তম বিধান। উপযুক্ত সময় ভিন্ন কাউকেই আমি আমার বিধানকে বুঝবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান করি না। বিধান নিত্য আসে। নিত্য নূতন ভাবে আমার বিধান নিত্য সংসারে আসে। যাদের বুঝতে দিই তারা বোঝে ও গ্রহণ করে। আর যারা বোঝে না তারা গ্রহণ করে না।"

জয় মা আনন্দ দায়িনী, ভক্তি দায়িনী বিধান জননী।

মাগো আমায় সব দে মা।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন "আমি দুঃখ পাচ্ছি কারণ তুমি এখনও নস্তি ছাড়তে পারলে না।" আমি বললাম, সে কি কথা, তুমি আবার দুঃখ পাবে

কি করে? তুমি ত সুখ দুঃখের অতীত। তোমার আবার দুঃখ হবে কি করে? মা বললেন, "আমারও দুঃখ হয়। আমার দুঃখ তোমাদের দুঃখের রূপ না হ'লেও আমার দুঃখ কেমন তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানব জন্মই হ'চ্ছে আমার সঙ্গে লীলার উদ্দেশ্যে। আমাকে সে জানবে ও তাতে আমাতে একাত্ম হ'য়ে মহানন্দলীলাই আমার শ্রেষ্ঠ ভাব। মানবকে দিয়েছি তার স্বাধীনতা। স্বেচ্ছায় যদি সে আমাকে ভালবাসে তবেই আমি তাকে গ্রহণ করি। জোর করে ভালবাসা আদায় করাও যায় না আর সে ভালবাসায় শ্রেষ্ঠ শান্তি পাওয়া যায় না। তাই কাউকে আমি জোর করে আমাকে ভালবাসাই না। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সংস্কার বদ্ধ হ'য়ে জন্ম জন্মান্তরে মানব আত্মা যখন আপন স্বরূপগত হয় তখনই সে আমাকে চায় ও ভালবাসে। তার ভোগ ও উপভোগ, দেহ বিকার যখন পূর্ণ হয় তখন সে আমার প্রতি একান্ত হয় ও তখন তাতে ও আমাতে লীলার প্রকাশ হয়। এই যে দেহ বিকার বা দেহান্ধতা যাকে মোহ বিকার বা মোহান্ধকার তোমরা বল এইটাই আমার দুঃখের প্রতীক বলে জানবে। যেখানেই মোহান্ধকার সেইখানেই আমার দুঃখ। কারণ এই মোহান্ধকার আমার ও জীবের ভিতরে একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে। আমার করুণাঘন দৃষ্টি জীবের উপরে প্রতিনিয়ত থাকলেও এই মোহান্ধকারে সেই আমার করুণাঘন দৃষ্টি জীবের জীবনে সক্রিয় হয় না। জীব অহংকারী, দুর্বিনীত হ'য়ে আমাকে অস্বীকার করে ও মোহগ্রস্থ হয়। এতেই আমার দুঃখ। এই মোহান্ধকার যত কেটে যাবে জীব আমার একান্ত হবে তত আমার আনন্দ। আমি চাই প্রতি জীব আমার লীলায় লীলায়িত থাকে। আমার সঙ্গে মহা আনন্দে আমার সান্নিধ্য করবে। আমার সঙ্গে এক যোগে যুক্ত থাকবে। এই হ'চ্ছে জীবের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর জীবত্ব। এই কল্যাণকর জীবত্ব মানব জীবনেই একমাত্র সম্ভব। আমার দুঃখ অপনোদন করতে হ'লে মোহ থেকে মুক্তি চাই। এ নয় যে সংসার অসার, দেহ নশ্বর ইত্যাদি। সবই সত্য ও সর্ব্ব অবস্থাকে আমার বিধান ও সকল মানবকে আমার সন্তান বলে

করে আমার বিধান বলে সংসারের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই মোহমুক্তি। সংসারের সব আমার সৃষ্ট ও যে সকল ভাব তোমার ভিতরে আছে সব আমার প্রেরিত ভাব মনে করে কর্ত্তব্য জ্ঞানে সে সকল সম্পাদন করাই মোহমুক্তি। এই পন্থা শ্রেষ্ঠতম। তোমাকে সেই পথে নিয়ে চলেছি। ভয় নাই অগ্রসর হও। নচিৎ একদিন তোমাকে ছাড়তেই হবে।"

মা আমার ক্ষমারূপিনী দয়াময়ী জননী।

১২ই নভেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "নিজের অস্তিত্বকে বিশ্বাস কর। ভেবে দেখ তোমার সত্তা কি? পুত্র পিতার প্রতীক ও পিতা পুত্রের স্রষ্টা। তোমাকে যদি মায়া মনে কর তবে পিতার অস্তিত্বকেও মায়াই ব'লতে হয়। পিতার যে শক্তি সে শক্তি তোমার ভিতরে সঞ্চারিত হ'য়েছে। সে শক্তি একমাত্র তোমার পিতৃত্বেই বিকাশ হ'তে পারে, তার নিরোধে নয়। কন্যার মাতৃত্বেই মাতার মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। কন্যার জীবনে যদি মাতৃত্বের বিকাশ না হয় তবে তার মাতার মাতৃত্বের খর্ব্ব হয়। কারণ যে ধারা প্রবাহিত তাকে প্রবাহিতই রাখতে হবে তবেই সে তার শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধান খুঁজে বের করবে। ধারা ব্যাহত হ'লে তার ধারা বিপথগামী হয় ও সে তার সহজ, সরল গতিমানকে বিচ্ছিন্ন করে। যতই উদ্বেল হ'য়েই আপনার শক্তিকে প্রকাশ করুক না কেন, আপনার সহজ ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হয়। তেমনি মানব জীবনের গতিকে ব্যাহত করো না। ধারা রক্ষা কর। তোমার পিতা মাতা ছিলেন, তোমরাও পিতা মাতা হও এবং সরলভাবে আমার প্রতি ধাবিত হও ও আমার সঙ্গে সহজ সম্বন্ধ রাখ তবেই আমার লীলা তোমাদের অন্তরে প্রকাশিত হবে। ধারাকে ব্যাহত করে গতিরুদ্ধ করে নিজে যে শক্তি লাভ করলে তাতে তোমার অন্তরে আত্ম প্রসাদ লাভ হ'তে পারে ও সকলে তোমার শক্তি দেখে বিস্মিত হ'তে পারে তাতে আমার সঙ্গে আত্মনিষ্ট সহজ প্রেম বা ভক্তি লাভ হয় না ও আমার সঙ্গে তোমার যে সহজ সরল মাতাপুত্র সম্বন্ধ সেটা থাকে না। এত মানুষ সৃষ্টি করলাম কেন? ভেবে দেখ একটি দম্পতি—ধরে নাও তারা হাজার বছর পূর্ণ

যৌবনে জীবিত আছেন। তাদের এক একটি সন্তান হ'চ্ছে ও কিছুদিন পরে কোনও প্রকার রোগে প্রত্যেক সন্তান বিকলাঙ্গ হ'য়ে পড়ছে। তাদের অন্তরে কি ভাব আসবে? তারা ভাববে তাইত এত সন্তান হ'ল প্রত্যেকেই বিকলাঙ্গ হ'য়ে পড়ছে। দেখি আরও সন্তান হোক তারা যদি বিকলাঙ্গ না হ'য়ে বেঁচে থাকে তবে অন্তরে শান্তি পাব কারণ তারা আমাদের ধারাকে পূর্ণ ভাবে উদ্‌যাপিত করতে পারবে বেঁচে থেকে। আমার ভাবও তাই। এত মানব সৃষ্ট হোল সবই যে বিকলাঙ্গ। কেউ যে আমার কথা বলে না। আমার প্রকৃত ধারা, আমার প্রকৃত ধর্ম্ম, আমার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে প্রকৃত রূপে আমাকে নিজেদের ভিতরে জানতে পারল না। আমি যে তাদের ভিতরে বেঁচে আছি, আমি যে তাদের ভিতরে মূর্ত্ত আমি যে তাদের প্রকৃত ধারক ও তারা যে আমার প্রতীক, আমার প্রকৃষ্ট স্বভাব-সৃষ্ট জীব তা তারা অস্বীকার ক'রে নানারূপ বিকৃত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হ'চ্ছে। বিকলাঙ্গ হ'য়ে পড়ছে। তাই আরও সৃষ্টি করছি দেখছি যদি এর ভিতরে কেউ পূর্ণ অঙ্গ নিয়ে বেঁচে গিয়ে আমার প্রকৃত ধারাকে মানব জীবনে প্রবাহিত করতে পারে। আমি যদি স্রষ্টা তবে তোমার সৃষ্টি করবার দোষ কোথায়? তোমার ভিতরে যদি সৃষ্টি করবার ক্ষমতা না দিতাম তবে তুমি সৃষ্টি না করলেও কোনও দোষ হ'ত না বা তুমি সৃষ্টি করতেই পারতে না। কিন্তু যে স্বভাব আমার সেই স্বভাব যদি তোমার ভিতরে আমি দিই তাকে তুমি পাপ বলে ঘৃণা করলে আমার সৃষ্টি ও আমি স্রষ্টা দুইটিকেই তুমি অস্বীকার করলে। এই কি তোমার ধর্ম্ম সাধনা? এই কি তোমার আমার সাধনা? আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শক্তিকে উপেক্ষা ক'রে আমার স্বভাব বিকাশকে অস্বীকার ক'রে আবার আমারই সাধন করছ, একি তোমার স্বৈরাচার নয়? তাই তোমাকে বলছি নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার কর তবেই তুমি আমাকে জানতে পারবে। আমার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এই কর্ম্মমুখর সংসারের ভিতরেই আছে। এখান থেকে চলে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণে নাই। কর্ত্তব্য—বীরের ধর্ম্ম পালন করা। কর্ত্তব্যকে যদি পাপ, মায়া, মোহ বলে মনে

কর তবে তোমার শ্রেষ্ঠতমের অর্থাৎ আমার পূজা সার্থক হবে না।"

জয় মা আনন্দময়ী জ্ঞান দায়িনী জননী।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্ম মন্দিরে শ্রীমান্ সরোজেন্দ্র নাথ সেনের ব্রহ্ম উপাসনা ও শ্রীমান্ মৃণাল ভূষণ বসুর সঙ্গীত। একলাই মন্দিরে গেলাম। সরোজ একটু দেরীতে এল। মৃণাল গান করল। প্রথম থেকেই আমি যোগধ্যানে মগ্ন হ'লাম। উপাসনার কথা কখনও কানে আসছে আবার কখনও আসছে না। আস্তে আস্তে উর্দ্ধগতি হ'ল ও ক্রমে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে উঠে যেতে লাগলাম। যেখানে এলাম সে জাগাটা স্নিগ্ধ নীলাভ অথচ অত্যন্ত ফিকে আলোতে উদ্ভাসিত ও অসীম দিগন্তে বিস্তৃত। প্রশ্ন করলাম, 'এ কোথায় এলাম। মা বললেন, "এ অমার্গ মণ্ডল। নীচে নেমে যাও।" এক ধাপ নীচে চলে এলাম। এসে দেখি সেখানটা গোধূলি আলোকের মত আবছা ভাব। সব দেখা যায়। কিন্তু দিনও নয় রাত্রিও নয়। অসীম দিগন্তে বিস্তৃত মেঘলার মত সব কি ভেসে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একটা সুতীব্র আলোকের ফলা (তরবারীর ফলার মত) পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব্ব দিকে চক্ষের নিমেষে ছুটে গেল—সেই মেঘলার ভিতর দিয়ে ও তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিল। তারপর ভীষণ আলোড়ন হ'য়ে একটা পর্ব্বতের মত সৃষ্ট হ'ল। সেই পর্ব্বত নিমেষে অন্তর্হিত হ'য়ে মিলিয়ে গেল ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের বেলাভূমির মত দিগন্ত বিস্তৃত হ'ল। তারপর নানা দিক থেকে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক বর্ত্তিকার মত ছুটাছুটি করতে লাগল। তাদের সঙ্ঘর্ষে ভীষণ আলোড়ন ও নানা অগ্নিপিণ্ডের আবির্ভাব হ'তে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, এ কোথায় এলাম? মা বললেন, "এ হোল মন্মার্গ মণ্ডল। আরও নীচে নেমে যাও।" এবার যেখানে এলাম সে জায়গাটা দিনের বেলাকার নির্ম্মল নীলাকাশের মত। বেশী আলোও নাই আবার একেবারে আবছায়াও নয়। কিন্তু দিগন্ত বিস্তৃত উর্দ্ধ অধঃ পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে। মা বললেন, "এ হোল ব্যোম মণ্ডল। আরও নীচে যাও।" এবার যেখানে এলাম সে জায়গাটা

তীব্র আলোকে উদ্‌ভাসিত। শুধু আলোক আর আলোক। উর্দ্ধ, অধঃ পরিপূর্ণ তীব্র আলোক। আর কিছুই নাই। মা বললেন, "এ হোল জ্যোতির্ম্মণ্ডল। আরও নীচে যাও।" এবার যেখানে এলাম সে জায়গাটা শীতের বেলায় ২টা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত যে রকম আলো থাকে অনেকটা সেই রকম আলোতে উদ্‌ভাসিত—। অতি সূক্ষ্ম তারের জালের মত পরদার পর পরদা একটার পরে আর একটা রয়েছে। তারা এক জায়গাতেই রয়েছে বলে মনে হ'চ্ছে কিন্তু যে যার স্তরে কম্পিত হ'চ্ছে। তাতে মনে হ'ল তারা স্বীয় স্তরেই একদিক থেকে অন্য দিকে ধাবিত হ'চ্ছে। মা, বললেন, এই হ'ল মারুত মণ্ডল। আরও নীচে যাও।" এবার যেখানে এলাম সে জায়গাটা ধূসর ধূম্র জালে সমাচ্ছন্ন। শীতের প্রত্যূষে যেমন কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে ঠিক তেমনি। মাঝে মাঝে যেন সেই ধূম্রজাল থেকে বারিপাত হ'চ্ছে। মা বললেন, "এ হ'ল অবনী মণ্ডল। আরও নীচে যাও।" এবার যেখানে এলাম সে জায়গাটা বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ আমাদের দেশ। মা বললেন, "এই হ'ল ভূমণ্ডল। আবার ওঠ উপরে।' আবার পর পর প্রত্যেক মণ্ডল পরিক্রমা করে অমার্গ মণ্ডলে এসে দাড়ালাম। সেখান থেকে একটি অপূর্ব্ব অদৃষ্ট পূর্ব্ব অপরূপ রাজ্য দেখতে পেলাম। মা বললেন, "ওই হ'ল ব্রহ্ম মণ্ডল।" আমি বললাম, ওখানে আমাকে নিয়ে চল। মা বললেন, "না, ওখানে তুমি এখন যেতে পারবে না। যোগে তোমার এখনও সে অবস্থা আসে নাই। নিজ যোগ শক্তিতে ওখানে যেতে হ'লে আরও যোগাভ্যাস করতে হবে।" আমি বললাম আমাকে যে তুমি পূর্ব্বে স্বর্গের অনেক স্থানে নিয়ে গেছ সেও ত ব্রহ্মলোকই। মা বললেন, "হ্যাঁ, তখন তোমাকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে গেছি, তাই তুমি যেতে পেরেছিলে। এখনও অনেক সময় তোমাকে আমিই নিয়ে যাই। এখানেও আমিই তোমাকে নিয়ে এসেছি। মনে কর যখনই তুমি ওই রকম অপূর্ব্ব রাজ্যে গেছ ভেবে দেখ আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম কিনা?" আমি বললাম, হ্যাঁ, তুমি সঙ্গে ছিলে। মা বললেন, "আমি নিয়ে গেলে যেতে পারবে। অথবা যখন তোমার তেমন যোগশক্তি হবে তখন আমার

সাহায্য ছাড়াই তুমি ওখানে যেতে পারবে। সেই অবস্থা তোমার আত্ম শক্তির চরম বিকাশ ও তোমার নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা।" এইবার মাকে বললাম, আমার ভীষণ অর্থ অনাটন যাচ্ছে, শেষে কি একটা মহাবিপদে পড়ব ? মা বললেন, "চিন্তা কর কেন ? তোমার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সংসার, ব্যবসায়, কারখানা সব আমার ইচ্ছায় হ'য়েছে ও যা আমার ইচ্ছায় হ'য়েছে ও যার জন্ত তোমাকে ভার দিয়েছি তার সকল দায়িত্ব আমার। আমি এ সকল রক্ষা করবার ভার নিজ হাতে রেখেছি। এখন তোমার অর্থ সঙ্কট দিয়েছি তার কারণ তোমার অর্থের প্রয়োজন ও তুমি তার জন্যে সচেষ্ট হবে ও নানা পথ চিন্তা করে অর্থাগম করবে। এখন কিছুদিন তোমার অর্থের বিশেষ প্রয়োজন যাতে তোমার সংসারের সকল অভাব ও সকল ঋণ থেকে তুমি অচিরে মুক্ত হ'তে পার। কষ্ট না এলে উদ্‌ভাবন আসে না। তাই এই অর্থ কষ্ট। এতে তোমার কষ্ট হবে কিন্তু কোনও ক্ষতি হবে না। এমন হবে না যে তুমি বিপদে পড়বে। সকল বিপদ থেকে আমিই তোমাকে রক্ষা করব। চিন্তা নাই।" এর পরে হঠাৎ দেখি একটা প্রকাণ্ড শ্বেত প্রান্তর যেন একটি সুউচ্চ গিরিদেশ কিন্তু সমতল। দিগন্ত বিস্তৃত সে দেশ একেবারে বরফে ঢাকা। প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে যেমন আলোক হয় তেমনি। আমি মাতৃহারা ছোট ছেলে। 'মা' 'মা' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি। আলোকের পরদার মতন সব পরদা আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমার মনে হ'চ্ছে এমনি কোনও একটি পরদার আড়ালে মা লুকিয়ে আছেন। আমি খুব একলা ও মাকে কেঁদে কেঁদে খুঁজছি। অনেকক্ষণ এমনি ভাবে কাঁদছি। হঠাৎ দেখি একটি অপরূপ লাবণ্যবতী নারী, শ্যামা, পরনে নীল বর্ণের শাড়ী, গায়েও নীল বর্ণের একটি জামা, গলায় সাদা ফুলের মালা ও বহু অপরূপ অলঙ্কারে দেহ ভূষিত। তিনি ধীরে এসে আমাকে কোলে তুলে নিলেন। আমি প্রথমে তাঁর কাঁধে মুখ লুকালাম। তিনি আমাকে নিয়ে উত্তর দিকে চললেন। কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁর-কোলে থেকেই তাঁর মুখ দেখবার জন্তে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

মুখ কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। তারপরেই আমার ধ্যান ভঙ্গ হোল।

মাগো আমার প্রেমময়ী জননী। তুই আমায় এত ভালবাসিস্ কেন মা? আমাকে তোর কোলে রাখ মা। সকল সংশয়, সকল ভয় দূর হোক্ মা। তোর কোলে থেকে তোর ছেলে হই মা। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর মা।

২৭শে নভেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, এত যে জপ করছি, কই আমারত কিছু হ'চ্ছে না। মহাশক্তিত লাভ হ'চ্ছে না। কেন হ'চ্ছে না? মা বললেন, "হ'চ্ছে, তোমার শক্তি লাভ হ'চ্ছে। অতি আস্তে আস্তে শক্তি লাভ হ'চ্ছে। তুমি এখনও জানতে পারছ না। কিন্তু শক্তি তোমার লাভ হবেই। ধৈর্য্য ধারণ কর। সাধন করে যাও। আস্তে আস্তে মহাশক্তির উৎস তোমার ভিতরে সঞ্চারিত হবে। বাঁশের লাঠিকে পাকা লাঠি তৈরী করতে হ'লে একটা পাকা ঝাড়ু বাঁশ বেছে নিতে হয় ও তাতে রোজ তেল লাগাতে হয়। রোজ, রোজ, তেল লাগাতে লাগাতে ক্রমে সে অত্যন্ত শক্ত হয় ও এমন শক্তি তার হয় যে ইস্পাতের তলোয়ারকে পর্য্যন্ত এক আঘাতে ভেঙ্গে দুই খণ্ড করে দিতে পারে। কাঁচা বা অপক্ক বাঁশের লাঠিকে শত শত বার তেলে সিক্ত করলেও তার সে শক্তি হয় না। বাঁশ যখন আপন স্বভাব ধর্ম্মে সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয় তখনই তার শক্তি গ্রহণ ও ধারণ করবার ক্ষমতা লাভ হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি পূর্ণ বিষয় মুখীন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি কাঁচা ও তোমার স্বীয় স্বভাব ধর্ম্মে তুমি পরিপক্ক হও নাই। তোমার শক্তি গ্রহণ ও ধারণ করবার ক্ষমতা লাভ হয় না। যতই তুমি আত্মা মুখীন্ হবে, যতই তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হবে ততই তুমি পরিপক্ক হবে। ভক্তি ও বিশ্বাসের তেলে যতই তুমি সিক্ত হবে ততই তোমার শক্তি গ্রহণ ও ধারণ করবার ক্ষমতা হবে। এমন তোমার সময় আসবে যখন তুমি পূর্ণ শক্তিশালী হবে ও তোমার আর ভয় থাকবে না। সুতরাং ধৈর্য্য ধর। আমার প্রতি বারা

একাগ্র হয়, ও আমার জপ যারা করে একান্ত মনে তাদের মহাশক্তি লাভ হয় এবং কিছুর অভাব থাকে না। মনে কখনও সন্দেহ আনবে না। মহা আকর্ষণে আমাকে ভজনা কর। তোমার মহাশক্তি, ঐহিক ও পারত্রিক সুখ, সম্পদ, অর্থ, বিত্ত ইত্যাদি সব হবে। আমার প্রতি একাগ্রমনা হও। আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমার ভার নিয়েছি নিজে, কোনও ভয় নাই। অগ্রসর হও নির্ভয়ে।"

মা আমার আনন্দময়ী মহাশক্তি রূপিনী

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ; কলিকাতা।

আজ বাবার মৃত্যুর-সাম্বৎসরিক ছিল। অবনীদা উপাসনা করলেন। আমরা—টুনি, নীলু, মালা, ময়না, বাবুল, রাহুল, পুতুল মিলে গান করলাম। বাবার নব-তত্ত্বামৃত থেকে অবনীদা কিছু পড়লেন। সঙ্কট বারিণী স্তোত্র পড়া হ'ল। তারপর বাবার উন্নত ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় আমরা সকলে আলোচনা করলাম। খেতে বসেও অনেক আলোচনা হ'ল। অবনীদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ধর কেউ যদি দেয়ালে মাতৃ মূর্ত্তি দেখে তাকে তুমি কি বলবে?" আমি বললাম, সেটা সংস্কার। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার আত্মায় এমন গভীরভাবে অঙ্কিত থাকে যে সেই সংস্কার সাধন জাত হয় পরজন্মে। এই ভাবে অনেক আলোচনা হ'ল।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠতেই মা বললেন, "এইবার আবার তোমার অবনীর কাছে যাবার প্রয়োজন হ'য়েছে। এবার গিয়ে প্রথমে বলবে যে, যে কথা তুমি বলতে এসেছ সে তোমার কথা নয়। সে সব আমার কথা। তোমার মনে কোনও অহঙ্কার থাকবে না। অবনীর মনে যাতে এমন ভাব না আসে যাতে সে মনে করতে পারে যে তুমি তাকে সাধন শিক্ষা দিতে গিয়েছ। তুমি এ জন্মে তার অনুজ হ'লেও আসলে তুমি তার অগ্রজ। কিন্তু দেহাত্ম বোধ বড় কঠিন ও এই জন্মের সম্বন্ধ হিসাবে তুমি অনুজ হ'য়েও যে অগ্রজের মত উপদেশ দিচ্ছ তাতে তার মনে তোমার প্রতি যাতে বিন্দুমাত্র বৈরী ভাব না আসে সেই

দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রেখে তার সঙ্গে কথা বলবে। তার অন্তর ও দৃষ্টি অনেকাংশে মুক্ত হ'য়েছে। তার দর্শন হ'চ্ছে। কিন্তু এই সব দর্শনেও তার অন্তরের সন্দেহ যাচ্ছে না। এই সন্দেহ ভঞ্জনই তোমার কর্ত্তব্য। সে তোমার উত্তর-সাধক। সাধকেরও উত্তর সাধক না থাকলে উৎসাহ জাগেনা। উত্তর-সাধক সাধকের সমপর্য্যায় হ'য়ে নিজেও সাধন করে ও সাধকেও উৎসাহিত করে। এই উৎসাহ সাধকই স্থষ্টি করে তার অভিজ্ঞতা উত্তর সাধকের কাছে বর্ণনা করে। আর উত্তর সাধকের সাধন অন্তর সাধককে উৎসাহিত করেই ক্ষান্ত থাকে না। সেও সেই বর্ণনা শ্রবন ক'রে আপন চিত্তকে সাধনের পথে ও সাধকের অভিজ্ঞাত বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে উন্নতির দিকে ধাবিত করে। তোমার সাধন ধারার একটি ধারক প্রয়োজন। তোমাকে সে লোকের নিকটে পরিচিত করবে। সে সময়ে হবে। যখন তোমাকে আমি প্রকট করব লোক সমাজে তখন সে সাক্ষী দেবে যে সে তোমার বিষয় সব জ্ঞাত আছে ও তোমার যে শক্তি সে শক্তি সত্য ও আমার দ্বারা প্রেরিত। এখন থেকে ক্রমেই তুমি অবনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবে ও সাধন পথের ক্রমিক ধারা ও সাধনের উচ্চ বিকাশের ধারা দু'জনে সংযোজিত করে উভয়ে আমার মন্ত্র আমার দীক্ষা ও আমার বাণী প্রচার করবে। মিলিত জীবনে সাধন সিদ্ধ হয়। দুই সাধকের সাধন ধারা ও দুই সাধকের অন্তরের মিলনে এক মহাধারার সাধন হয়। একে বলে যুক্ত সাধন। সংসারে এ পাওয়া বড় কঠিন। যেখানে ও যখন হয় তখন সে সাধন অতি উচ্চ সাধন। তুমি তার সাধনকে তোমার অন্তরের সাধন অভিজ্ঞতায় পূর্ণ সম্মতি দিচ্ছ। আর সে তার ধারাকে সম্প্রসারিত করছে তোমার সাধন অভিজ্ঞতা পূর্ণ রূপে বিশ্বাস ক'রে। এ অতি উন্নততম যোগাযোগ। কালকের উপাসনা যে অবনী করবে ও তারপরে যে তোমার ও তার ভবিষ্যতে সাধন ধারা যুক্তস্রোতে বইবে এ আমার ইচ্ছায় ও আমার বিশেষ অভিপ্রায়ে হ'য়েছে জানবে। এর পিছনে এক মহাবিস্ময়কর ব্যবস্থা রয়েছে লোক কল্যাণের জন্য। যাও যত শিঘ্র পার যাও ও তার সন্দেহ ভঞ্জন কর।"

মা তোমার লীলা কিছুই বুঝতে পারিনা। মাগো আমায় আরও বিশ্বাস দে।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "দীনতা ও হীনতা পরিত্যাগ কর। নিজেকে দীন বা হীন মনে করবে না। তুমি দীনও নও হীনও নও। তুমি আমার পুত্র, রাজরাজেশ্বরীর পুত্র মনে করে বিনয়ে নিজেকে দীনভাবে সকলের পদতলে দাঁড়িয়ে সকলের সেবা করবে। মনে তোমার দৈন্য থাকবে না। কাজে তোমার দৈন্য থাকবে না। চলাফেরায়, কথা-বার্ত্তায়, পোষাকআষাকে তোমার দৈন্য থাকবে না। দীনতা থাকবে তোমার বিনয়ে। হীনতা আসে কখন? যখন হীন চিন্তা কর।" এই হীন চিন্তা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করবে। শক্তির মহা-উৎস যখন প্রাণে সঞ্চারিত হয় তখন হীন চিন্তায় সাধনের বিশেষ ক্ষতি হয়। পরিপূর্ণ জীবন প্রবাহ নিয়ে হীনতাকে বর্জ্জন কর। তবেই অন্তর আত্মমুখীন্ হ'য়ে আমার স্পর্শের জন্য লালায়িত হবে। তাই বলি হীনতা ও দীনতাকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর। জয় মা আনন্দময়ী মা আমার। মাগো দেখা দে মা।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকাল থেকে মার মুখখানা ক্রোধান্বিত। যেন আমার উপরে বেশ রেগে গেছেন। বললেন, "নস্যিটা আজও ছাড়তে পারলে না। একটা সামান্য দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করতে পারছ না। এর জন্যে তোমার নিজের ক্ষতির চাইতে আমার বহুগুণ ক্ষতি হ'চ্ছে। আমার যা ক্ষতি হ'চ্ছে সেটা অপূরণীয়। তোমার মাধ্যমে যে লোকশিক্ষার মহান্ উৎস খুলে দেব এই জগতে সেই কার্য্য ক্রমাগত পিছিয়ে যাচ্ছে। কারণ এই নস্যির জন্যে তোমার ভিতরে যে শক্তি এতদিনে সঞ্চারিত হওয়া দরকার ছিল তা' হ'চ্ছে না। নাসিকার উর্দ্ধভাগে ভ্রূযুগলের মাঝখানে যে প্রজ্ঞাচক্র আছে সেখানে অতি সূক্ষ্ম ধমনীতন্ত্রী সকল চক্রাকারে রয়েছে। সাধন শক্তিতে সেই তন্ত্রীসকল

স্পর্শ জাগ্রত, তীব্র তেজ প্রভাবযুক্ত হয়। এই নস্য নাসিকার ভিতর দিয়ে গিয়ে, সেই ধমনী ও তন্ত্রী গুলোকে জড়িত ক'রে ফেলে ও তার জন্যে সেই ধমণী ও তন্ত্রীর শক্তি খর্ব্ব হয় ও তারা মৃতকল্প হ'য়ে পড়ে। তাতে দেহে ও মনে যে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া দরকার সে শক্তি সঞ্চারিত হয় না। দেহ শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে। সাধন অনুযায়ী মনে ও আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হ'তে পারে না" আমি বললাম আগেত অনেক পণ্ডিতগণ নস্য নিতেন ও তাঁরা সব মহাজ্ঞানীও হ'য়ে ছিলেন। তাঁদের বেলায় দোষ হয়নি কেন? মা বললেন, "দেখ, তখন সংসারে লোকে সৎ কার্য্যই বেশী করত ও সেই সব নস্য খাঁটি জিনিষ দিয়ে তৈরী হ'ত। যদিও সেগুলো মাদক দ্রব্য ও সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য তবুও তাতে ততটা দেহের ক্ষতিকারক ছিল না। আর আজকাল লোক অত্যন্ত হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন হ'য়েছে ও যে সব জিনিষ দিয়ে নস্য প্রস্তুত করে সে সব দেহের পক্ষে বিষতুল্য ও ভীষণ ক্ষতিকারক। তুমি যদি আমার অবাধ্য হও তবে তোমাকে আমি নানা ভাবে দুঃখ দেব ও শাস্তি দেব। তার কারণ তোমার মাধ্যমে আমার কাজ সম্পন্ন করবার জন্যে তোমাকে উপযুক্ত করবার জন্যে যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সেটা আমি করব। এ নস্যি তোমাকে ছাড়তেই হবে ও যতদিন না ছাড়বে ততদিন নানা প্রকার অর্থকষ্ট, অশান্তি, দুঃখ, মনোবেদনা ইত্যাদি দিয়ে তোমাকে আমি নস্য ছাড়াব। যদি আমার কথা না শুনে চল তবে দেহপাত পর্য্যন্ত হ'তে পারে জানবে। দেখ, অর্থের জন্যে কোনও চিন্তা নাই। এ কথা তোমাকে বার বার বলেছি। আমার ধন ভাণ্ডার আমার বাধ্য সন্তানদের জন্যে। আমার যা ধন আছে তাই পেয়েইত তোমরা ধনী। তোমরা যে টাকা প্রস্তুত কর সেই সকল টাকা অর্থাৎ পৃথিবীর সকল টাকা এক সঙ্গে করলেও আমার একটি মাণিক্যের মূল্যও হয় না। আমি ধরনীর গর্ভে বহু রত্ন দিয়েছি যার মূল্য তোমাদের সকল অর্থেও হয় না আমার সৃষ্ট পরশপাথর অমূল্য সম্পদ। এ অমূল্য প্রস্তর এই ভূভাগেই আছে। কিন্তু কেউ পায় না কেন? কারণ কেউ সে জন্য উপযুক্ত নয়। তুমি যদি তার

জন্যে উপযুক্ত হও তবে কলিকাতার রাস্তায় তুমি পরশপাথর কুড়িয়ে পাবে জানবে। আমার লীলা, অলৌকিক ও অপ্রত্যাশিত বলে জানবে। আমার সম্পূর্ণ বাধ্য হ'লে অসীম শক্তি, প্রচুর অর্থ ও সম্পদের অধিকারী হ'তে পারবে। আর আমার অবাধ্য হ'লে দুঃখ পাবে, দৈন্য পাবে। তোমার ছেলে মেয়ে যদি তোমার অবাধ্য হয় তুমি যেমন সেটা সহ্য করতে পার না ও তাদের শাস্তি দাও তেমনি আমিও আমার অবাধ্য সন্তানকে শাস্তি দেই ও দুঃখে ফেলি। দুঃখ তুমি পাও আমার কথার অবাধ্য হওয়ার দোষে। অবাধ্য হবে না। এখনও বাধ্য হও তবে তোমার মহাশক্তির বিকাশ হবে।" আমাকে তুমি নস্য ছেড়ে দেবার মত মনবল দাও মা। আমি যে বড় দুর্ব্বল। ছেড়ে দিয়েও আবার নস্য দিতে চাই বা দিই। এমন মনবল দাও যাতে আর নস্য স্পর্শ করতে না হয় মা। "মনে বল আন ও শক্তি সঞ্চয় কর যাতে মনকে কঠিন করতে পার ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও যাতে আর নস্য স্পর্শ না কর। এই নস্য ছাড়লে তোমার অলৌকিক প্রতিভা হবে, প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হবে ও তোমার মহাশক্তি হবে। আমার কথার বাধ্য হও, ছাড় নস্য"। মাগো আমায় বল দে মা, আমায় শক্তি দে মা। আমায় এমন শক্তি দে যাতে আর নস্য স্পর্শ না করি। আমি বড় দুর্ব্বল। আমার সকল দুর্ব্বলতা দূর করে দে মা। তোর চরণ ভরসা। তোর জয় হোক্ মা আমার জীবনে। তুই আমাকে মহাশক্তিধর কর মা। মাগো আমার স্নেহময়ী জননী আমার, দে মা আমায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাতে আর নস্য গ্রহণ না করি মা। জয় মা মহাশক্তি মা দুর্গা জয় হোক্ মা।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "আত্মরক্ষা জীব ধর্ম্ম। অর্থাৎ নিজ দেহ রক্ষা করা, নিজ দেহের তুষ্টি বিধান করাই জীব ধর্ম্ম। আহার, নিদ্রা, আনন্দ, আরাম, মৈথুন ইত্যাদি সবই এই দেহ রক্ষা বা দেহের তুষ্টি বিধানের পর্য্যায় পড়ে। এর কোনও পরিমাপ নাই। কারণ, কি দরকার দেহের তুষ্টি বিধানের জন্যে সে

জ্ঞান আত্ম-বুদ্ধি বা আত্মদর্শন না হ'লে জাগ্রত হয় না। আত্মবুদ্ধি বা আত্মদর্শনই—আত্মতুষ্টির পরিমাপের সম্যক জ্ঞান দান করে। আত্মদর্শন না হ'লে বুদ্ধি জরাগ্রস্থ থাকে। এই জরাগ্রস্থ বুদ্ধি বাসনা ও কামনাকে সংযত করতে ত পারেই না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেমন তোমার আকাঙ্ক্ষা হ'ল রসগোল্লা খাবার। এর অর্থ রসগোল্লার স্বাদের প্রতি তোমার মনকে ধাবিত করল তোমার ইচ্ছা শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি। তুমি এক সের রসগোল্লা কিনে একটার পর একটা করে সব গুলো খেয়ে ফেললে। এখানে তোমার বুদ্ধি লোভের দ্বারা স্বৈরাচারী হ'য়ে সব গুলো রসগোল্লা তোমায় ভক্ষণ করালো। ভেবে দেখ একটা রসগোল্লার যে স্বাদ বাকী গুলোরও সেই স্বাদ। একটা খেলেই যখন তোমার সেই স্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় তবে তুমি অতগুলো খেয়ে নিজের পরিপাক শক্তির উপর অযথা গুরুভার চাপালে কেন? একে বলে জরাগ্রস্থ বুদ্ধি। আজ তোমার মাসিক আয় ১০০৲ টাকা। তোমার সংসার যাত্রা অতি ক্লেশে নির্ব্বাহ হ'চ্ছে। তোমার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা হয় যে যদি তুমি ২০০৲ টাকা মাসে পাও তবে তোমার সংসার স্বচ্ছলভাবে চলতে পারে। কিছুদিন পরে তোমার ২০০৲ টাকা মাসিক আয় হ'ল। তখন তুমি ভাবলে এতেও হ'চ্ছে না। এমনি করে তোমার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে চলল। একদিন তুমি মাসিক ২০০০৲ টাকা আয় করতে আরম্ভ করলে তবুও তোমার তাতে সঙ্কুলান হোলে না। একি? না, তোমার বুদ্ধি জানে না তোমার কত টাকা হ'লে তুমি একেবারে শান্ত হবে। তাহ'লে এখানেও তোমার বুদ্ধি জরাগ্রস্থ। সমাজে তোমার চলা ফেরার জন্যে, আহার ব্যসনের জন্যে কত টুকু তোমার নিজস্ব প্রয়োজন সেটা তুমি ঠিক করবে তোমার আত্মজ্ঞান দিয়ে। নিজের জন্য যদি পরিমিত সংস্থান কর ও তা ক'রে পরিবারের অন্য সকলের জন্যে যদি তোমার নিজের চাইতে বেশী সংস্থান কর তবে তুমি স্বার্থহীন আত্মদর্শী। কারণ পরিবার তোমার উপর নির্ভরশীল। পরিবারের সুখ সুবিধা তোমার পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। তুমি পরিবারের প্রতিপালক হিসাবে আমার

জন্যে উপযুক্ত হও তবে কলিকাতার রাস্তায় তুমি পরশপাথর কুড়িয়ে পাবে জানবে। আমার লীলা, অলৌকিক ও অপ্রত্যাশিত বলে জানবে। আমার সম্পূর্ণ বাধ্য হ'লে অসীম শক্তি, প্রচুর অর্থ ও সম্পদের অধিকারী হ'তে পারবে। আর আমার অবাধ্য হ'লে দুঃখ পাবে, দৈন্য পাবে। তোমার ছেলে মেয়ে যদি তোমার অবাধ্য হয় তুমি যেমন সেটা সহ্য করতে পার না ও তাদের শাস্তি দাও তেমনি আমিও আমার অবাধ্য সন্তানকে শাস্তি দেই ও দুঃখে ফেলি। দুঃখ তুমি পাও আমার কথার অবাধ্য হওয়ার দোষে। অবাধ্য হবে না। এখনও বাধ্য হও তবে তোমার মহাশক্তির বিকাশ হবে।" আমাকে তুমি নস্য ছেড়ে দেবার মত মনবল দাও মা। আমি যে বড় দুর্ব্বল। ছেড়ে দিয়েও আবার নস্য দিতে চাই বা দিই। এমন মনবল দাও যাতে আর নস্য স্পর্শ করতে না হয় মা। "মনে বল আন ও শক্তি সঞ্চয় কর যাতে মনকে কঠিন করতে পার ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও যাতে আর নস্য স্পর্শ না কর। এই নস্য ছাড়লে তোমার অলৌকিক প্রতিভা হবে, প্রচুর ধন সম্পদের অধিকারী হবে ও তোমার মহাশক্তি হবে। আমার কথার বাধ্য হও, ছাড় নস্য"। মাগো আমায় বল দে মা, আমায় শক্তি দে মা। আমায় এমন শক্তি দে যাতে আর নস্য স্পর্শ না করি। আমি বড় দুর্ব্বল। আমার সকল দুর্ব্বলতা দূর করে দে মা। তোর চরণ ভরসা। তোর জয় হোক্ মা আমার জীবনে। তুই আমাকে মহাশক্তিধর কর মা। মাগো আমার স্নেহময়ী জননী আমার, দে মা আমায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যাতে আর নস্য গ্রহণ না করি মা। জয় মা মহাশক্তি মা দুর্গা জয় হোক্ মা।

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "আত্মরক্ষা জীব ধর্ম্ম। অর্থাৎ নিজ দেহ রক্ষা করা, নিজ দেহের তুষ্টি বিধান করাই জীব ধর্ম্ম। আহার, নিদ্রা, আনন্দ, আরাম, মৈথুন ইত্যাদি সবই এই দেহ রক্ষা বা দেহের তুষ্টি বিধানের পর্য্যায় পড়ে। এর কোনও পরিমাপ নাই। কারণ, কি দরকার দেহের তুষ্টি বিধানের জন্যে সে

জ্ঞান আত্ম-বুদ্ধি বা আত্মদর্শন না হ'লে জাগ্রত হয় না। আত্মবুদ্ধি বা আত্ম-দর্শনই—আত্মতুষ্টির পরিমাপের সম্যক জ্ঞান দান করে। আত্মদর্শন না হ'লে বুদ্ধি জরাগ্রস্থ থাকে। এই জরাগ্রস্থ বুদ্ধি বাসনা ও কামনাকে সংযত করতে ত পারেই না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেমন তোমার আকাঙ্ক্ষা হ'ল রসগোল্লা খাবার। এর অর্থ রসগোল্লার স্বাদের প্রতি তোমার মনকে ধাবিত করল তোমার ইচ্ছা শক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি। তুমি এক সের রসগোল্লা কিনে একটার পর একটা করে সব গুলো খেয়ে ফেললে। এখানে তোমার বুদ্ধি লোভের দ্বারা স্বৈবাচারী হ'য়ে সব গুলো রসগোল্লা তোমায় ভক্ষণ করালো। ভেবে দেখ একটা রসগোল্লার যে স্বাদ বাকী গুলোরও সেই স্বাদ। একটা খেলেই যখন তোমার সেই স্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় তবে তুমি অতগুলো খেয়ে নিজের পরিপাক শক্তির উপর অযথা গুরুভার চাপালে কেন? একে বলে জরাগ্রস্থ বুদ্ধি। আজ তোমার মাসিক আয় ১০০৲ টাকা। তোমার সংসার যাত্রা অতি ক্লেশে নির্ব্বাহ হ'চ্ছে। তোমার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছা হয় যে যদি তুমি ২০০৲ টাকা মাসে পাও তবে তোমার সংসার স্বচ্ছলভাবে চলতে পারে। কিছুদিন পরে তোমার ২০০৲ টাকা মাসিক আয় হ'ল। তখন তুমি ভাবলে এতেও হ'চ্ছে না। এমনি করে তোমার আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে চলল। একদিন তুমি মাসিক ২০০০৲ টাকা আয় করতে আরম্ভ করলে তবুও তোমার তাতে সঙ্কুলান হোলে না। একি? না, তোমার বুদ্ধি জানে না তোমার কত টাকা হ'লে তুমি একেবারে শান্ত হবে। তাহ'লে এখানেও তোমার বুদ্ধি জরাগ্রস্থ। সমাজে তোমার চলা ফেরার জন্যে, আহার ব্যসনের জন্যে কত টুকু তোমার নিজস্ব প্রয়োজন সেটা তুমি ঠিক করবে তোমার আত্মজ্ঞান দিয়ে। নিজের জন্য যদি পরিমিত সংস্থান কর ও তা ক'রে পরিবারের অন্য সকলের জন্যে যদি তোমার নিজের চাইতে বেশী সংস্থান কর তবে তুমি স্বার্থহীন আত্মদর্শী। কারণ পরিবার তোমার উপর নির্ভরশীল। পরিবারের সুখ সুবিধা তোমার পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। তুমি পরিবারের প্রতিপালক হিসাবে আমার

যারা নিযুক্ত। সেই জন্যে তাদের প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালনে যদি তুমি সমাজ নিয়মের ব্যতিক্রমে অর্থ উপার্জন কর তবেও তোমার উপর গ্লানিরূপ অন্যায় বর্ত্তিবে না। আর যদি দশের সেবায়, আর্ত্তের সেবার জন্য অর্থ উপার্জ্জন কর সামাজিক ন্যায়ের বিরুদ্ধাচারণ করে তবেও তোমার উপর সেই অন্যায় বর্ত্তিবে না। কারণ তুমি নিজে স্বার্থহীন ও তোমার উদ্দেশ্য পরোপকার বা কোনও সদ্-ইচ্ছা ও তাতে তোমার কোনও অন্যায় নাই। স্বার্থহীন যে সদ্-ইচ্ছা সে মূলতঃ সরল ও আমা প্রেরিত। এইখানে তুমি ইচ্ছাযোগে অর্থ উপার্জ্জন করলে। ন্যায় অন্যায় তোমাদের অভিধানে অনেক আছে। কিন্তু আমার অভিধানে ন্যায় একটি ও অন্যায় একটি। ন্যায় হোল নিস্বার্থ আর অন্যায় হ'ল স্বার্থপরতা। তোমার আত্মজ্ঞান হ'লে তোমার নিজের প্রয়োজন কি তা তুমি সম্যক জানতে পারবে। তখন তোমার পরিবারের কতটুকু বেশী অর্থাৎ তোমার থেকে কতটুকু বেশী প্রয়োজন তাদের, সে জ্ঞান তোমার হবে। সেই জন্য অর্থ উপার্জ্জিত হ'লেই হ'ল না তার সঙ্গে আত্মজ্ঞান যদি আসে তবে অর্থের সদ্ ব্যবহার হয়। নিস্পৃহ আত্মজ্ঞানীরও আকাঙ্ক্ষা হয়। তাঁদের রসগোল্লা খাবার আকাঙ্ক্ষা হ'লে একসের রসগোল্লার ভিতরে একটি আস্বাদ করে বাকী সবাইকে খাইয়ে তৃপ্তি পান। এই হ'ল আত্মবুদ্ধি। এই আত্মবুদ্ধিরই আজ সংসারে অভাব। সকলের বুদ্ধিই জরাগ্রস্থ হ'য়ে পড়েছে। এই জন্যই আজ সংসারে বিবাদ, অন্যায়, অবিচার, জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম। আত্মবুদ্ধি জাগ্রত করবার গুরুভার তোমার হস্তে দিয়েছি। তোমাকে চরম সাধনে নিয়োজিত হ'তে হবে। সংসারের এই চরম অভাব মোচনই আমার কাম্য। এই আত্মবুদ্ধি জাগ্রত হ'লেই মানব সমাজ এক মহাপ্রেম পরিবারে গ্রথিত হবে ও পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে তখন জনগণ পরার্থে আত্মনিয়োগ করবে, পর সেবায় আর্ত্তসেবায় ও জীব সেবায় জীবনের চরম ও পূর্ণ সার্থকতা বলে জীবনকে ধন্য করবে। তুমি সাধন কর।

তোমার সকল ভার আমার উপর। কোনও চিন্তা নাই আমি আছি ”।

মা মা আমার আনন্দময়ী জগত জননী মাগো।

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, তোমার সেইরূপ আর একবার দেখাও। মা বললেন “যাদের আমার প্রতি আকর্ষণ হয় তাদের আমার ছায়া মূর্তি দেখিয়ে আমার সাধনে প্রবৃত্ত করি। তারপর সাধন করতে করতে সকল জড়তা, সকল মোহ পাশ যখন ছিন্ন হয় তখন প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত দর্শন দিয়ে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি বিধান করি। তোমার দর্শন বহুভাবে হ'য়েছে। এখন তুমি আমার আলোকে নিমগ্ন আছ ও আলোক দর্শন করছ। উষার আগমনে পূর্ব্ব গগনে যে আলোক সে আলোক সূর্য্যেরই আলোক। সে আলোক যখন দেখ তখন তুমি নিশ্চিৎ জান যে দিন হ'য়েছে ও আর কিছুক্ষণ পরেই সূর্য উঠবে। কিন্তু উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গেই তুমি যদি সূর্য দেখতে চাও তা হয় না। তোমাকে দেরী করতে হবে সেই ক্ষণের জন্যে যে ক্ষণে সূর্য্য উদিত হয়। তোমার অন্তরে যে আলোক এসেছে সে আলোক আমারই আলোক। সুতরাং এ অবধারিত সত্য যে আমি তোমার হৃদয়াকাশে উদিত হ'য়েছি। তবে আমার প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। এ তোমার ইচ্ছাধীন নয়। এ আমার ইচ্ছাধীন কখন ও কবে তোমাকে আমি দর্শন দেব। ফুলের গাচ রোপন করে নিয়ত তার সেবা যত্ন করতে হয়। তার কারণ গাছ সজীব ও প্রাণবন্ত হ'য়ে বড় হ'লে তোমার অভিপ্সিত ফুল তাতে ফুটবে ও তোমার আনন্দ হবে। তেমনি সাধন হ'ল ফুলের গাছ তাকে নানা অভিচারে যথা—দয়ায়, ক্ষমায়, দানে, প্রেমে, ভক্তিতে, বিশ্বাসে, নির্ভয়ে, নির্ভয়ে সেবা যত্ন করে আস্তে আস্তে বড় করে উঠাতে হবে। তারপর আমারূপ পুষ্প যখন তোমার হৃদয়াকাশে ফুটবে তখন তোমার মহানন্দ। এ হবেই। এ যে অবধারিত সত্য। প্রকৃতিগত সত্য। মুক্ত চিত্ত হও, মুক্তাত্মা হও। অর্থাৎ

সামান্য বিষয় চিন্তা, অথ চিন্তা ও সকল অভিলাষ শূন্য হও। আমাকেও অভিলাষ করে সাধনে প্রবৃত্ত হবে না।

অভিলাষশূন্য হওয়া অর্থেই মুক্তচিত্ত হওয়া। আমার সাধন করে যাও। আমার সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যই তুমি পালন করবে। আমার কর্ত্তব্য তোমাকে দর্শন দিয়ে সিদ্ধি দান করা। আমার কর্ত্তব্য ঠিক উপযুক্ত সময়ে আমি পালন করব। তার জন্যে তুমি আকুলী ব্যাকুলী করলেও সময়ের আগে আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করি না। তোমার সেই ক্ষণ যখন আসবে তখনই আমি তোমায় দর্শন দেব তার আগে নয়। কত শত যোগী ও সাধক আছেন তাঁরা কত কঠিন সাধন করছেন কত বৎসর ধরে। কিন্তু তাঁরা আমার দর্শন পান নাই। আবার এমন সাধক আছেন যাঁরা সামান্য সাধনাতেই আমার দর্শন পেয়েছেন। সাধন এক জন্মে হয় না এ কথা তোমায় আগেও বলেছি। সুতরাং আমার প্রতি তোমার যে এই আকুলতা ও তোমার যে সব দর্শন হ'য়েছে তার জন্যে রয়েছে তোমার বহু জন্ম জন্মান্তরের সাধনা। সে সাধনা আমিই একমাত্র নিরীক্ষণ করেছি। সেই প্রস্তুতি আমিই তোমাকে দিয়েছি। তার জন্যে যা দরকার আমিই তোমাকে করিয়েছি। তোমার কিছু করবার নাই। শুধু সাধন কর, মুক্তাত্মা হও। তোমার এ জন্মে যা পাওয়ার প্রয়োজন তা পাবেই। সেটা তোমার জন্য রক্ষিত আছে। যারা মহত্তম আত্মা তারাই তাদের পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ জন্ম পর্য্যন্ত দেখতে পায়। তারও পূর্ব্বের জন্মের কথা তাদের স্মৃতিতে অস্পষ্ট থাকে। তোমার পূর্ব্বেকার চতুর্থ জন্ম দর্শন করেছ। তুমি দেখেছ যে তুমি সাধনই করছ। সাধক রূপেই জন্মে জন্মে সাধন করেছ। তবে তুমি ভয় করছ কেন যে আমার দর্শন পাবে না। এ জন্মের দেহাভিমান, কৃত কর্ম্মের ফল খালন হ'লেই তোমার মোহ মুক্তির পরেই অচিন্তনীয় দর্শন পাবে। মহাশক্তি পাবে ও মহান্ কর্ত্তব্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করবে। এ কথা বার বার বলা নিষ্প্রয়োজন।*

খুব কাঁদলাম। মা বললেন "ছিঃ কাঁদতে নাই। তুমি কাঁদলে যে আমি স্থির থাকতে পারি না। আমাকে তোমার চোখের একফোঁটা জল অস্থির করে। এখন কেঁদো না। সব হবে সময়ে। ক্ষণের জন্যে প্রস্তুত থাক। এখন সংসারের অনেক কর্ত্তব্য আছে। সে গুলো সম্পাদন না করলে ত তোমার ও দিকে যাওয়া হবে না। তোমার অন্তরে গভীর উচ্ছ্বাস আছে, সে উচ্ছ্বাস যদি একবার বাঁধ ভাঙ্গে তবে যে তোমার সংসার, সংসারের কর্ত্তব্য, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, সব ভেসে যাবে। মহানির্লিপ্ত হ'য়ে যাবে। সেই জন্যই আমার অভিপ্রায়ে সে উচ্ছ্বাসের বাঁধ রোধ করে রেখেছি। আগে সংসারের সকল কর্ত্তব্য সমাপ্ত হোক—তোমার পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি যে কর্ত্তব্য আছে সে গুলো পূর্ণ হোক্। তারপর তোমার জীবন যে কি মহা আবর্ত্তন আনবে এই জগতে সেটা কেউ ভাবতেও পারে না—সে এক অচিন্তনীয় মহাভাব, মহাপ্রেম, মহান্ আদর্শ, মহাশক্তি, মহামুক্তি ও মহা প্রেরণা। জগত এক মহাপ্রেম পরিবারে একাকার হ'য়ে যাবে তোমার প্রেম মন্ত্রে। মনে সংশয় রেখো না। সংশয়ই অবিশ্বাস ও সেই মহাপাপ। আমি যা বলি মনে প্রাণে বিশ্বাস কর ও মুক্তাত্মা হও। এগিয়ে চল—। আমার সাধনে, আমার ধ্যানে, আমার চিন্তনে ও আমাতে সর্ব্বার্থ সমর্পন ক'রে। তোমার জন্যে মহা অমূল্য সম্পদ ও মহান্ ঐশ্বর্য্য আছে যে ঐশ্বর্য্যের তুলনা হয় না। আজ পর্য্যন্ত কোনও মানব যে ঐশ্বর্য্যের কথা চিন্তাও করে নাই। বিশ্বাসী হও, নির্ভয় হও। তোমার সকল ভার আমায় হাতে দাও ও নিশ্চিন্ত মনে সাধন করে যাও। কোনও চিন্তা নাই, কোনও ভয় নাই। আমি আছি।"

মাগো তুই আমাকে কোলে নে মা। আমি বড় দুর্ব্বল। তোর অবাধ্য ছেলে মা। আমাকে বল দে, প্রেম দে, শিক্ষা দে মা।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, কিছু জ্ঞানের কথা বল মা। মা বললেন "জীবনে প্রসঙ্গ অভিলাষ কর" এর তাৎপর্য্য ত বুঝলাম না। ভাল করে বুঝিয়ে দাও। মা বললেন "প্র" অর্থে সম্প্রসারণ। যেমন 'প্রবন্ধ' অর্থে 'বন্ধ'

যা তাকে সম্প্রসারিত করাই হ'চ্ছে 'প্রবন্ধ'। তোমার অন্তরে যে ভাবধারা বন্ধ অবস্থায় আছে তাকে তোমার ভাষায় মূর্ত্ত বা ব্যক্ত বা সম্প্রসারিত করার অর্থই প্রবন্ধ। "প্রবুদ্ধ" বুদ্ধ অর্থ প্রজ্ঞাজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান ও সেই জ্ঞান যখন সম্প্রসারণ লাভ করে তখন তাকে 'প্রবুদ্ধ' বলে। তেমনি 'প্রসঙ্গ' অর্থ 'সঙ্গ' যা, তাকে সম্প্রসারিত করাই 'প্রসঙ্গ'। প্রতি ব্যক্তির জীবনে 'সঙ্গ' কি? ব্যক্তিগত জীবনে "অভিজ্ঞতাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গ। এই 'অভিজ্ঞতাই' প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র নিজস্ব সঙ্গ ও প্রিয়। সজনে, নির্জ্জনে প্রত্যেকে এই 'সঙ্গ'কে আপন অন্তরে গোপনে ধারণ করে তাকে দেখে, তার সঙ্গে আলাপ করে ও তার ভবিষ্যতের চলার পথে সেই 'সঙ্গ'কে প্রহরী রেখে সংসারে যাত্রা করে। প্রতি জীবের জীবনেই এই 'সঙ্গ' বা অভিজ্ঞতা তার ভবিষ্যৎ চলার পথে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এই "সঙ্গ" ছাড়া কোনও মানব বিদ্যা, জ্ঞান, যশ, মান, অর্থ, বিত্ত এক কথায় কিছুই লাভ করতে পারে না। সংসারে বিষয় লাভ করতে হলেও এই "সঙ্গ" প্রয়োজন। আবার সাধন ক্ষেত্রেও এই "সঙ্গই" একান্ত প্রয়োজনীয়। একটি অট্টালিকা গড়তে হ'লে ইষ্টকের প্রয়োজন। এই ইষ্টক একটির পর একটি সমান ভাবে সাজাতে হয় ও তাকে বাঁধতে হয় চুন, সুরকি, সিমেণ্ট, জল, বালি ইত্যাদির মিশ্রিত দ্রব্য দিয়ে। যখন অট্টালিকা তৈরী হ'তে থাকে তখন, সেটা সম্পূর্ণ হ'লে কেমন দেখতে হবে তার কোনও ধারণা লোকের মনে হয় না। কিন্তু সেটা যখন সম্পূর্ণ হয় তখন বিশ্বাস হয় যে এ একটি সুন্দর অট্টালিকা। "ইষ্টক' হ'চ্ছে "সঙ্গ" চুন, সুরকি ইত্যাদি হোল বুদ্ধি, বিবেক, সংযম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, দয়া, প্রেম ইত্যাদি। আর সম্পূর্ণ অট্টালিকা হ'ল বিশ্বাস। বুদ্ধি, বিবেক, সংযম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, তিতিক্ষা, প্রেম দিয়ে যে বিশ্বাসরূপ অট্টালিকা তৈরী হ'ল তাতে জীবাত্মার আবাস হয়। এই বিশ্বাসই জীবের শ্রেষ্ঠতম আবাস ও সেই আবাস তৈরী হয় "সঙ্গ" রূপ অথবা 'অভিজ্ঞতা' রূপ ইষ্টক দ্বারা। কেউ কেউ লোহার খাঁচা বা ফ্রেমের উপরে ইষ্টক ইত্যাদি দিয়ে অট্টালিকা তৈরী করে গভীর বিশ্বাসে বাস

করে। কারণ সে ভাবে এত শক্ত করে বাড়ী গ'ড়েছি যে ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্পেও বাড়ীর কিছু হবে না। লোহার ফ্রেমের অভিজ্ঞতাই তাকে সে বিশ্বাস প্রদান করে। তেমনি ভগবৎ নির্ভররূপ লোহার ফ্রেমে যদি বিশ্বাস গৃহ তৈরী হয় তবে সাধকের সিদ্ধি; সে আর কিছুর ভয় করে না। তাই বলেছি "প্রসঙ্গ" অভিলাষ কর জীবনে। "প্রসঙ্গ" যারা জীবনে পূর্ণভাবে জ্ঞান দ্বারা গ্রহণ করে তারা সংসারে জয়যুক্ত হয়। কি সাধন পথে, কি সংসার পথে। তুমি এই প্রসঙ্গ জীবনে গ্রহণ কর। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ কর।"

মাগো মা আমায় আরও জ্ঞান দে মা।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "বহির্দৃষ্টি সংযত ক'রে অন্তর দৃষ্টিতে প্রবাহিত কর।" আমি বললাম সোজা করে বুঝিয়ে দাও মা' ঠিক বুঝতে পারলাম না। মা বললেন, "রাস্তায় চলেছ, দেখলে একটা কুকুর ও একটি কুক্কুরী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সঙ্গমে আবদ্ধ হ'য়েছে। তুমি বাহ্য দৃষ্টিতে দেখলে ও তোমার মনে কাম চিন্তার সূত্র খুলে গেল। এই যে তোমার বহির্দৃষ্টি এতে তোমার স্থূলতাকে জাগরিত করল। কিন্তু তুমি যদি এই পরিবেশকে অন্তর দৃষ্টিতে প্রবাহিত ক'রে বিচার কর তবে তোমার নিকট কি প্রতিভাত হয়? তুমি জান কুকুরগণ বৎসরে দুইবার কামার্ত্ত হয়। কুকুরী যখন সন্তান ধারণের জন্যে প্রকৃতিগত গূহ্য কারণে কামার্ত্ত হয় তখন সে কুকুরের অনুসন্ধান করে। কুকুরীটির কাম স্পৃহায় কুকুরের কাম স্পৃহা জাগ্রত হয়। ও সে কাম সেবার দ্বারা সৃষ্টি কার্য্যের সহায়তা করে। কুকুরী কামার্ত্ত না হলে কুকুরও সম্পূর্ন কামার্ত্ত হয় না। আর যদি বা হয় কুকুরী তাকে তার নিকট অগ্রসর হ'তে দেয় না। একদিন কামসেবা করে কুকুরীর গর্ভসঞ্চার হয় ও সে আর কুকুরের কাছেও যায় না বা কুকুরকে তার কাছে আসতে দেয় না। সুতরাং প্রকৃতিগত কারণে সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই কামের প্রয়োজন। যে কোনও মনুষ্যেতর জীবের ভিতরে এই ধারা তুমি লক্ষ্য করবে। তারা প্রকৃতির অত্যন্ত নিকটতম ও প্রকৃতি যা চায় তারা

তাই দিয়ে থাকে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তারা যেতে পারে না। যে কোন মেয়ে পশু যে কোনও পুরুষ পশুর সঙ্গে একত্র বসবাস করলেও বৎসরে একবার কি দুইবার কি ততোধিকবার, যার যার প্রকৃতিগত নির্দিষ্ট সময়ে সে সঙ্গম লিপ্সা করে। তার গর্ভ সঞ্চার হ'লেই সে তার গর্ভ ধারণ করে ও তার কাম স্পৃহা বিদূরিত হয়। সন্তান যখন হয় তাকে রক্ষা করে ও সন্তান বড় হ'য়ে যখন তার নিজের চেষ্টায় তার আহার্য্য সংগ্রহ করে তখন আবার সেই পশুমাতা নির্দ্ধারিত সময়ে কামার্ত্ত হয় ও গর্ভ ধারণ করে। এই যে উদাহরণ দিচ্ছি এর অর্থ হ'চ্ছে তোমার অন্তর দৃষ্টি যদি প্রবাহিত থাকে বা উন্মুক্ত থাকে তবে তুমি কি জ্ঞান লাভ করবে ? তুমি জানবে যে কাম শুধু সৃষ্টি কার্য্যের সহায়তা করবার একটা স্পৃহা মাত্র। স্পৃহা শুধু সৃষ্টি কার্য্যই করবে। এই মানসিক ইচ্ছা দেহজাত হ'য়ে দেহের লিঙ্গকে সঞ্চারিত করে। লিঙ্গ সঞ্চারিত হ'লে বীর্য্য স্খলন হ'য়ে নারী-জাতির যোনিদ্বারদ্বারা প্রবেশ ক'রে গর্ভ সঞ্চার করে। গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পরে পুরুষবীর্য্য দ্বিতীয়বার নারী দেহে প্রবেশ প্রকৃতি বিরুদ্ধ। অথবা নির্দ্ধারিত সময় ব্যতিরেকে নারী সহবাস প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও অমঙ্গল কারক। অথবা নর-নারীর সঙ্গম হবে অথচ গর্ভ সঞ্চার হবে না এ গর্হিত ব্যবস্থাও মানব সমাজের প্রভূত ক্ষতিকারক। তখন তোমার অন্তর দৃষ্টিতে তুমি এই জ্ঞান লাভ করলে যে প্রকৃতিগত কারণে অথবা আমার নিয়মে জীব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই কামের সৃষ্টি। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নয়। এই ভাবে প্রতিটি প্রকৃতিগত ব্যবস্থাকে বহির্দৃষ্টির সাহায্যে গ্রহণ ক'রে অন্তর দৃষ্টিতে প্রবাহিত করে জ্ঞান লাভ কর। আমি পরা প্রকৃতি ও আমার বিধান সবই আমার মঙ্গল বিধানে নিয়োজিত জানবে। সেই মঙ্গলের স্বরূপকে উপলব্ধি কর তোমার অন্তর দৃষ্টি দিয়ে। স্থূল ভাবের যে দৃষ্টি সেই তোমাকে অন্তর দৃষ্টির উন্মেষকে সহায়তা করবে। স্থূলের ভিতর দিয়ে সূক্ষ্মের স্বরূপকে উপলব্ধি করে আপন অন্তরে বিচার করলে স্থূলতারূপ অভিব্যক্তির অন্তরালে আমার মহান্ নির্দ্দেশ ও আমার গূঢ়তম বিধানের আদর্শকে প্রাণে অনুভব করে নিজের ও সকলের

প্রকৃতিগত জীবনের নিগূঢ় সত্য পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারবে। তাই বলি অন্তর-দৃষ্টিকে প্রবাহিত কর।

মা আমায় কত শিক্ষা দিচ্ছিস্ মা। তোর করুণা অপার। আমার মা।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, কিছু জ্ঞানের কথা বল মা। মা বললেন, "আজ তোমাকে বিষয় সম্বন্ধে বলব"। আমি বললাম, সেকি কথা, বিষয় কি আর একটা জ্ঞান? মা বললেন, "সংসার, বিষয়, অর্থ এ সকল বিষয় সম্যক্ জ্ঞানও ব্রহ্মজ্ঞান। এবার শোন, অর্থ, বিত্ত, সম্পদ সবই আমি প্রদান করি। আমি ছাড়া এই ব্রহ্মাণ্ডে এমন আর কেউ নাই যে তোমাকে এক কণা ধূলিও দান করতে পারে। যেখান থেকে যা পাও, যার কাছ থেকে যা পাও সবই আমার দান ও আমার ইচ্ছায় হয়। আমার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না। সবই আমার। আমার জিনিষ নিয়ে তোমরা নাড়াচাড়া কর। তোমাদের মুদ্রা তৈরী হয় আমার দেওয়া খনিজ, তামা, সোনা ইত্যাদি থেকে। পৃথিবীতে যত কিছু আছে, যান, বাহন, যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, ইস্পাত সবই আমার সেই প্রাকৃত বস্তু থেকে। আমার দেওয়া সম্পদকেই তোমরা নানা প্রকার উপাদানে আকারে, আধারে, ব্যবস্থায় তৈরী করে নিয়েছ ও নিচ্ছ। এই যে তোমাদের সৃজনী শক্তি, এই যে তোমাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান এও আমারই দান। সেই জ্ঞানের আধার যে দেহ সেও আমার দান। মূল-ধনভাণ্ডার আমার ও মূল সৃজনী শক্তি তোমার ভিতরে, সেও আমার। তবে তোমার কি আছে? তোমার এমন ক্ষমতা নাই যে আমার সাহায্য ব্যতিরেকে কিছু সৃজন করতে পার। মাতৃ স্তন্যের দুগ্ধের যে ধারায় শিশুর দেহ পরিপুষ্ট হয় সেইরূপ ধারাতেই আমার সম্পদ আমার স্তন-দুগ্ধসম তোমাদের সংসার রক্ষা করছে। গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখ মাতৃবক্ষে স্তনদুগ্ধও যা আমার প্রাকৃত সম্পদও তাই। ইহাই আমার রক্ষণ ও পালনরূপ দুগ্ধ।

দশ সের ধান যদি এক টাকা হয় তবে তার তুল্য মূল্য করলে দশ সের ধানই সত্য। টাকার কোনও মূল্য নাই যদি তা' দিয়ে তোমার আহার্য্যের বা প্রয়োজনের দ্রব্য তুমি সংগ্রহ করতে না পার। এমন সময় আসে যখন কোটি কোটি অর্থের বিনিময়ে এক মুষ্টি অন্ন অনেক বড় জীবন রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হয়। এক গেলাস জলের জন্য সহস্র স্বর্ণ মুদ্রাও দিতে কুণ্ঠিত হয় না তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি। তবে আমার প্রাকৃতিক সম্পদই মূল্যবান্ ও তার জন্যই অর্থ। আমার দেওয়া আনন্দ উপভোগ করবার জন্যই অর্থের প্রয়োজন। আমার দেওয়া ক্ষুধার উপশমের জন্য অর্থের প্রয়োজন। তায় আবার সেই আনন্দ ও ক্ষুধার জন্য যে জিনিষ অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ কর তাও আমারই দেওয়া সম্পদ।

এই যে অর্থ এও আমারই দান। এই অর্থ সঞ্চয় ও সদ্ ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন"। আমি বললাম, অর্থ সঞ্চয়? সে কি মা? তুমি না বলেছ সঞ্চয় করবে না, আমার উপরে পূর্ণ নির্ভর করে থাকবে। মা বললেন, "না, এ সত্য নয়। যে ব্যক্তি একক ও আমার প্রতি একনিষ্ঠ ও যার উপরে কোনও পরিবার, পরিজনের বা দশের জন্যে আমি কোনও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করি না সে ব্যক্তি সঞ্চয় করবে না। তার নিজের জন্য পূর্ণ বিশ্বাসে ও নির্ভরে সে আমার উপরে সব ছেড়ে দেবে তার সঞ্চয়ের প্রয়োজন নাই। সে আমার একান্নবর্ত্তী। অর্থাৎ সে ও আমি এক। অর্থাৎ সে চায় আমি দিই, আবার আমি চাই সে দেয়। আবার আমি না চাইতেই সে দেয় এবং সে না-চাইতেই আমি দিই। কিন্তু যাদের উপরে পরিজনের, দশজনের কর্ত্তব্যের ভার দিয়েছি সে ব্যক্তি অর্থের সদ্‌ব্যবহার করবে ও সময়ে সঞ্চয় করবে। যেমন ধর আজ তোমাকে আমি দশ টাকা দিলাম। তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ইত্যাদির ভরণ পোষণের কর্ত্তব্য তোমার উপরে। এই দশ টাকা পেয়ে তুমি কিছু মদ্ খেয়ে খরচ করলে, কিছু দান করলে, কিছু হারিয়ে ফেললে। অথচ তোমার পরিবারের প্রয়োজনীয় অন্নের ব্যবস্থা করলে না। এ তোমার অন্যায়। এই অন্যায়ের জন্যে যে কয়টি টাকা তুমি অসদ্ভাবে

ব্যয় করলে সেই কয়টি টাকার অভাব তোমার জীবনে একদিন না একদিন হবেই। তুমি পাঁচশত টাকা পেলে ব্যবসায়। সেই টাকা তুমি এমন অমনোযোগী হ'য়ে পকেটে রাখলে যে রাস্তায় পকেটমার সে টাকা নিয়ে গেল। অথবা সে টাকা এনে তুমি এমন একটি খোলা বাক্সে অত্যন্ত অসাবধানতায় রাখলে যে চুরি হ'য়ে গেল। এ তোমার অন্যায় ও এর জন্যে কেবল মনোকষ্ট নয়, নানা প্রকার জটিল সমস্যায় তুমি পড়লে ও এক সময় তোমার জীবনে আসবে বা তোমার পরিবারের জীবনে আসবে যখন তোমার বা তাদের অভাবগ্রস্থ হ'তে হবে নিশ্চিত। সুতরাং অর্থ যখন আসবে তখন তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করবে আমার দান বলে। তাকে সযত্নে রক্ষা করবে আমার আশীর্ব্বাদ মনে করে। কোনও কারণে তাকে অশ্রদ্ধা করবে না। তার সদ্ব্যবহার করবে। তোমার পরিবারের ভরণ পোষণ সবচেয়ে আগে করবে। তারপরে অন্য দশজনের জন্যে করবে। যারা তোমার উপরে নির্ভরশীল বা যাদের উপজীবিকা তোমার উপরে নির্ভর করে তাদের প্রতি সযত্নে কর্ত্তব্য করবে। কৃপন হ'য়ে অর্থ সঞ্চয় করবে না। প্রকৃত প্রয়োজন কি সেটা কর্ত্তব্য-জ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত হও। অনেক ব্যক্তিকে আমি প্রচুর অর্থ প্রদান করি কারণ জানি তাদের দ্বারা বহুলোক উপকৃত, পালিত ও রক্ষিত হবে। আবার সেই লোক যদি অর্থের অপব্যবহার করে তবে তার জীবনে বা তার পরবর্ত্তী জীবনে বা তার পুত্র-পৌত্রের বা প্রপৌত্রের জীবনে অর্থের অভাব হবে নিশ্চিত সত্য। এ প্রমান ইতিহাসে পাবে। এক ব্যক্তি পাটের ব্যবসায় প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হ'ল। এই অর্থ আমারই দান ও সে দান আমারই সম্পদ থেকে। এই অর্থের বিনিময়ে সম্পদ ও সম্পদের বিনিময়ে অর্থ। সুতরাং অর্থ ও সম্পদ এক পদবাচ্য। তোমার অর্থের অভাব হ'য়েছে। এ অভাব তোমার দোষে। তুমি জ্ঞানে কর অজ্ঞানে কর কারখানার অর্থ সদ্ভাবে ব্যয় কর নাই। কারখানার পরিচালনা করতে পার নাই। তাই আজ তোমার অর্থের অভাব হ'য়েছে। এই অভাব হ'য়েছে বলেই তোমার অর্থ বিষয়ে

সতর্ক দৃষ্টি হ'য়েছে ও কারখানার পরিচালনার ভার তুমি নিজে নিয়েছ। এখন কারখানা ঠিক চলবে ও তোমার প্রচুর অর্থ আসবে। কোনও চিন্তা করো না। কোনও অসুবিধায় পড়বে না। আমি আছি ভাবনা নাই। জয় দয়াময় বল, জয় করুণাময়ী বল। মাভৈ মন্ত্রে দীক্ষিত হও।"

মা মা মা মা দয়াময়ী মা আমার।

২৬শে মার্চ্চ, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

ক'দিন হোল মার মুখখানা ভার। কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেন কিন্তু মুখ ভার করে। আমার উপরে অভিমান করেছেন। কেন অভিমান করেছেন জানি না। নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় করেছি। রোজ রোজ যেমন কত কথা বলেন এখন আর তেমন বলেন না। আজ সকালে বললাম কিছু বল মা। মা বললেন' "সঞ্চরণশীল জীবনে বিহিত কর্ম্মপ্রবাহকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। বিশ্বাস এক। কিন্তু তার বিভিন্নতা আছে। যেমন অত্যন্তিক বিশ্বাস, বিশ্লেষাত্মক বিশ্বাস, প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস ও জীবন্ত বিশ্বাস। অত্যন্তিক বিশ্বাস হোল অন্ধ বিশ্বাস। যে কোনও বিষয়ে অতি মাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন করা। চিরাচরিত বা ধারাবাহিক কোনও বিষয়ে লোক পরম্পরায় যে বিশ্বাসের প্রবাহ চলে আসছে সেই বিষয়ে বিশ্বাস। যেমন গঙ্গায় স্নান করলে স্বর্গবাস হয় ও সকল পাপ দূর হয়। কাশীতে মৃত্যু হ'লে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, যে কোনও শীলাখণ্ড কোনও তীর্থস্থানে স্বয়ং প্রত্যক্ষ দেবতা ইত্যাদিতে অত্যন্তিক বিশ্বাসকে বলে অন্ধ বিশ্বাস। এর বিচারে যায় না। কেউ বিপরিত কথা বললে আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়, বলে একি হ'তে পারে ? এযে জাগ্রত দেবতা। কত যুগ ধ'রে হাজার হাজার লোক একে জাগ্রত দেবতা বলে জেনেছে আর আজ আমি একে শুধু শীলাখণ্ড বলে ভাবব ? অসম্ভব। এই হোল অত্যন্তিক বিশ্বাস। এতে আমাকে লাভ করা যায় না।

বিশ্লেষাত্মক বিশ্বাস হোল আমাকে বিশ্লেষণ দ্বারা বিচার করে তবে বিশ্বাস। যেমন শাস্ত্র আলোচনার ভিতর দিয়ে আমার অস্তিত্বকে স্বীকার

করা। যে হেতু বেদ-বেদান্ত, পুরাণ ইত্যাদি আমার অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করে গেছে সেই হেতু ভগবান আছেন। যে হেতু গীতায় আমাকে নারায়ণরূপী ক'রে আমার অস্তিত্বের প্রমাণ করবার চেষ্টা হ'য়েছে, এত বিশ্লেষণ করা হ'য়েছে তবুও কি বলব ঈশ্বর নাই ; এই বিচার যখন মনে আসে তখন তোমাদের বিশ্লেষাত্মক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসেও আমাকে পাওয়া যায় না।

তারপর প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস। ঈশ্বর ত' আছেনই। তা যদি না হোত তবে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ এ সব কে সৃষ্টি করলেন ? তিনি আছেন থাকুন কিন্তু আমার কার্য্যে তাঁর হস্তক্ষেপ করবার প্রয়োজন কি। এই ত কত অর্থ, কত আরাম কতভাবে আমার আজ্ঞাবহ লোক আমার কথায় উঠচে, বসছে। নানা ভাবে ছলে বলে কৌশলে আমি কত কাজ করছি, কত উপার্জ্জন করছি, কত ক্ষমতা লাভ করছি। এ সবতো আমাকে করতেই হবে, দলের জন্যে, স্বার্থের জন্যে, নিজের সুখের জন্যে, পরিবারের আরামের জন্যে এতে কোনও দোষ নাই। দোষ যদি হয় তবে ক'দিন হরিসংকীর্ত্তন করব নানা সাধুদের অর্থ দেব, দান করব, তা হলেই ঈশ্বর আমার দোষ নেবেন না ও আমার অন্যায় ক্ষমা করবেন ইত্যাদির চিন্তা হ'ল প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস। এ বিশ্বাস নিকৃষ্টতম। এতে আমাকে উপেক্ষা করা হয় ও নিজ ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। এ বিশ্বাসে লোক জন্ম জন্মান্তর ঘুর্ণিত হয় ও তার সকল সুকৃতি বিনষ্ট হয়। এই জন্যেই তার মহাশোক ও মহাবিপদ উপস্থিত হয়।

"জীবন্তবিশ্বাস" অর্থ বিশ্বাস যখন প্রাণধর্ম্মী। প্রাণ যেমন সকল জীবের কাছে প্রিয়তম বস্তু, এই জীবন্ত বিশ্বাসও তেমনি বিশ্বাসীর কাছে প্রিয়তম বস্তু। সে আমাকে প্রতিনিয়ত নিশ্বাসে প্রশ্বাসে গ্রহণ করে। পানাহারে আমাকে গ্রহণ করে। প্রতি কর্ম্মে প্রতি অবস্থায় আমার উপস্থিতি, আমার সান্নিধ্য অনুভব করে। প্রতিক্ষণে আমাকে চিন্তা করে। প্রতি ভাবে আমাকে ভাবে। প্রতি কর্ম্মপ্রবাহে আমার মঙ্গল হস্ত দর্শন করে। প্রতি জীবে আমাকে প্রত্যক্ষ করে। তার জগত আমাময় হ'য়ে যায়। তদ্‌গত চিত্ত হ'য়ে আমার নিয়ন্ত

ধ্যানে আত্ম সমাহিত রাখে। তার কর্ম্মপ্রবাহ তখন বিহিত হয়। এই বিহিত কর্ম্মপ্রবাহ তার বিশ্বাসপ্রবাহ হ'য়ে দাঁড়ায়। সঞ্চরণশীল জীবন তখন তার ফল্গু-নদীর মত বিশ্বাসরূপ কর্ম্মপ্রবাহে অথবা কর্ম্মরূপ বিশ্বাস প্রবাহের ধারায় উচ্ছল হ'য়ে আমার দিকে ধাবিত হয়। সকল কর্ম্ম তখন তার আমাময়। জীবন প্রবাহ তখন তার ব্রহ্মপ্রবাহ। কর্ম্মপ্রবাহ তখন তার ঈশ্বর সত্তায় অনুপ্রাণিত হয়। এই হোল শ্রেষ্ঠতম। তাই তোমাকে বলেছি "সঞ্চরণশীল জীবনে বিহিত কর্ম্মপ্রবাহকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। তার অর্থ জীবন্ত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমাময় হ'য়ে যাও। সংশয় রেখো না। আরও সাধন কর। উচ্চ থেকে উচ্চে উঠে যাও। ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, অর্থ, বিত্ত, গৃহ সব হবে কোনও চিন্তা করো না। আমামুখিন হও সর্ব্ব অন্তরে।"

জয় মা আনন্দময়ী জননী মা আমার জ্ঞানদায়িনী জননী। জয় মা জয় মা জয় মা।

২৭শে মার্চ্চ, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, কিছু জ্ঞানের কথা বল মা। মা বললেন, "শোন, দয়াই জীবের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। দানেই দয়ার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি। জ্ঞান দান, ধন দান, সদুপদেশ দান, বিশ্বাস দান, বিবেক দান, ধর্ম্ম দান, কর্ম্ম দান, দৃষ্টি দান, প্রাণ দান, প্রেম দান, ভক্তি দান, আরোগ্য দান, ইত্যাদি বহুপ্রকার দান আছে। এর ভিতর শ্রেষ্ঠতম হোল জ্ঞান দান, তারপর বিশ্বাস দান, তারপর বিবেক দান, তারপর প্রেম দান, তারপর ভক্তি দান, তারপর ধর্ম্ম দান, তারপর প্রাণ দান, তারপর দৃষ্টি দান, তারপর আরোগ্য দান। মানব জীবনে অজ্ঞানতাই হোল মৃত্যুসম। এই অজ্ঞানতার বশেই লোক যতপ্রকার কুকার্য্য করে। এই অজ্ঞানতার প্রভাবে মানবের অধোগতি হয়। এই অজ্ঞানতার প্রভাবে মানবগণ মৃতকল্প হ'য়ে থাকে। বিদ্যা, যশ, স্বাস্থ্য, সম্পদ, আহরণ করেও আত্মসাক্ষাৎকার না পেয়ে মানবগণ অবিদ্যার বশবর্ত্তী হ'য়ে মহাকুহকে পতিত হয়। কার্য্য অকার্য্যে ভেদ বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। অকার্য্যকেই

কর্ত্তব্য বলে মনে করে ও নিরতিশয় দুঃখ পায়। সেইজন্তে জ্ঞান দান সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান দান করলে মানব অন্তরে এক অভিনব জিজ্ঞাসার উদয় হয়। তখন বিশ্বাস. বিবেক, প্রেম, ভক্তি, ও ধর্ম্ম প্রদান করতে হয়। তখন সে সত্যিকারের প্রাণ পায়। তারপরেই তার দিব্য দৃষ্টি খুলে যায় ও ভূরোগ ও ভবরোগ থেকে সে আরোগ্যলাভ করে। এ দানের মর্য্যাদা অতি উচ্চ। যে দান করে সে মহাশান্তি ও যে দান গ্রহণ করে সে চির কৃতার্থতা লাভ করে। ধন দানে কর্ম্ম দানে যেমন দাতা মুক্ত ও গ্রহীতা ঋণী হয় জ্ঞান দানে দাতাও মুক্ত গ্রহীতাও মুক্ত। দান দয়ারই আশ্রিত কিন্তু দয়াকে গৌরবান্বিত করে। আমার স্বভাব দয়া ও দানই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আমি সবই দান করি। যা কিছু তোমরা পাও সবই আমারই দান। আমার দানের মর্য্যাদা যদি তোমরা দাও তবে আমার দয়াকেই গৌরবান্বিত করে। আমার যা শ্রেষ্ঠতম বা একমাত্র স্বভাব সেইটাই সংসারে তোমাদেরও শ্রেষ্ঠতম স্বভাব হওয়া প্রয়োজন। আমার স্বভাবের ভাবকে জীবনে প্রবাহিত করলে আমার নিকটতম হ'তে পারবে ও আমার ইচ্ছা কি সেটা বুঝতে পারবে। একেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে। নিজে যদি এই জ্ঞানের অধিকারী হও তবে জনগণের অন্তরে আমার সেই জ্ঞান বিতরণ করা তোমার পক্ষে সহজ হবে। মানবগণ তোমাকে বুঝতে পারবে ও তোমার জ্ঞান গ্রহণ করবে। দয়া হবে কখন, যখন দেখবে মানব মোহগ্রস্থ হ'য়ে আমাকে ভুলে অবিদ্যায়, মোহে, জড়তায় আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে, তখন তোমার দয়া হবে ও সেই দয়ার পরেই তোমার দান করবার বাসনা হবে। কি তুমি দান করবে? দান করবে জ্ঞান। তারপর অর্থ কর্ম্ম, আরোগ্য যার যা প্রয়োজন দান করবে। তোমার কাছে অগণিত নরনারীর জনতা প্রতিনিয়ত ভীড় করে থাকবে। সকলেই তোমার দয়া চায় ও দান গ্রহণ করতে চায়। কি যে তোমার জীবনে হবে আর কি যে হবে না তা তোমার জানা নাই। কিন্তু মহাসম্পদ তোমার জীবনে আসবে। এই সম্পদ এত উচ্চতম যে আজ পর্য্যন্ত কোনও মানব তার সামান্যতম অংশও লাভ করতে পারে নাই। তোমার অর্থে পরমার্থে একাকার

হ'য়ে যাবে। দেহে থেকে বিদেহী হ'য়ে যাবে। তোমার ক্ষণ-দৃষ্টিতে মহা কঠিন রোগ আরোগ্য হবে। তোমার একটি কথা মহাসত্য হ'য়ে যাবে। যা বলবে তাই হবে। এ এক অলৌকিক পরিবেশ হবে যাতে এই পৃথিবীর সকল মানব স্তম্ভিত ও সন্মোহিত হ'য়ে যাবে। দয়া ও দান এই দুই মহা সম্পদকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত কর ও এদের সেবা কর। আমার করুণা তোমার জীবনে মহা উৎস হ'য়ে তোমার সকল জড়তা, তোমার সকল পাপ-পুঞ্জ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি আমাময় হ'য়ে যাবে। তুমি আর আমি মহাপ্রেমে একাকার হ'য়ে যাব এই সংসারে এই ধরণীতে জীব উদ্ধারের মহা কর্ম্মে। জাগ্রত হও—"।

মাগো একি বললে আমাকে? কি বলতে কি বললে মা?

১০ই এপ্রিল, ১৯৫৮ খৃঃ. কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার যে এই অবস্থা হ'য়েছে তাতে ত' আমার মনে হ'চ্ছে যে আমার অধোগতি হ'য়েছে। আগে যেমন স্বর্গের নানা দৃশ্য দেখতাম, সাধু মহাত্মাদের দেখতাম এখন আর সে সব দেখতে পাই না। কেবল অর্থ আর অর্থ করে নানা বিষয়ে একেবারে মগ্ন হ'য়ে আছি। এ আমার কি অবস্থা? মা বললেন, "অবস্থান্তর প্রাপ্তিই স্বভাব ধর্ম্ম। এই যে স্বভাব ধর্ম্ম এর অধোগতি নাই। যদি স্বভাব আপন ধর্ম্মে সাধন মার্গে চলে তবে তার উর্দ্ধগতি ছাড়া নিম্নগতি হয় না। তোমার দেহের অন্ত্র যেমন আপন স্বভাবের নিজস্ব প্রভাবে দেহের স্বভাবজাত কর্ম্ম করে, যেমন বাহ্য, প্রস্রাব ইত্যাদি তেমনি সূক্ষ্ম দেহও আপন নিজস্ব প্রভাবে সাধন পথে নিজ কর্ম্ম ক'রে যায় ও তা উন্নতির পথেই হয়। দেহ যেমন স্বভাবে আস্তে আস্তে বড় হয়, দেহের ও আত্মার শক্তি; মনের বল ও জ্ঞান আহরণ করে তেমনি আত্মা সে সব গ্রহণ ক'রে উন্নতি করে। দেহ আধার বলে তার সাহায্যে আত্মার জ্ঞান, বল সব কিছু লাভ হয়। যৌবনে যে মনের শক্তি হয় বাল্যের চাইতে সে শক্তি অনেক বেশী। যৌবনে যে দেহের শক্তি হয় সে শক্তি বাল্যের চাইতে বেশী।

দেহ স্থূল ব'লে ক্রমে শক্তিহীন হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আত্মা সূক্ষ্ম বলে ক্রমেই শক্তিশালী হয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। বৃদ্ধের বিচার বিবেচনা যুবকের চাইতে অনেক স্থির ও জ্ঞানপূর্ণ। তোমার যে গতি সেও উর্দ্ধে চলেছে। আগে যা দেখতে সে গুলো নিম্ন স্তরের। তুমি এখন আরও উর্দ্ধে চলেছ। তোমার পরিক্রমা এখন ক্রমেই উর্দ্ধ দেশে। শিঘ্রই তোমার আত্মিক দর্শন সর্ব্ব সময় প্রাপ্ত হবে। এই আত্মিক দর্শন বেশ কিছুদিন স্থির ভাবে চলবে ও ক্রমে ক্রমে সেটা এমন স্বভাব জাত হ'য়ে যাবে যে ক্রমে আমার দর্শন তোমার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক হবে। এমনি হ'তে হ'তে তোমার এমন অবস্থান্তর হবে যে তুমি আমাতে মগ্ন হ'য়ে দেহ দৃষ্টিতেই সর্ব্ব অবস্থায় সকলখানে আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করবে। আমাকে স্মরণ করলেই আমি তোমার সামনে এসে দাঁড়াব। এ-সাধনের শ্রেষ্ঠতম পর্য্যায় যা আজ পর্য্যন্ত কোনও সাধকের হয় নাই। তোমার গতি ও শক্তি অতি ধীরে ধীরে উর্দ্ধগতি লাভ করছে। তাড়াতাড়ি হবে না। অতি আস্তে আস্তে হবে। দেখ স্থূল দেহ কেমন অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয় এতে তোমরা অতি আস্তে ও তোমাদের অজ্ঞানিতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হও। সেটা তোমরা কিছুই টের পাও না। তেমনি সাধনে অতি ধীরে ধীরে অবস্থান্তর হয়। তাতে সাধকের মঙ্গল। প্রত্যেকটি অবস্থা অতি ধীরে হয় বলে তার দেহের ও আত্মার পরিবর্ত্তন স্বভাব পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। তা না হ'লে হঠাৎ কিছু হ'লে হয় সাধক পাগল হ'য়ে যায় না হ'লে কোনও উৎকট ব্যাধি হয়। যে ভাবে সাধন করছ করে যাও। অর্থের জন্যে আজ যে তোমার পরিশ্রম ও পূর্ব্বের পরিশ্রম সার্থক হবে। আমি কি দেখছি না যে তুমি কি করছ? তোমার সব কর্ম্ম ও সব কিছুর ফল ফলবেই। আমি তার তুল্য মূল্য করব। যে সব খর্ব্বতা, বা দুর্ব্বলতা মাঝে মাঝে আসে সেটা স্বভাব জাত মনে করবে। তারও দরকার আছে ও সে গুলো আমার ইচ্ছায় হয়। সাধনের সময়ে সে সব না এলে তোমার আত্ম বিচার হয় না। সে সব দুর্ব্বলতার জন্যে মনে কোনও উদ্বেগ রেখো না। তাদের কোনও বিশেষ স্থান দেবে না এবং

উপেক্ষা করে যাবে। সাধন কর। আমার নিজ কার্য্যে তোমায় সব করাব। তোমার কোনও কিছু করবার দরকার নাই। কারণ যা কিছু দেখেছ, পেয়েছ কিছু কি তোমার নিজের চেষ্টায় হ'য়েছে? হয় নাই। আমার উপরে নির্ভর করে থাক। যা দেবার ও যা নেবার দরকার সব আমি দেব ও নেব। তোমার জীবনের চরম উন্নতির জন্মে, তোমাকে পরম মুক্ত আত্মা করতে যা প্রয়োজন সব আমাকে করতে হবে। এই সব আমার কার্য্য। তোমার কোনও চিন্তা নাই। আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে সাধন করে যাও। তোমার সকল ভার আমি নিজে গ্রহণ করেছি। তুমি চিহ্নিত পরম ও শ্রেষ্ঠতম আত্মা, বিশ্বাস কর।"

জয় মা আনন্দময়ী মা জগত জননী

১০ই এপ্রিল, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "তোমার দশ লক্ষ নাম জপ হ'য়েছে। তোমার ভিতরে মহাশক্তি সঞ্চারিত হ'য়েছে। তোমার যে কি মহাশক্তি তোমার অন্তরের নিভৃত কক্ষে সঞ্চিত হ'য়েছে তা' তুমি নিজেই জান না। এক কোটি জপ পূর্ণ হ'লে সেই শক্তির উৎস মুখ খুলে যাবে। আগ্নেয়গিরির ভিতরে যে মহা অগ্নি উৎপাতের গলিত লাভা মহাতেজে ফুটন্ত অবস্থায় ভিতরেই সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে, তাকে কেউ বুঝতে পারে না তার বাইরের শান্ত ও শ্যামল পরিবেশ ও মূর্ত্তি দেখে। এইরূপ এই পৃথিবীতে কত আগ্নেয় গিরি আছে যে গুলো শত সহস্র বৎসরেও তাদের উৎস মুখ থেকে অগ্নি উদ্গীরণ করে নাই। তাই জনগন তাদের ভিতরের রহস্য কিছুই জানতে পারে না। আবার কোনও কোনও আগ্নেয়গিরি অনেক বৎসর স্থির থেকে একদিন হঠাৎ অগ্নি বৃষ্টি করতে আরম্ভ করে দেয়। তখন জনগণ বুঝতে পারে এই শান্ত সমাহিত গিরির ভিতরে কি মহাশক্তি ও কি মহাপ্রলয়ের বিভীষিকা লুকিয়ে ছিল। এই যে অগ্নির স্ফুরণ এও সেই গিরির স্বাভাবিক পরিবেশ অর্থাৎ যাতে তার স্ফুরণ হ'তে পারে এমনি পরিবেশের সৃষ্টি না হ'লে তার উৎস মুখ খুলে যায় না। ভিতরে

মহাশক্তির আলোড়ন কিন্তু বাইরে শান্ত ভাব। যতদিন ভিতরে অগ্নির আলোড়ন হয় ততদিনও গিরির নিজের ইচ্ছায় স্ফুরণ করবার শক্তি থাকে না। আবার যখন ও যতক্ষণ স্ফুরণ চলে তখন গিরির কোন ক্ষমতা থাকে না তাকে রোধ করবার। তেমনি তোমার ভিতরে যে ক্ষমতার উৎস এসেছে তা তুমি জান না ও তার স্ফুরণ করবার ক্ষমতা তোমার নাই। আবার যখন স্ফুরণ আরম্ভ হবে তখন আর তোমার তাকে রোধ করবার ক্ষমতা থাকবে না। তোমার ভিতরে জন্ম জন্মান্তরের রিপু সকলের প্রভাব কিছু কিছু আছে। এই রিপুর ভিতরে মদ্ বা অহঙ্কার সব চাইতে প্রবল। তারপর প্রবল তোমার কাম, তারপর ক্রোধ, তারপর লোভ, তারপর মোহ ও সবচেয়ে হীন হোল মাৎসর্য্য। অতি অল্প মাত্রায় হ'লেও এই সব রিপুর প্রভাব তোমার দৈহিক ও মানসিক পূর্ণতম স্বভাব-ধর্ম্ম বিকাশের অন্তরায় হ'য়ে আছে। যত জপ হ'চ্ছে তত এদের ক্ষয় হ'চ্ছে। এক কোটি গায়ত্রী জপে এদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে ও তোমার মহাশক্তির উৎস মুখও খুলে যাবে। তখন তুমি যা ইচ্ছা করবে তাই হবে ও যা বলবে তাই সত্য হবে। সে অবস্থা থেকে আর নিজেকে তুমি ফেরাতে পারবে না। রিপুর প্রভাব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হ'লে তখন তোমার দ্বারা কারুর কোনও ক্ষতি হবে না ও সেই উপযুক্ত সময় যখন তোমার উৎসমুখ খুলে যাবে। তার আগে যদি তোমার শক্তির উৎসমুখ খুলে দেই তবে তোমার চিত্ত ও মন রিপুর প্রভাব যুক্ত থাকায় জীবের ক্ষতি করতে পার। তাই এখন তোমার শক্তির উৎসমুখ উন্মুক্ত হবে না। এক কোটি জপের সঙ্গে সঙ্গে রিপুর প্রভাবের পূর্ণ ক্ষয় আর মহাশক্তির পূর্ণ জাগরণ ও উৎসমুখের পূর্ণ মুক্তি হবে। তখন তোমার শক্তি দেখে জগতের জনগণ স্তম্ভিত হবে। তোমার যে কি সম্ভাবনা তার ধারণা আজ জগতের কেন তোমার নিকটতম ব্যক্তিও কিছুই জানতে পারবে না। কিন্তু যখন সেই উৎসমুখ খুলে দেব তখন সকলে মহাবিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যাবে কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত কোনও মানবের এত মহাশক্তি লাভ হয় নাই। তুমি মনে রেখো যে জগতে যে মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা র'য়েছে

সেই মহাপ্রলয়কে রোধ করবার ক্ষমতা শুধু তোমার ভিতরে সঞ্চারিত করছি অতি ধীরে ধীরে। তোমার দ্বারা আমার মহান্ কার্য্য সাধিত হবে ও সেই জন্তেই কত জন্ম জন্মান্তর তোমাকে আমি চিহ্নিত করে এনেছি আজ এই কার্য্য সাধন করবার জন্তে। বিশ্বাস দৃঢ়তম কর। প্রাণপনে সাধন চালাও। আমি তোমার পূর্ণ সহায় জানবে। কোনও তর্কে যেও না। কোনও লোকের কাছে নিজের কথা সাধনের কথা ব'লো না। তুমি মনে প্রাণে মহাসাধন কর। তোমার জীবনে সকল আশা পূর্ণ হবে ও মহা সাধক হ'য়ে জগতের অশেষ কল্যাণ করবে।"

জয় জয় জয় জয় মা মা মা মা।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই যে চোখ বুজলে কত কি দেখতে পাই সে সব কি আমার মস্তকের ভিতরে যে সব তন্ত্রী, ধমণী ইত্যাদি আছে তাদেরই প্রকারন্তর ভেদের খেলা না অন্য কিছু? মা বললেন, "এ হোল আত্মার দৃষ্টি। দেহ স্থূল আর আত্মা সূক্ষ্ম। দেহের দৃষ্টি স্থূল আর আর আত্মার দৃষ্টি সূক্ষ্ম বা ভূমা। যেমন একটা বিরাট্ প্রান্তরে গেলে। তুমি তোমার স্থূল দৃষ্টিতে দূর থেকে দূরান্তর দেখতে পাও। কিন্তু নিকটের জিনিষ যেমন স্পষ্ট দেখতে পাও দূরের জিনিষ তেমন স্পষ্ট দেখতে পাও না। আবার তোমার থেকে যার চক্ষু ভাল সে বহু দূরের জিনিষ তোমার থেকে স্পষ্ট দেখতে পায়। দূরে একটা জিনিষ খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছনা প্রথমে। কিন্তু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সেটা তুমি ভাল দেখতে পাও। এই যে ত্রিভুবন বিশ্ব-চরাচর এতে আমর সত্ত্বা ওতপ্রোত। তোমরা সকলেই এই ব্রহ্ম সত্ত্বায় সম্পূর্ণ মগ্ন হ'য়ে আছ। এই যে ব্রহ্মসত্ত্বা এই সত্ত্বায় তোমার অন্তর বাহির, দেহের ভিতর বাহির পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করে রয়েছে। তোমার স্থূল চক্ষুর দৃষ্টিও তোমার এই যে আত্মসত্ত্বা যা ব্রহ্মসত্ত্বা তার দ্বারাই চালিত হ'চ্ছে। এই আত্ম সত্ত্বা বা জীব সত্ত্বা দেহের মাধ্যমে সক্রিয় হ'য়ে সকল কার্য্য-কারণের মূল। দৃষ্টি যখন

স্থূল তখনও আত্মসত্তা সক্রিয় থেকে দেহমুখিন্ হ'য়ে চক্ষুরূপ যন্ত্রকে কার্য্য করায়। চক্ষুর অক্ষি,পুট ইত্যাদির সাহায্যে আত্মসত্তা সক্রিয় হ'য়ে একাগ্র হ'লেই যেটা তুমি দেখতে চাও তাই দেখতে পাও। এখন তোমায় বলছি যে দেহ তোমার দৃশ্যতঃ স্থূল হ'লেও এটাও স্থূল নয়। কারণ দেহভূত অর্থাৎ যা দিয়ে দেহ সৃষ্ট হ'য়েছে সে মূলতঃ সূক্ষ্ম। কিন্তু সূক্ষ্মের বিশেষ ঘনত্বই দেহ সৃষ্টির সহায়ক। এই দেহ সৃষ্টির মূল ক্রমিক উৎস পর্য্যালোচনা করলেই সে সত্য তোমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে যাবে। এবার শোন, স্থূল দৃষ্টির চর্চ্চা করলে যেমন সেই দৃষ্টির প্রসারতা হয় তেমনি সূক্ষ্ম দৃষ্টির চর্চ্চা বা অভ্যাস করলেও তার প্রসারতা হয়। ধ্যান ও যোগেই এই প্রসারতার অভ্যাস আসে। ধীরে ধীরে এই প্রসরতা ক্রমিক গতিতে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে গমন করে। প্রথমে যে সব জিনিষ, যে সব সূক্ষ্ম পরিবেশ তোমার নিকটতম তাই দেখতে পাবে। যেমন নানা প্রাকৃতিক্ পরিবেশ, নানা অবস্থা দর্শন, এই পৃথিবীতে দূর-দূরান্তরের ঘটনা প্রবাহ, আত্ম দর্শন ইতাদি। ক্রমেই অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে আরও সূক্ষ্মতর লোক দর্শন ও তারপর আরও অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মতম লোক, স্বর্গের বহু উচ্চতম লোক দর্শন ও তারপর আমাকে দর্শন। এখন কথা বা তোমার প্রশ্ন হ'চ্ছে, দেহে থেকে কি করে এই সব দর্শন হয়। যখন চক্ষু মেলে থাক তখন দেহাধিকার অর্থাৎ তখন আত্মা দেহ বিন্যাসে ব্যস্ত। অর্থাৎ আত্মা তখন দেহের পরিচর্য্যা করে। কিন্তু যখন চক্ষু মুদ্রিত কর ও আমাকে একাগ্র হ'য়ে ধ্যান কর তখন আত্মা আত্মনিষ্ঠ ও আমার সূক্ষ্ম সত্তায় নিমগ্ন হয়। আত্মা যখন 'আমাভূত' হয় অর্থাৎ আমার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে তখন সে দেহে থেকেও ভূমায় অবস্থান করে ও ভূমা দর্শন করে। তুমি মনে কর যে তোমার মস্তকের ভিতরে কি ক'রে এত সব দৃশ্যপট ও অলৌকিক পরিবেশের আবির্ভাব হোল? কিন্তু তা নয়। তখন আত্মা আর দেহ বিন্যাস করে না। তখন আত্মা আত্ম বিন্যাসে মগ্ন। এই যে আত্ম বিন্যাস এতেই যে হেতু আত্মা আমারূপ সত্তার অংশ সেই হেতু আমার সূক্ষ্ম সত্তায় এসে পড়ে ও সূক্ষ্ম যা কিছু তাই দর্শন করে। তোমার

দেহ থেকে যেমন তোমার অন্তর লোক লক্ষগুণ শক্তিসম্পন্ন তেমনি এই দৃশ্য জগতের একটি অন্তর লোক আছে যা এই দৃশ্য জগত থেকে লক্ষ কোটি গুণ শক্তি সম্পন্ন। যেহেতু সেই অদৃশ্য অন্তর লোক আত্মার লোক সেই হেতু আত্মা একাগ্র হ'লেই সেই অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতে এসে পড়ে। তার দেহ ধারণ এই জগতে খেলা করবার জন্যে ও এই অদৃশ্য লোকের মনোরম পরিবেশকে উপভোগ করবার জন্যও আত্মার দেহ ধারণ স্বাভাবিক। যেমন স্থূল পরিবেশ, স্থূল ভোগের তৃষ্ণা নিবারণে দেহসুখ ও আত্মার পরিতৃপ্তি হয় তেমনি সূক্ষ্ম দর্শনের ভোগে আত্মার পরম পরিতৃপ্তি হয়। দেহে থেকে এ দুই ভোগ বিশেষ সক্রিয় ও সহজতম বলেই আত্মার দেহ ধারণ। সুতরাং যা কিছু অদৃশ্য লোকের পরিবেশ দেখতে পাও ধ্যানে সে সব সত্য ও তোমার উপভোগের জিনিষ। এ সব অলীক বা মিথ্যা নয় বা মস্তকের ভিতরকার স্থূল ধমনী বা তন্ত্রীর কার্য্য নয়। এ সব তোমার আত্ম দৃষ্টি ও তোমার সূক্ষ্ম পরিবেশে অবস্থান। এখন বুঝলে ?"

মা, মাগো, তুই আমায় এত ভালবাসিস্ মা ? মাগো আমি তোর অযোগ্য সন্তান মা। আমাকে ক্ষমা কর। তোকে বড় জ্বালাতন করি, না ?

মাগো, মাগো, মাগো আমার মা দয়াময়ী।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল থেকে মা আমাকে বার বার বলছেন "মানবের ধর্ম্ম কি সেটা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে চেষ্টা কর।" আমি মাকে বললাম আমাকে বুঝিয়ে দাও। মা বললেন, "দেখ, প্রত্যেক জীবের স্ব স্ব ধর্ম্ম আছে। যেমন ব্যাঘ্রের ধর্ম্ম প্রাণী হত্যা, ভক্ষণ, প্রজনন। পক্ষীর ধর্ম্ম খাদ্য গ্রহণ, কূজন, প্রজনন। কুকুরের ধর্ম্ম হোল তার প্রভুর অনুরক্ত হওয়া, তাকে রক্ষা করা, প্রজনন, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি। এই যে ধারাবাহিক ধর্ম্মের আচরণ এ প্রত্যেক জীবের নিজস্ব অধিকারে যুগ যুগ থেকে চলে আসছে। এই যে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ব্যবহার জীবের ভিতরে দেখতে পাও তা ছাড়াও এদের সকলের ভিতরেই ছয়টি রিপু বর্ত্তমান। মনুষ্যেতর

জীবের ভিতরে ২।১টি রিপুর প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য রিপুর ব্যবহারিক নিষ্ক্রিয়তা হ'য়েছে। কিন্তু মানবের ভিতরে এই রিপু সকলের ব্যবহারিক সক্রিয়তা হ'য়েছে। এই সব রিপুই হ'চ্ছে মানবের ধর্ম্ম। দেখ রিপু না থাকলে মানব জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যেত। কাম না থাকলে প্রজনন হ'ত না। ক্রোধ না থাকলে অন্যায় রোধ হ'ত না, লোভ না থাকলে উন্নতির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যেত, মোহ না থাকলে দেহের উন্নতি সাধন, পরিবার প্রতিপালন হোত না; মদ না থাকলে সংসার কার্য্য, একটি কোনও বৃহৎ কার্য্যে অন্য লোককে চালিত করা যেত না; মাৎসর্য্য না থাকলে জীবন যুদ্ধে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যেত না। এখন ভেবে দেখ এই যে সব রিপু, এরা যেমন মনুষ্যেতর-জীবের ভিতরে প্রায় সর্ব্বাংশে ব্যবহারিক নিষ্ক্রিয়তা লাভ করেছে তেমনি মানবের ভিতরে ব্যবহারিক সক্রিয়তা লাভ করেছে। সংসারে মানবের সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান, বিজ্ঞানের উন্নতি সব কিছু এই রিপুর পূর্ণ সক্রিয়তার ফল। মানব দেহ মন এমন ভাবে সৃষ্ট যে এই সব রিপুর পূর্ণ ব্যবহার ক'রে সে তার জীবনের মহা উন্নতি সাধন করতে পারে যা মনুষ্যেতর জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন কথা হ'চ্ছে রিপুর ব্যবহার কি প্রকার হ'তে পারে? খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ যে আজ যদি তোমার অতিথি সেবার ইচ্ছা হয় বা দরিদ্র সেবার ইচ্ছা হয় সে ইচ্ছা তোমার লোভেরই সূক্ষ্মতম রূপ। একজন সাধুকে দেখে তোমার সাধু হবার ইচ্ছা হ'ল সেটা তোমার মাৎসর্য্যের সূক্ষ্মতম রূপ। এ সব কথা আগে তোমাকে বলেছি বোধ হয় তোমার মনে আছে। তা হ'লে এই রিপুর পূর্ণ বিকাশ দুই ভাবে হ'য়ে থাকে। এক দেহের প্রয়োজনে মনের দ্বারা আর আত্মার প্রয়োজনে মনের দ্বারা। সর্ব্ব অবস্থায় মনের গতিই হ'চ্ছে একমাত্র গতি যার দ্বারা হয় দেহ নয় আত্মা রিপুর সেবা করে। দেহ গভীরভাবে ও একান্তে রিপুর সেবা করলে মনোবিকারে স্থূলতা লাভ হয়, বিষয় বুদ্ধি প্রবল হয়। আর আত্মা গভীরভাবে রিপুর সেবা করলে মনোধিকারে সূক্ষ্মতা বা আত্মিক, বা পরমার্থিক সাধন হয়। এটা মনুষ্যেতর জীবের ভিতরে নাই কারণ তাদের দেহ

বিন্যাস মানবের দেহ বিন্যাসের সমতুল্য নয়। মানবের এই যে রিপু-ধর্ম্ম এ গুলো দ্বিমুখিভাবে চলে। যেমন শরীর চর্চ্চার সঙ্গে জ্ঞান চর্চ্চা চলে। সংসার প্রতিপালনের সঙ্গে অতিথি সেবা, দরিদ্র সেবা চলে। স্বার্থের সঙ্গে পরার্থ চলে। আপনার সেবা তোমাকে করতে হবে। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার পরসেবাও করতে হবে। নিজে জ্ঞান পেলে হবে না। নিজে বিদ্বান হ'লে হবে না পরকেও জ্ঞানী ও বিদ্বান করতে হবে। তার জন্যে বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই যে পরসেবা এটা মনুষ্যেতর জীবের ভিতরে নাই। এই মানব ধর্ম্ম। তুমি হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃশ্চিয়ান, এসব ব্যবহারিক ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম তোমার সাংসারিক পরিচয়ের জন্য। কারণ ভেবে দেখ প্রত্যেক মানবের ভিতরে তোমার যাযা আছে তাই আছে। দেহের বিষয়েও তাই মনের বিষয়েও তাই। যেমন তুমি ধুতি প'রে আছ—তুমি বাঙ্গালী, ও প্যান্ট পরে আছে—ও সাহেব। কিন্তু তুমি যদি উলঙ্গ হও আর ও যদি উলঙ্গ হয় তবে দেখবে তোমার যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে ওর ও সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। তোমার পরিচ্ছদ যেমন তোমার ব্যবহারিক অঙ্গ-আবরণ, তেমনি তুমি হিন্দু, ও মুসলমান হ'চ্ছে ব্যবহারিক সামাজিক ধর্ম্মের আবরণ, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে দেহের বা মনের বা আত্মার জন্যে তোমার যা যা প্রয়োজন তারও সেই সেই প্রয়োজন। সুতরাং মানব ধর্ম্ম হ'ল রিপুর যুগপৎ দৈহিক ও আত্মিক ব্যবহার বা চর্চ্চা। তোমার যেমন নিজের জন্যে প্রয়োজন আছে তেমনি পরের জন্যেও তোমার প্রয়োজন আছে। এই মানব ধর্ম্ম। এখন বুঝেছ"? বেশ পরিষ্কার বুঝেছি মা।

মা আমার মা গো।

২রা মে, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "রিপুই তোমার স্বভাব আর স্বভাবই তোমার ধর্ম্ম। দেহের জন্যে রিপুর প্রয়োজন। সংসারের জন্যেও যেমন রিপুর প্রয়োজন তেমনি আত্মার জন্যেও রিপুর প্রয়োজন। দেহের প্রয়োজনে রিপুর প্রয়োগ হবে সংযমের

মধ্যে। এই রিপু তোমার স্বভাব, এ থেকে মুক্ত তুমি হ'তে পারবে না ও সেটা অভিপ্রেতও নয়। কোনও জীব বা কোনও মানব আজ পর্য্যন্ত রিপুর উর্দ্ধে উঠতে পারে নাই। এই রিপু আছে বলেই জীবত্ব। জীবত্বই তোমার স্বভাব। ধর্ম্মের অর্থ—হোল "মর্ম্মে যা ধৃত তাই ধর্ম্ম। মর্ম্মে যা কৃত তাই কর্ম্ম।" এই রিপু মর্ম্মে ধৃত ও আত্মা যখন আত্মিক রিপু সংযুক্ত হয় তখন তার ধৃত স্বভাব জাগ্রত ও পরিবর্দ্ধিত হয় ও সেই পরিবর্দ্ধনকেই ধর্ম্ম আচরণ বলে। আর এই রিপু যখন দেহে ধৃত হয় ও সেই ধৃত রিপু যখন জাগ্রত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তখন কর্ম্ম বলে। সংযমের দ্বারা দেহ ধৃত রিপুর পরিচালনায়, দেহ, পরিবার, সমাজ, সংসার জাতি প্রতিপালন সুন্দরভাবে কৃত হয়। আর যদি উদ্দামতার দ্বারা, অসংযমের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে অবিদ্যা অন্যায়, অরাজকতা, ব্যাধি, দুঃখ, অশান্তি ইত্যাদিতে গ্রাস করে। দেহের পরিচ্ছদ গৈরিক নয়। গৈরিক হ'ল আত্মার পরিচ্ছদ। আত্মার দিব্য দেহই হোল গৈরিক দেহ। সংসারে গৈরিক বাস পরিধান স্বভাব বা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কেন তাই বলছি। রিপুর ভিতরে মদ বা অহঙ্কার হ'ল সবচেয়ে কঠিন রিপু। অথচ এ না থাকলেও জীবের অস্তিত্ব থাকে না। আবার এ যদি দেহকে গ্রাস করে তবে এই অহঙ্কারে সাধন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হ'য়ে যায়। কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে দেহের ভিতরে এই অহঙ্কার প্রবেশ করে মানব তা জানতে পারে না। পারেনা বলেই সকলে সাধনে সিদ্ধি লাভ করতে বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে না। এই অহঙ্কার পরিচ্ছদের ভিতর দিয়েই নানা ভাবে প্রবেশ করে। তুমি খুব দামী জামা কাপড় পরলে স্বতঃই তোমার মনে একটা অহংভাব আসে। যারা তোমার থেকে হীন বা দীন পরিচ্ছদ প'রে চলে তাদের প্রতি তোমার মনে একটা অবজ্ঞার উদয় হয় ও নিজেকে তাদের থেকে বড় বা ধনী বলে মনে হয়। গৈরিক যারা পরে তাদেরও মনে এমনি শ্লাঘার উদ্রেক হয়। তারা মনে করে 'আমি ধার্ম্মিক, আমি এ সকল সংসারের মানবদের থেকে পৃথক ও উর্দ্ধে। এরা মোহগ্রস্থ ও মায়াগ্রস্থ আর আমি মুক্ত কারণ আমি প্রবর্য্যা গ্রহণ করেছি ও ধ্যান,

ধারণা ও যোগাভ্যাস করছি। এই যে অহংজ্ঞান এতে গৈরিকধারী আপনার সাধনের পথ কণ্টকিত ও বহু কষ্ট সাধ্য ক'রে তোলে। সামান্য যা কিছু জ্ঞান যোগাভ্যাসে লাভ হয়, তাতেও তার পূর্ণ মোক্ষ লাভ করবার পথ বহু লম্বিত হয়। ধর্ম্ম হোল স্বভাব, অর্থ হোল সেই স্বভাব বিশ্লেষণ, বা আত্ম বিচার বা আত্ম দর্শন বা আত্মানুসন্ধান। কাম তারপর হোল আমার প্রতি কামনা বা আমাকে লাভ করবার ইচ্ছা। তারপর মোক্ষ আমাকে লাভ বা আমার সান্নিধ্য। ধর্ম্ম বা স্বভাব হ'চ্ছে গোড়া। তাকে পরিত্যাগ করে জীবত্ব থাকে না। এই স্বভাব বা ধর্ম্ম প্রতিপাদ্য। এ কে জানতে হবে ও একেই জানাই অর্থ ও তাই ধর্ম্ম পালন। আরও পরে বলব। এখন যে ভাবে সাধন করছ করে যাও। দেহের চাঞ্চল্য থাকবেই, কামের প্রভাব থাকবেই। তার জন্যে চিন্তার কোনও কারণ নাই। বরং সেটা যদি না থাকত তবে ত' তুমি ক্লীব হ'য়ে যেতে। সাধন কর আমি আছি।"

জয় জয় আনন্দময়ী মাগো।

১লা জুন, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "জীবের স্বাভাবিক স্ফুরণই মায়া। মায়া বলে কোনও নেতিবাচক ভাব নাই। আজ পর্য্যন্ত মানব সমাজে যে অর্থে "মায়ার" ব্যবহার হ'য়েছে সেটা ভুল। সেটা হ'চ্ছে ক্ষণিক একটা বন্ধন যা চিরন্তন নয় ও যা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পথে বিঘ্নস্বরূপ—এই ভাবে "মায়ার" বিশ্লেষণ হ'য়েছে। "মায়া" হোল প্রত্যেক জীবের সঙ্গে জীবের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা টান এবং প্রত্যেক জীবের সঙ্গে আমার যে স্বাভাবিক টান তাই হ'ল "মায়া"। কোনও জীব একলা থাকতে পারে না। তার যদি সমাজ থাকে ভাল, না হ'লে সে অন্য যে কোনও জীবের সঙ্গে আপনার সখ্যতা গ'ড়ে তুলবেই। যেমন বৃক্ষ সে একক। তার যদি দশটা স্বজাত বৃক্ষের সঙ্গে অবস্থিতি না হ'য়ে থাকে তবে সে পক্ষী বা অন্য কোনও জীবের সখ্যতা লাভ করে।" আমি বললাম, এ কথা বলছ, কিন্তু কত যোগী সন্ন্যাসী তাঁরা ত' সমাজ সংসার ত্যাগ ক'রে একাকী নির্জ্জনে

গুহায় বাস করেন। তাঁরা কেউ কেউ এমন আছেন শুনতে পাই যে কোনও মানুষের সাক্ষাৎ তাঁরা চান না। মা বললেন, "হ্যাঁ, সে সত্যি, কিন্তু তাঁরা আমার সান্নিধ্য কামনা করেন। আত্মার দিক দিয়ে তাঁরা আমাকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পেতে চান ও দেহের দিক থেকে, বৃক্ষ, তরুলতা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক জীবের সঙ্গে সখ্যতা রক্ষা ক'রে চলেন। তাই তাঁদের সমাজ। তাঁরা জীবাত্মার ভেদ্ বর্ত্তমান নাই জানেন বলেই মানব সমাজের একজন হ'য়েও সামাজিক বন্ধন না থাকলেও অন্যান্য জীবের সঙ্গে তাঁরা আপন সমাজ গ'ড়ে তোলেন। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় আমার সঙ্গে সখ্যতা ও তার জন্যে তাঁরা এই পরিবেশ স্বেচ্ছায় ও আনন্দ মনে গ্রহণ করেন। এই যে "মায়া" এ না থাকলে জীব জগত বা জীব সমাজ থাকতে পারে না। এ অতি সূক্ষ্ম বন্ধন, যে বন্ধন দ্বারা সকল সংসার গ্রথিত। কেউ কাউকে ছাড়া চলতে পারে না। প্রত্যেকটি সৃষ্ট জীব অপরের সেবা বা সখ্যতা করছে। দৃশ্যতঃ হয়ত তোমরা সেটা ধরতে পার না। কিন্তু তোমার জীবন ধারণের জন্যে যে কত জীব সাহায্য ক'রে যাচ্ছে তার কতটুকু ধারণা তোমার আছে? তোমার যখন যা প্রয়োজন ঠিক সেই সময় সেই জীব তার যতটুকু তোমাকে দেয় তা' দেবেই। এই আমার অমোঘ বিধান ও এই 'মায়া'। মায়া ভিন্ন জীব জগত অচল বা মৃত। মায়া আছে বলেই জীব জগত প্রাণ চঞ্চল। এক কথায় মায়াই জীব জগতের প্রাণ স্পন্দন। এই স্পন্দন আছে বলেই স্বভাব ধর্ম্ম প্রতিপালিত হ'চ্ছে। এই যে স্পন্দনরূপ প্রাণ ক্রিয়া যা একের থেকে অন্যেতে প্রতিফলিত বা বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে তাতে একের সঙ্গে অন্যকে একটা অদৃশ্য অথচ এক কঠিন বন্ধনে বদ্ধ করে রেখেছে। এই যে বন্ধন এ অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। মূলতঃ এই বন্ধনের রূপান্তরই আমার প্রতি আশক্তি। সাধারণ মানুষ মনে করে "আমাকে" লাভ করা বা আমার সাধন করা বড় কঠিন ব্যাপার। তার জন্যে কত রকম কৃচ্ছ সাধন করতে হয়। কত রকম পদ্ধতি, আসন, বসন, পূজা, হোম, ধ্যান, যোগ ইত্যাদি না করলে আমার সাধন হয় না। আমাকে লাভ করবার জন্যে কোনও কৃচ্ছ সাধন বা যোগ

ধ্যান কিছুই প্রয়োজন হয় না। শিশুর সঙ্গে মাতার যে মায়ার বন্ধন, 'আমার সন্তান' তোমাদের সঙ্গেও আমার সেই বন্ধন। যদি পূর্ণ স্বভাব ধর্ম্ম তুমি পালন কর তবে আমাকে সব সময় নিকটে পাবে। কেবল নিকটে পাবে না, প্রত্যেকে আমাকে সর্ব্ব সময় দেখতে পাবে। যে হেতু এই স্বভাব ধর্ম্ম থেকে মানবগণ বিচ্যুত সেই হেতু আমার সাধন পদ্ধতি—নানা রকমে জটিল, কঠিন, কষ্টসাধ্য ও লম্বিত করে ফেলেছে। যেন "আমি" বহু দূরে থাকি ও "আমি" একটি বিরাট্ কিছু যার জন্যে অসাধ্য সাধন করতে হবে ও তা না করলে আমার দর্শন বা আমার সখ্যতা লাভ হবে না। এ মহাভুল এবং এই ভুলপথে এমনভাবে মানব কুল অগ্রসর হ'য়ে চলেছে যুগ যুগ ধ'রে যাতে আমার সঙ্গে সহজতম যোগ বা সখ্যতা ত' দূরের কথা ক্রমেই দূরত্ব বেড়েই চলেছে। তোমার যে মা তাঁকে কি তুমি নানা রকম কঠিন আসন, বসন, ধ্যান, যোগ, অনুষ্ঠান ক'রে তাঁর ভালবাসা পাও? না, মাকে আপন সহজতম সম্বন্ধে "মা" বলে ডেকেই তাঁর ভালবাসা পাও? পূর্ণ স্বভাব ধর্ম্ম পালিত না হ'লে আমার ও তোমার সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে তার স্ফুরণ হবে না। সেই সম্বন্ধ যাতে সহজতম হয় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। আমার সঙ্গে তোমার যে যোগ বা বন্ধন বা সম্বন্ধ সেটা যাতে একেবারে অত্যন্ত সরল হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখবে। সেই সরল বন্ধন বা সম্বন্ধই রূপান্তরিত "মায়া" যা তোমাকে ও তোমার পরিবেশকে চির জাগ্রত রেখেছে। অগ্রসর হও আমি আছি। কোনও চিন্তা নাই —"।

মা মা মা।

১১ই জুন, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ লেকে বেড়াতে বেড়াতে মা বললেন "দেখ তোমাদের সংবিধানে বা শাস্ত্রে পাপ ও পুণ্যের যে সব ব্যাখ্যা বা নির্দ্দেশ আছে সে গুলো বহুলাংশে ভ্রমাত্মক। কেন তাই বলছি শোন। আমাকে অবিশ্বাস ছাড়া আর কিছু পাপ নাই আর আমাকে বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছু পুণ্য নাই। এই যে অবিশ্বাস এ নানা রূপে আসতে পারে, ক্লিবত্বে, ভীরুতায়, ও অহঙ্কারে। এতেই পাপ

সঞ্জাত হয় ও মানব আত্মার মহাক্ষতি হয়। কোনও প্রকারে যাতে তোমার ভিতরে কোনও রূপে আমার প্রতি অবিশ্বাস প্রবেশ না করে বা তোমার নিজের ক্ষমতাকে আমার ক্ষমতার চাইতে বড় বলে মনে না হয় বা আমার ক্ষমতাকে খর্ব্ব না কর। অতি সামান্যতম অহংকারের বীজ সকল সাধন বিনষ্ট করে দেয়। দেখ জীবাত্মার জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে রিপুসকল সঞ্জাত হয়। ও মন, বুদ্ধি বিবেক যা বল সব সঞ্জাত হয়। এই সব জীবাত্মার স্বরূপ বা স্বভাব বা ধর্ম্ম। এই খানেই আমার সঙ্গে জীবত্মার পার্থক্য। আমি, সকল রিপু, মন, বুদ্ধি, বিবেকের স্রষ্টা। আমি এ সকলের স্রষ্টা ব'লেই আমি কত উর্দ্ধে তা একবার ভেবে দেখ। আমার একমাত্র শক্তি সে হ'ল ইচ্ছা শক্তি যার দ্বারা নিমেষে আমি সব করে যাচ্ছি। যত কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য ক্রিয়া হ'চ্ছে সব আমার ইচ্ছা শক্তিতেই হ'য়ে যাচ্ছে। **জীবাত্মার যে স্বভাব, সেই স্বভাবজাত যে স্বরূপ ও সেই স্বরূপজাত যে অভিব্যক্তি তার ভিতরে পাপও নাই পুণ্যও নাই**। রিপু সকল ও মন, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েই জীবাত্মার সৃষ্টি। এই যে রিপু ও মন-স্বরূপ (মন, বুদ্ধি ও বিবেক) এ সব আমার দেওয়া ইচ্ছার অধীন। জীবাত্মার গভীর ও সক্রিয় ইচ্ছাতেই জীব দেহ লাভ হয়। ভোগই বল, সাধনই বল যার প্রতি প্রগাঢ় ইচ্ছা হ'লেই জীবাত্মা দেহ ধারণ করে। দেহ ধারণের পূর্ব্বে যে ইচ্ছা সে ইচ্ছা অপাঙ্গে বা দেহের অজ্ঞাতে দেহের দ্বারা আত্মা সম্পাদন করিয়ে নেয়। যেমন আত্মা না থাকলে দেহ মৃত তেমনি রিপু সকল দেহের নয় এ সবই আত্মার। দেহে এসে এই সব আত্মিক রিপু ও মন-স্বরূপ স্থূলরূপ ধারণ করে স্থূল ভোগের জন্যে। এই সব স্থূল ভোগে দেহের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই আত্মা ভোগ করেন ও সেই জন্যেই আত্মার দেহ ধারণ। আত্মা যেমন দেহকে নির্দ্দেশ দেয় আমি পরমাত্মাও তেমনি আত্মাকে নির্দ্দেশ দিই। এই যে রিপু ও মন-স্বরূপ এর ব্যবহার ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সম্পাদিত করাই কর্ত্তব্য বা কর্ত্তব্যজ্ঞানে তার ব্যবহার করাই হ'চ্ছে স্বধর্ম্ম পালন। রিপুর যেটুকু ব্যবহার তোমার করা কর্ত্তব্য তাই

তোমার ধর্ম্ম। মনকে যতটুকু বা যে দিকে ধাবিত করায় দেহ ও আত্মার উত্তেজনা ও সেই উত্তেজনায় বুদ্ধি ও বিবেকের ক্ষতি সাধন না হয় সেই হ'চ্ছে তোমার স্বধর্ম্ম। এই সবের নির্দ্দেশ তোমার বা জীবাত্মার ভিতরে সহজাত অবস্থায় আছে। সেই যে সহজাত নির্দ্দেশ, বা প্রকৃতিগত নির্দ্দেশ বা স্বভাব সেই সব পালনে স্বধর্ম্ম পালন হয়। তার বিরুদ্ধে গেলে ধর্ম্মচ্যুত হ'তে হয়। সৎকার্য্য যা তোমরা কর সে সব আত্মার অবগাহন। অবগাহনে যেমন দেহ স্নিগ্ধ হয় সেইরূপ সৎকর্ম্মে আত্মা স্নিগ্ধ হয় ও তার ফল স্বরূপ আত্মার শান্তি আসে। একে পুণ্য বলে না। অসৎ কার্য্য করলে আত্মার অশান্তি হয়, আত্মার উত্তেজনা হয়, একেও পাপ বলে না। দেহ আত্মার নির্দ্দেশে চলে আর আত্মা আমার নির্দ্দেশে চলে। মূলতঃ আমার নির্দ্দেশেই সব চলে। Central control না ছাড়লে যেমন Switch দিলেই Electric Motor চলে না তেমনি আমি ইচ্ছা না করলে আত্মা বা দেহ কেউ কাজ করে না। আসলে আত্মা শুদ্ধ। কিন্তু দেহ গ্রহণ করলে দেহ সুখে দেহ যখন বিপথগামী হ'য়ে চলে তখন আত্মা তাকে রক্ষা করতে পারে না। রক্ষা করবার চেষ্টা করে কিন্তু রক্ষা করতে পারে না। তখন সে যদি আমার একান্ত শরণাপন্ন হ'য়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে তবে দেহ রক্ষা পায়। আত্মার সঙ্গে আমার সংযোগ খুব গভীর ও নিকট হওয়া সত্ত্বেও যদি আত্মা দেহ বিকারে (দেহ যখন বিপথগামী হ'য়ে পড়ে) আমার শরণাপন্ন না হয় তবে সেই অন্যায়ে দেহপাত হয়। আবার দেহান্তর হয় সময়ে। আত্মা অবিনশ্বর ও একমাত্র জীবন্ত রূপঘন সত্তা বলে দেহপাত আমার কাছে অতি তুচ্ছ। একটি কুম্ভকার কিছু মাটি নিয়ে তার মন মত প্রতিমা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ সেই মাটি দিয়ে একবার ক'রে একটা প্রতিমা গ'ড়ে আবার ভাঙ্গে, আবার গড়ে। মাটির কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। হয় সেই মাটি দিয়ে যে প্রতিমা গড়ে তারই রূপ পরিবর্ত্তন। তেমনি আত্মা তার ইচ্ছায় স্থূল কর্ম্ম সম্পাদন করবার মানসে দেহ ধারণ করবার ইচ্ছা করে ও আমার ইচ্ছায় তার দেহ ধারণ হয়। সেই দেহের সাহায্যে আত্মা তার

অভিপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করে যায়। যদি অভিপ্সিত কার্য্য না হ'য়ে দেহ-বিকারে দেহ বিপথগামী হয় তখন আত্মা দুঃখ পায় ও তখনই আমার ইচ্ছায় দেহান্তর হয়। আত্মার কার্য্য সম্পাদন হ'লেও আমার ইচ্ছায় দেহান্তর হয় অথবা দেহ অশক্ত হ'লেও দেহান্তর হয় আমারই ইচ্ছায়। আত্মার কার্য্যের পরিধি এক দেহেতে যতটুকু হওয়া প্রয়োজন ততটুকু থাকে। সেই পরিধির সমাধা হ'লেও দেহান্তর হয়। এখন শোন, এই যে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস রূপ পুণ্য ও পাপ এরাই আত্মাকে সক্রিয় রাখে ও এরাই আত্মার সঙ্গে গমন করে। বিশ্বাস যত গভীর হয় দেহের সাধনে সেই বিশ্বাস আত্মার প্রজ্ঞা লোককে গভীর ভাবে জাগ্রত করে ও আত্মাকে এক অসীম শক্তিতে মগ্ন করে ও সেই শক্তির দ্বারা জন্ম জন্মান্তরের পরিক্রমায় আত্মা আমার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয় ও আমার নিকটতম সান্নিধ্য লাভ করে ও সেই পরম মোক্ষ। আর অবিশ্বাস যদি গভীর হয় তবে তার জীব পরিক্রমায় জন্ম জন্মান্তরের পথ বহু বিলম্বিত হয় ও আমার সান্নিধ্য লাভ করায় বহু বিলম্ব হয়। এ ভিন্ন পুণ্য ও পাপ নাই। সৎ-কার্য্য যা আত্মা বিবেকরূপ বাণীতে সম্মতি দান করে। আর অসৎ কার্য্য যা আত্মা বিবেকরূপ বাণীতে অসম্মতি দান করে। এই যে আত্মার বিবেকরূপ প্রজ্ঞা এ প্রতিক্ষণেই আমার নিকট হ'তে আহরণ করে। এই বিবেকের বাণী অনুসারে কার্য্য না করলেই আমাকে অস্বীকার করা হয় বা আমার প্রতি উপেক্ষার ভাব হয় ও অবিশ্বাস আসে—সেই পাপ। আর সেই বিবেকের বাণী শ্রবন ও সেই অনুসারে কার্য্য করাই বিশ্বাস ও পুণ্য। মনই আত্মার শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ ও সেই অঙ্গ দ্বারাই মনন ও সাধন ও সেই মনন ও সাধন দ্বারাই আমার সঙ্গে যোগ ও এই যোগেই বিবেক স্থির জাগ্রত ও অতি সুস্পষ্ট বাণীর দ্বারা (ব্রহ্মবাণী) আত্মা চালিত হন ও দেহকে চালিত করেন। মনে রাখবে বিশ্বাসই একমাত্র প্রতিপাদ্য ও সেই পুণ্য, অবিশ্বাসই পাপ।"

জয় মা আনন্দময়ী জ্ঞান দায়িনী জননী।

১৯শে জুন, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে লেকে বেড়াতে বেড়াতে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজ রথ যাত্রা, মা এই রথ যাত্রার তাৎপর্য্য কি? মা বললেন, "আমি ব্রহ্মাণ্ডনাথ ও জগতের নাথ, এ কথা তোমরা জান। আমি এই ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছি অনেক দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ কত কোটি কোটি কল্পান্তর পূর্ব্বে যে সে বিষয় তোমাদের ধারণার অতীত। ব্রহ্মাণ্ড ও তার ভিতরে জীবও সৃষ্টি করেছি। কিন্তু কোথায়ও আমার লীলার সহায়তার পূর্ণরূপ লাভ হয় নাই। এক একটি গ্রহ সৃষ্টি করেছি ও তার ভিতরে জীবাত্মা সৃষ্টি করেছি। কিন্তু কোনও গ্রহেই জীব পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হয় নাই যাতে আমি আর সেই জীব একাত্মা হ'য়ে অপার আনন্দ লীলায় মগ্ন হ'তে পারি। তাই আমার জগৎ সৃষ্টি। এই জগৎ আমার পূর্ণ রথ স্বরূপ ও এই জগতে যে জীব সৃষ্টি করেছি তারা শ্রেষ্ঠতম জীব ও আমার অতি নিকটতম স্বরূপ ও স্বভাব দ্বারা এদের আমি সৃষ্টি করেছি আমার লীলা ও খেলার প্রিয়তম সঙ্গীরূপে। এই যে উৎসগত মূল রহস্য এও কোনও কোনও মহাসাধকের কাছে প্রকট হ'য়েছে যোগে ও সাধনায়। তাঁরাই এই রথ যাত্রার উৎসব লোক সমাজে প্রচার করেছেন। আমি জগতের নাথ রূপে জগতরূপ রথে সংসারে অবতীর্ণ হ'য়েছি নিত্য লীলার জন্যে। জগতরূপ বা সংসাররূপ এই যে নিত্য রথ এই রথকে বহন করছে মানবগণ যুগ যুগ ধরে। এরা কি শূন্য রথকে বহন করেছে? না, এই যে সংসার রূপ রথ এর যে নাথ আমি আমাকেই বহন করছে। বহন করছে কাকে? আমাকে। রথ তো উপলক্ষ্য। আমি রথে বসে আছি বলেই ত' রথকে মানবগণ টানছে। এর নিগূঢ় অর্থ হ'চ্ছে সংসারই আমার শ্রেষ্ঠতম লীলাক্ষেত্র ও মানবের শ্রেষ্ঠতম সাধন ক্ষেত্র। এই সংসাররূপ রথ বা কর্ম্ম প্রবাহে মানব অবগাহণ করবে ও সে তার ভিতরে সর্ব্ব অন্তরে মনে রাখবে যে সেখানে আমি অধিষ্ঠিত। সংসারের রথ তারা টানছে সত্য কিন্তু আসলে তারা আমাকেই টানছে। অর্থাৎ সংসার ধর্ম্মপালন করা আমারই প্রিয় কার্য্য ও আমার একমাত্র কার্য্য—আমাকেই বহন করার

নামান্তর। যদি সংসার কর্ম্ম প্রবাহের ভিতরে সর্ব্ব অবস্থায় আমার উপলব্ধি থাকে বা আমার স্বরূপ দর্শন কর সর্ব্ব অবস্থায় তবে মানবের পরম মোক্ষ লাভ হয় ও জন্মান্তর রহিত হয়। বিরাট্ সংসারের ঘাড়ে আমি ক্ষুদ্র 'বামন' রূপে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সংসার বিরাট্ দেখলেও আসলে সে শুধু যন্ত্র। সেই বিরাট্ যন্ত্রের প্রাণ আমিই। বামন অর্থে ছোট, ক্ষুদ্র বা উপেক্ষার বস্তু বা অপ্রকট্রূপ বস্তু। যদিও সংসাররূপ যন্ত্রে আমাকে আসলে অতি ক্ষুদ্র বা অপ্রকট্ বলে মনে হয় তবুও ঐ সংসার বা জগত রূপ রথে আমি একমাত্র রথী যাকে তোমরা নিত্য বহন করছ। এই জ্ঞান যাতে সর্ব্ব সময় মানবের অন্তরে জাগ্রত থাকে সেই জন্মেই সাধকগণ এই উৎসবের প্রচার করে গেছেন। এখন বুঝেছ?"

আশ্চর্য্য! তুই আমাকে এত জ্ঞান দিচ্ছিস কেন মা? মাগো মাগো আমার সোনা মা—লক্ষ্মী মা আমার —।

২৬শে জুন, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ লেকে বেড়াতে বেড়াতে মাকে বললাম, আমার কাম রিপুর যে কিছুতেই নিবৃত্তি হ'চ্ছে না তার কি করি? মা বললেন "কামের বহিপ্র্রকাশকে সংযত বা শান্ত কর। তোমাকে একদিন বলেছি রিপুর কখনও নিবৃত্তি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিচার করবে কতটুকু তোমার কাম ভোগ প্রয়োজন। উদ্দাম রিপু প্রবণতায় মানসিক ও দৈহিক দুঃখ ও ব্যাধি হয়। সেই জন্মেই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে গিয়েছেন পূর্ব্বকালের সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ। এতে প্রজনন যা আমার একান্ত অভিপ্রেত সেও পালন হয় আর কাম ভোগ মধ্য-পথ অবলম্বন করে চলে। তাতে স্বেচ্ছাচারিতা বা যদৃচ্ছা রিপুপ্রবণতা থাকে না। তোমার যতটুকু প্রয়োজন সেই টুকুই তোমার ভোগ্য। এই ভোগের বহিপ্র্রকাশ সংযত করবে। কামকে নিরোধ বা সংহার করবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কেবল তাই নয়, কাম দেহজাত অবস্থায় প্রজননের সাহায্য করবে আর আত্মজাত অবস্থায় আমার প্রতি গভীর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করবে।

দেহ-সাধন বা মোহ-সাধন বা দেহজাত কাম ভোগের নিবৃত্তির পর যখন আত্মজাত ঐশ্বরিক প্রীতিতে কাম পরিবর্ত্তিত হবে তখন তুলনা মূলক অবস্থায় তুমি বুঝতে পারবে দেহজাত কাম চরিতার্থে যে সুখ তুমি পেয়েছ তার কত শত কোটিগুণ সুখ আমার সঙ্গে সঙ্গমে। এ কথা সত্য যে আত্মা দেহারূঢ় হ'লে দেহের সুখও যেমন চায় আত্মার নিজের আত্মিক সুখও তেমনি চায়। দেহ সুখে যদি নিজেকে আবৃত ক'রে রাখ তবে দেহসর্ব্বস্ব বা পূর্ণ মোহগ্রস্থ হ'য়ে পড়বে ও আত্মার আত্মভাব ভুলে যাবে। সেই জন্যে সংসার সাধন যেমন প্রয়োজন তেমনি সংসারে থেকে আমার সাধন একই রূপে প্রয়োজন। আমার সাধন যদি সংসারে থেকে না কর তবে সংসার সাধন সম্যকরূপে সফল হবে না। সংসারে থেকে সংসারের সকল কর্ত্তব্য পালন ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রতি যদি কর্ত্তব্য পালন না কর তবে পূর্ণ মোহগ্রস্থ হ'য়ে পড়বে। তাতে তোমার জন্মান্তর পরিক্রমা লম্বিত হবে ও আমার সঙ্গে মিলনের পথ অতি কঠিন হ'য়ে পড়বে। সুতরাং কামের বহিপ্র্রকাশ সংযত করলে আস্তে আস্তে অন্তরের নিভৃত কক্ষে আমার প্রতি আকুলতা সঞ্জাত হবে। দেহজাত কামই রূপান্তরিত হ'য়ে আত্মাকে গভীর প্রেমানুভূতিতে আমার সঙ্গে যোগে যুক্ত ক'রে সাধন মার্গে অগ্রসর করায়। সাধন কর আমি আছি।"

মা মা মা মা আমার।

১০ই জুলাই, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আবার আজ ক'দিন হোল কাম খুব প্রবল হ'য়েছে। সর্দ্দিও খুব প্রবল হ'য়েছে। তার সঙ্গে সারা শরীরে ব্যথা আর জ্বর জ্বর ভাব। বায়োক্যামিক ঔষধ খাচ্ছি। কাল রাত্রে কালোজিরা রসুনের সঙ্গে বেঁটে ঘি দিয়ে ভাতের সঙ্গে খেলাম। ময়না বলল 'এই যে খাচ্ছ, এতে শরীর ভীষণ শুকিয়ে যাবে। তাই হোল। রাত্রে ভাল নিদ্রা হ'ল না। ভীষণ কাম ভাব। যত মনকে নানা ভাবে শান্ত করতে চাই করতে পারি না। মাকে বললাম দেখেছিস্ ত'? আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমার এখন পর্য্যন্ত সাধনের কিছুই হয় নাই।

এমন কাম ভাব থাকবে কেন ? মা বললেন, "এর জন্যে চিন্তা করো না। এত স্বাভাবিক। রিপুসকল দেহ ধারণ হ'লে দেহ জাত হ'য়ে বিষয় মুখিন্ অর্থাৎ নিম্নগামী হবে ইহা স্বাভাবিক। যেমন নদীর জল নিম্নগামী হওয়াই তার ধর্ম্ম, এরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এর যখন প্রায়োজন থাকে না তখন একে রোধ করবার বা সংযত করবার একমাত্র পথ হ'চ্ছে "নাম জপের" বাঁধ প্রস্তুত করা। নিম্ন গমনের পথ যেমন নিম্নদিকে, ঊর্দ্ধ গমনের পথ তেমনি ঊর্দ্ধদিকে। জপের দ্বারা এই নিম্ন গতির ধারা বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে ঊর্দ্ধগামী হয়। জপের বাঁধ এত উচ্চ যে রিপু সকলের ধারা সেটা অতিক্রম করতে পারে না। ঊর্দ্ধগতির পথ জপের বাঁধ থেকে নীচু কিন্তু জপের বাঁধ নিম্নগামীর পথ থেকে উঁচু। তাই রিপু সকলের ধারা জপের বাঁধে বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে ঊর্দ্ধ পথ ধরে। সে পথ সাধনের পথ ও আমার পথ। রিপু সকল জীবাত্মাতেই সঞ্চাত হ'য়ে থাকে। দেহের নিজস্ব বলতে রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, ত্বক ইত্যাদি। দেহের সকল কর্ম্ম আত্মার নির্দ্দেশে হয়। আত্মাই আদি কারণ ও সকল কর্ম্মাকর্ম্ম ভাব অভাব, সব আত্মার কার্য্য। সকল ইচ্ছা ও তার ব্যবহার আত্মার কার্য্য এ কথা নূতন হ'লেও সত্য। তবে দেহের সুখের লালসায় দেহ আত্মাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়েই দেহসুখ সম্ভোগ করিয়ে নেয়। এ সুখ আত্মাও গ্রহণ করে। দেহের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি আত্মার সংযোগ ছাড়া অনুভূত হয় না। আত্মা দেহ ধারণ ক'রে স্থূল সম্ভোগের দ্বারা সুখানুভূতি বা আনন্দানুভূতি লাভ করতে প্রয়াস পায়। এই স্থূল সুখানুভূতির ক্রমবিকাশই আত্মার অভিজ্ঞতা ও সেটা বহু জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে তুলনামূলক হয়ে, ওটার চেয়ে এটা আরও আনন্দদায়ক এই ভাবে জীব পরিক্রমা চলতে থাকে ও ধীরে ধীরে আত্মা পূর্ণ জ্ঞানী হয় মানবের সপ্তম জন্মে। তখন তার সকল স্থূল আনন্দের বা রিপু সম্ভোগের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েছে। তাই সপ্তম জন্মে জীবাত্মা দেহ ধরণ করেও পূর্ণ জ্ঞানী ও রিপুর স্থূল পরিবেশে বা আনন্দে আর আনন্দ লাভ করেন না। তখন তার চিন্তা কোথায় অপার আনন্দ আছে ও সেই জন্মে মানব আমার পূর্ণ সাক্ষাৎ রূপ

আনন্দ লাভ করে। আজ পর্য্যন্ত যে ধারণা আছে যে আত্মা একেবারে-মুক্ত তার ভিতরে রিপু নাই এ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আত্মাকে সৃষ্টি করেছি সকল রিপু দিয়ে। রিপুর উৎস আত্মায় না থাকলে দেহের কি ক্ষমতা আছে যে সে রিপুকে সৃষ্টি করে। আত্মাই রিপুর কারণ। এই কারণ সৎ কারণ। কারণ আমি সৎ ও আমার সৃষ্ট সবই সৎ। দেহ সঞ্জাত হ'য়ে রিপুর নিম্নগতি হওয়াও সত্য, কারণ তাতে তুলনা মূলক বিচারে জ্ঞানের উর্দ্ধগতি ও আমাকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। আমাকে প্রাপ্তি বা আমার সাক্ষাৎ সব চাইতে আনন্দ কর বলে অন্য সকল আনন্দ-উপভোগ না করলে আমাকে প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা হওয়া যায় না। সুতরাং স্বভাবের গতিতে চল। জপ করে যতটুকু রিপুকে সংযত করতে পারলে ততটুকুই তোমার পক্ষে প্রয়োজন জানবে। সাধন কর-সব হবে। তোমার মহান্ সম্ভাবনা। আমার পূর্ণ শরণাপন্ন হও। ভয় করো না কিছুতেই।"

জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার।

১০ই জুলাই, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

মা আমাকে বললেন, "তুমি, শিবপুত্র। তোমার সাধনে শিব ও পার্ব্বতী দু'জনেই তোমাকে মহা সাহায্য করছেন। এর ভিতর তোমার অনেকবার পার্ব্বতী দর্শন হ'য়েছে। এর ভিতর তোমার পূর্ব্ব জন্মের মাতা পার্ব্বতীর দর্শন ও অন্যান্য ভক্ত যোগী মহাত্মাদের দর্শন হ'য়েছে। এখন তুমি চিন্তা করে দেখ যে তোমার যে পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত দেখিয়েছি সে সব বিশ্লেষণ করলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে।" এ সব কথা কি বলছ মা? এ যে আমার কল্পনার অতীত। লোকে আমাকে পাগল বলবে। বলবে এ লোকটা কি সব বাজে কথা বলছে। মা বললেন, "লোকে কি জানে বা বোঝে বা তাদের কি এমন ক্ষমতা আছে যাতে আমি যা বলছি সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। তবে বলি শোন, আজ পর্য্যন্ত শিবের জন্ম বৃত্তান্ত কেউ জানে না। আজ তোমাকে সেই কথা বলছি। শোন মন দিয়ে। বহু যুগ পূর্ব্বে "মৈথলা" বলে তিব্বতের

ভিতরে একটি জায়গা ছিল। তখন পৃথিবীর ভিতরে দেশ বিন্যাস হয় নাই। এই "মৈথলায়" একটি অখ্যাত কৃষক পরিবার ছিল। তাদের একটি পুত্র হয়। তিব্বতী ভাষাকে সংস্কৃত করলে তা দাঁড়ায় "অরিন্দ্রম"। অরিন্দ্রম বিবাহ করেন, তিব্বতী ভাষাকে সংস্কৃত করলে তা দাঁড়ায় "আত্রেয়ী"। এই বিবাহ হয় দেশাচার ও লোকাচার বিরুদ্ধ গভীর প্রেম সম্বন্ধে। বিবাহের ব্যবস্থা গন্ধর্ব্বমতে সম্পন্ন হয় ও এঁরা সমাজ ত্যাগ করে হিমালয়ের গভীর দেশে গুহা আশ্রয় করে, সংসার যাত্রা, ধর্ম্মাচরণ, যোগাভ্যাস ও সাধনে প্রবৃত্ত হন। দু'জনেই পরম সাধক ও জ্ঞানী ছিলেন। এঁদের বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। সেই পুত্র যখন পঞ্চম বৎসরে উপনীত হয় সেই সময় আমার নির্দ্দেশে, আমার-বাণী শ্রবন করে তাঁরা উভয়েই দেহ ত্যাগ করেন। এই পুত্রের নামকরণ করে যান "সোওঁঙ্কার"। এই পঞ্চম বৎসরের পুত্র স্বভাবের ভিতরে আমার প্রসাদে ও আমার হাতে সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হ'য়ে উঠেন। ধ্যান, যোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, দর্শন, ইন্দ্রিয়-গ্রাম, জন্মান্তরতত্ত্ব, পরমজ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি লাভ করে ত্রিকালজ্ঞ হ'য়ে উঠেন। তাঁর ষোড়শ বর্ষ বয়সের সময় দুইজন আর্য্য উত্তরাপথে তিব্বত অতিক্রম করে হিমালয়ের তুষার ভূমি পরিক্রমার সময় ভীষণ তুষারপাতে প্রাণ হারাণ। সোওঁঙ্কার এই দুই আর্য্যের প্রাণদান করেন ও তাঁরা দুই জনে এঁর প্রিয় ভক্ত ও শিষ্য হন। এঁদের নাম হ'ল "শ্রীনন্দন ও শ্রীভৃঙ্গার"। এঁরাই লোক সমাজে "নন্দী' ও ভৃঙ্গী" নামে পরিচিত। এঁরা দুইজনে "সোওঁঙ্কারকে" সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দান করেন। এর আগে সোওঁঙ্কারের কোনও কথ্য ভাষা জানা ছিল না। এই সোওঁঙ্কার পরে লোক সমাজে "শঙ্কর" বা "শিব" নামে খ্যাত হন। ইনি লোক সমাজের ও সকল জীবের মহা উপকারী ছিলেন। ইনি হিমালয়াধিপতির কন্যা "সতীকে" ত্রিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। সতীর মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মার গভীর একাগ্রতার ফলস্বরূপ আবার পার্ব্বতীরূপে জন্ম গ্রহণ করে গভীর তপস্যায় শিবের মনোরঞ্জন করে তাঁকে ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে মাত্র ষোল বৎসরের সময় বিবাহ

করেন। এই মহারূপবতী, ব্রহ্মজ্ঞানী, দিব্য দৃষ্টি ও দেবভাগে সৃষ্টা নারীর গর্ভে চারিটি সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। দুইটি কন্যা ও দুইটি পুত্র। তুমি কার্ত্তিকেয় ছিলে। শ্রীনন্দন যোগ শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদ ইত্যাদি ও নানাভাবে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন শঙ্করের কৃপায়। এই সব শাস্ত্র তিনিই আর্য্যদের ভিতরে প্রচার করেন ও শঙ্করকে আর্য্যদের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীভৃঙ্গার জন্মান্তর তত্ত্ব জ্যোতিশ শাস্ত্র, যোগ, ধ্যান, ও নানা প্রকার অলৌকিক জ্ঞানে ও বিদ্যায় সিদ্ধ হন শঙ্করের কৃপায়। তিনিও আর্য্যদের ভিতরে সেই সব জ্ঞান বিতরণ করেন ও শঙ্করকে আর্য্যদের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি পরবর্ত্তী সময়ে "ভৃগু" বলে খ্যাত হন ও মহাশক্তিধর রূপে খ্যাত হন। এঁদের দুইজনের চেষ্টার ফলেই শঙ্করের দুই বার বিবাহ সম্ভব হয়। এঁদের প্রচেষ্টাই ছিল শঙ্করের মত মহাবীর্য্যবান্, মহাশক্তিধর ও পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের পুরুষানুক্রমিক ধারা যাতে অব্যাহত থাকে। শঙ্কর প্রায় দশ শতাব্দী ও পার্ব্বতী প্রায় এগার শতাব্দি জীবিত ছিলেন। শ্রীনন্দন নবম শতাব্দী ও শ্রীভৃঙ্গার প্রায় আঠারো শতাব্দী জীবিত ছিলেন। এঁদের সকলেরই ইচ্ছা মৃত্যু হয় আমার নির্দ্দেশে। যে পরমতত্ত্ব আজ তোমাকে বললাম সে সব লোকের অজ্ঞাত ছিল আজ পর্য্যন্ত। এ সবও তোমার জন্যে দরকার বলেই তোমাকে বললাম। এখন কাউকে বলো না এ সব কথা। পরে উপযুক্ত সময়ে এ সবের প্রচার মহামূল্যবান বলে পরিগণিত হবে। পরে আরও বলব।"

জয় মা আনন্দময়ী মা গো।

১২ই জুলাই, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল আফিস থেকে ফিরবার সময় আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীচরণ মজুমদার আমাকে বললেন যে মাকে জিজ্ঞাসা ক'রো শনি মঙ্গলবার অমাবস্যা কি হয়? কালকে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম। মা কিছু বললেন না। আজকে আফিস থেকে এসে প্রায় ঘণ্টা খানিক ঘুমিয়ে উঠেই মাকে ধরলাম বল। মা বললেন, "অমা" হ'চ্ছে অমার্গ" বা অমার্গ মণ্ডলের পরিবেশ। "বস" সেই

স্বরূপ। "অমানিশা" অমার্গ মণ্ডলের যেমন কোনও শরীর নাই তেমনি শরীরহীন অমার্গ মণ্ডলের পরিবেশ। অমাবস্যার যে যোনী মধ্যক্ষণ সেই ক্ষণে এই পৃথিবীর উপরে অমার্গ মণ্ডলের স্পর্শ তরঙ্গ এসে লাগে। সেই ক্ষণটুকুতে পৃথিবীর পরিবেশ ক্ষণতরে চিন্ময় বা মহাপবিত্র পরিবেশে রূপান্তরিত হয়। এই যে ক্ষণ এ ক্ষণ বিচার করে নিরূপণ করা এখনকার জ্যোতিষীদের কার্য্য নয়। যাঁরা মহাসিদ্ধ সাধক তাঁরাই এই ক্ষণকে বলে দিতে পারেন। জ্যোতিষীগণ সময়ের যে নির্দ্দেশ দেন সেটা সেই যোনীক্ষণের আগের ও পরের। কিন্তু কখন সেই মুহূর্ত্ত তার নির্দ্দেশ দিতে পারেন না। আমার পূজার যে পদ্ধতি আছে এই যোনীক্ষণে সেই সময়ে যদি সাধক আমার সাধনা করেন তবে তিনি কৃত কৃতার্থ হন ও আমার সাক্ষাৎকার হয়। সেই ক্ষণের নির্দ্দেশ এখন কেউ দিতে পারে না ও তেমন সাধক সেই ক্ষণের বিচার করেন না বলেই তাঁর সাধন অগ্রসর হয় না। তোমাকে এক দিন বলেছিলাম যে এক একটি গ্রহ এক একটি মণ্ডলে আছে। এর ভিতরে শনিগ্রহ আছে ধাতু মণ্ডলে, মঙ্গল আছে মারুত মণ্ডলে। মনে ক'রো না দিন গুলোর নাম বৃথাই করা হ'য়েছে। বহুকাল পূর্ব্বে সাধকগণ দিনের নাম ধার্য্য করে গেছেন। মহাযোগী শিবই এই কার্য্য করে গেছেন ও শ্রীভৃগুর সেটা আর্য্যদের ভিতরে প্রচার করে গেছেন। এই যে দিন এর ক্ষণটুকুর যতখানি পরিব্যাপ্তি সেই সময়ে সেই গ্রহ পৃথিবীর উপরে তার প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবের উপর প্রতিফলিত হয় সক্রিয় ভাবে। এখন অমাবস্যার সেই যোনীক্ষণে শনিগ্রহের প্রভাব আরও বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয় কারণ পৃথিবী তখন অমার্গ মণ্ডলের স্পর্শ পায়। সেই শনিবারে অমাবস্যায় যোনীক্ষণে ধাতু ধারণ বিধেয়। তা হ'লে শনির সক্রিয় যোগাযোগ সেই ধারকের উপর বর্ত্তায়। এখানে শনির মনস্তুষ্টি বিধান করা হয় ব'লে শুভ প্রভাব সেই ধারকের উপর বর্ত্তায়। শনির বক্র প্রভাব অন্য যার উপর পতিত হয় তার ধাতু ঘটিত রোগ বা ধাতু ঘটিত সমস্যা বর্ত্তায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র এই সব ধাতু ধারণ বিধেয় অর্থাৎ যা ভূগর্ভে পাওয়া যায়।

পাথরও পূর্ব্বাপর খনিজ বলে পাথর ধারণও বিধেয়। মঙ্গলেরও তাই। মঙ্গলের বেলায় যে সকল বৃক্ষ, লতা, গুল্ম বায়ুর উপরে নির্ভরশীল অর্থাৎ যার জীবন ধারণের জন্যে বায়ুই প্রধান সেই সবের কিছু ধারণ করলে মঙ্গলের সক্রিয় শুভ প্রভাব ধারকের উপর বর্ত্তায়। যেমন, "করবী," "পুনর্নবা" "রক্তাম্বর" "শ্বেতপদ্মমূল" "আরুণী," "মেঘলা" "সপ্তপত্র" 'বিল্ব" "তুলসী," "চন্দ্রচূড়" "অশোক," "দেবদারু" ইত্যাদি। এ সব মহা সত্য বলে জানবে। ভবিষ্যতে এ সকল জনগণের মহা মঙ্গলের কার্য্য সাধন করবে। সাধন কর। এ সবের দিকে বেশী যেও না এখন তাতে সাধনের ক্ষতি হবে। এ সব পরবর্ত্তী কালে নিজ হ'তে সব জানতে পারবে। তখন সব চোখের সামনে দেখতে পাবে। তোমাকে চিনিয়ে দিতে হবে না। এমনি ভাবেই শঙ্করকে আমি অপার জ্ঞানের অধিকারী করেছিলাম। সাধন কর, অগ্রসর হও, আমি আছি।"

জয় জয় জয় মা আমার আনন্দময়ী জননী মা দুর্গা।

২৮শে জুলাই, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত কালীচরণ মজুমদার আমাকে বলে ছিলেন, মাকে জিজ্ঞাসা করতে যে ২৪ ঘণ্টার ভিতরে কখন আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তি একবার জাগ্রত হ'য়ে প্রাণের শক্তি আহরণ করে নেয়। আমি মার কাছ থেকে যা পেলাম তা' এইরূপ। মা বললেন, "মাছ যেমন অনেকক্ষণ জলের ভিতরে থেকে এক একবার জলের উপরে ভেসে উঠে বায়ু গ্রহণ করে; ঘড়িতে যেমন ২৪ ঘণ্টায় একবার ক'রে চাবী দিতে হয়; জীবদেহ যেমন নিয়মিত আহার দ্বারা সচল থাকে তেমনি জীবদেহে প্রাণ বা সূক্ষ্ম দেহ বা আত্মা জীবিত থাকে ২৪ ঘণ্টায় একবার পরমাত্মার নিকট থেকে শক্তি আহরণ করে। কুণ্ডলিনী মূলাধার থেকে ঊর্দ্ধ গতিতে ধীরে ধীরে স্বাধীষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাক্ষ, ও প্রজ্ঞাচক্র উৎক্রমন ক'রে ব্রহ্ম কেন্দ্রতে এসে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় অতি সামান্য ক্ষণের জন্যে ও তাই থেকে যে শক্তি সে আহরণ করে তাতে তার ২৪ ঘণ্টার পথ অনায়াসে পার হ'তে কোনও কষ্ট হয় না।

পল—১।৬০ দণ্ড বা ২৪ সেকেণ্ডে এক পল। বিপল—পলের—১।৬০ ভাগ বা সেকেণ্ডের ২।৫ ভাগ। অনুপল—১।১৫০ ভাগ সেকেণ্ডের। অর্থাৎ—এক মিনিটে—২॥০ পল। এক মিনিটে—১৫০ বিপল একমিনিটে—৯০০০ অনুপল।

অনুপল—৯০০০ × ৬০ মিনিট = ৫,৪০,০০০ অনুপল এক ঘণ্টায়। ৫,৪০,০০০ × ২৪ ঘণ্টা দিন রাত্রি—১,২৯,৬০,০০০ অনুপল দিন রাত্রিতে।

তোমাদের দেহে সূক্ষ্ম প্রাণের ক্রিয়া এক দিন রাত্রিতে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় ৫০,০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ বার স্পন্দিত হয়। এই ক্রিয়া অনুপলে হয়। ১,২৯,৬০,০০০ দিন রাত্রি অনুপলে তার থেকে ৫০,০০০০০ স্পন্দন বিয়োগ কর—১,২৯,৬০,০০০—৫০,০০০০০=৭৯,৬০,০০০ অনুপল। একে ৯০০০ অনুপল দিয়ে ভাগ কর।

৭৯,৬০,০০০ ÷ ৯০০০ = ৮৮৪$\frac{৪}{৯}$ মিনিট। ৬০ মিনিট দিয়ে ৮৮৪$\frac{৪}{৯}$ কে ভাগ কর ৮৮৪$\frac{৪}{৯}$ ÷ ৬০ = ১৪ ঘণ্টা ৪৪ মিঃ $\frac{৪}{৯}$ ভাগ। অর্থাৎ ১৪ ঘণ্টা ৪৪ মিঃ ২৭ সেকেণ্ডের মতন। দিন ১২ টা থেকে রাত ১২টা—১২ ঘণ্টা। ১২ ঘণ্টা + ১৪ ঘণ্টা ৪৪ মিঃ ২৭ সেকেণ্ড=২৬ ঘণ্টা ৪৪ মিঃ ২৭ সেকেণ্ড। রাত্রি বারটা থেকে আবার রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টা। ২৬ ঘণ্টা ৪৪ মিঃ ২৭ সেকেণ্ড থেকে ২৪ ঘণ্টা বিয়োগ করলে ২ ঘণ্টা ৪৪ মিঃ ২৭ সেকেণ্ড। তা হ'লে রাত্রি—২ ঘটিকা ৪৪ মিঃ ২৭ সেকেণ্ডের প্রায় কাছাকাছি সময়ে প্রতি রাত্রে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হ'য়ে পরমা শক্তির থেকে শক্তি আহরণ করে। সেই সাধনের প্রশস্ত সময় রাত্রি ২ ঘটিকা থেকে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত। এই সময়েই অমার্গ মণ্ডলের স্পর্শ হয় পৃথিবীর সঙ্গে ও এই ক্ষণই হ'ল "যোনীক্ষণ"। সামান্য অনুপলের তারতম্যের মাঝামাঝি এই যোনীক্ষণ বা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়। এ অতিশয় সূক্ষ্ম বিচারের বিষয়।"

জয় জয় জয় মা জ্ঞানদায়িনী জননী মা আমার মহা শক্তিময়ী জননী।

২৯শে জুলাই, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে ২-২৫ মিনিটের সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুনছি মা ডাকছেন "ওঠ, লক্ষিটি, উঠে ধ্যানে বোস"। আলস্য বশতঃ উঠি উঠি করছি। মা বললেন, "ওঠ, সময় হ'য়ে গেছে।" মাথার কাছে ঘড়ি ও টর্চ্চ রেখেছি। উঠে দেখি ঠিক ২টা ২৫ মিঃ। আসন বিছানার উপরে পেতে ধ্যানে বসলাম। এত রাত্রেও নীচের বাড়ীর কথাবার্ত্তায় মনঃ সংযোগ করতে প্রায় ১০ মিঃ কেটে গেল। জপ চলেছে। ক্রমে পশ্চিম দিকে প্রায় ৪৫° ডিগ্রি মেরিডিয়ানের দিকে উর্দ্ধ গতি হ'চ্ছে। ক্রমেই উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি। দেখি ধূসর বর্ণের মেঘে আবৃত হ'য়েছে সেই দিকটা। ক্রমে সেই মেঘ কৃষ্ণ বর্ণের হ'ল ও স্থির একটি পটের মত জমাট্ বেঁধে রইল। তার উপরে বিচ্ছিন্ন শ্বেত মেঘ খণ্ড চারিদিকে বিস্তৃত। কোথা থেকে এক অপরূপ স্নিগ্ধ নীলাভ আলোক পতিত হ'য়ে এক অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সেই শ্বেত মেঘ খণ্ডের ফাঁকে সুনীল কৃষ্ণ মেঘ পটের উপরে এক সালঙ্কারা কালী মূর্ত্তির আবক্ষ। শুধু কটি দেশ থেকে উপরিভাগ দেখতে পাচ্ছি। প্রায় এক মিনিট মা দর্শন দিলেন। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ শিহরণে হৃদয় মন, প্রাণ আলোড়িত হ'ল। এর ভিতরেই আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। মা বললেন, "হ'য়েছে", এখন শুয়ে পড়। ঘড়িতে দেখি তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট। শুয়ে পড়লাম। সকালে আলস্য বশতঃ আর বেড়াতে গেলাম না।

আমার মা ভরসা। আমার মা আমার মা।

১লা আগষ্ট, ১৯৫৮ খৃঃ. কলিকাতা।

কাল রাত্রি প্রায় ১২॥০ টার সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঠিক আমার ঘরের নীচে রাস্তার ফুট্পাতে বাবুরাম গোয়ালা খাবার প্রস্তুত করে। তারা প্রায় ৪।৫ জনে মিলে খুব জোরে জোরে কথাবার্ত্তা বলছে ও তাইতেই আমার ঘুমের ব্যাঘাত হ'য়েছে। বাবুরামকে বললাম এত রাত্রে কেন সে এইভাবে আমার ঘুমের ব্যাঘাত করে। অনেকদিন তাকে আমি একথা বলেছি, শুনে

নাই। যা হোক্, আমার কথায় তারা নিঃশব্দে কাজ সেরে নিল। কি করি ঘুম হ'চ্ছে না। উঠে বাথরুম সেরে এক গেলাস জল খেয়ে, ঘাড়ে, কানের পিঠে জল দিয়ে বিছানায় ফিরে এলাম। তখন প্রায় পৌনে একটা। ভাবলাম ঘুম যখন হ'চ্ছে না তখন মার ধ্যান করি। আসন বিছানায় পেতে ধ্যানে বসলাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার, আসনে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মনঃ সংযোগ হ'ল। মাকে বললাম, অনেক দিন সাধুভক্তদের দেখিনা, আজ তাঁদের দেখা। মা বললেন, "আজ এইক্ষণ মনে রেখো, এ হ'চ্ছে মহাপ্রলয় ক্ষণ। এই দিনের যেমন তিথি নক্ষত্রের সমাবেশ হ'য়েছে এইরূপ সমাবেশে কোটি বৎসর পরে পৃথিবী ধ্বংশ হবে।" আস্তে আস্তে একটি আলোর বর্ত্তিকা আমার দেহের ভিতরে দক্ষিণে ও বামে আন্দোলিত হ'তে লাগল ও ক্রমেই সেই বর্ত্তিকা উর্দ্ধ দিকে উঠতে লাগল। ক্রমে সে আমাকে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে নিয়ে চলল। এমন একটা জায়গায় এলাম যেখানে সামনে অপার অসীম মহা সমুদ্র-নিস্তরঙ্গ, শান্ত ও অপরূপ শ্বেত আভাতে উদ্ভাসিত। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, অনেক বার এই রকম সমুদ্র দেখেছি ধ্যানে, কখনও এমনি শান্ত আবার কখনও উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল। এর তাৎপর্য্য কি মা? মা বললেন, "এ হোল ভব-সাগর। স্থূল সাগরেরই সূক্ষ্ম রূপ। আত্মিক রাজ্যের এই মহাসমুদ্রই ভব-সাগর। মনোগত যে আত্মা তার স্বরূপগত চিন্তাই এই মহা ভব-সাগরের স্বরূপ লক্ষণ। মন যখন পূর্ণ স্বভাবগত স্থির তখন এই সাগর শান্ত আর মন যখন বিক্ষুব্ধ তখন এই সাগর উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল।" এই সব দেখছি হঠাৎ আমার চোখের সামনে যে সমুদ্র বেলা ভূমি খানিকটা আছে তার উপরে একটি বিরাট্ পুরুষের আবির্ভাব হ'ল। তাঁর গঠণ অত্যন্ত বলিষ্ঠ, শ্যামবর্ণ, খালি গা, শুধু একটা ধুতি পরিধানে। উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণদের মত মাথার সবটুকু কামানো, শুধু ব্রহ্মতালুর উপরে খানিকটা চুল আছে ও সেখানে একটি লম্বা শিখা গুচ্ছ। তাঁর দৃষ্টি সমুদ্রের দিকে। আমাকেও যেন দেখতে পাচ্ছেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? মা বললেন, "ইনি ভক্ত রামানুজ"। হঠাৎ পট পরিবর্ত্তন হ'ল। সমুদ্রের ভিতরে একটা আলোর রাজ্য

ও তার ভিতরে একটি পূর্ণ মুখ মণ্ডল। সেই মুখ চীন দেশীয়; ঠিক পূর্ণ চন্দ্রের মত উজ্জ্বল ও দীপ্যমান। কালো একটি বৃহদ্ গোঁফ আছে। দাড়ি নাই; চক্ষু মুদ্রিত। মা বললেন, "ইনি কনফিউসিয়াস্"। আবার পট পরিবর্ত্তন। একটি সুন্দর গৃহ ও তার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে মুখ ক'রে একটি অতি সুন্দরী তরুণী। আঁচল গলায় জড়ানো। ঘরটি যেন পূজার ঘর ও সেই ঘর থেকে যেন তিনি পূজা সমাপন করে এসে আমাকে দেখছেন। পরনে সাদা শাড়ি, চওড়া কল্কা পার, মাথায় অল্প ঘোমটা, সারা মুখ ও কপাল দেখা যাচ্ছে। কপালে চন্দনের টিপ্। মা বললেন, "ইনি মহাভক্তিমতী মীরা দেবী"। আবার পট পরিবর্ত্তন। চারিদিক থেকে বায়োস্কোপের পরদার উপরে ছবির মতন একটির পর একটি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির আবির্ভাব হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ, মাধবাচার্য্য, শঙ্কর, যাজ্ঞবল্ক্য, Saint Paul, ঋষি Tolstoy, দাউদ্, ভক্তিমতী রাবেয়া, সম্রাট্ সোলোমন ইত্যাদি। বহু বহু মহান আত্মার আবির্ভাব হ'ল। সমুদ্রের ভিতর থেকে একটি দেহ উঠছে তার গায়ে রাজকীয় পোষাক (পুরাতন ইউরোপীয়) তার গলাটা ক্রমেই লম্বা হ'তে লাগল যেন Spring এর মত হ'ল, মাথাটা প্রায় আমার কাছে এল যেন তার মহাকষ্ট হ'চ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? মা বললেন, "ইনি নেপোলিয়ান্। খুব কষ্ট পাচ্ছেন।" এর পরে এক অপূর্ব্ব পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। সাগরের ভিতর থেকে একটি অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় দেহের আবির্ভাব হ'ল। তাঁর দেহের অপরূপ লাবণ্য অথচ বৃদ্ধ। চুল দাঁড়ি সব সম্পূর্ণ পাকা। গলায় পাট্‌করা একটি খুব পাতলা চাদরের মত, গলায় একটি মালাও আছে। হাতে যেন একটা কি আছে, পদ্ম বলে মনে হ'ল, হাত অঞ্জলীকৃত; মাকে জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? মা বললেন, "মহাভক্ত নারদ"। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটল। হঠাৎ যেন সব কোথায় মিলিয়ে গেল ও আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। দেখি ঘড়িতে ২টা। মাকে স্মরণ করে শুয়ে পড়লাম।

আমার মা ভরসা। আমার মা আনন্দময়ী—। মাগো।

৯ই আগষ্ট, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "চৈতন্য বাহ্যতঃ তিন স্বরূপ কিন্তু মূলতঃ একই স্বরূপগত। যেমন জড় চৈতন্য, জীব চৈতন্য ও পরম-চৈতন্য।

জড় চৈতন্য যথা :—

নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, মাটি, ঘর, বাড়ী, ও মনুষ্য দ্বারা প্রস্তুত সব কিছুই জড় চৈতন্যের বাহ্য-স্বরূপ। যদি ও এরা সব জড়, অনঢ় ও স্থানু, জীবত্ব বা জীবচৈতন্য বিহীন তবুও এরা চৈতন্যের ধারক। প্রত্যেকটির শক্তির বিভিন্নতা সত্বেও নিজস্ব শক্তি আছে বা তার ভিতরে শক্তি উৎপাদিত হ'তে পারে। শক্তির ধারক মাত্রেই চৈতন্যের অংশ বা পরম-চৈতন্যে অবলীলায়িত আছে বলে চৈতন্য স্বরূপ। এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম-সাগর বা পরম-চৈতন্য-সাগর। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর ভিতরে চৈতন্য লীলায়িত।

কিন্তু জীব অধিকর্ত্তা ভেদে আংশিক পরম-চৈতন্যের সক্রিয় অংশ। পরম-চৈতন্য জীব-চৈতন্য রূপে অংশ গ্রহণ করে জীবাত্মারূপ অধিকার ভেদ পেয়েছে'। যেমন পুত্র পিতার অংশ। কিন্তু মূলতঃ পুত্র পিতাই। পিতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ যা পিতার একমাত্র নিজস্ব তাই পুত্ররূপে স্বরূপগত হ'য়েছে। কিন্তু পিতা পুত্র, দেহাধিকারে বিভিন্নতা লাভ ক'রে স্বরূপগত আপন আপন সত্তায় জীবত্ব রক্ষা করছে। এক পিতাই পুত্রের দ্বারা বহু হ'য়েছেন। আবার বহুপুত্র মূলতঃ একই পিতা বা পিতার নিজস্ব অংশ। দ্বৈতবাদ এসে যাচ্ছে মনে করা ভুল। কারণ পিতাও যা মূলতঃ পুত্রও তাই। কিন্তু অধিকার ভেদে পিতা, পিতা আর পুত্র, পুত্র। এখানে দ্বৈতবাদ নামান্তর মাত্র। কারণ স্ব স্ব স্বরূপগত না হ'লে কার্য্য ও কারণ, দৃশ্য ও দ্রষ্টার স্বরূপগত কার্য্য থাকে না। কারণ যে কার্য্য পিতার দ্বারা সম্পাদিত হ'চ্ছে সে কার্য্য দ্রষ্টা হিসাবে স্বরূপগত হ'য়ে পুত্র উপভোগ করছে। পুত্র কারণ আর পিতা কার্য্য। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে পুত্রের উপভোগ কার্য্য সম্পাদন হবে বলেই পিতা কারণ হ'য়ে পুত্রের জন্ম দান করলেন। এই কার্য্য কারণ একে অন্যের প্রতি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এখানে অদ্বৈতবাদ

এসে পড়েছে মনে করা ভুল। কারণ পিতার স্নেহ ও পুত্রের পিতৃভক্তি মূলতঃ ভিন্ন ধারার অভিব্যক্তি। আবার পুত্রই পিতার স্বরূপগত হ'য়ে অপত্য স্নেহ লাভ করছে। ভাবধারার পরিবেশনে পুত্রই পিতা হ'য়ে উঠছেন। কিন্তু প্রত্যেক পুত্রই তার পিতার কাছে পুত্রই থেকে যায়। সুতরাং অদ্বৈতবাদ এখানে নামান্তর। পিতা তার শ্রেষ্ঠ দেহ সম্পদ দিয়ে পুত্রকে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু পিতার আত্মীক কোনও ক্ষতি হ'ল না। পুত্রের জন্ম লাভের পরে পিতা পুত্রের প্রতি আগধ স্নেহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'লেন। আর পুত্র পিতাকে আপন সহজ ভালবাসায় গ্রহণ করল। পিতা পুত্রের এই যে মিলনক্ষণ বা পরম সম্পদ যাতে পিতা পুত্রের প্রতি আর পুত্র পিতার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে একে অন্যকে পরম প্রেমে গ্রহণ করছে, এই হ'চ্ছে বিশুদ্ধ। পরম-চৈতন্যের যে মহা সত্তা সে সত্তা পিতারই ন্যায় ও জীব চৈতন্যের যে সত্তা সে পুত্রেরই ন্যায়। জীব চৈতন্য যখন পরম চৈতন্যের অংশ হ'য়ে প্রথম আত্মারূপে ও পরে জীবত্মারূপে জন্ম গ্রহণ করল তখন তার স্বাভাবিক প্রেম পরম-চৈতন্যের প্রতি থাকা বিজ্ঞান সম্মত। এই যে পারস্পারিক বন্ধন এই বন্ধনে যখন উভয়ে মিলিত হয় তখন বিশুদ্ধ চৈতন্যের উৎপত্তি ও সেই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের পূর্ণ মীমাংসা। অধিকার ভেদ বর্ত্তালেও কার্য্য কারণের সমাবেশে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত বলে জীবত্মা মূলতঃ পরমাত্মার অংশ হ'য়েও একদিকে দ্রষ্টা আর একদিকে দৃশ্য হ'য়ে পড়েন। আবার পরম চৈতন্য একদিকে স্রষ্টা ও আর একদিকে দ্রষ্টা হ'য়ে পড়েন। এই যে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও স্রষ্টা এর মূলে দ্রষ্টা ও দৃশ্য জীবত্মায় বর্ত্তায় আর একদিকে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও স্রষ্টা পরমাত্মায় বর্ত্তায়। তা হ'লে পরমাত্মা স্রষ্টা হ'য়ে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের অধিকর্ত্তা। সুতরাং দ্রষ্টাও দৃশ্যের অধিকর্ত্তা ভেদে জীবাত্মা আর পরমাত্মা এই তিন অধিকার ভেদে পরমাত্মা। স্রষ্টার স্থান জীবাত্মার নাই বলে জীবাত্মা স্বরূপগত ও অংশগত পরমাত্মার হ'লেও সে পরমাত্মা নয়। আর পরমাত্মার ভিতরে স্রষ্টার স্থান আছে বলে স্বরূপগত দৃশ্যও দ্রষ্টার উর্দ্ধে ও সেই জন্যে তিনি পরমাত্মা। এই একটি কার্য্য কারণের ব্যবধানে জীবত্মা পরমাত্মার পরম অংশ হ'য়েও শক্তিতে অনেক স্থূল

বা নিকৃষ্ট। এই শক্তিতে শক্তিহীন বলেই জীবাত্মার পরমাত্মার উপরে নির্ভর ভিন্ন উপায় নাই। এই নির্ভরই যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ সবের বিভিন্নতার সামঞ্জস্য। এই নির্ভরেই যোগাযোগ হয় জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে ও সেই বিশুদ্ধ চৈতন্য ও সেইক্ষণই হ'ল পিতাপুত্রের স্নেহালিঙ্গন। এই পরম মোক্ষ। এই পরম পদ লাভ ও জীবত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ মীমাংসা।"

জয় মা জ্ঞান দায়িনী জননী। জয় জয় জয় মা দুর্গা।

১৩ই আগষ্ট, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল লেকে বেড়াতে বেড়াতে মাকে বললাম, এত যে জপ করছি সঙ্কট ত' নিবারিত হ'চ্ছে না। নানা সঙ্কটে বিব্রত হ'য়ে পড়ছি কেন? মা বললেন, "কর্ম্মই জীবনের গতি নিদ্ধারণ করে। কর্ম্মই প্রতিপাদ্য ও প্রামাণ্য। কর্ম্মই জীব জীবনে সুখ ও দুঃখ উৎপাদন ক'রে থাকে। জীব জীবন জন্মান্তরের আবর্ত্তে এই কর্ম্মফল সংগ্রহ করে থাকে। যেমন কর্ম্ম হয় তেমনি ফল হয়। প্রত্যেক জন্ম পরিক্রমায় বিগত জন্মের সদ্ অসদ্ কর্ম্মের ফল ক্ষয় হয় ভোগে। যেমন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ফল ভোগের দ্বারা ক্ষয় হয়, তেমনি আবার সেই জন্মে কর্ম্মফল জীব অর্জ্জন করে। সদ্ কর্ম্ম করতে করতে আত্মা ক্রমেই সক্রিয় আত্মনিষ্ট হয়, জন্মান্তরে সাধন নিষ্ঠ ও সদ্কর্ম্ম নিষ্ঠ হ'য়ে উঠে। এ সব আপনা থেকেই স্বভাবের দ্বারা জন্ম পরিক্রমায় হ'তে থাকে। সেই জন্যেই প্রত্যেকের ভিতরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করাই শ্রেষ্ঠতম দান। এতে গ্রহীতা ও দাতা উভয়েই জন্ম পরিক্রমার হাত হ'তে রক্ষা পায়। কারণ দেহ এত স্থূল ও সক্রিয় যে তার ভাব অভাবের তাড়নায় আত্মা নিশ্চেষ্ট হ'য়ে পড়ে ও পূর্ব্ব জন্মের সাধন থাকা সত্ত্বেও দেহ বিকারে সে অনেক অন্যায় আচরণ করে থাকে। ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি এত সূক্ষ্ম যে মানব জানে না কোনটা প্রকৃত ন্যায় ও কোনটা প্রকৃত অন্যায়। এক ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া এই সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। অনেক উন্নত সাধু, স্বভাবের বিরুদ্ধ কাজ করায় জন্মান্তর পরিক্রমা এড়াতে পারে না। কারণ

পূর্ণ স্বভাব নিষ্ঠ না হ'লে পূর্ণ ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হয় না ও সেটা যে পর্য্যন্ত জীবের না হয় সে পর্য্যন্ত তার জন্ম পরিক্রমা ধারাবাহিক রূপে চলতে থাকে। এই জন্ম দানই আমার কার্য্য সাধনে অগ্রসর করবার জন্যে। এই জন্ম গ্রহণের ইচ্ছা দেহান্তরে আত্মার জন্মায়। কারণ দেহান্তরের পরে আত্মা সম্যক বুঝতে পারে যে তার সেই জন্মে তার কতটুকু অগ্রগতি হ'য়েছে। তখন সে জীবজন্ম আবার ইচ্ছা করে। এই ইচ্ছাই স্বরূপগত হ'য়ে আমার ইচ্ছায় আবার আমার অভিপ্রেত পরিবারে ও পরিবেশের ভিতরে তার দেহ ধারণ হয়। প্রত্যেক জন্মে কতগুলো স্থূল কার্য্য থাকে যা সেই জন্মেই ফল ভোগে ক্ষয় হয়। তোমার পূর্ব্ব জন্মাকৃত কর্ম্মফল ভোগ ক্ষয় হ'য়েছে। কিন্তু এ জন্ম অনেক স্থূল কর্ম্মের ফল এখনও তুমি ভোগ করছ। জপ যত করবে তত আত্মনিষ্ঠ হবে। যত আমামুখিন্ হবে ততই সেই ফলের ক্ষয় হবে। এই জন্যে তোমাকে বলেছি, আগে যা করেছ, করেছ; কিন্তু এখন যদি সেই সব কার্য্য কর তবে সাধন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে ও তোমার কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। কারণ যখন দেহাধিকারে আত্মা আবৃত থাকে বা প্রজ্ঞার বিচার থাকে না তখন অন্যায় কর্ম্ম করলেও আমার কাছ থেকে তত কঠিন শাসন পাও না। কারণ তোমার বিচার আমার হাতে। কিন্তু যখন তোমার জ্ঞান হ'ল যে এটা অন্যায় বা তোমার আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'ল তখনও যদি তুমি সেই পূর্ব্বকার অভ্যাস বশতঃ সেই সব অন্যায় কার্য্য কর তখন আমি অতি কঠিন শাসন করি। কারণ তখন তোমার কঠিন শাস্তি তোমারই মঙ্গলের জন্যে। সুতরাং এইযে তোমার কষ্ট ভোগ হ'চ্ছে এ সব তোমার অভ্যাস বশতঃ পূর্ব্বকার অন্যায় কার্য্য করার জন্যে হ'চ্ছে। তোমাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছি যে, যে কার্য্য পূর্ব্বে করে তোমার কষ্ট কম হ'য়েছে সেই সব কার্য্য এখন করাতে তৎক্ষণাৎ তোমার বিশেষ ক্ষতি ও মনকষ্ট হ'য়েছে। তুমি সদা আত্ম নিষ্ঠ, জাগ্রত ও সচেতন থাকবে। দেখবে কোনও কার্য্য আমার আদেশ ছাড়া না কর। করলেই আবার সঙ্কট উপস্থিত হবে। তোমার মঙ্গলের জন্যে ও তোমার সাধনের জন্যে যা প্রয়োজন তা যত

কঠিন হোক্ না কেন আমি করব। আমার প্রতিটি নির্দ্দেশ পালন করবে। তোমাকে আমার চাই। তোমার দ্বারা আমার মহান্ কার্য্য সাধিত হবে। বিশ্বাস দৃঢ়তম কর ও সাধনে আরও অগ্রসর হও। ভয় নাই আমি সর্ব্ব সময় তোমার সাহায্য করব।"

জয় মা দয়াময়ী জননী।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "ভাবগত যে বুদ্ধি সে বুদ্ধির বিচার প্রয়োজন।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভাবগত বুদ্ধিই বা কি আর তার বিচারই বা কি করে করব? মা বললেন "জীবদেহ ধারণ হ'লেই বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। এই বুদ্ধি প্রত্যেক কার্য্যে জীবকে সহায়তা করে। আত্মগত, সাধনগত ও আমাগত এই বুদ্ধির প্রত্যেককে বিচার করবে। যে বুদ্ধি যে কার্য্যে তোমাকে নিয়োজিত করছে সেই বুদ্ধিই ভাবগত ও সেই বুদ্ধি তোমাকে ন্যায় অথবা অন্যায়ের পথে নিয়ে যাচ্ছে কিনা সেটা বিচার করবে আত্মনিষ্ট হ'য়ে আত্মজ্ঞান দ্বারা। বুদ্ধি মনের চক্ষু ও সেই চক্ষু তোমাকে কি দর্শন করাচ্ছে সেটা তোমার দর্শনীয় কিনা। যদি আত্মজ্ঞান না থাকে তবে বুদ্ধি তোমাকে অসদ্ কর্ম্ম করাবে দেহ সুখের জন্যে। আর যদি আত্মজ্ঞান থাকে তবে এই বুদ্ধিই তোমাকে সদ্ কর্ম্ম করাবে আত্মার সুখের জন্যে ও সর্ব্বপ্রকার সুখের জন্যে। বুদ্ধির কার্য্যই মনের সুখ ও দুঃখের হেতু। মনের সুখ ও দুঃখই দেহের ও তোমার স্থূল পরিবেশের সুখ ও দুঃখের হেতু। সুতরাং বুদ্ধিরূপ চক্ষুদ্বারা তোমার দর্শন পরিমার্জ্জিত কর। দর্শন যত পরিমার্জ্জিত হবে বুদ্ধি ততই স্থির ও প্রজ্ঞাযুক্ত হবে ও ক্রমে এই বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকারূপে পরিণত হবে। তখনই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। তখন এই বুদ্ধিই আর অসদ্ দর্শন করাতে চাইবে না। ক্রমে গভীর দর্শন হবে, আমার দর্শন ও আমার কৃপা লাভ হবে। এই জন্যই তোমাকে বলেছি ভাবগত যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধির বিচার প্রয়োজন। অগ্রসর হও। আমি আছি, চিন্তা নাই।"

জয় মা আনন্দময়ী জননী মা দুর্গা —।

১৯শে আগষ্ট, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ লেকে বেড়াতে বেড়াতে মাকে বললাম, আমার নানাভাবে সাধনের বিঘ্ন হ'চ্ছে আমারই নিজের দোষে তাতে আমার জন্মান্তর পরিক্রমা ও পরম মোক্ষ প্রাপ্তি বহু লম্বিত হবে। মা বললেন, "মোক্ষ, মোক্ষ করিস্ কেন? পরম মোক্ষ লাভ করা অতি কঠিন। এক জন্মেত হয়ই না, জন্ম জন্মান্তরেও পরম মোক্ষ লাভ হয় না। কর্ম্মই জীবাত্মার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য। এই কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী ও সকল প্রকার কর্ম্মের ফলই উপজীবিত হয়। কর্ম্ম অর্থ স্থূল কর্ম্ম নয়। তোমার প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি মনোবৃত্তিই কর্ম্ম ও প্রত্যেকটিই ফল প্রসব করে। তোমার এই যে কোটি কোটি কর্ম্মপ্রবাহ তারা সকলেই বীরত্বের আশ্রিত। কারণ জীব জন্ম বীর-ধর্ম্মী। কর্ম্মই তোমার জীবনের লক্ষ্য চিহ্নিত করে। একবিন্দু বীর্য্যের ভিতরে অগণিত যে শুক্রকীট্ ছিল তাদের তুমি তোমার প্রথম মানবত্বের সূচনায় যুদ্ধ ক'রে ধ্বংস ক'রে তবে তোমার আকাঙ্খিত স্থান মাতৃ জঠরে করে নিয়েছ। এই যে তোমার জীবন যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল এতে তুমি জয়ী হ'য়েছিলে বলেই তোমার আজিকার রূপে স্থিতি। তুমি সকলকে হত্যা ক'রে তবেত তুমি আজ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। সুতরাং হত্যায় তোমার অন্যায় নাই যদি সেটা তোমার আত্মোন্নতির জন্যে করতে বাধ্য হও। এ পূর্ণ স্বভাবধর্ম্মী ও হীন কার্য্য নয়। এই যে বীরত্ব এ তোমার স্বভাবজাত। তুমি বীর না হ'লে তোমার জীবনে প্রতিষ্ঠা হবে না। তারপর জন্ম গ্রহণের পর থেকে এই সংসারে তোমার নিজের প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্ব্বক্ষণ গভীর সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়। এই সংগ্রাম তোমার প্রতি নিয়ত হবে। যদি সংসারের সংগ্রামে ভীত হ'য়ে তুমি সংসার পরিত্যাগ কর তবে তুমি ভীরু ও সেটা তোমার গভীর অন্যায়। ভীরুতাই অবিশ্বাস এবং অবিশ্বাসই পাপ। যে সংসার আমার দান ও যে সংসারে তোমার সর্ব্বক্ষণ সংগ্রাম করাই আমার অভিপ্রায় সে অভিপ্রায়কে তুমি তোমার ভীরুতার দ্বারা অপমানিত করলে। সেই তোমার হীন কর্ম্ম ও তাতে তোমার জন্মান্তর পরিক্রমা লম্বিতও পরম মোক্ষ

সুদূর পরাহত হবে। এখন কথা হ'চ্ছে মানব প্রকৃতি যে স্বভাবের অন্তর্গত সেই স্বভাবের পূর্ণ বিকাশই মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশ ও সেই সাধনের সিদ্ধি। সেটা যে পথেই হোক না কেন। জ্ঞানের পরিচর্য্যা, বিজ্ঞানের পরিচর্য্যা, ভক্তির পরিচর্য্যা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচর্য্যা, আমার পরিচর্য্যা, রিপুর পরিচর্য্যা যে কোনও দিকে তুমি তোমার নিজেকে একাগ্র মনে পরিচর্য্যায় নিযোজিত করবে, সেই দিকেই তোমার সিদ্ধি অর্থাৎ সেই দিকেই তোমার সাফল্য লাভ হবে। এই সফলতা যদি লাভ করতে হয় তবে তোমার স্বভাবকে সেই দিকে পূর্ণ একাগ্র করতে হবে। তুমি যদি তোমার দেহজাত স্থূল কাম বাসনার দিকে তোমার সকল দেহ, মন ও প্রাণকে সম্পূর্ণ একাগ্র মনে ধাবিত কর তবে তোমার সেই কাম চরিতার্থের সকল প্রকার ভোগের প্রকরণ অচিরেই লাভ হবে। কিন্তু তোমার সেই অসঙ্গত রিপু প্রবণতায় উৎকট্ দেহ ও মনের ব্যাধি উপস্থিত হবে। কারণ রিপুর পরিচর্য্যা যতটুকু তোমার স্বভাবের অন্তর্গত সেই টুকুই তোমার পক্ষে বিধেয়। এর বাইরে গেলে তোমার সেই দিকে যেমন সফলতা আসবে আবার অন্য দিকে উদ্দামতার জন্মে স্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হবে। কাম রিপুর পরিচর্য্যা শুধু লিঙ্গ দ্বারাই হয় না। দৃষ্টিতে হয়, ঘ্রাণে হয়, স্পর্শে হয়, মনে হয়, ইঙ্গিতে হয় ইত্যাদি বহু প্রকারে কাম রিপুর পরিচর্য্যা হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা যেটুকু তোমার করণীয় কর্ত্তব্য সন্তান উৎপাদনের জন্মে সেইটাই তোমার স্বভাবের অন্তর্গত। এর বাইরে স্বভাব বিরুদ্ধ। এ শিক্ষা তোমার নিম্ন স্তরের জীবের জীবন যাত্রা তোমার পক্ষে শিক্ষনীয়। কারণ তারা স্বভাবের অনুকূলে জীবন যাপন করে। ঈশ্বর সাধনায় তুমি নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে রাখলে। তোমার সংসারের সকল কর্ত্তব্য তুমি অবহেলা করলে। তোমার জীবন ধারণের যে মুখ্য উদ্দেশ্য, সকল সাংসারিক কর্ম্ম কর্ত্তব্যাদেশে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত করা সেই উদ্দেশ্যকে তুমি উপেক্ষা করে শুধু আমার আরাধণায় মগ্ন হ'য়ে রইলে তবে তোমার সংসারে তোমার স্ত্রী, পুত্র অভাবের তাড়নায় পতিত হবে। তারা দুঃখ পাবে। তোমার উপরে

দেশের দশের, পরিবার, পরিজনের যে কর্ত্তব্য র'য়েছে সেটা তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিজের পরিবেশে পর্য্যালোচনা করে জানতে হবে। তুমি যদি সেটা না ক'রে সকলকে ছেড়ে নিজের মোক্ষ লাভের জন্যে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে সংসার ত্যাগ করে আমার সাধনে লিপ্ত হও তবে আমাকে হয়ত তুমি পাবে। কারণ তোমার সাধনের একাগ্রতাই আমাকে লাভ করবার সাহায্য করবে। কিন্তু সংসার পরিত্যাগ করার জন্যে যে অন্যায় সেটা তোমার বর্ত্তাবে। তোমার ওই সফলতা আংশিক। তার জন্যে আবার জন্মগ্রহণ করে তোমাকে পূর্ণ সংসারী হ'য়ে সংসার করতে হবে। শত্রুকে যেমন হাতে অস্ত্র দিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে পরাজিত করাই বীর ধর্ম্ম তেমনি রিপুগণকে ভোগের উপকরণ দিয়েই জয় করা মানব ধর্ম্ম ও পরম মোক্ষের সহায়ক। কারণ রিপুও আমিই দিয়েছি ও তাদের ভোগের জন্য উপকরণও আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। তুমি মনে করলে আমি রিপু জয় করেছি কারণ আমার বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে একদিনও সংসর্গ করি নাই। এ দিকে নানারূপ সাধন প্রণালী অধিকার করে আমি ঈশ্বর দর্শন লাভ করেছি ও অনেক অলৌকিক সম্পদের অধিকারী হ'য়েছি সুতরাং আমার পরমমোক্ষ লাভ হবেই। সেটা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ ভেবে দেখ তোমার যে মনোবৃত্তি সেই মনোবৃত্তি যদি তোমার পিতা মাতার হ'ত তবে তোমার জন্ম হ'ত কি প্রকারে। যে সরল স্বভাবের পথে তোমার জন্ম লাভ হ'য়েছে সেই পথই তোমারও জন্যে চিহ্নিত। সে পথ ছেড়ে স্বভাবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'লে তোমার সেই কর্ম্মের জন্যে আবার জন্মগ্রহণ অনিবার্য্য। যদিও তোমার সাধনের জন্যে সুখ সম্পদ আনয়ন করবে পরজন্মে তবুও তোমার সংসার পরিচর্য্যা নিশ্চিত সত্য। বিদেহী অবস্থায়ও তোমার স্বর্গবাস ও সুখ উপভোগ করতে হবে। কিন্তু স্বর্গবাস হওয়া সত্বেও সময়ে তোমাকে সংসারে জন্ম গ্রহণ করে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতেই হবে। সুতরাং পরম মোক্ষ লাভ করতে হ'লে তোমার পূর্ণ সমত্ব অধিকার করা প্রয়োজন। সংসারের প্রতিটি কর্ত্তব্য ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা পূর্ণরূপে সম্পাদন করবে ও আমাকে সর্ব্বঘটে, সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব

অবস্থায় দর্শন করে সাধন করবে। এতে সংসারের বন্ধনও খণ্ডন হবে আমাকেও লাভ হবে। ভোগের দ্বারা রিপুর প্রভাব দূর হবে আর সাধনের দ্বারা আমার করুণা লাভ হবে। এইরূপে ষষ্টজন্ম তোমার অতিবাহিত হবে। সপ্তম জন্মে তোমার সংসার স্পৃহা বা ভোগের বাসনা থাকবে না; থাকবে আমার প্রতি আকুলতা ও সেই জন্মে শুধু আমার প্রতি কর্ত্তব্যের ভিতর দিয়ে ও মহা সাধনের ভিতর দিয়ে মানবের পরম হিতে নিজেকে নিয়োজিত করবে। সেই জন্মে দেহান্তে তোমার পরম মোক্ষ প্রাপ্তি হবে। তখন তুমি ও আমি আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে নিত্যলীলায় আনন্দ সাগরে মগ্ন থাকব। তখন তুমি হবে আমার পরম সখা ও প্রিয়তম শিষ্য। এই বার বুঝেছ ?"

মাগো তোমার একি লীলা মা ? মাগো আমায় দেখা দে মা। আমার ব্রহ্মজ্ঞান দে মা। আমার সকল কর্ত্তব্য আমাকে দিয়ে করিয়ে নে মা। কাউকে যেন ঘৃণা না করি মা। মা গো স্নেহময়ী জননী আমার।

২৩শে আগষ্ট, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ বিকালে খুব সঙ্ঘের উৎসব ছিল। মন্দিরে শচীদার (ডাঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়) উপাসনা ছিল। আরাধনার পর থেকে গভীর ভাবে মগ্ন হ'য়েছি। উপসনার কথা কিছুই কানে আসছে না। আস্তে আস্তে উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি। অতি উর্দ্ধে এক মনোরম আলোকের রাজ্য এসে পড়লাম। দেখি, একটি অতি উজ্জ্বল স্বর্ণসিংহাসনে এক অপূর্ব্ব মাতৃ মূর্ত্তি। মাতৃ মূর্ত্তির মাথা, গলা, হাত ও সর্ব্বাঙ্গ অতি উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত। এ এক আশ্চর্য্য দর্শন। মাকে প্রায় তিন চার মিনিট দেখলাম। আমার মার নব নব রূপ।

মা আমার বহুরূপী—মাগো।

২৫শে আগষ্ট, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "আত্মোন্নতির জন্যে হত্যায় অন্যায় হয় না।" আমি বললাম, এ আবার কি কথা ? হত্যা মাত্রেই অন্যায়, তা' আত্মোন্নতির জন্যই হোক্ আর দশের উন্নতির জন্যই হোক্। মা বললেন, "তা নয়, হত্যাই জীব

জগতের ধর্ম্ম। এক একটি জীব জীবন ধারণের জন্যে কোটি কোটি হত্যা করে। তোমার পিতার এক বিন্দু বীর্য্যের ভিতরে অগণিত শুক্র কীট্ ছিল। তোমার দ্বারা সেই অগণিত শুক্র কীট্ ধ্বংস হ'য়েছে। তুমি তাদের হত্যা করে তবে তোমার নিজ সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছ। এই যে তোমার জীবরূপে জন্মের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তোমার হত্যালীলা আরম্ভ হ'য়েছে এ হত্যালীলা শেষ হবে আবার তোমার দেহান্তে। তুমি প্রতিদিন তোমার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, চলা ফেরায় খাদ্যে, পানে সর্ব্ব অবস্থায় কোটি কোটি হত্যা করে চলেছ। যদি তোমার এই সকল হত্যায় অন্যায় হোত তবে তোমার মোক্ষ লাভের আর কোনও উপায়ই থাকত না। যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী নয় তারা বলবে অজ্ঞানিতে এ সব অন্যায় করলে অন্যায় হয় না। কিন্তু যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁরা ত জানেন যে তাঁরা কত কোটি কোটি হত্যা প্রতিদিন করছেন। ও হত্যা প্রকৃতিগত কারণে তাঁদের আত্মোন্নতির জন্যেই হ'চ্ছে। এতে প্রত্যবায় যতটুকু হয় তার থেকে আত্মোন্নতির ধর্ম্ম প্রধান। জীব জীবন সংগ্রামের জীবন। তোমাকে নিজের পরম উন্নতির জন্য সংগ্রাম করতে হবেই ও সেই সংগ্রাম করতে হ'লে হত্যা করা একেবারে অপরিহার্য্য। সুতরাং হত্যার জন্য মনে দুঃখ করো না। তোমার প্রতিষ্ঠা যখন আমার কাম্য তখন আমার অগণিত সৃষ্টজীবের দেহপাতে ও তাদের দেহ দানে যদি তোমার প্রতিষ্ঠা হয় সেটা আমারই নির্দ্দেশিত পথ। এ পথকে পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ও তোমার যথাবিহিত কর্ত্তব্য নয়। জীব হত্যা হ'চ্ছে বলে মনে দুঃখ পেয়ো না। যারা আজ তাদের দেহ দান করে তোমাকে পুষ্ট করছে তারা সে কার্য্য আমারই নির্দ্দেশে করছে। কারণ তোমার প্রতিষ্ঠা আমার কাছে তাদের জীবনের থেকে বেশী প্রয়োজন। তবে আমার নাম করে হত্যা, বা আমার করুণা লাভ হবে মনে করে কোনও জীবকে হত্যা বা লালসার বশবর্ত্তী হ'য়ে হত্যা বা অযথা হত্যা এইরূপ হত্যা মহা অন্যায়। এ হত্যায় মিথ্যাচার হয়। এ প্রকার হত্যায় মনের নির্ম্মল ও সরল ভাবধারা ব্যাহত হয়ে

সাধনে বিঘ্ন উৎপাদন করে। এতে আত্মোন্নতি হয় না, হয় আত্মবিনাশ। এ বিষয় পরে আরও বিশদ্‌ভাবে বলব। এর অতি সূক্ষ্ম বিচার আছে। এখন এই যা বললাম মনে রেখ। জীবন পথে চলতে সংগ্রাম তোমার অনিবার্য্য ধর্ম্ম ও সেই সংগ্রামে জীব হত্যা তোমার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী।"

মাগো তুমি আমার বিচিত্র জ্ঞানদায়িনী জননী। আমায় আরও জ্ঞান দে মা। মা আমার প্রাণে বল সঞ্চার কর মা। মাগো মাগো মাগো।

৩০ শে আগষ্ট, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ লেকে বেড়াতে বেড়াতে মাকে বললাম, আজ ক'দিন হ'ল রাত্রে আমাকে ডেকেও দিচ্ছিস্ না আর আমার যোগাসনও হ'চ্ছেনা। মা বললেন "যেটুক করছ তাই এখন তোমার প্রয়োজন! আমাতে যদি খুব বেশী মগ্ন হ'য়ে থাক তবে তোমার সংসার ব্যবসায় স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদির প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য ব্যহত হবে। তোমার উৎস মুখ এখন আমি খুলে দেব না, তা হলে এরা সব ভেসে যাবে। তা' হ'লে ভক্তি, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদির প্রবাহে তুমি আমার দিকে উন্মাদ হ'য়ে ছুটে যাবে। তখন তোমাকে রোধ করবার সাধ্য আমারও থাকবে না।" আমি বললাম, একি কথা, তোমার রোধ করবার ক্ষমতা থাকবে না, সে কি? তুমি সর্ব্বশক্তিময়ী, তোমার অসাধ্য কি আছে? মা বললেন "হ্যাঁ সে সত্যি, কিন্তু যে জিনিষ তোমাকে দিলাম, তোমার রূপান্তরের জন্যে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া বা তাকে রোধ করা আমার নিয়ম নয়। যা দেব বিচার করেই দেব ও তোমার মঙ্গলের জন্যেই দেব। সুতরাং যা তোমার জীবনে প্রতিনিয়ত হ'চ্ছে সেটা আমার ইচ্ছাকৃত বিধান ও সেই তোমার সাধনের সোপান। তোমাকে নানা সাংসারিক কার্য্যের জন্যে চিন্তা, পরিশ্রম করতে হচ্ছে। সে জন্যে তোমার নিদ্রা পরিমিত দরকার, শরীর সুস্থ রাখা প্রয়োজন। অধিক রাত্রে যোগাভ্যাসে তোমার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় ও তাতে তোমার উপর সংসারের ন্যস্ত কর্ত্তব্য উপযুক্তরূপে সম্পাদিত হ'তে পারে না। আমার পূজা কি ধ্যান যোগেই শুধু হয়? না, আমার পূজা প্রতিনিয়ত হয়

আমার প্রতি একাগ্র থেকে সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য যথাযথ পালনে। জেনে রাখবে আত্মাই সব। দেহ যন্ত্র। প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, বিশ্বাস, ইত্যাদি সব আত্মায় জন্মায়। আত্মাই এই সকলের আধার। দেহের কি শক্তি আছে এর যে কোনও একটা সৃষ্টি করবার। জীবাত্মার এ সব আমিই দিয়েছি ও এর প্রত্যেকটি জীবের কল্যাণের জন্যে। দেহ লাভ হ'লে, দেহ অত্যন্ত স্থূল ব'লে দেহ বুদ্ধি জাগ্রত হয়। এই বুদ্ধি ও মনও আত্মারই সম্পদ। কিন্তু দেহ এমন স্থূল যে তার মনোরঞ্জনের জন্যে আত্মাকে বাধ্য হ'য়ে নিম্নগামী হ'তে হয়। দেহ যদি স্বভাবধর্ম্মী হয় তবে আত্মার ঊর্দ্ধগমন হয়। দেহের লালসায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে আত্মার জড় ভাব আসে। প্রত্যেক জীবাত্মা ভিন্ন কিন্তু একই উপাদানে সৃষ্ট ও একই মহা পরম সত্ত্বায় বিধৃত বলে এক আত্মা অন্য আত্মার বিষয় অবগত হয়। সংসারে যেমন তোমরা অন্যান্য সকলকে স্থূল দৃষ্টিতে দেখতে পাও তেমনি আত্মিক জগতে ব্রহ্ম সত্ত্বায় নিমগ্ন সাধক সকল আত্মাকে দেখতে পান। স্বাভাবিক যে ধারা স্থূল জগতে দেখতে পাও আত্মিক জগতেও ঠিক একই ধারা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত। একচুল তারতম্য নাই। তাই বলি সম্পূর্ণ স্বভাবধর্ম্মী হও। যে পরিবেশ তোমার সেই পরিবেশে ও সেই অবস্থায় তোমার সকল কার্য্য, সকল কর্ত্তব্য, সকল ভাব, অভাব নিয়ত পালন কর। সে থেকে বিচ্যুত হ'লেই তুমি তোমার পরিবেশ থেকে বিচ্যুত বা তোমার স্বাভাবিক ধারা বা ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হ'লে। এই স্বাভাবিক ধারা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে যদি নিজেকে অন্যভাবে সাধন করব মনে করে সারাদিন ধ্যান ধারণা কর ও সংসারের সকল কর্ত্তব্য উপেক্ষা কর তবে জানবে তোমার ত্রুটি হল। হয়ত তোমার নিজের আত্মিক উন্নতি হবে সত্য। কিন্তু যে পরিবেশে আমার নির্দ্দেশে, আমার বিধানে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সেই পরিবেশে থেকে তার সেবার ভিতর দিয়ে আমার সেবাই তোমার প্রকৃত ধর্ম্ম। দৃষ্টি আমাতে রাখবে ও তোমার সকল কর্ত্তব্য আমার নির্দ্দেশিত কর্ত্তব্য বলে মনে করে সরল অন্তরে সেই সকল কার্য্য সকল করবার ও পালন করবার

জন্যে পূর্ণ চেষ্টা করবে। তা' না হ'লে আবার তোমার জন্ম হবে ও আবার সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করতে হবে। আমার নিয়ম অমোঘ এ থেকে কোনও কালে কোনও অবস্থাতে নিস্তার নাই। সুতরাং যে দিকে যে ভাবে আমি তোমাকে নিয়ে চলেছি সেই ভাবে ও সেই দিকে চল। সেই তোমার নিয়তি ও সেই তোমার ধর্ম্ম ও তার পরিচর্য্যা তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য। এবার বুঝেছ ?"

মাগো তোর সকল কথার মর্ম্ম আমি বুঝতে পারি না মা। তুই কখন যে কি বলিস্ মা। মহা প্রহেলিকায় আমায় ফেলে রেখেছিস্ মা। মাগো এ সব ভাসিয়ে দে মা। শুধু তুই আর আমি সারাক্ষণ এক হয়ে থাকি মা। আমার মাগো, লক্ষ্মী মাটা গো।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ভোরে ধ্যানের পর মা বললেন, 'পাপ কি সেটা আগে বুঝতে চেষ্টা কর। প্রোজ্জ্বল্য শক্তি যখন অপকৃষ্টতে পরিণত হয় সেই পাপ। পঃ অপ। "পঃ" অর্থে প্রোজ্জ্বল্য শক্তি। "অপ" অর্থে অপকৃষ্ট। প্রোজ্জ্বল্য শক্তি হ'ল আত্মিক প্রজ্ঞা। প্রোজ্জ্বল্য শক্তি ঐশী বিধান। দেহাত্ম বিদ্বেষ যখন অন্তর লোক প্লাবিত করে, আত্মিক প্রজ্ঞাকে সঙ্কুচিত ক'রে ঐশী বিধানকে অবজ্ঞা করে সেই হ'ল পাপ। দেহ স্থূল ও স্থূল ব'লেই দেহের জড়তা স্থূলতাকে আশ্রয় ক'রে নিজ দেহ শক্তিকে বা জড়শক্তিকে (যদিও দেহের কোনও শক্তি নাই) প্রকৃত শক্তি ব'লে মনে করে ও যা কিছু হ'চ্ছে সবই সেই করছে ও সবই তার দ্বারা কৃত হ'চ্ছে তখন তার ওই প্রোজ্জ্বল্য শক্তি বা আত্মিক প্রজ্ঞা সঙ্কুচিত হয়। এই যে দেহ শক্তির জড়জ্ঞান এর নাম বিদ্বেষ। তখন দেহ বা জীব বিদ্বেষী হ'য়ে উঠে। সে আত্মিক প্রজ্ঞাকে বা অন্তর লোকের চিরন্তন স্বাভাবিক ধারাকে উপেক্ষা করে বা অস্বীকার করে। এই উপেক্ষা বা অস্বীকারকেই পাপ বলে। যে ঐশী বিধানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত, যে ঐশী বিধানে জন্ম, মৃত্যু, কর্ম, সংসার ইত্যাদি সকল কার্য্য পূর্ণরূপে সম্পাদিত হ'চ্ছে

ও যার মূলে আমি নিত্য নিরাধার নিরঞ্জন, নিত্য লীলায় নব নব রূপে ব্যক্ত সেই বিধান রূপ নিত্য প্রত্যয়কে উপেক্ষা ক'রে জীব যখন জড় শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বা দেহ কার্য্যকে শক্তি জ্ঞানে নিজে করছে মনে ক'রে আমার বিধানকে উপেক্ষা করে বা অস্বীকার করে তখনই পাপের জন্ম হয়। সুতরাং আমার বিধান বা আমাকে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করাই পাপ। এর বিশদ্ ব্যাখ্যার প্রয়োজন এখন নাই। কারণ যা বলেছি সেটা সহজ ও সরল। এই জ্ঞান নিয়ে নিজ মনে যদি ধীর ভাবে বিচার কর তবেই কোনটা পাপ আর কোনটা পাপ নয় তা বুঝতে পারবে। ইংরাজিতে "Sin" এরও সেই অর্থ। 'S' Suspision 'I' in 'n' nature. এই যে nature এই প্রকৃতি এই আদ্যা শক্তি ও আমি। সুতরাং প্রকৃতির সকল কিছুই আমার সৃষ্ট ও তার ভিতরে আমিই ওতপ্রোত হ'য়ে আছি। সেই দৃষ্টি এলেই বিশ্বাস দৃঢ় হবে ও পাপ থাকবে না। সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তোমরা পাপে মগ্ন রয়েছ। গীতায় যে সমর্পনের কথা আছে "আমিই সব ও আমাতেই সকল সমর্পন কর, এই সমর্পনই একমাত্র পুন্য ও এই জ্ঞান এলেই তুমি পাপ মুক্ত। তা ছাড়া আর কিছু পাপ নয়। তোমরা যেটা পাপ মনে কর সেটা পাপ নয় অন্যায়। অন্যায় ও পাপের ভিতরে অনেক পার্থক্য আছে। এর বিষয় পরে বিশদভাবে তোমাকে বলব! আজ এইটার বিষয় বেশ ভাল করে বুঝতে চেষ্টা কর।"

মা আমার নিত্য লীলাময়ী— জ্ঞানদায়িনী জননী। মাগো মাগো মাগো।

১০ই সেপ্টম্বর, ১০৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা আমাকে বললেন, "আমিই সর্ব্বসত্তা, আমিই ব্রহ্মময়ী, আমিই ব্রহ্ম। আমিই প্রকৃতি, আমিই শক্তি ও আমিই সারাৎসারা ব্রহ্মস্বরূপা মহা মাতৃকা। আমি ও ব্রহ্ম অভিন্ন। আমিই দয়িত ও আমিই একমাত্র ভজনীয়, পূজনীয়, ত্রিকাল জয়ী মহাকালরূপী মহাকাল। আমিই ভক্তের ভগবান, আমিই সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী একমাত্র জননী। জগতে আজ পর্য্যন্ত আমার প্রতিষ্ঠা পূর্ণ একাগ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জ্ঞানের দিক থেকে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষদের অন্তরের

নিভৃত কন্দরে প্রশ্ন থেকে গেছে। সে প্রশ্ন পরবর্ত্তিকালে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ভক্তের অন্তরেও মহা মহা জীবাত্মারই ভজন, পূজন হ'য়েছে। যদিও আমাজ্ঞানে মহাভক্তগণ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জীবাত্মার ভজনা করেছেন তবুও তাতে অভিচার দোষ হ'য়েছে। আমি বলছি বুঝতে চেষ্টা কর। জীবাত্মার ভিতরে মানবাত্মা শ্রেষ্ঠতম শক্তির অধিকারী। এই মানবজন্মে আমার বহু ভক্ত জ্ঞানী সাধকগণ সাধনের দ্বারা মানব জন্মে যতটুকু ঐশ্বর্য্য লাভ করা সম্ভব তা করে গেছেন। এই ঐশ্বর্য্য সকল এমন আধিভৌতিক অথচ এত শক্তিশালী যে সাধারণ মানুষ সেই শক্তি দেখে মহা বিস্ময় বোধ করেছে ও তারা নত মস্তকে সেই ঐশ্বর্য্য ও শক্তির কাছে মাথা নত করে তাকেই ব্রহ্ম ভেবে ভজন, পূজন, করেছে। যদিও তাঁদের ভিতর দিয়ে তারা পরব্রহ্মেরই ভজনা ক'রে সিদ্ধি ঋদ্ধি লাভ করে মহাশক্তি-শালী ও ঐশ্বর্য্যবান হ'য়ে গেছেন তবুও তাঁদের অভিচার দোষ হ'য়েছে। এটা মনে রাখবে যে প্রত্যেক মানব কোনও উপলক্ষ্যের মাধ্যমেই হোক্ বা সরাসরি আমার সঙ্গে একযোগেই হোক্ সাধন করলে সে মহাশক্তির অধিকারী হ'তে পারে ও এইরূপ অনেক মানব এই মহাশক্তির অধিকারী হ'য়ে গেছেন। এঁদের সূক্ষ্মত্বলাভ হয়, যত্র তত্র সূক্ষ্ম দেহে বিচরণ করবার ক্ষমতা লাভ হয় ও নানা প্রকার অলৌকিক প্রতিভা বা ক্ষমতা লাভ হয় এই স্থূল দেহেই। এই স্থূল দেহের পরে সূক্ষ্ম দেহ যখন ধারণ করেন তখন তাঁদের সাধনলব্ধ ফলস্বরূপ তাঁরা কল্প কল্পান্তর স্বর্গে বাস করেন ও তাঁদের ক্ষমতা স্বর্গে ও পৃথিবীতে প্রকট করবার শক্তি থাকে। এখন কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে তোমাকে এই বিষয় বলছি যাতে তোমার বুঝবার পক্ষে সুবিধা হয়। যেমন শিব, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি মহাত্মাগণ সরাসরি আমার সঙ্গে একযোগে সাধন করে মহাসিদ্ধি ও মহাঋদ্ধি লাভ করে গেছেন। এইরূপ কালে কালে অনেক মহাত্মাই এমনি সরাসরি আমার সঙ্গে একযোগে সাধন করে মহাসিদ্ধি ও ঋদ্ধি লাভ ক'রে গেছেন। এই সকল মহাসাধকগণ এখনও ও আরও বহু কল্প সূক্ষ্ম দেহে পরলোকে আমার সঙ্গে নিত্য যোগে বিহার করছেন ও করবেন। এই পরলোকেও তাঁরা আমার

ভজনাই করছেন—যোগ, ধ্যান, ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা। এখন ধর "শিব" অর্থে মঙ্গল। একমাত্র আমি ভিন্ন মঙ্গল নাই। আমিই একমাত্র শিবস্বরূপ। কিন্তু তুমি যখন আমার শিবস্বরূপের ধ্যান করছ তখন যদি মহাভক্ত মানব শিবের দিকে তোমার মন যায় তবে তোমার সাধনে অভিচার দোষ হবে। তখন আমারই নির্দ্দেশে মানব মহাসাধক শিবের সূক্ষ্ম আত্মা তোমার কাছে প্রাকৃত বা অপ্রাকৃতরূপে জাগ্রত হবেন। এই অবস্থায় এই দৃশ্য দেখে বা দর্শন পেয়ে তুমি আত্মহারা হ'য়ে মনে করলে "আমাকেই" দর্শন করলে। কিন্তু তা হ'লনা। তোমার অভিষ্ঠ সিদ্ধ হ'ল মনে করলে, তুমি বর লাভ করলে, ও তুমি সিদ্ধ হ'লে মনে করলে। কিন্তু তোমার পূর্ণ সিদ্ধি হ'লনা ও তোমার পূর্ণ মোক্ষ লাভ হ'ল না। এইরূপে যে কোনও দেহধারী মানব সাধক যাঁরা তোমাদের জ্ঞানে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছেন তঁাদের তুমি আমাজ্ঞানে প্রাপ্ত হ'লে। কারণ মহা-সাধকের সূক্ষ্ম আত্মারও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট সাধকের প্রতি মোহ হয় ও অনেক সময় তাঁরা সংসারে লোক সমাজে পূজা পাবার জন্যেও লালায়িত হন। তাঁরা সময়ে সময়ে তাঁদের অনেক ভক্ত সাধকের কাছে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন ও তাঁর শক্তি অনুসারে তাঁর সাধককে অনেক ঐশ্বর্য্য দান করেন—কারণ সে ক্ষমতা তাঁদের ভিতরে উপজাত আছে। সাধারণ সাধকগণ কেন, অনেক উচ্চ কোটির সাধকগণও এই ভাবে আমার সাধন থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পূর্ব্ববর্ত্তিকালের মহা-ব্রহ্মজ্ঞ সাধকদের ভজন, পূজন করে তৃপ্তিলাভ করেন। সেই ভুল তাঁদের ভেঙ্গে যায় পরলোকে এসে। কারণ এখানে সাধকের সঙ্গে আমার যোগ অতিব ঘনিষ্ট ও সক্রিয় হয়। তোমরা জান যে গুরুভিন্ন ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করা যায় না। অর্থাৎ তোমার জ্ঞানের পরিধির বাইরে যে বস্তু আছে সেই বস্তুর খানিকটা যে সন্ধান পেয়েছে সেই তোমাদের কাছে গুরুরূপে বিচার্য্য হয়; এই সব সাধক গুরুদের অনেক ঐশ্বর্য্য ও বিভূতি হয়। আমাকে সরাসরি ভজন, পূজন করেই হোক্ বা আমার কোনও উত্তম ব্রহ্মজ্ঞ সাধকের ভজন, পূজন করেই হোক্। এ সকল ঐশ্বর্য্য তাঁদের লাভ হয় কারণ আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যও নিম্নস্তরের সম্পদ।

শিষ্যের দীক্ষা ও তার সাধন পথে লোকগুরু অনেক শ্রম করেন ও তাকে নানা বিভূতি ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে চমৎকৃত ক'রে গুরুশ্রায়ী করে তোলেন। এতে লোকগুরুর অভিচার দোষ হয়। কারণ অপাঙ্গে অতি সূক্ষ্মরূপে তাঁর মনে আত্মপ্রসাদ উপজাত হয়। এই আত্মপ্রসাদের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই হোল অহংকারের নামান্তর—। তখন সেই লোকগুরুর ভিতরে অপাঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে অহংকার প্রবেশ ক'রে তার পূর্ণ মোক্ষ বহু লম্বিত ও কষ্টসাধ্য ক'রে তোলে। এই ভাবে ঠিক পথে আজ পর্য্যন্ত সকল সাধক অগ্রসর হচ্ছেন না বলেই পূর্ণ মোক্ষলাভে তাঁরা বঞ্চিত হ'চ্ছেন। দুই একটি মহাসাধক বা মহাভক্ত পূর্ণ মোক্ষ লাভ করবার অধিকার আজ পর্য্যন্ত পেয়েছেন। পূর্ণ মোক্ষ হ'ল আমার সত্ত্বা লীলায়িত দেখে আমার সরাসরি ভজনের ভিতর দিয়ে আমার সঙ্গে চিরদিন আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকাই পূর্ণ মোক্ষ। পিতৃ মাতৃ ভাবে ভজনই শ্রেষ্ঠতম সাধন। এতে সাধকের অন্তরে জড় জ্ঞান বা কোনও মাধ্যম এসে পড়ে না। তুমি যে ভাবে সাধন করছ করে যাও। আমিই তোমাকে সাধনে সিদ্ধি দেব। কোনও লোকগুরুর খোঁজ ক'রোনা। আমার উপর পূর্ণ নির্ভর ও বিশ্বাস রেখে সাধনে অগ্রসর হও। আমিত তোমাকে বলেছি তুমি শ্রেষ্ঠতম আত্মা। তোমার দ্বারা আমার অভিপ্রেত সাধন ভজন সংসারে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি সদা সর্ব্বদা তোমার প্রতিটি কর্ম্মে ভাবে সাহায্য করছি। কোনও সংশয় মনে রেখো না। অগ্রসর হও—আমি আছি"।

মা মা মা ব্রহ্মময়ী মা, আমায় সকল ভাবে সাহায্য কর মা। আমি তোর দাসানুদাস। মাগো।

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, আজ সকালটা আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেল। উঠতেও দেরী হ'ল লেকে বেড়াতে যেতে পারলাম না আর তোমার জপধ্যানও হ'ল না। মা বললেন, "সে কিরে? শুষ্ক জপধ্যানই বুঝি সব সময় করতে হবে? এই যে তুই কয়েকটা গান করলি এই ত' আমার জপ। এতে

তোমার জপের চাইতে অনেক গুণ বেশী ফল হয়েছে। আসলে মনে রাখবে অন্তরকে আমামুখিন্ করাই শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম। আমামুখিন্ মন যদি "পাতা পাতা" জপ করে সেও মনে করবে শ্রেষ্ঠতম জপ। তোমাকে আমি সব সময় স্পর্শ করে আছি। আমার প্রতি একাগ্র হ'লেই বুঝতে পারবে। আমার প্রতি একাগ্রতাই শ্রেষ্ঠতম কার্য্য ও শ্রেষ্ঠতম সাধনা এর জন্যে শুষ্ক জপ বা কৃচ্ছ সাধন দরকার নাই জানবে"।

জয় মা আনন্দময়ী—।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে এক নূতন দর্শন হ'ল। শুতে যাবার পূর্ব্বে অভ্যাসমত আসন করে ধ্যানে বসেছি। ব্রহ্ম কেন্দ্রে যে সারা দেহের রক্তের প্রবাহের চাপ. এর পূর্ব্বেকার সময়ে রক্ষণ করে শিবনেত্রে ধ্যানযোগ করতাম সেটা নিয়ন্ত্রিত করে রক্তের চাপকে স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে শিবনেত্রে প্রজ্ঞাচক্রে জ্যোতির পথে অগ্রসর হ'য়ে উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছি। স্থির দৃষ্টি হ'তে প্রায় ৩।৪ মিনিট লাগল। গায়ত্রী জপ চলেছে অন্তরের অন্তস্থলে। মূলাধার থেকে শক্তিকে জাগ্রত দেখতে বাসনা হ'ল। শক্তির জ্যোতিশিখা প্রায় অনাহত চক্র পর্য্যন্ত এল। তারপর হঠাৎ আমার দৃষ্টি আমার মূলাধারে ফিরে গেল। দেখতে লাগলাম, কোথায় আমার মূলাধার চক্র এ যে অনন্ত অসীম ব্যোম মণ্ডল। আমার দেহ নাই। আমি এক অব্যক্ত সূক্ষ্ম সত্ত্বা, অসীম ব্যোম মণ্ডলে যদৃচ্ছা বিচরণ করছি। দেহও আমার সেই অনন্তে একাকার হ'য়ে গিয়েছে। আমার দেহ নাই। মুলাধার এক অনন্ত ব্যোম মণ্ডল। আমি দেহ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ব্যোম মণ্ডলে হাওয়ায় ভেসে ভেসে আমার দেহকে দেখছি। কিন্তু দেখব কি, দেহও যে সূক্ষ্ম সত্ত্বায় পরিণত হ'য়ে গিয়েছে। আমি পূর্ব্বাপর সব কিছু দেখতে পাচ্ছি। ধ্যানের এই গভীরতায় দেহ ও আত্মাকে দেখতে পেলাম। দেখলাম দেহ নাই। এক মহাসূক্ষ্ম সত্ত্বায় উহা বিলীন হ'য়ে গিয়েছে। আর আত্মা অতি সূক্ষ্ম ধুম্র মণ্ডলের উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত

চক্রাকার সূক্ষ্মতম জলীয় বর্ণের এক বস্তু। সে আমি ও সেই আমি সব নিরিক্ষণ করছি। এ এক অতীব আশ্চর্য্য অবস্থা।

জয় মা আনন্দময়ী জননী।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে প্রায় ৪৷৷৹ টার সময় এক কুস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে পড়লাম। মাকে বললাম এখনও আমার দেহ শুদ্ধ হয় নাই। তোর ধ্যান ধারণা সবই আমার বিফল হ'ল। অন্তরে একটা দুঃখ। জীবনে যে সব অন্যায় করেছি সব একে একে স্মৃতিপটে আসতে লাগল। বাথরুমে গেলাম ও মুখ ধুয়ে এসে ধ্যানে বসলাম। আসন নিতে ভুলে গেছি। বিছানায় বসে মনকে একাগ্র করতে চেষ্টা করছি। মনে নানা প্রকার চিন্তা আসছে। মনকে এক প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে একাগ্র করে নিলাম। জপ আরম্ভ হ'ল। ক্রমে এক অনন্ত আলোকের সাগরে এসে গেলাম। দেখছি আমার দেহ নাই। সকল স্থূল জগত যেন নাই। সব সেই এক মহা সত্ত্বায় অনন্ত আলোকের সমুদ্রের ভিতরে একাকার হ'য়ে গিয়েছে। শুধু "আমি-রূপ যে চৈতন্য সেই চৈতন্য সত্ত্বা জাগ্রত র'য়েছে। সে মহাসাগরের অনন্ত প্রসারের ভিতরে নিরবয়ব হ'য়ে জাগ্রত চৈতন্য নিয়ে রয়েছে। যতবার নিজের দেহকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি ততবার দেখছি দেহ নাই, সেই মহাচৈতন্য সাগরের ভিতরে বিলীন হ'য়ে গিয়েছে। শুধু জাগ্রত রয়েছি "আমি"। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার? মাকে বললাম একি? মা বললেন, "**মন্ত্র-চৈতন্য-সাধন**" হ'চ্ছে। আমার অদ্বৈতরূপ উপলব্ধি কর। আমি যে মহান ব্যাপ্তি, মহান্ অদ্বৈতরূপ পরম সত্ত্বা, সেই সত্ত্বাকে ধারণা কর। আমি মহান্ বিধৃতিপূর্ণ অদ্বৈতস্বরূপ। এই মহান্ বিধৃত অনন্ত মহা-সাগররূপ অদ্বৈত সত্ত্বায় জীবাত্মা বা জীবচৈতন্য শুধু "**আমি**" রূপে বর্ত্তমান। এই যে "**আমি**" রূপ যে চৈতন্যময় জীবাত্মা সেই "**আমি**" রূপ পরমচৈতন্যে লীলায়িত বা জাগ্রত। এখানে আছে কেবল "আমি" "আমি" এই দুই "**আমি**"। জীব-চৈতন্যেও "**আমি**" আর পরমচৈতন্যেও "**আমি**"। জীবচৈতন্য আমি রূপে

আপন নিজ সত্বা নিয়ে আমারূপ **"পরম আমি'** চৈতন্যে লীলায়িত। **এই "আমি"রূপ, প্রকার ভেদে জীবচৈতন্য ও পরম চৈতন্য পৃথক, আকার ভেদে নয়। এই পার্থক্য শুধু আত্মচৈতন্যরূপ স্বরূপগত।** দৃশ্যতঃ বাহ্য জড় জগত এই জীব-চৈতন্যরূপ "আমির" প্রকাশ বা ধারা। কিন্তু এই দৃশ্য বাহ্য জড় জগতও অদৃশ্য মহান্ চৈতন্যময় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহান চৈতন্যরূপ পরম চৈতন্য **"আমির"** প্রকাশ। সুতরাং আমিরূপ পরমচৈতন্যই জীবচৈতন্য ও তার **"আমি"** রূপ বাহ্য প্রকাশ আমাতেই বিধৃত ও অবলীলায়িত বা জাত। এই যে আমার অদ্বৈতরূপ এ রূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ দুই **"আমিতে"** একাকার হ'য়ে এক "আমি" বর্ত্তমান। জীবাত্মার **"আমি"** আবার 'আমিতে' গ্রথিত। তোমার 'আমি' রূপ সত্বা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই যে দেহ দেখ সে নাই। এ দেহ এক পরম চৈতন্যময় সত্তায় বিলীন হ'য়ে গেছে। এর উপস্থিতি শুধু জীব-চৈতন্যরূপ আত্মচৈতন্যের অভিব্যাক্তিতে বা তার আমি রূপ বহিপ্র্কাশে। মূলতঃ তার 'আমি' রূপ জীবচৈতন্য ভিন্ন অন্যরূপ নাই। বা যা দৃশ্যতঃ গ্রহণ করেছে সে শুধু রূপান্তর। এই রূপান্তরও কার্য্যতঃ প্রয়োজন। এই জীবচৈতন্যের 'আমির' দৈহিক রূপান্তর ও এ তার চৈতন্যের পরম চর্চ্চার জন্যে ঘটিত হ'চ্ছে। এ না হ'লে জীবচৈতন্য বিধৃত হয় না বা তার সক্রিয় ভাব বিলাস আসে না। জীবচৈতন্য রূপ 'আমি' যদি নিরাকার. নিরবয়ব থাকে তবে তার মহাচৈতন্যে ভাসমান থাকায় তার কোনও প্রয়োজন থাকে না। সে আমাতে পূর্ণ আনন্দ উপভোগ ক'রে আপনাকে মুক্ত ও একক মনে করে। আমার কোনও প্রয়োজন বা আমার কোনও অস্তিত্ব সে স্বীকার করে না। এই জন্যেই জীবচৈতন্যের 'আমিকে' আমার নিজ প্রয়োজনে স্থূল দেহ লাভ করাই। এই স্থূল দেহের 'কর্ম্মই' তাকে আমার স্থিতির প্রশ্ন এনে দেয় ও সে আমাকে অন্বেষণ করে। সাধন ক'রে ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, কর্ম্ম, দয়া ইত্যাদি দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করে। এই জড় দেহ গুণে সে নিজ আত্মায় গুণ সংগ্রহ করে। এই গুণেই সে আমাকে পরম সুহৃদ বলে জানে ও আমার সঙ্গে তার সখ্যতা লাভ হয়। আমি একক

'আমি' পূর্ণ। কিন্তু এই পূর্ণতায় আমার লীলা হয় না। তাই **'আমি'** জীবচৈতন্যরূপ 'আমির' সৃষ্টি করেছি ও তার সঙ্গে নিত্য লীলায় আমি 'সম্পূর্ণ'। এই **বিশুদ্ধ-চৈতন্যই** একমাত্র পথ যে পথে আমি ও জীব এক মহান্ সত্তায় গ্রথিত বা লীলায়িত। শুধু দুই 'আমি'। এই দুই 'আমি' এক 'আমি' সখ্যতায় ও লীলায় আলিঙ্গনাবদ্ধ। কিন্তু এই দুই সত্তা একই সত্তার অধিকারী হ'য়েও অধিকার ভেদে **জীবচৈতন্য ও পরমচৈতন্য**। জীবচৈতন্য কখনও পরমচৈতন্যের মধ্যে একাকার হ'য়ে বিলীন হ'য়ে যায় না। তার 'আমি' নিয়ে সে জাগ্রত থাকে চিরকাল। পরম মোক্ষও সে আমার ভিতরে 'আমিত্ব' নিয়েই আমার সঙ্গে নিত্য লীলায় মগ্ন থাকে ও তার জন্মান্তর হয় না। এই জন্যেই তোমাকে আজ এই সব দেখলাম।

মা করুণাময়ী মা আমার।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মা বললেন, চৈতন্য সম্পাদন করবার জন্যই জীবাত্মার দেহ ধারণ। দেহ ধারণ না হ'লে আমার প্রয়োজন সে স্বীকার করে না। জীবাত্মা মুক্ত ; সে সূক্ষ্ম দেহধারী-চৈতন্য। এই অবস্থায় তার জন্ম ও তার উপস্থিতি এমন মুক্ত যে সে আপন শক্তিতে যদৃচ্ছা বিচরণ করে ও আমাকেই উপেক্ষা করতে চায়। তাই আমার ইচ্ছায় জীবত্মার দেহ ধারণ। দেহ ধারণ হ'লে, দেহ স্থূল বলে তার সুখ ও দুঃখ অত্যন্ত স্থূল আকার ধারণ করে। দুঃখে পতিত হয়ে সে যখন আর কোনও সাহায্য বা অবলম্বন পায় না তখন কোথায় শান্তি আছে সেই কথা চিন্তা করে। আত্মা আমার সক্রিয় অংশ বলে স্বতই তার আমার দিকে আকর্ষণ হয়। আমাকে জানতে চায় ও আমার কাছে শান্তি প্রার্থনা করে। এই অবস্থায় ক্রমিক গতিতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে সে আমাকে জানতে পারে ও আমাকে বিশ্বাস করে। এতে তার শান্তি আসে। এমনি করে এক জীবন থেকে পরবর্ত্তী জীবনে সে তার পূর্ণ অভিজ্ঞতা বা সংস্কার নিয়ে আমার প্রতি ধাবিত হয়। যাদের ভিতরে এ অভিজ্ঞতা বা সংস্কার লাভ হয় না তারা অন্য

আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্যে আত্মজ্ঞান লাভ করে। আমার প্রতি তারও প্রেম জাগে। আমার অংশ বলে আমার প্রতি স্বাভাবিক অথচ অতি সূক্ষ্ম একটা প্রীতির বন্ধন প্রত্যেক জীবাত্মার ভিতরে আছে। জ্ঞান বা ভক্তি লাভ করলেই সেই বন্ধন দৃঢ়তর হয় ও সে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। জড় জগতের নানা দৈহিক ও মানসিক দুঃখ দেখে সাধারণ ব্যক্তিও জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করে। এই দুঃখ মোচনের জন্যে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ একবার উপজাত হলে সেটা সংস্কারে রূপায়িত হয় ও সেই সংস্কার জন্মে জন্মে ক্রমিক গতিতে আত্মজাত হ'য়ে তার সাধনে অগ্রসর করায়। এমন করেই মানব আত্মা ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান লাভ ক'রে আমার দিকে ধাবিত হ'য়ে পরম মোক্ষ-লাভ করবার চেষ্টা করে। এ সবই আমার প্রয়োজনে হয়। তার প্রয়োজন শুধু আমার প্রয়োজনকে তৃপ্ত করা। ভৃত্য যেমন তার প্রভুর প্রয়োজনকে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রে প্রভুর সেবায় নিজের প্রয়োজনকে প্রয়োজন মনে করে না তেমনি জীবাত্মার প্রয়োজন যা আছে সেটাকে সামান্যতম মনে ক'রে আমার প্রয়োজনকেই সবিশেষ শ্রেষ্ঠত্বদান করে। আসলে জীবাত্মার প্রয়োজন কিছুই নাই। আমার প্রয়োজনই জীবাত্মার একমাত্র প্রয়োজন। যেটা তোমরা প্রয়োজন বলে মনে কর সেটা আমারই প্রয়োজনেই হ'চ্ছে। যতকিছু তোমাদের প্রয়োজন বোধ সেগুলো আমার প্রয়োজনের জন্যেই সম্পাদিত হয়। যত কিছু কর্ম্ম করছ ও যা কিছু তোমরা সংসারে করছ সবই তোমার সংস্কার সাধন করবার জন্যে আমার প্রয়োজনে হ'চ্ছে। সবই আমার ও সবই আমার প্রয়োজনে তোমরা করছ। তোমার দুঃখ সেও আমার প্রয়োজনে আবার তোমার সুখও আমারই প্রয়োজনে। তোমার পরিবার প্রতিপালন করতে পারছ না, তারা অভাবে কষ্ট পাচ্ছে, কি তোমার দোষ, কত তুমি অর্থের জন্যে চেষ্টা করছ ইত্যাদি সব মনে করবে একজনের প্রীতির আকাঙ্ক্ষা করে, তাকে মুক্ত করবার জন্যে আর দশজনকে দৈহিক কষ্ট ভোগ করাই। যেমন তোমার জীবন কিছু অগ্রসর হ'য়েছে আমার প্রতি আকাঙ্ক্ষায় তখন আর যে দশজন

যাদের তখনও তোমার পর্য্যায় আসবার সময় হয় নাই তাদের কষ্ট হয় সেটা আমার প্রয়োজনে তোমার উন্নতির জন্যে। কারণ এটা স্বভাবসিদ্ধ যে আর যে দশজন এখন কষ্ট পাচ্ছে তারা সময়ে আমার দিকে আসবেই। তাই এখনকার কষ্ট তাদের কিছুই না। তারাও মুক্ত হবে। সবাই অব্যক্ত বিশ্বরূপে বিধৃত বলে, সবই সূক্ষ্ম বলে, সকলেই মুক্ত জীবাত্মার আকার বলে তাদের দৃশ্যতঃ দুঃখ দুঃখই না। এই জ্ঞান পরমজ্ঞান যদি সেই দৃষ্টি দিয়ে বিচার কর। আমার কাছে তোমাদের যে দুঃখ সেটা দুঃখ না। কারণ যে দুঃখের জন্যে আজ তুমি দুঃখ করছ, সেই দুঃখ দিচ্ছি কেন, যাতে ভবিষ্যতে মহা দুঃসহ দুঃখ থেকে তুমি অব্যাহতি লাভ কর। তুমি ত' জাননা যে এই দুঃখ কেন তোমার জীবনে এল? এই দুঃখ এল ব'লেই তুমি আমাকে স্বীকার করলে, আমার শরণাপন্ন হ'লে ও এতেই তোমার ভবিষ্যতে যে মহান দুঃখ আসতে পারত সেটার হাত থেকে তুমি রক্ষা পেলে কারণ এই সামান্য দুঃখেই তুমি আমার শরণাপন্ন হ'লে। আরও জ্ঞান দেব। আমার একান্ত হও, আমাকে জান ও আমার সঙ্গে লীলায় যুক্ত হও"।

জয় মা আনন্দময়ী।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ মাকে বললাম, তুই ত' ভীষণ স্বার্থপর। নিজের প্রয়োজনে আমাদের সকলকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিস্। মা এ কথা শুনে হাসছেন। বললেন, "তুই ত, ভারী মস্ত তার্কীক হ'য়েছিস্। আমার প্রয়োজন কি সে কথা ধীর ভাবে অন্তরে গভীর জ্ঞানে চিন্তা করে দেখ তো। আমার প্রয়োজন যে তোরই মহামুক্তির জন্যে। এই মহামুক্তির অর্থ হ'চ্ছে তুই তোর জীব-জীবনের সর্ব্বার্থ লাভ করছিস্। তোর জীবনের চরম সফলতাই যে তোর শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন। যেমন বিদ্বান বিদ্যা অর্জ্জন করে বিদেশে গিয়ে অর্থ-উপার্জ্জন ক'রে নিয়ে এসে বাড়ীর উন্নতি করে, আত্মীয় পরিজনের সাহায্য করে ও পরম শান্তিতে নিজ গৃহে থেকে বাকী জীবন কাটিয়ে দেয় তেমনি জীব

পরিক্রমায় দেহ ধারণ ও তাই। তুমি যে সম্পদ আহরণ করলে সে সম্পদ নিয়ে এসে আমার কাছে বাকী জীবন অতিবাহিত করবে বলে। এতে তোমারই প্রয়োজন। আমার প্রয়োজন কত দিন? যত দিন তুমি তোমার প্রয়োজনকে তোমার নিজ স্বার্থ বুদ্ধিতে জাগ্রত রাখবে, যতদিন তুমি তোমার প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনই মনে করবে ততদিন আমার প্রয়োজন তোমার জন্যে। তুমি যদি নিজের প্রয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে আমার প্রয়োজন মনে করে নিকিঞ্চন হও তখন আমার আর প্রয়োজন নাই—। তখন আমি তোমার সেই নিস্বার্থপরতার জন্যে আমার ঐশ্বর্য্য তোমাকে ঢেলে দেব। তুমি যখন সব মন প্রাণ আমার হাতে তুলে দেবে তখন আমি তোমাকে আমার শ্রেষ্ঠতম প্রেম দান করে তোমাকে শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্যের অধিকারী করব। ভৃত্য যখন নিজের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা তার প্রভূর কৃপার উপর ছেড়ে দেয় তখন সে তার প্রভুর সমপর্য্যায় এসে যায়। তার প্রভু তাকে নিজের অন্তরের সকল স্নেহ তার ভৃত্যকে ঢেলে দেয়। আমার যে সম্পদ তাও সেই প্রকার।" আমি বললাম, তোমার প্রয়োজনেই যখন সকল তুমি করিয়ে নেবে তবে আমি আর সারাদিন নানা কর্ম্ম করি কেন? মা বললেন "বেশ তর্ক করতে শিখেছিস্। কর্ম্ম না করলে তোর জীবজীবনের উন্নতি কেমন ক'রে হবে? কর্ম্মফলই যে উন্নতির সোপান। জন্মান্তরের কর্ম্মের কথা ছেড়ে দিয়ে এই জীবনের কর্ম্মের কথাই ধর। এ জীবনে যেমন কর্ম্ম করছিস্ তেমনি ফল পাচ্ছিস্। কোনও কোনও কর্ম্মে আনন্দ আসছে, সফলতা আসছে, শান্তি; সুখ আসছে। আবার কোনও কোনও কর্ম্মে দুঃখ, শোক, নিরাশা, ভয়, আসছে। এই জীবনেই কর্ম্মফলের দ্বারাই ভবিষ্যৎ জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছিস। একটা কুকর্ম ক'রে দুঃখ পেলে আর সেই কুকর্ম্ম করবার ইচ্ছা হলেও সেই দুঃখ পাওয়ার অভিজ্ঞতার ফলে সেই কুকর্ম্মের দিকে আর অগ্রসর হও না। যে কর্ম্মে সুখ আসে আনন্দ আসে সেই কর্ম্ম করতে চাও। কারণ তোমার অভিজ্ঞতায় বলে এই কর্ম্মে সুখ আছে। সুতরাং এই কাজ করব। অনন্ত জীবন প্রবাহে বহু জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফল

উদ্ভূত অভিজ্ঞতায় তোমাকে পরম শান্তির দিকে,—আমার দিকে,—নিয়ে যাবে বলেই কর্ম্ম তোমার করতেই হবে ও কর্ম্ম তোমার চির মঙ্গলের কারণ। যে কর্ম্মই করনা কেন, দেহী অথবা বিদেহী অবস্থায় সেই কর্ম্মের ফলাফল আত্মা বিচার করেন। সেই বিচার অনুসারে তোমার আবার দেহ ধারণে ইচ্ছা হয় ও সেই ইচ্ছায় আমার আদেশে আবার লৌকিক জগতে তোমার জন্ম হয়। পূর্ব্ব জন্মের কথা বিস্মৃত হও তোমার কঠিন স্থূল ও স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণে বা পরিবেশে। স্বাভাবিক পরিবেশে বা আত্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যাক্তিগণের পরিবেশে জীবনের আরম্ভ হ'লে তোমার পূর্ব্ব জন্মাকৃত গভীর মনন সম্ভূত ঘটনাবলী তোমার অন্তরে জাগ্রত হবে। সুতরাং কর্ম্ম তোমার প্রয়োজন তোমার নিজস্ব প্রয়োজনে। তোমার নিজস্ব প্রয়োজন আমার প্রয়োজনে ততক্ষণ যতক্ষণ তুমি আমার প্রয়োজনকে স্বীকার করবে। আমার প্রয়োজনকে স্বীকার করলেই আমার প্রয়োজনের শেষ। তখন তোমারই প্রয়োজন মুখ্য। তখন তোমার পরম ঐশ্বর্য্য লাভ। আরও পরে বলব।"

জয় মা আনন্দময়ী, জ্ঞানদায়িনী জননী আমার।

৮ই অক্টোবর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

॥ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ
দিবিব চক্ষুরা ততম্" ॥

এর মূল উৎপাদিকাগত অর্থ :—"ত" অন্তে—অন্ত। "দ" অন্তে বৃহদার্থে "দ্র" অর্থাৎ "দ্রব্য"—"তদ্" অর্থে দ্রব্যের অন্ত—অর্থাৎ "দ্রব্য অর্থে স্থূল যা তাই—। স্থূলের অন্ত—অর্থাৎ সূক্ষ্ম—অর্থাৎ "অনন্ত"।

"বি." "ব" ইকার যুক্ত হওয়ায় আত্যন্তিক লক্ষণ যুক্ত হ'য়েছে অর্থাৎ "ব" "ই" কারে বৃদ্ধি বা বৃহদ্ ইত্যাদি। "ষ" অর্থে অ-ষ-অ অর্থাৎ "অষয়" অর্থাৎ বৃহদ্-অষয়-অথবা "বিষয়" অথবা "বৃহদাষয়"। বৃহদাষয় যা তাই "বিষয়"। "ষ্ণ্য

বা "ষ্ণু" একই ধর্ম্মী অর্থাৎ "ন্যূ" অর্থে "ন্যূনতম"—সুতরাং "বিষ্ণু" অর্থে বিষয়ের ন্যূনতম অবস্থা—অর্থাৎ "সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অব্যয়। তা হলে "তদ্ বিষ্ণো" অর্থ হল—"সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অব্যয় অনন্তের"।

"পরমং"—"প" বৃহদার্থে "প্র" যেমন "ব" বৃহদার্থে "ব্র" বা "ব্রহ্ম" তেমনি "প্র" কে প্রকৃত আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত। "র" র-অ অর্থাৎ "রয়" অর্থাৎ নিহিতার্থে অবস্থিত বা "যুক্ত"। "মং" ম-অ-অং বা "ময়ং" অর্থাৎ প্রকৃত আমি যুক্ত যে 'বাঙময়" অথবা অয়ং যুক্ত যে প্রকৃত বস্তু।

"পদং" "প" বৃহদার্থে "প্র" অর্থাৎ "প্রকৃত" দ-অ-অং "দ" বৃহদার্থে "দ্রব্য" 'অয়ং' অর্থাৎ 'প্রকৃত দ্রব্য'।

'সদা' 'স' অর্থে 'সহ' বা 'যুক্ত'। আবার সঃ অর্থে 'সে'। 'দা' অর্থে 'দাতা' বা 'দাতৃ'। এ ভাবেও হয় যথা 'সৎ-আ' যথা 'সৎ' 'আমিত্ব'।

'পশ্যন্তি'—'প' অর্থে 'প্রকৃত' শ্য অর্থে 'শম'। 'অন্তি'-অ-ন-অ-তি-ই অর্থাৎ 'অন্তের' যা শেষ সেই 'অন্তি' অর্থাৎ-প্রকৃত 'শম' রূপ যে শেষ বা অন্ত তারও শেষ বা 'অন্তি' বা 'অন্ত'। এখানে 'ইকারন্ত' হ'য়েছে গৌরবে। অথবা 'শম' রূপ যে প্রকৃত 'অন্ত' তাহাতে বাস করেন বলে 'অন্তি' হ'য়েছে। এখানে অধিকার ভেদে 'ই' কার হ'য়েছে—যেমন 'অন্তি' অর্থাৎ অন্তে যিনি বাস করেন।

'সুরয়' 'সু' অর্থে 'সুখ' বা 'সুখকারী'। 'রয়' অর্থে নিহিতার্থে অবস্থিত বা যুক্ত। 'সু' এখানে 'সুখ' অর্থাৎ 'পরাশান্তি' আর 'রয়' অর্থে যুক্ত। পরাশান্তি যুক্ত।

'দিবিব' 'দি' অর্থে 'দিব্য' অর্থে প্রযুক্ত। 'বি' অর্থে 'বৃহদ্' এখানে মহান্ অর্থে ব্যবহৃত হ'য়েছে। 'ব' বৃহদার্থে 'ব্র' অর্থাৎ 'ব্রহ্ম'। মহান্ দিব্য ব্রহ্ম।—

—সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অব্যয় অনন্তের প্রকৃত আমি যুক্ত যে বাঙ্ময় প্রকৃত দ্রব্য সেই আমিত্বের প্রকৃত অন্তরেও যিনি অন্তি তিনিই পরা শান্তি যুক্ত দিব্য ব্রহ্ম।

'চক্ষুরা-ততম্'—'চ' অর্থে 'চিৎ' বা 'চিন্ময়'। 'অক্ষু' বা অক্ষি' চক্ষুরা' অর্থে 'চিৎ' 'অক্ষির' 'ততম্' সদৃশ। এখন সম্পূর্ণ অর্থ করা যাক—

চিদ্ অক্ষি সদৃশ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অব্যয় অনন্তের প্রকৃত আমি যুক্ত যে বাঙ্ময় প্রকৃত দ্রব্য সেই আমিত্বের প্রকৃত অন্তরেও যিনি 'অস্তি' তিনিই পরা শান্তি যুক্ত দিব্য ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্লেষণ—

চিদ্ অক্ষি সদৃশ সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অব্যয় অনন্তের প্রকৃত আমি যুক্ত যে বাঙ্ময় প্রকৃত দ্রব্য—সেই জীবাত্মারূপ 'আমি'। সেই জীবাত্মারূপ 'আমিত্বের' প্রকৃত অন্তরেও যিনি 'আমি' রূপ অস্তি হয়ে বাস করেন তিনিই পরাশান্তি যুক্ত দিব্য ব্রহ্ম।"

জয় মা জ্ঞানদায়িনী জনন আমার।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, এ-সব দেখে আমার কি লাভ হ'চ্ছে? সংসারে অর্থকষ্ট, ঋণ এ সব যদি না গেল তবে এ সব দর্শন করে আমার কি লাভ? সাধন করলে যদি দৈহিক, সাংসারিক, ও পারত্রিক সবের একযোগে উন্নতি না হয় তবে সে সাধন আমি চাই না। তোমাকে ডাকব অথচ সংসারে দৈন্য দুঃখ, অর্থকষ্ট থাকবে শরীর খারাপ হবে তবে সে সাধন আমার জন্যে নয়। যারা শুধু পরকাল চায় তাদের নিয়ে তুমি সাধন শেখাও। আমার দ্বারা হবে না। মা বললেন, "শোন, আমার সাধন মনে প্রাণে করলে সব হয়। সংসারে সুখ হয় অর্থাগম হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, ইহকালে ও পরকালে সুখ হয়। কোনও বিপদ, কোনও দুঃখ, কোনও ঋণ থাকে না। তোমার মূলগত সাধন এখনও আরম্ভ হয় নাই। এই মূলগত সাধন হল প্রকৃত অন্তর্মুখিন অবস্থা। যত আমার সাধনে অগ্রসর হবে ততই অন্তর্মুখিন হবে ও ততই সংসারের সকল সুখ হবে ও সকল দৈন্য দূরে যাবে। সংসার, দেহ আমার দান ও তাতে তোমার শান্তিবিধানই আমার কাজ। কষ্ট পাও স্বভাব নিষ্ঠা থেকে দূরে যাও বলে, আমার কথা শোন না বলে। আমার একান্ত বাধ্য হও দেখবে সব ফিরে

পাবে। ঋণ থাকবে না, শরীর স্বাস্থ্যযুক্ত হবে ও অর্থাগম হবে। সংসারে কোনও অশান্তি থাকবে না। তোমার আত্মদর্শন হ'য়েছে। এই দর্শন হ'ল সবিকল্প দর্শন। এই দর্শন হ'লেই হল না। ক্রমে এই দর্শনের ভিতরে আস্তে আস্তে ডুবে যেতে হবে। তারপর সবিকল্প সিদ্ধি হবে অর্থাৎ তখন চোখ বুজলেই আত্মদর্শন হবে। ও সঙ্গে সঙ্গে অনেক ক্ষমতার ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে। এই ভাবে আত্মদর্শনে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করবে। এই দর্শনে তুমি অভ্যস্ত হবে। তখন আত্মা আর দেহের বিভেদ বা পৃথক সত্ত্বা তোমার কাছে লয় প্রাপ্ত হ'য়ে যাবে। তুমি তখন আত্মসত্ত্বায় মগ্ন হ'য়ে যাবে। দেহ বোধ বিলুপ্ত হবে ও আত্মবোধ সদা জাগ্রত হবে। তখন সেই আত্মসত্ত্বার ভিতর দিয়ে 'আমাকে' অর্থাৎ পরমাত্মার দর্শন পাবে। একবার, দুবার দর্শন পেলেই চলবে না। আস্তে আস্তে ক্রমেই মগ্ন হ'তে থাকবে। অভ্যাসের দ্বারা ধীরে ধীরে আত্মায় আমাকে চিরস্থির সদা জাগ্রত দেখবে। এই অবস্থা হ'ল শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। একে বলে নির্ব্বিকল্প অবস্থা। এই অবস্থায় আমার ও তোমার গভীরতম সখ্য অবস্থা। তখন তুমি ও আমি অভেদ। যা ইচ্ছা করবে তাই হবে। যা চাইবে তাই পাবে। সুখ, সম্পদ, ইহকালে, পরকালে দীর্ঘ জীবন। জন্ম, মৃত্যুর দ্বারকে নিজ ইচ্ছায় বন্ধ বা উন্মুক্ত করতে পারবে। এ অবস্থায় পূর্ব্বেকার অনেক সাধকগণ একবার দু'বার নির্ব্বিকল্পে গিয়েই আত্মহারা হ'য়ে গিয়েছেন। তাঁরা নির্ব্বিকল্প সাধন করেন নাই। তাঁরা একবার নির্ব্বিকল্পে গিয়েই ক্ষান্ত হ'য়ে মনে করেছেন 'আমার ওঁ' পরমাত্মার দর্শন হ'ল আর কি আমার পরম মোক্ষ লাভ হ'য়েছে। এতে একবার দর্শন হ'লেও আমার অনেক ঐশ্বর্য্য সাধকের ভিতরে এসে যায় ও সে তখন আমার দ্বারা ধৃত হয়। কিন্তু এই ধৃত অবস্থার পূর্ণ অনুশীলন প্রয়োজন যাতে আমি বা আমার প্রেম'করুণা, আমার পরম সুখঐশ্বর্য্য ধারবাহিক রূপে সাধকের অন্তরে নিয়ত উৎসারিত হ'তে থাকে। এ আমার পরম আনন্দ। আমি ও সাধক একাত্মা। একবার আমার গা ছুঁয়ে তুমি একটু আনন্দ লাভ ক'রে গেলে আর কাছে এলে না এত'

আমার অভিলাষ নয়। যখন কাছে এসেছ এস '**মায়ে পোয়ে নিয়ত আনন্দ রঙ্গে খেলা করি তাই ত আমি চাই**। তোমার কোন অভিলাষ আমার আর অদেয় থাকবে না। আমি নিজে থেকেই সব তোমাকে ঢেলে দেব। এই অবস্থায় শিব ও যিশুখৃষ্ট ভিন্ন আর কেউ আজ পর্য্যন্ত উঠতে পারেন নাই। তাঁদের ভিতরেও যে সকল সামান্যতম অপূর্ণতা ছিল সেই সকল অপূর্ণতাকে তোমার জন্মান্তরের সাধন দ্বারা পূর্ণ করে নিয়ে এসেছি তোমাকে সম্পূর্ণ শ্রেষ্টতম মহা-মানব করবার জন্যে। যে শক্তি তোমার ভিতরে আসবে সে যে মহাশক্তি। কোনও সংশয় মনে রেখো না। সম্পূর্ণ মুক্ত হও, নির্ভয় হও, যে ভাবে সাধন করছ করে যাও। যেটুকু জপ হ'চ্ছে সেইটুকুই তোমার প্রয়োজন জানবে। যা করছ সবই আমার ইচ্ছায় হ'চ্ছে। তোমার কোনও কাজ আমার ইচ্ছা ভিন্ন হ'চ্ছে না জানবে। তোমার যখন যা প্রয়োজন ঠিক আসবে ও পাবে। তোমাকে কে ঠকাবে? কার এমন সাধ্য আছে যে তোমাকে ঠকাতে পারে? আমার উপর সব ছেড়ে দাও দেখবে সব পাবে। আমার কথার বাধ্য হও সদা আমার ধ্যানে মগ্ন থাক। অর্থ, বিত্ত সুখ সব তোমার আসবে। **যে কার্য্যের জন্যে তোমাকে সংসারে এনেছি সে আমারই প্রার্থিত কার্য্যের জন্যে। তার জন্যে যখন যা প্রয়োজন সবই আমি করব। চিন্তা কি? আমার প্রিয়তম পুত্র তুমি** তোমার অভাব কিসের? সময় আসবে যখন তোমার জন্যে আমার অদেয় কিছু থাকবে না। তোমার জন্যে যদি পৃথিবী ধ্বংস করে আবার গড়তে হয় তাও করব। তোমার জন্যে আজ এই সংসারে যে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়েছি তাতে তোমার জীবন দেখে সকল মানব মহা আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমাময় হ'য়ে সংসারকে স্বর্গে পরিণত করবে। অগ্রসর হও, মনে ক্ষোভ এনো না। **তোমার আমি আছি আর তুমি কি চাও?**

জয় জয় জয় মা আমার অভয়দায়িনী—দয়াময়ী মা আমার।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে প্রায় ১১-৪৫ মিঃ সময় ধ্যান-যোগে বসলাম। মন স্থির

করতে প্রায় ১৫ মিঃ সময় লাগল। তারপর ভ্রূযুগলের মাঝখানে প্রজ্ঞাচক্রে মন স্থির হ'ল। এই চক্রে মন স্থির হবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে খুব টন্ টন্ করে। এই অনুভূতিটা ঠিক যেমন চন্দনের টিপ কপালে ভ্রূযুগলের উপরে লাগালে সেটা শুকিয়ে গেলে যেমন টন্ টন্ করে তার চাইতেও অনেক বেশী তীব্র। এই অনুভূতি এখান থেকে আরম্ভ হ'য়ে ক্রমে উর্দ্ধগতি লাভ করে ও সবটাই টন্ টন্ করে ও একটা আলোকের দণ্ড প্রতিভাত হয় মানস চক্ষে। আজ এটা হবার পর আরও একটা অনুভূতি হ'ল। সেটা হ'চ্ছে ঠিক ব্রহ্মতালুর ভিতরে যেন একটা পোকা হেঁটে বেড়াচ্ছে। ব্রহ্মতালু দপ্ দপ্ করছে। পরক্ষণেই দেখলাম যেন একটা জ্যোতির উল্কা ভীষণ বেগে উর্দ্ধে অনন্ত আকাশে উঠে যাচ্ছে। আমার দৃষ্টি এমন একটা জায়গায় এসে স্থির হোল যেটা অসীম ব্যোমমণ্ডল। এই ব্যোমমণ্ডল এক অপূর্ব্ব জ্যোতির বর্ণে আবৃত। বর্ষাকালে গোধূলির সময় মেঘে আবৃত সারা আকাশ অথচ বর্ষণ নাই। অপরূপ এক ফিকে লালচে ধরণের জ্যোতি। সেখানে ডিম্বাকৃতি একটি জ্যোতির পদার্থ। নক্ষত্রের ভিতর থেকে যেমন জ্যোতির রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় অথবা খুব মূল্যবান্ হীরক খণ্ড থেকে যেমন অন্ধকার রাত্রে জ্যোতির দীপ্তি নির্গত হয় তেমনি এক অপূর্ব্ব জ্যোতির দীপ্তি নির্গত হ'চ্ছে। এক মনুষ্যদেহ, ঋজু, সারা অঙ্গ গৈরীক বসনে আবৃত। এই মনুষ্যের মস্তকের চারিধারে আগেকার বর্ণিত ডিম্বাকৃতির জ্যোতির মণ্ডল। উর্দ্ধে ও অধঃতে মহাশূন্য। আমার নিজদেহ বিলুপ্ত। দেহের কোনও অনুভূতি নাই। আমার দেহ যে আছে তা মনেই হ'চ্ছে না। কেবল তাই নয়, যতবার আমার দেহকে নীচে দেখতে চাচ্ছি ততবার শুধু মহাশূন্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। উর্দ্ধদিকে চেয়ে মনে হ'চ্ছে যেন কোনও এক অপার্থিব লোক সেখানে আছে। এ এক তীব্র অনুভূতি। এইবার বিস্ময়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম একি দেখছি? মা আমায় বললেন "ওই যে ডিম্বাকৃতি

আলোক মণ্ডল দেখছ ও হচ্ছে তোমার আত্মা আর যে মনুষ্যদেহ দেখছ ও হ'চ্ছে তোমার সংস্কারগত জৈব-দেহের সূক্ষ্মতম বিকাশ। মানব আত্মা সংস্কারগত দেহ নিয়ে সংসারে প্রকাশমান রয়েছে। মানবাত্মা বা জীবাত্মা যখন সর্ব্বদেহ-সংস্কার মুক্ত হ'য়ে আমার সঙ্গে নিত্য লীলায় মগ্ন হয় তখন তার ওই দৃশ্যমান দেহটুকু আর থাকে না। তখন শুধু থাকে আলোক মণ্ডল বা চিন্ময় আত্মা। তোমাকে একদিন বলেছি মন্ত্র চৈতন্য সাধন হ'চ্ছে তোমার। মন্ত্র প্রথম জপ আরম্ভ করলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। মন্ত্র জপ হ'ল আমাতে পৌছবার সাধন পথ। এই জপ করতে করতে ক্রমে একটু একটু ক'রে আলোর রেখা ফুটে উঠে। এমনি করে ধীরে ধীরে মন্ত্র হয় চৈতন্যস্বরূপ ও সারা সাধন পথ পূর্ণ আলোকিত হ'য়ে উঠে। সেই আলোকে আত্মা বা নিজ আত্মার বা সর্ব্বজীব আত্মার দর্শন হয়। এ হ'ল সবিকল্প বা অমার্গ সাধন। এই দর্শন একটু একটু করে স্পষ্ট হ'তে থাকে। ধীরে ধীরে তুমি ওই আত্মার জ্যোতিতে ওই সূক্ষ্মতম মনুষ্যদেহের সর্ব্ব অবয়ব অতি স্পষ্ট দেখতে পাবে। এইরূপে দেখতে দেখতে ক্রমে ক্রমিক গতিতে তোমার দেহের প্রতি উপেক্ষা আসবে ও তুমি ওই আলোক মণ্ডলকেই ধ্রুব নিত্যবস্তু, অতিশয় প্রিয় ও আপন বলে গ্রহণ করবে। যখন তোমার এই অবস্থা হবে তখন তোমার সবিকল্প সাধনে সিদ্ধি হবে। এ হ'ল প্রথম দেহ তারপর আত্মা অর্থাৎ দেহে থেকে আত্মার দর্শন পেলে ও দেহে থেকে আত্মার দর্শন পেয়ে তুমি দেহের সংস্কার থেকে মুক্ত হলে। তখন তোমার আত্মা পরিমুক্ত, জীবন্মুক্ত ও নির্ব্বিকল্প সাধনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তখন তোমার ওই পরিমুক্ত আত্মা তোমাকে পূর্ণ সাহায্য করবে নির্বিকল্প সাধনে অগ্রসর হবার। তখন তুমি তোমার ওই আত্মার সাহায্যে ক্রমে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে চলে যাবে আমার দিকে অর্থাৎ পরমাত্মার দিকে। ক্রমে ও অতি ধীরে ধীরে তুমি আমাকে দর্শন করবে। একবার দু'বার তিনবার এইভাবে

বার বার আমাকে দর্শন করবে। এইভাবে দর্শন করতে করতে ক্রমে তুমি আমাতে একনিষ্ঠ হ'য়ে পড়বে ও আমার সঙ্গে নিত্য লীলায় মগ্ন হবে। এই দেহে থেকেই এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হবে। এই সাধনে তোমাকে সিদ্ধ হ'তে হবে ও অমিত শক্তি, ঐশ্বর্য্য, মহাজ্ঞান ও ভক্তি লাভ করবে। এ না হ'লে আজিকার মানবগণ তোমাকে গ্রহণ করবে না ও আমার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সংসারে করতে পারবে না। এমন অলৌকিক ক্ষমতা তোমার হওয়া প্রয়োজন যাতে তুমি সকল স্তরের মানবের কাছে বিস্ময়ের বস্তু ও মহত্তম দৃষ্টান্ত হ'য়ে থাকতে পার। তা না হ'লে এযুগে কেউ তোমার কথা গ্রাহ্যও করবে না। তুমি সাধন করে যাও। তোমার কোনও কিছু করবার নাই। সব আমি করাব। পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর আমার উপর রেখে চলে যাও ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধে। অর্থ, বিত্ত সব তোমার মুহূর্ত্তের ইচ্ছায় তোমার করতলগত হবে। কোনও ভাবনা নাই—আমি আছি।

জয় জয় জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার—

১১ই নভেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে লেক থেকে বেড়িয়ে ফিরে মনটা বেশ খারাপ হ'য়ে গেল। এর কারণ শুষ্কতা। সাধু ভক্তদের দর্শন হয় না। মাকে বললাম এরকম অবস্থা আমার হ'ল কেন? মা বললেন, "তোমার এ উচ্চ অবস্থা চলছে। পর্ব্বতের উপরে যখন আরোহণ কর তখন ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চে চলে যাও। নিম্নদেশের কত তরুলতা, ফুল, ফল, নানা পাখির কাকলী, নানা বিচিত্র প্রাকৃতিক পরিবেশ সব আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে তুমি উচ্চ থেকে উচ্চে চলে যাও। ক্রমেই আর সে সব থাকে না। যখন পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরে উপস্থিত হও তখন কেবল তুষার মণ্ডিত শ্বেত বিস্তার দেখতে পাও। আরত কিছু দেখতে পাওনা। তোমার এ অবস্থাও সেইরূপ। দেখ, সিদ্ধির নিকটবর্ত্তি হ'লে এইরূপ অবস্থা হয়। এই অবস্থায় সর্ব্ব চরাচর সৌন্দর্য্যহীন উষর, মন উৎসাহহীন ও নিরাশ হ'য়ে পড়ে। এ কেমন জানো?

অনেক যাত্রী একসঙ্গে তীর্থ পরিক্রমায় বেড়িয়েছে। রাস্তায় কত ছোট ছোট তীর্থ, রাস্তার অপরূপ সৌন্দর্য্য, সকলের সঙ্গে কত সখ্যতা, এমনি করে চলেছে দূর থেকে দূরান্তরে। চলতে চলতে মূল তীর্থের আগের চটীতে এসে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে এসে শুনল যে এখন যে রাস্তা সে অতি দুর্গম, দুরারোহ পার্ব্বত্য পথ, নদী ও উপত্যকায় এমন বাধা সৃষ্টি করেছে যে, যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রাণ সংশয় হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। পথ দীর্ঘ, পথে খাদ্যের সংস্থান নাই, লোকালয় নাই, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও নাই। আছে শুধু নীরস কঠিন প্রস্তর, উষর বালুকা, উত্তপ্ত পথ ইত্যাদি। এই শুনে যাত্রীরা সকলেই রণে ভঙ্গ দেয়। দুই একজন যারা অসীম মনের বল ও ভগবৎ বিশ্বাস নিয়ে মরণ পণ ক'রে এসেছে তারাই এগিয়ে চলে। এই শেষ পথ। এ পথ বড়ই দুর্গম ও নীরস। এই পথটুকুই যাত্রীদের ধৈর্য্যের শেষ ও চরম পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে যে যাত্রী মূল তীর্থে পৌছতে পারে সে অনাবিল আনন্দ ও অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। এইরূপ জীবনের সাধন। সিদ্ধির পূর্ব্বেই এইরূপ অবস্থা হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পারলে সিদ্ধি। চিন্তা কেন করছ? সবই ত আমার হাতে তোমার জন্যে আমার সব কিছু করতে হবে। অগ্রসর হও আমি আছি—কোনও চিন্তা নাই। জয় মা আনন্দময়ী মাতৃজননী, জয় জগদীশ্বরী মা আমার।

২১ শে নভেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা

আজ সকালে লেকে বেড়াতে বেড়াতে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যে আমায় বলেছিলে যে আমার সাধন এখনও আরম্ভ হয় নাই তবে সাধন আরম্ভ হোল কিনা কি করে বুঝব? মা বললেন, "তোমাদের অর্থাৎ জীব দেহ "ত্রয়ী"। দেহ মন ও আত্মা নিয়ে তিন স্তর। অনেক সময় দেহ যা চায় মন তা চায় না, আবার মন যা চায় দেহ তা চায় না, আবার আত্মা যা চায় দেহের ভিতর মন তা চায় না। এই নিয়ে নিয়ত সঙ্ঘাত চলেছে—আত্মা মন

আর দেহের সঙ্গে। দেহ "ধৃতি" মন 'স্থিতি" ও আত্মা বৃদ্ধি"। দেহ লাভ হ'লে মনও আত্মা দেহের গণ্ডিতে ধৃত হয় ও আত্মা মনের মাধ্যমে স্থিতিলাভ করে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তোমাকে অনেকবার বলেছি দেহ ধারণ সাধনের জন্যে। মহা সম্প্রসারিত অব্যয় আত্মার যখন একটি প্রকোষ্ঠের ভিতরে স্থিতি হয় অথবা বসবাস করবার সুযোগ হয় তখন তার এক সক্রিয় ভাবান্তর হয়। তখন মন ও দেহের সাহায্যে তার উৎকর্ষ ও বৃদ্ধি হয়। দেহ চাইল একটা কাজ করতে মন তখন বেঁকে বসল তা' হ'লে দেহ সে কাজ করতে পারল না আবার মন চাইল এক কাজ করতে দেহ বেঁকে বসল তখন মন দেহকে দিয়ে তার অভিপ্সিত কাজ করাতে পারল না। ধর এক খঞ্জ ব্যক্তি। তার মন চাইছে দৌড়তে কিন্তু দেহ অশক্ত। মনের শক্তি নাই যে তাকে চালায়। তেমনি মন যদি জড়াগ্রস্থ হয় ও অত্যন্ত বিষয় মুখিন হয় সেও খঞ্জ হ'য়ে পড়ে। আত্মা যে কার্য্য করতে চায় মনকে দিয়ে সে কার্য্য করাতে পারে না। আত্মা পূর্ণ পবিত্র ও সৎ। কিন্তু দেহাধিকারে মন দেহের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে পড়ে ও তার বৃদ্ধির বা উর্দ্ধগতির পথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। মন আত্মার অঙ্গ ও দেহ মনের অঙ্গ। মন যা করতে চায় সঙ্গে সঙ্গে আত্মার নির্দ্দেশ নেয়। আত্মা যে নির্দ্দেশ দান করেন সেই—বিবেক। কিন্তু সে নির্দ্দেশ যদি মন দেহাধিকারে না শোনে তবে আস্তে আস্তে আত্মার প্রভাব মনের উপর কমে যায় ও বিবেক নিক্রিয় হ'য়ে পড়ে। তখন মন দেহের লালসায় ও দেহের সুখে ধাবিত হ'য়ে অনন্ত দুঃখ পায়। এখন শোন, দেহ, মন ও আত্মা এ হ'চ্ছে ধাপ। দেহে থেকে মনের পরিচর্য্যা ও মনে সমাহিত হ'য়ে আত্মার পরিচর্য্যা এই ভাবে একদিকে চলে। আবার আত্মার আদেশে মন চালিত ও মনের আদেশে দেহ চালিত এ হ'ল আর একদিক। কিন্তু এই দুই দিকই পরস্পর যুক্ত। এখন দেহ থেকে মনের সাহায্যে আত্মাকে জানতে হবে, আত্মার নির্দ্দেশ শুনতে হবে। আত্মার দর্শন পেতে হবে। এই আত্মদর্শন বা আত্ম-সাক্ষাৎকার না পেলে মন চঞ্চল ও বহুমুখগামী হ'য়ে পড়ে। নিশ্চয়াত্মিকা

বুদ্ধি জাগ্রত হয় না। কোনটা কার্য্য ও কোনটা অকার্য্য তার বিচার হয় না। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জাগ্রত হ'লে মন তখন স্থির ও প্রজ্ঞাযুক্ত হয় ও প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মার নির্দ্দেশে চলে। মন যখন আত্মার নির্দ্দেশে চলে তখন দেহ মনের অঙ্গ হ'য়ে মনের নির্দ্দেশেই চলে ও শুদ্ধ হয়। এই আত্মসাক্ষাৎকার হ'লে মন দেহ চাঞ্চল্য শূন্য হয় ও তার নিরুপদ্রব সমাহিত অবস্থা আসে। তখন আত্মা, মন ও দেহ একযোগে আমার সাক্ষাৎকার অভিলাষ করে ও ধীরে ধীরে আমার দর্শন, স্পর্শ লাভ করে ও নিয়ত আমার ভিতরে অবস্থান করে। **এই আত্মসাক্ষাৎকারই আন্তর** সাধনার সূচনা। তার আগে আত্মার সাধন বা আত্মসাধন। আত্মসাধনে সিদ্ধ হ'লে ব্রহ্ম সাধন আরম্ভ হয়। আত্ম-সাধন হচ্ছে প্রস্তুতি। আর আত্ম সাধনে সিদ্ধির পরে যে সাধন সেই হ'চ্ছে আসল সাধন। সেই হ'ল ব্রহ্ম সাধন। আত্মদর্শন সম্বন্ধে এর আগে তোমাকে বলেছি যে একবার আত্মদর্শন হ'লেই হ'ল না। বার বার বহুবার দর্শন করে করে আত্ম সমাহিত বা আত্মমগ্ন হ'য়ে যেতে হবে। এইভাবে আত্মমগ্নতা না এলে আমার সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় না। শুধু আত্মাই আমাকে দর্শন করতে পারে সে দেহে থেকেই হোক্ আর দেহান্তেই হোক্। সেই জন্যে আত্ম-সাক্ষাৎকার প্রথম প্রয়োজন। তোমার এখন প্রস্তুতি চলছে। একবার দু'বার আত্মসাক্ষাৎকার হয়েছে। এখন ধীরে ধীরে বহুবার হ'তে হবে ও আত্মমগ্নতা পূর্ণভাবে আসবে। তখন তুমি আমার সাধনে প্রস্তুত হবে। ভয় কি? আমিইত তোমার সকল ভার গ্রহণ করছি। আমিই তোমাকে শেখাব ও নিয়ে যাব সাধনের মহাদুরূহ পথে। চিন্তা করো না নির্ভয় হও।"

জয় মা জগত জননী, জ্ঞানদায়িনী মা আমার।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে আবার প্রায় ১০॥০টায় ধ্যানযোগে বসলাম ও জপ চলতে লাগল। দেখতে দেখতে মহা আলোকের রাজ্য চোখের সম্মুখে খুলে গেল। কত সব মনোরম রাজ্য প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক দৃশ্য সকল একের পর এক

চোখের সামনে আসতে লাগল। মহা উর্দ্ধে চলেছি এক মহা আকর্ষণে। বহুদূর দূরান্তরের মহা গভীরে দৃষ্টি চলেছে। দৃষ্টি যেন চলছেই। এর যেন পরিসমাপ্তি নাই। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল **শ্রীযিশুখৃষ্টের মূর্ত্তি**। এবার এ মূর্ত্তি আমার এত কাছে যে তাঁর বক্ষ থেকে মস্তক পর্য্যন্ত সব অতি নিখুত ভাবে দেখতে পাচ্ছি। মুখে কাঁচা দাড়ি মাথায় কালো চুল অবিন্যস্ত, বক্ষদেশ অনাবৃত। বক্ষের কাঁচা লোম দেখতে পাচ্ছি। তাঁর দৃষ্টি উর্দ্ধে সে যে কি গভীর যোগ দৃষ্টি—তাকিয়ে আছেন অথচ চক্ষু ধ্যানস্থ অবস্থায় মহা উর্দ্ধগতি লাভ করেছে। আমি যেন নিকটে আছি জানেন ও তাঁর এই ভাবের অবতারণা যেন আমাকে বলে দিচ্ছে –'**এইভাবে সাধনে উর্দ্ধদৃষ্টি লাভ কর**'। সকল দেহ, সংসার তোমার থাকবে ও দৃষ্টি মেলেই তাঁকে দর্শন কর। তাঁর প্রতি একাগ্র দৃষ্টি রেখে সাধন কর ও অগ্রসর হও। তিনি আমায় কিছু মুখে বললেন না। কিন্তু তাঁর এই উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে এই ভাব তীব্র ভাবে সঞ্চারিত হল। ছিলেন প্রায় তিন চার মিনিট। এর আগেও অনেক বার তাঁকে নানা অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু এবার তাঁর দর্শন যেমন স্পষ্ট ও নিকট এর আগে তা' হয় নাই। একবার মা আমাকে বলেছিলেন, "খৃষ্ট ও শিব এই দুইজনই আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর ভিতরে শ্রেষ্ঠতম সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী ভক্ত সাধক। এঁদের ভিতরে অহঙ্কার বলে কিছু ছিল না। দেহাত্মবোধ এদের ছিল না। সবই "**আমার**" এই বোধে এঁরা চির কাল সাধন করে গেছেন ও স্বর্গেও সর্ব্বো- চ্চস্তরে অবস্থান ক'রে আমার গভীরতম কৃপা লাভ করছেন। এঁরাই তোমাকে সাধনে মহা সাহায্য করছেন। এঁরাই তোমাকে উপযুক্ত সাধন পথে নিয়ে যাবার জন্যে নিয়ত চেষ্টা করছেন"।

আমার জীবন ধন্য। ধন্য আমার পিতা মাতা, ধন্য আমার ভ্রাতা ভগ্নিগণ, ধন্য আমার আত্মিয় পরিজন, ধন্য আমার সাধ্বী পত্নি, ধন্য আমার সন্তানগণ, ধন্য আমার শ্বশুরকুল, ধন্য আমার দেশবাসী, ধন্য আমার জগৎ বাসী, ধন্য আমার ব্রহ্মাণ্ড বাসী, ধন্য আমার স্বর্গ বাসী বিদেহী ভক্ত ও জনগণ। ধন্য আমার

পরম জননী। সব ধন্য, প্রকৃতি ধন্য, জগত ধন্য। ধন্য ধন্য ধন্য, ধন্য আমার দিন আনন্দকারী—।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে অনেক কথা বললেন। বললেন, "দেখ, কারুর সঙ্গে যেচে কথা বলবি না। কারুর বাড়ী যেচে যাবি না। কাউকে যেচে উপদেশ দিবি না। কাউকে যেচে ঔষধ দিবি না। কাউকে যেচে দান করবি না। যারা তোর কাছে চাইবে শুধু তাদের দিবি। যারা তোকে আদর করে তাদের বাড়ী যেতে বলবে বা নিয়ে যাবে শুধু তাদের বাড়ী যাবি। যারা চাইবে তাদের উপেক্ষা করবি না। এ নিয়ম মেনে চলবি তবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারবি।"

জয় মা আনন্দময়ী মা আমার।

১লা জানুয়ারী ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল বেলা তিনটায় লাইট্ হাউজ সিনেমাতে "Ten commandments" নামে একটি বিদেশী ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। আমি ময়না, বাবুল, রাহুল, পুতুল সকলে মিলে যাই। ইদানীং প্রায় ৭৮ মাস হ'ল আমার ছবি দেখবার ইচ্ছা হয় না। সাধারণতঃ যেসব ছবি লোকে দেখে সে সব ছবির প্রতি আমার আকর্ষণ বিন্দুমাত্র নাই। কেবল ভক্তদিগের জীবন বা ভক্তিমূলক ছবি দেখবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়। ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৮ খৃঃ আফিস ফেরৎ লাইট্ হাউজে যাই। ইচ্ছা যে ৩১শে ডিসেম্বরের পাঁচখানা টিকিট কিনব। আমার estimate ২৵৹ আনার টিকিট কেনা। কিন্তু দেখলাম ২৵৹ ও ২।৶ আনার টিকিট সব বিক্রি হ'য়ে গেছে। আছে ৩৲ টাকার টিকিট ৩১শে ৩টার সময়। ভাবলাম এত দামের টিকিট কিনে যাব না। অনেকগুলো টাকা অযথা ব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এই মনে ক'রে ফিরছি। কিন্তু একটা অহেতুক আকর্ষণে আমি টিকিট ঘরের সামনে অগ্রসর হ'য়ে পকেট থেকে ১৫৲ টাকা দিয়া ৫খানা

টিকিট কিনলাম। এ কেনা যেন আমি কিনলাম না। আমাকে দিয়ে আর কেউ জোর করে কেনালেন। যাহোক ৩১শে ৩টার সময় সকলে গিয়ে নিজ নিজ আসনে বসলাম। ছবি আরম্ভ হ'ল। মূষার প্রথম জীবন মনকে তেমন নাড়া দিতে পারল না। ক্রমে যখন তাঁর ঈশ্বর দর্শন ও তাঁর বাণী শ্রবণ হ'ল সেই পর্ব্বত কন্দরে সেই সময় থেকে মন অতি নিবিষ্ট হ'তে আরম্ভ করল। ক্রমে নানা অলৌকিক ঐশ্বর্য্য দ্বারা তিনি সম্রাটকে ও তার সকল বৈরিতাকে অভিভূত ও পরাস্ত করে ক্রীতদাস সকলকে মুক্ত ক'রে নূতন রাজ্যে নিয়ে গেলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসের এক অপূর্ব্ব জীবন্তলীলা। মূষার জীবন এমন এক অলৌকিক জীবনাদর্শ যে সে আদর্শ জীবনপ্রদীপের আলোকে সমস্ত ইউরোপ, আফ্রিকা উদ্‌-ভাসিত হ'য়ে উঠল। যে জীবন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসের অসামান্য পরাকাষ্ঠা ও নিদর্শন মূষা পৃথিবীর দ্বারে রেখে গেলেন তার তুলনা নাই। মাঝে মাঝে এই জীবন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখে আমার হৃদয় ভাবাবেগে অধীর হয়েছে। চক্ষে জল এসেছে। কি মহাবিশ্বাস, এ যে কল্পনাতীত।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে অভ্যাসমত যেমন রৌদ্রে দাঁড়িয়ে দাঁতন করতে করতে যোগ ও জপ সাধন করি তেমনি করছি। চক্ষু আমার মুদ্রিত। মা আমাকে বহু অলৌকিক ও অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখালেন। নানা কথা বলতে লাগলেন। বললেন, "এ কথা বিশ্বাস কর যে এই ছবি তৈরী হ'য়েছে শুধু তোমার জন্য। আমার উপরে বিশ্বাস করলে মানবের অন্তরে কি অসামান্য শক্তি সঞ্চারিত হয় সেইটা তোমাকে দেখাবার জন্যেই আমিই এই ছবির অবতারণা করছি। আমার বাণী যদি প্রতি অক্ষরে পালিত হয় তবে ভক্ত আর আমি একাত্ম হয়ে যাই। তখন ভক্ত যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। তোমার অন্তরে আমার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তম কর। আমার বাণী তুমি প্রতি নিয়ত শ্রবণ করছ। সেই

বাণী সর্ব্বভাবে সর্ব্ব অবস্থায় তোমার অবশ্য পালনীয়। মূষা যে মহাশক্তি আহরণ করেছিলেন তোমার ভিতরে তার চাইতেও মহাশক্তি আমিই সঞ্চারিত করব লোক কল্যাণের জন্যে। বিজ্ঞানের এটমিক বা হাইড্রোজেন বোমার কি শক্তি আছে যে সে আমার সৃষ্ট এই পৃথিবীর জনগণকে ধ্বংস করে যদি আমার ইচ্ছা না হয়। এই যে মহাধ্বংস যা অবশ্যম্ভাবিরূপে নেমে আসছে তার কারণ ভগবদ্ বিশ্বাসহীনতা ও আমার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। আজ এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে ঘোর অবিশ্বাস, অনাচার ও আমার প্রতি ঘোর উপেক্ষা, সেটা ইজিপ্টের সম্রাট্ রেমেসিসের থেকেও প্রবল-তর। আর ধ্বংসের উপকরণও আজ ভীষণ শক্তিশালী ও ভয়াবহ। সেই জন্যেই এমন শক্তিশালী মাধ্যম আমার প্রয়োজন যে এই মহা-অবিশ্বাস ও আমার প্রতি উপেক্ষা রোধ করবে ও ওই জড় শক্তিশালী এট্‌মিক বোমার পূর্ণ অপদার্থতা প্রমাণ করবে। ধ্বংসন্মুখ মানবগণকে সেই মহা বিধ্বংসী প্রলয়ের হাত থেকে রক্ষা করবে। তোমার এমন শক্তি হবে যাতে তোমার মুখের বাক্যে লক্ষ লক্ষ এট্‌ম বোমা নিষ্ক্রিয় শীতলত্ব লাভ করবে। যে মহাদম্ভ আজ পৃথিবীর জনগণকে মৃত্যুর দ্বারে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, আমার শক্তিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে, সেই দম্ভের পূর্ণ ধ্বংস তোমাকে করতে হবে। যে তোমার বিরুদ্ধে যাবে সেও ধ্বংস হবে। যে তোমার উপদেশে কর্ণপাত করবে না সেই ধ্বংস হবে। যে রাজ্য তোমার কথায় কর্ণপাত না ক'রে বিজ্ঞানের মূঢ়তায় নিজকে অমিত বলশালী ভেবে অগ্রসর হবে সেই নিজের সম্পূর্ণ ধ্বংস ডেকে আনবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই তোমার জন্ম। তোমাকে যে আমি কি মহাশক্তি দেব সে আজ তুমি ও পৃথিবীর কেউ জানে না। আমার বার্ত্তা আমার বাণী, ও আমার প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস তুমি সকলের অন্তরে ঢেলে দেবে। ধ্বংসের মুখে তুমিই একমাত্র পরিত্রাতা হ'য়ে আমার শ্রেষ্ঠতম প্রেম করুণা জনগণের অন্তরে ঢেলে দেবে। বিপদে না পড়লে মহা-অনিষ্টির মধ্যে না পড়লে কেউ আর আমাকে

চাইবে না। তাই এক মহা ধ্বংস আমি নিয়ে আসছি। অবিশ্বাসী মরবে। বিশ্বাসী প্রাণ পাবে। মহাধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে তুমি সেই ধ্বংস নিবারণ করবে। তোমার শক্তির উৎস আমি। আমি যে কি মহাশক্তি শালী তার অনেক নিদর্শন মানবগণ অতীতে পেয়েও আমাকে উপেক্ষা করছে। এ যে আমার মহাদুঃখ, এ যে আমার মহাশোক। আমি মানব সৃষ্টি করেছি যে তারা সুখী, বিশ্বাসী পরিবার গঠন ক'রে স্বার্থহীন ভাবে নিজ নিজ পরিবার প্রতিপালন করবে। পরিবারে পরিবারে সম্প্রীতি, সখ্যতা, সহৃদয়তা, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, পুণ্য শীলতা এইরূপে সমগ্র মানব সমাজ এক ধর্ম্মী হ'য়ে আমাকে ভজনা করবে, আমাকে প্রেমে পূজা করবে ও আমার মহাপ্রেম পরিবার হবে। আমার প্রেম-সংসার হবে। আমার মানবসংসার স্বর্গসংসার হবে। আমার পুত্র কন্যা আমার প্রেমে সকলকে প্রেম করবে। তা না ক'রে চরম বৈরিতা, চরম অবিশ্বাস, চরম হীনতা দ্বারা আজ মহাধ্বংসকে ডেকে আনছে।

তুমি ওঠ, জাগ্রত হও। মহা-সাধন কর। মহা শক্তিলাভ কর। তোমার ভিতরে মহা শক্তির অলোড়ন তুমি অনুভব করছ। কিন্তু সেই মহা শক্তির উৎস মুখ এখন আমি খুলে দেব না। এই উৎসমুখ এমন সময় খুলে দেব যে তুমি নিজেই অবাক হ'য়ে যাবে যে এ শক্তি তোমার ভিতরে কি করে এল। তোমার কোনও চিন্তার প্রয়োজন নাই। এখন যে ভাবে সাধন করছ করে যাও। ঠিক উপযুক্ত সময়ে তোমাকে আমি অপার শক্তির উন্মেষ দেব। সেই মহাশক্তি দেখে সকলে তোমার পদতলে পড়বে ও তুমি আমার পদতলে দাঁড়িয়ে সকলকে আমার একান্ত করবে। **এই তোমার কার্য্য, এই তোমার কর্ত্তব্য ও এই তোমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য**"। প্রস্তুত হও, আমি আছি, তোমার কোনও সংশয় নাই।"

জয় মহাশক্তি স্বরূপিনী মা জগত জননীর জয়। এ দাস যেন তোমার করুণা কখনও বিস্মৃত না হয়—।

১০ই জানুয়ারী, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে ধ্যানে বসবার কিছুক্ষণ পরে মা এলেন। আমাকে বললেন, "এই ত' আমি তোর ডাইনে দাঁড়িয়ে আছি।" যেই হাত বাড়ালাম অমনি বললেন, "এই ত' বামে দাঁড়িয়ে আছি।" যেই বামে হাত বাড়ালাম অমনি বললেন "এই ত তোর পিছনে দাঁড়িয়ে তোর মস্তক স্পর্শ করছি।" কে যেন আমার মস্তকের পশ্চাৎ দিকে স্পর্শ করল। আমি মাকে বললাম, এ আবার কি খেলা তোমার? একবার বলছ ডাইনে আছি, ডাইনে যেই হাত বাড়ালাম অমনি বামে গেলে। যেই বামে হাত বাড়ালাম অমনি পিছনে গিয়ে মস্তক স্পর্শ করলে। এ আবার আমার সঙ্গে কি খেলা? মা বললেন, "তুই না যোগ ধ্যান করছিস্? আমাকে মহা উর্দ্ধে অনন্ত আলোকের সাগরে খুঁজে বেড়াচ্ছিস্। কিন্তু আমি যে তোর কাছে সর্ব্বক্ষণ ছায়ার মত রয়েছি সেটা কি উপলব্ধি করতে পারছিস্ না? তোর সামনে, বামে, দক্ষিণে, পশ্চাতে সব দিকে আমি তোকে ঘিরে ছায়ার মত রয়েছি। এই অনুভূতি দৃঢ় কর। অসীম অনন্তে আমাকে খুজে দিশাহারা হবি কেন? সব সময় সর্ব্ব অবস্থায় আমার নিকট সান্নিধ্য অনুভব কর। তা' হ'লে যোগধ্যানের গভীরতা স্থিত হবে, আনন্দ পাবে ও ক্রমে আমাকে দেখতে, পাবে।" মাকে দেখলাম খুব আনন্দিত, খুব হাসি হাসি মুখ যেন আমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছেন। আমার মার সঙ্গে খেলা করতে খুব ভাল লাগে। এমন একটা সরলতা ও স্নেহ মাখানো থাকে এ খেলায় যে প্রতিদিন ও সব সময় মার সঙ্গে খেলা করতে ভাল লাগে।

আমার মা মা মাগো মা আমার।

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে ধ্যানে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই মা এলেন। এসেই বলতে

লাগলেন, "এ তোমার কি স্বভাব? রাত্র থেকে নস্যি ছেড়ে দিলে, সকালে দিলে না, আবার দুপুর থেকে দিতে আরম্ভ করলে। না দিলেও ত' তোমার তেমন কিছু অসুবিধা হ'চ্ছিল না। তবুও দিতে আরম্ভ করলে। এতে তোমার যতটা ক্ষতি হ'চ্ছে তার থেকে আমার মহান্ কার্য্যের অনেক বেশী ক্ষতি হ'চ্ছে। যে মহান্ কার্যের জন্যে তুমি চিহ্নিত সে কাজ ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। এর জন্যে আমার শক্তি তোমার ভিতরে স্থিতি লাভ করতে পারছে না। কারণ ব্রহ্মকেন্দ্রে যে সহস্রদল পদ্ম আছে তার ভিতরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে। আমার জ্যোতি এই সব কোষের ভিতরে আস্তে আস্তে আসতে আরম্ভ করে সাধনার সঙ্গে সঙ্গে ও ক্রমে এরা পূর্ণরূপে সেই জ্যোতির ধারক হয়। তখন এই সহস্রদল পদ্ম পরম জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়। যদি এই কোষ সকল ম্রিয়মান বা অন্য কোনও বিষাক্ত দ্রব্যের দ্বারা আহত হয় তবে এদের ধারণার ক্ষমতা ক্ষীণ হ'য়ে যায় ও এরা ধীরে ধীরে নির্জ্জিব হ'য়ে পড়ে। তোমার নস্য দেবার জন্য এদের ক্ষতি হ'চ্ছে। নস্য ছেড়ে দিলেই এরা আবার পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে জাগ্রত হ'য়ে আমার জ্যোতির ধারক হবে। আমি মাকে বললাম, আমাকে এই সব কোষ দেখাও না একবার। মা বললেন, "দেখ"। বলবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম শত শত লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ধূলিকণার মত সব জ্যোতির কণা আমার মস্তকের ঊর্দ্ধস্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে অনেক গুলি কালোও আছে। এ যেন প্রহেলিকা। অসীম নভোস্থলে এই সব জ্যোতির কোষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবার মাকে বললাম আমাকে ব্রহ্মকেন্দ্রের সহস্রদল পদ্ম দেখাও। মা বললেন "দেখ"। দেখি একটা ছাতার মত। সম্পূর্ণ খোলা বা flat, মাঝখানে একটি ছোট গোল মতন রক্তবর্ণের চক্র। সেই চক্র থেকে সূক্ষ্মতন্ত্রির মত ও মেঘের স্তরের মত গাঢ় রক্তবর্ণ তার দল, একটার পর একটা স্তরে স্তরে যুক্ত হ'য়ে আছে। আর তার ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতির কণা আগে যা দেখেছি সেই গুলো। আমার মনে হ'ল ঠিক যেন কেউ আমার মাথায় একটা খোলা ছাতা flat ক'রে বসিয়ে দিয়ে গেছে যার পূর্ণ অবয়ব আমি

দেখতে পাচ্ছি। এর পরে মা বললেন," এরা সব সূক্ষ্ম। এরা কেউ স্থূল নয়। তোমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এদের উপস্থিতির কোনও নিদর্শন ধরা পড়ে না। কিন্তু এরাই প্রকৃত সকল ভাবের, বুদ্ধির, জ্ঞানের, ও প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ ধারক ও বিকাশের ক্ষেত্র। "ওমান" বলে প্রাণের থেকেও সূক্ষ্মতর একটি পদার্থ তোমাদের দেহে বর্ত্তমান। এই "ওমান" থেকেই "মানব" বা মানুষ বা মনুষ্য ইত্যাদির নাম করণ হ'য়েছে। এটা হোল এমন পদার্থ যার গঠন ঠিক তোমাদের দেহের অনুরূপ। এ তোমার স্থূল শরীরের ভিতরে তোমার স্থূল শরীরের রূপ নিয়ে সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান। এর গতি বিধি তোমার শরীরের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম সকল স্থানে, অস্থি,মজ্জার ভিতরেও। এ হোল গুণগ্রাহী। এ তোমার স্থূল শরীরের সকল সূক্ষ্মতম স্থানেরও সকল সংবাদ আত্মার কাছে প্রতি নিয়ত বহন করে আনে। "প্রাণ" হ'চ্ছে আত্মার ক্রিয়া। আত্মা দেহে প্রবেশ করলেই প্রাণরূপ ক্রিয়ার দ্বারা দেহে ক্রিয়া করেন। তখন বাহিরের তাপ, জল বায়ু ও নানা রূপ বায়বীয় সূক্ষ্ম পদার্থ ও স্থূল খাদ্য দ্বারা দেহ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় প্রাণরূপ-শক্তি ক্রিয়ার দ্বারা। প্রাণ শুধু দেহের পরিচর্য্যাই করে অর্থাৎ দেহকে সে চালায়। কিন্তু দেহে প্রাণ সঞ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, ভাব, অভাবের দায়িত্ব "ওমানের"। সে তখন দেহের কোথায় কোন অভাব, কোথায় ক্রিয়া ঠিক হ'চ্ছে না ইত্যাদির ভার নিয়ে সর্ব্বত্র পলকে পর্য্যবেক্ষণ করে বেড়ায়। ভাব হোক্ অভাব হোক্ পলকে আত্মার নিকট সংবাদ দেয়। এই খানেই "ওমানের" কর্ত্তব্য শেষ। সে সূক্ষ্ম দেহ। সকল সংবাদ সে মন, ইচ্ছা, বুদ্ধির দ্বারা পলকে আত্মার কাছে পৌছে দেয়। "ওমান" সংবাদ নিয়ে যায় মনের কাছে, মন দেয় ইচ্ছার কাছে, ইচ্ছা দেয় বুদ্ধির কাছে ও বুদ্ধি আত্মাকে দেয়। এ সব এক পলকে হ'য়ে যায়। আত্মা রাজা সে ব্রহ্ম কেন্দ্রে বাস করে। প্রাণ দেহ-ত্যাগ করলেও "ওমান" অত তাড়াতাড়ি দেহকে ত্যাগ করে না। সে অতি ধীরে ধীরে দেহত্যাগ করে ও আত্মার আজ্ঞা বহন করে। যেমন ধর একটা জাহাজ সমুদ্রে চলেছে। তার একটা শরীর

আছে, তার ভিতর ইঞ্জিন ও কলকব্জা আছে ও প্রয়োজনীয় সব কিছু আছে যাতে সে চলতে পারে ও চলবার সময় দিনের পর দিন যাতে তার কোন অভাব না হয়। Captain যে সে তার উচ্চ ঘরে বসে বসে জাহাজের গতি বিধি সব ঠিক করেন। কোনও একটা গোলমাল হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে খবর আসে। যে ভাবের বা যে বিষয়ের গোলমাল সেই বিশেষ Engineer বা লোকের উপর ঠিক করবার উপযুক্ত উপদেশ বা নির্দ্দেশ দেন। জাহাজের যেমন আকার সেই আকারে জলের ভিতরে বা বায়ুর ভিতরে একটা নিজস্ব আকার সৃষ্টি ক'রে চলে। সেটা তোমরা অনেকে বুঝতে পার না। কিন্তু এটা সত্য। তেমনি দেহও তাই, স্থূলের যে আকার সেই আকারে সে "ওমান" কে রক্ষা করে চলে। জীব প্রাণধর্ম্মী হওয়াতে এ তার অচ্ছেদ্য অংশ। দেহের কোনও জায়গায় কোনও বিপদ হ'লে "ওমান" সঙ্গে সঙ্গে সে সংবাদ মনকে দেয়, মন ইচ্ছাকে দেয়, ইচ্ছা বুদ্ধিকে দেয় ও বুদ্ধি আত্মাকে দিয়ে নির্দ্দেশ আকাঙ্ক্ষা করে। এই বুদ্ধির সঙ্গে আত্মার যোগ অতি নিকটতম ও বুদ্ধিকে আত্মা ঠিক পথে চালিত করে। বুদ্ধি যদি দেহের স্থূলতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে তবে সে বুদ্ধিতে পূর্ণ মঙ্গল হয় না দেহের। ক্ষণিক হয়ত লালসার বা বিপদের শান্তি হয় কিন্তু উদ্বেগের মূল থেকে যায়। তাতে ক্রমে ক্রমে আত্মার শক্তি বুদ্ধির উপরে হ্রাস পেতে থাকে ও মানব বিপথগামী হয়। আত্মা আমার অতি নিকট অংশ বলে পূর্ণ সৎ। কিন্তু বুদ্ধি যদি দেহ-বিকারে বিপথগামী হয় আত্মাকে সে মোহগ্রস্থ করে রাখে। কারণ আত্মা আপন উন্নতির জন্যে দেহ ধারণ করলেও অপমার্গে প'ড়ে মোহান্ধকারে পতিত হয় ও দেহ সর্ব্বস্ব হ'য়ে পড়ে। কারণ দেহের সাধন যে দিকেই গভীর ভাবে যাবে আত্মার গতি সেই দিকেই থাকে। তখন আত্মা আত্ম বিস্মৃত হ'য়ে দেহ লালসায় ধাবিত হয়। কিন্তু সে নিত্য সৎ বলে যদি একবার মুক্তির পথ খুঁজে পায় তখন আর তাকে কোনও মোহই বদ্ধ করতে পারে না। যদিও মন আত্মার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ তবুও বুদ্ধির নির্দ্দেশেই আত্মাকে চলতে হয়। এই বুদ্ধি দুই প্রকার। এক বিবেক বুদ্ধি বা বিবেক

প্রজ্ঞা। আর এক মোহবুদ্ধি বা মোহ প্রজ্ঞা। মোহ প্রজ্ঞাতেও সংসারের অনেক কাজ হয়। যত সব জড় বিজ্ঞানের উৎকর্ষ, বিত্তলাভ, বিষয়ে উন্নতি, সংসারে প্রতিষ্ঠা, সম্মানলাভ ইত্যাদি মোহপ্রজ্ঞার অন্তর্গত। আর বিবেক প্রজ্ঞা হ'ল সত্য অন্বেষণ, সত্য দৃষ্টি, সত্য চিন্তন ও সত্য দর্শন। এই বিবেক প্রজ্ঞা আত্মা নিমেষে আমার কাজ থেকে গ্রহণ ক'রে দেহকে, মন, বুদ্ধি ও ইচ্ছাকে চালিত করে। এই বুদ্ধিকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা ব্রহ্ম জ্ঞান বলা যায়। যখনই সৎকার্য্য করা হয় তখনই বুঝতে হবে আত্মা আমার নির্দ্দেশ গ্রহণ করছে ও সেটা মন বুদ্ধিও ইচ্ছাকে দিয়ে পালন করাচ্ছে। আমার নির্দ্দেশ প্রতিনিয়ত গ্রহণ করলেও বুদ্ধি যদি মোহপ্রজ্ঞার অধীন হয় তবে আত্মা, মন, ইচ্ছা, বুদ্ধি ও দেহকে অন্যায় করতে দেখেও নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে আরও দুঃখ পায়। ক্রমে ক্রমে সে দেহের লালসায় দেহ মুখিন হ'য়ে পরে ও আমাকে ক্ষণিকের জন্যে ভুলে যায়। এবার শোন নাসিকার দ্বারা নিশ্বাস গ্রহণে বিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে এমন সব পদার্থ তোমরা গ্রহণ কর যার ভিতরে বিষ ও অমৃত দুইই আছে। বিষ প্রবেশ করলেই একরূপ লালা নির্গত হ'য়ে সেটাকে নষ্ট ক'রে দেয়। আর অমৃত প্রবেশ করলে সেটা আগে নাসিকার দ্বার দিয়ে অতি সূক্ষ্মপথে সহস্র দলে প্রবেশ ক'রে তাকে ধৌত ক'রে ফিরে আসে প্রাণের কেন্দ্রে। কিন্তু মুখ দিয়ে নিশ্বাস নিলে এই বিষ বা অমৃত মিশ্রিত বায়ু বেশীর ভাগ ঊর্দ্ধদেশে অতি ক্ষিণ ক্রিয়া করে ও সে নিম্নগামী হ'য়ে বায়ু রোগ জন্মায়। সহস্র দল নিয়মিত পরিস্কৃত না হওয়াতে মস্তকের কার্য্য ক্ষমতা হ্রাস পায় ও ক্রমে নাসিকা চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও গলার পীড়া দেখা দেয়। "ওমানের" সেই সেই জায়গায় প্রবেশের ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে সেই সেই জায়গার প্রকৃত তথ্য আত্মা পূর্ণরূপে অবগত হয় না ও ফলে সেই সেই জায়গার স্বাভাবিক শক্তি বা গতি ব্যাহত হ'য়ে পড়ে। এখন এই সব কথা তুমি মনে রাখবে। ও যত তাড়াতাড়ি পার নস্য ছেড়ে দাও। কোনও ভয় নাই। আমার করুণা

তোমার প্রতি সর্ব্বদা থাকবে। তুমি এটা একদিন ছাড়বে তাও জানি। কবে ছাড়বে তাও জানি। সাধন কর। অগ্রসর হও। আমি আছি।"

জয় মা জ্ঞানদায়িনী জননী আমার। আমায় শক্তি দে, সঙ্কল্প দে, যাতে নস্য ছেড়ে দিতে পারি। মা মা মাগো।

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে সংবাদপত্রে সরকারের খাদ্য নীতির বিষয় প'ড়ে মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেল। ভাবলাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে একখানা চিঠি লিখি। ১৯৫২ খৃঃ স্বর্গীয় কিদোয়াইকে যে ভাবে খাদ্য নীতির বিষয় লিখেছিলাম সেইভাবে আবার পণ্ডিতজিকে লিখি। মনে মনে চিন্তা করছি কিভাবে লিখব ও দাঁতন করছি। হঠাৎ মা বললেন, "ওসব লিখে কোনও ফল হবে না। এ আমার বিধান। আমার বিধানেই জ্ঞানী অজ্ঞানের কথা বলবে। যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে লোক-কল্যাণ হবে সরকার সে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। অরাজকতা, অসন্তোষ, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার এ হবে সরকারের মানদণ্ড। এই গুলোকেই সরকার ন্যায় ও নীতি বলে গ্রহণ করবে। সরকারের ভিতরে যাঁরা জ্ঞানী ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আছেন তাঁরা অন্যায় বুঝতে পারলেও তাঁদের পারিপার্শ্বিক পার্শ্বচরেরা বা মন্ত্রণা দাতারা তাদের বিপরীত কার্য্য করবার জন্যেই মন্ত্রণা দেবে ও সেই মতই কার্য্য হবে। মহা অরাজকতা, মহাবিপ্লব, ও মহাবিপত্তি না এলে জন-জাগরণ, জন-চেতনা কখনও আসে না। জনগণের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই বর্ত্তমানে জনগণের দুঃখের ব্যবস্থা আমিই করছি। সুষ্ঠু ও পুষ্ট জন চেতনা যাতে মহা মঙ্গলের পথ পায় তার একমাত্র পথ হচ্ছে মহাবিপর্য্যয়।" আমি বললাম, কেন এরকম হ'চ্ছে? এর কারণ কি? মা বললেন, "হিংসা।" আমি বললাম সেত আমি জানি। কিন্তু মা বললেন, "তুমি হিংসাকে যে ভাবে জান এটা সে ভাবের নয়। এ হিংসা সুদূর প্রসারি মানব মনের গভীরতম প্রদেশের নীচবৃত্তি যা সে মনুষ্যেতর জন্মের দ্বারা ও মনুষ্যেতর জীবের সান্নিধ্যে

এসে লাভ করেছে। আজ তোমাদের পৃথিবীতে "হিংসার" যে ব্যবহারিক অর্থ লোক সমাজে প্রচলিত বা প্রচারিত হ'য়েছে "হিংসার" ঠিক সে অর্থ নয়। মানব মনের "হিংসা" "ঈর্ষার" নামান্তর। মানব মন 'হিংস্র" নয় "ঈর্ষী"। আমি বললাম "ঈর্ষা" ত আলাদা রিপু। সে কেমন করে "হিংসা" হবে? মা বললেন, শোন বলছি—

"জীব মাত্রেই ক্ষমতার অধিকারী। প্রত্যেক জীব নিজ নিজ দেহের পরিবেশে যতটুকু ক্ষমতা লাভ করবার দরকার সেটুকু লাভ করেছে। এই ক্ষমতায় সে তার ক্ষমতার চাইতে হীন ক্ষমতাপন্ন জীবকে 'উপেক্ষা' করে। এই যে 'উপেক্ষা' এই হ'ল 'ঈর্ষার' নামান্তর। তোমরা জান যে হীন ক্ষমতাপন্ন তার চাইতে বেশী ক্ষমতাপন্নকে সে যে চোখে দেখে তাকেই 'ঈর্ষা' বলা হয়। কিন্তু তা নয়। মনুষ্যেতর জীবের ভিতরে তাকে বলে 'ভয়' ও মনুষ্য জীবনে তাকে বলে মাৎসর্য্য। এই 'মাৎসর্য্য' ও 'ঈর্ষা' এক বস্তু নয়। মনুষ্যেতর জীবের জীবনে যেটা স্বাভাবিক 'হিংসা' মানবজীবনে তাই 'ঈর্ষা'। এবার তোমাকে খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটি বাঘ সে কখনও একটা সিংহকে আক্রমন করে না। বুভুক্ষ হ'লেও তা সে করবে না। কারণ সে জানে যে সিংহ তার চাইতে ক্ষমতাপন্ন। অথচ সে নির্ব্বিবাদে হরিণ, গরু, মহিষ, ইত্যাদিকে হত্যা ক'রে ভক্ষণ করে। তেমনি একটি শৃগাল কি কখনও একটি বাঘকে আক্রমণ করে? সে শুধু ছাগশিশুই আক্রমণ করে। মনুষ্যেতর জীবের ভিতরে এই যে হিংসা এ তার স্বভাব ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম তার জীবন ধারণের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে। একটি বাঘের যদি পেট ভর্ত্তি থাকে তবে তার • সামনে যদি নধর মেষ সাবকও চলে যায় সাধারণতঃ সে তার দিকে ফিরেও চায় না। এ হ'চ্ছে পশু জীবনের স্বভাব ধর্ম্ম। তার বুভুক্ষাই হিংসাকে জাগ্রত করে। তাই সেই হিংসাকে চরিতার্থ করবার জন্যেই তার প্রকৃতিগত অবলম্বন প্রয়োজন। যেমন, নখ, দাঁত,

শক্তি দ্রুতগতি ইত্যাদি। তার চাইতে অধিক ক্ষমতাপন্ন জীবের ভয়েও তার ভিতরে হিংসা জাগ্রত হয়। এ হিংসা তার—ঈর্ষা নয়। এ তার স্বাভাবিক জীবন রক্ষার প্রয়োজনে হয়। বাঘ সাধারণতঃ মানুষকে অধিক ক্ষমতাপন্ন বলে মনে করে সে যে কারণেই হোক্। সে জন্যে সে মানুষকে ভয় করে। মানুষকে সর্ব্বসময় এড়িয়ে চলে। কিন্তু অনেক সময় মানুষের দ্বারা বেষ্টিত হ'লে নিজের জীবন রক্ষার জন্যে মহাহিংস্র হ'য়ে উঠে। একবার যদি তার মানুষের ভয় ভেঙ্গে যায় সে নরখাদক হ'য়ে উঠে।

এইবার তোমাদের জীবন বিশ্লেষণ কর। তোমরা একটা ছাগলকে বলি দাও। কিন্তু একটা বাঘকে কি বলি দাও? তা হ'লে তোমরাও খাদ্যের প্রয়োজনে তোমার চাইতে হীন ক্ষমতাপন্ন জীবকে হত্যা করে খাও। আত্মা একস্বরূপ, পূণ্য-কর্ম্মা শুদ্ধ ও মুক্ত। কিন্তু যখন যে দেহতে সে বদ্ধ হয় সেই দেহের গুণাগুণের দাস হ'য়ে পড়ে। পশু জীবনের ভিতরেও কি আত্মার সদ্‌গুণের নিদর্শন সময় সময় পাওয়া যায় না? একটি ছাগমাতা ব্যাঘ্রের কবল থেকে নিজ সন্তান মুক্ত করবার জন্যে নিজ দেহের ক্ষমতা বিস্মৃত হ'য়ে ধাবিত হয়—হয়ত তার জন্যে সে তার নিজ দেহ পাত করে। এ হচ্ছে আত্মার ক্রিয়া। আত্মা তখন মহা প্রেরণায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেহকে ধাবিত করায়। দেখা যায় একটি ব্যাঘ্রী একটি মানব শিশুকে পালন করছে। এসবই আত্মার কার্য্য। আত্মা পশুদেহতেও অনেক সময় নিজ কার্য্য সম্পাদন করবার সুযোগ গ্রহণ করে। কিন্তু আত্মা যখন শ্রেষ্ঠতম মানব দেহ গ্রহণ করে, প্রজ্ঞা ও বিবেকরূপ মন্ত্রির দ্বারা চালিত হয় সেই অবস্থায় সে যদি পশু প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় তবে সে দেহ বিকারে বিকার গ্রস্থ হয়। তখন মানব দেহ লালসার বিকারে বিকারগ্রস্থ হ'য়ে পড়ে। সদ্ প্রবৃত্তি যে না থাকে তা নয় কারণ মন ও বুদ্ধি অত্যন্ত সক্রিয় মানব দেহে। কিন্তু দেহ লালসায় অসদ্ প্রবৃত্তি যুগপদ্ মানবকে হীনমন্যতার দিকে আকর্ষণ করে। তুমি

হয়ত বলবে আমার দেশাচার আমি মাছ খাই, আর একজন হয়ত বলবে তার দেশাচার সে মাংস খায়, আর একজন হয়ত বলবে আমার দেশাচার আমি মদ খাই। আবার আর একজন বলবে আমার দেশাচার তাই আমি মদ, মাছ, মাংস কিছুই খাইনা। কিন্তু এমন ব্যক্তিও আছেন যে, যে সমাজে মাছ, মাংস ও মদই দেশাচার সেই সমাজে বাস ক'রে এর কোনটাই তিনি গ্রহণ করেন না। বরং গ্রহণ না করে সাত্ত্বিক আহার করে অন্য দশজনের থেকে সবল, সুস্থ প্রজ্ঞাবান, সম্মানিত ও সকলের আদর্শ স্থানীয় হ'য়ে আছেন। তা' হ'লে দেহের লালসাই ধীরে ধীরে দেশাচারে পরিণত হ'য়েছে। যখন এই দেহের লালসা দেশাচারে পরিণত হয় তখন মানব তাকে স্বাভাবিক বলে মনে করে। যেমন তুমি শিশু থেকে মাছ খাও, এ তোমার কাছে অতি স্বাভাবিক যে একদিন মাছ না হ'লে তোমার খাওয়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়—। আর এক সমাজে মাছের নামে তাদের ঘৃণা হয়—। সুতরাং যে মাছ মাংস খায়না তার জীবন ধারণের উপযুক্ত খাদ্যও সংগ্রহ হয়। কেবল হয় না, চোব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় ভাবে হয়। তাই যদি এক জনের বা এক সমাজের পক্ষে সম্ভব হয় তবে আর এক সমাজের পক্ষে সম্ভব হবেনা কেন? তুমি হয়ত বলবে যে প্রাকৃতিক পরিবেশে আমার শরীরের উষ্ণতা রক্ষা করার জন্য এ সব আহার প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে তুমি জান যে দুগ্ধ বা ফলের ভিতরে বা অন্য সব নিরামিষ খাদ্যের ভিতরে শরীরের তাপ রক্ষা করবার যে সকল উপাদান আছে মৎস বা মাংসের ভিতরেও সেগুলো নাই। কিন্তু তুমি দেহ লালসায় লালায়িত হ'য়ে তোমার যুক্তি তর্ক নিয়ে আত্মার বিবেকরূপ সদ্যুক্তিকে খণ্ডন করতে প্রবৃত্ত হ'লে। দেহের লালসা কেবল খাদ্যের ভিতরেই নয়, পোষাকে, বিলাস দ্রব্যে ও আধুনিক জগতে জীবন ধারণের যে সকল উপকরণ স্বাভাবিক ব'লে প্রতীয়মান হয় সেই সেই সকল উপকরণেও দেহ লালসা অতি ধীরে ধীরে মানব সমাজকে গ্রাস করে

ফেলেছে। এই ধর চামড়ার জুতা। আজ তোমরা ভাবতেই পার না জুতা ছাড়া কি ক'রে চলা যায়। এই চামড়ার জুতার বিরাট্ ব্যবসায়। লক্ষ লক্ষ পশু হত্যায় এই জুতার ব্যবসায় চলছে। কেন পশু হত্যা হ'চ্ছে? যেহেতু জুতা তোমার প্রয়োজন—। যখন তুমি জুতা কেন তখন কি এ কথা তোমার মনে আসে যে এই যে জুতা জোড়া কিনলাম এর জন্যে একটি পশুকে তার জীবনের মূল্য দিতে হ'য়েছে। তবেই ভেবে দেখ যা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে তোমাদের কাছে আজ দেশাচার বা লোকাচার বলে চলিত হ'য়ে গেছে সেটা আসলে তোমার দেহের লালসার ফল যা অতি ধীরে ধীরে মানব সমাজকে পূর্ণরূপে মোহগ্রস্থ করে রেখেছে। এখন ভেবে দেখ এর উৎস কোথায়। এই উৎস হ'চ্ছে ঈর্ষায় যা হিংসার নামান্তর। যেহেতু তুমি ক্ষমতাশালী সেই হেতু তোমার থেকে হীন ক্ষমতাপন্ন জীবের জীবন নাশ করে তার দেহ দিয়ে তোমার লালসার নিবৃত্তি করছ। এই ঈর্ষারূপ যে হিংসা এইটাই অতি ধীরে ধীরে সকল মানব মনকে তার চাইতে হীন ক্ষমতাপন্ন বা তার চাইতে সমাজে নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের প্রতি বিরূপভাব জাগ্রত করছে। তুমি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একজোড়া জুতা কিনতে পার। কিন্তু একটি কাঙ্গাল দীন দুঃখীকে দুটো পয়সা দিতে হ'লে মনে ভাব অযথা দুটো পয়সা গেল। এইযে মনোভাব এই হ'ল ঈর্ষা বা হিংসা। কেন তাই বলছি। কাঙ্গালীকে দুটো পয়সা দেবার সময় তোমার মনে হয়, দেখ দেখি কি সব ঝামেলা, লোকটা খেটে খাবে না, আমার রোজগারের পয়সার ভাগ বসাতে এসেছে। তাকে তুমি তোমার চাইতে অনেক হীন বিবেচনা করলে। এই যে হীনমন্যতা যার দ্বারা তোমার মত সমশ্রেণীর আর একটি মানবকে হীন ভাবলে এই হ'ল তোমার ঈর্ষা ও তাই হিংসার নামান্তর। এতেই উচ্চ শ্রেণী নিম্ন শ্রেণীর প্রতি অন্যায় অবিচার করছে। ধনী দরীদ্রকে নিপীড়ন করছে। সভ্য বলে গর্ব্বিত জাতি অসভ্য বা বর্ব্বর জাতির প্রতি অত্যাচার করছে। রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি জনসাধারণের প্রতি অন্যায়

আচরণ করছে। যার যেটুকু ক্ষমতা তার সেইটুকু ক্ষমতা নিয়ে তাঁর চাইতে ক্ষমতা হীন মানব, সমাজ বা জাতির উপর আপন আপন ক্ষমতা বিস্তার ক'রে ক'রে অবিচার, অনাচার, অন্যায় অত্যাচার উপেক্ষা, দুঃখ উৎপাদন করছে মানব সমাজে। এর অপনোদন করতে হ'লে তোমাকে সেই ঈর্ষার মূলে ফিরে যেতে হবে। সকল জীবকে আমার অংশ বা সকল জীবে এক সেই শুদ্ধ আত্মা এই বোধ জাগ্রত করতে হবে। এ ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান পেতে হ'লে আমার প্রতি অনুরক্ত ও আমার শরণাপন্ন হ'তে হবে। তাই বলছি যাদের কাছে তুমি লিখবে তারা ত' ক্ষমতায় অন্ধ। তুমি লিখিলেও তাদের ঈর্ষা বা হিংসা অপনোদন হবে না। ও হবে না বলেই তারা মোহগ্রস্থ ও মোহগ্রস্থ বলেই তোমার কথা তারা গ্রহণ করবে না। তারা তোমার বাক্য গ্রহন করবে কখন, যখন রূঢ় আঘাত আসবে আমার হাত দিয়ে। যখন আমি তাদের চৈতন্য সম্পাদন করবার জন্যে এক মহা প্রলয়ের ও ধ্বংসের বিভীষিকার সৃষ্টি করব। তখন তাদের চৈতন্য ফিরে আসবে নিজ নিজ ক্ষমতার অসারতা যখন তারা বুঝতে পারবে। মহাত্মা বুদ্ধও অহিংস সাধনে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করেন নাই। মহাত্মা গান্ধি অহিংস সাধন আরম্ভ করেছিলেন মাত্র। এ সাধন অতি কঠিন। কেবল জীবহত্যা নিবৃত্তিই অহিংস সাধন নয়। মনে প্রাণে পূর্ণ ঈর্ষাহীন হতে হবে। সর্ব্বজীবের প্রতি পূর্ণ ঈর্ষাহীন হ'তে হবে। সর্ব্বজীবের প্রতি পূর্ণ ঈর্ষাহীন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনে সেই আদর্শ পালন করতে হবে। খোলের ভিতরে, মৃদঙ্গের ভিতরে ডাক ঢোলের ভিতরে, পশুর চামড়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। কোনও পশুর চামড়ার উপরে সাধনের আসন হবে না। এই ভাবে সর্ব্বতোভাবে ঈর্ষাহীন হ'তে হবে তবে তুমি পূর্ণ অহিংস হ'তে পারবে। এর ভিতরে পার্থক্য মনে রেখ। এমন জীব আমি সৃষ্টি করেছি যাদের পরিমিত আয়ু ও সেই পরিমিত আয়ুর ভিতরে সে তার জীবনের সার্থকতা সৃষ্টি করে তার প্রাণ ত্যাগের দ্বারা তোমার উপকার সাধন করে যায়। যেমন ঔষধি, ফল ইত্যাদি। তারা

তোমার জন্যেই সৃষ্ট ও তোমাকেই তারা দিয়ে যাচ্ছে তাদের সম্পদ। কিন্তু যে সম্পদ আমি সৃষ্টি করেছি সেই সম্পদের অধিকারীর প্রয়োজনে সে সম্পদ যদি তুমি তোমার লালসার দ্বারা হরণ কর তবে তুমি হিংসুক ও তোমার অহিংসা সাধন হ'ল না।"

জয় মা জ্ঞানদায়িনী জননী আমার।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ লেক থেকে বেড়িয়ে ফেরবার সময় মা বললেন, 'নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনের দিকে যেও না। ব্রহ্মের সগুণ সাধনের দিকে অগ্রসর হও।" আমি বললাম ব্রহ্ম সাধনের দিকে যেতে হ'লে নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনই ত শ্রেষ্ঠতম। এ আবার তুমি কি বলছ? মা বললেন, 'শোন তবে ভাল করে। এটা ত' জান যে নির্গুণ অর্থে গুণাতীত। সকল গুণের স্রষ্টা বলেই আমি গুণাতীত।

নির্গুণং হি গুণাধারং সর্ব্ব সাকার বিবর্জ্জিতং
সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতং ॥

সর্ব্ব সকাররূপ বিবর্জ্জিত হ'য়েও সর্ব্ব সাকাররূপ—গুণের আধার, ধারক বা স্রষ্টা। সকল ইন্দ্রিয়—বিবর্জ্জিত হ'য়েও সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের গুণের স্রষ্টা বা ধারক। এর অর্থ এই যে সকল প্রকার ভাব, অভাব, গুণ, ধারণা ইত্যাদির একমাত্র স্রষ্টা আমি-ও তাই আমি এ সকলের অতীত। অর্থাৎ গুণাধার ও গুণাতীত। এই গুণাতীত অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা বা ভজনা জীবাত্মার পক্ষে সম্ভব না। কেন না, তাই বলছি, শোন,—। যদি তুমি বল 'সোহং' অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম কারণ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, সবই ব্রহ্ম ও তুমিও ব্রহ্ম তবে তোমার সাধনায় অভিচার দোষ বর্ত্তে। আমি গুণাতীত ব্রহ্ম সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত এক অদ্বৈত স্বরূপ। তুমিই যদি ব্রহ্ম হও তবে তুমি কে? তুমি বলবে আমিই সেই ব্রহ্ম। তবে এই যে তোমার ভিতরে ব্রহ্মের ধারণা এ কোথা থেকে এল? তুমি বলবে আমি ব্রহ্ম বলেই আমার এই ধারণা। তা হ'লে এই যে তোমার 'ধারণা' রূপ যে গুণ সে গুণ তোমায় বর্ত্তাচ্ছে। তুমি যদি ব্রহ্ম হও তবে

তোমার এই যে 'ধারণা' রূপ গুণ এই গুণ তোমায় আরোপিত হ'ল। তা' হ'লে গুণাতীত ব্রহ্ম ত' তুমি হ'লে না। তুমি হ'লে সগুণ ব্রহ্ম। এবার গোড়ার দিকে যাও। তুমি যদি বল 'সোহং' অর্থাৎ আমিই সেই। এই যে 'আমি' ভাব এই ভাবও একটা গুণ। তুমি কে? না, আমিই ব্রহ্ম। এই 'আমির' ভিতরে তুমি গুণ যুক্ত হ'লে 'আমিত্বরূপ' গুণাংশে। সুতরাং সেখানেও 'তুমি' 'ব্রহ্মেতে' গুণ আরোপ করেও নির্গুণ ব্রহ্মের ভজনা করতে যাচ্ছ। এটা কি পারস্পরিক সম্বন্ধে বিপরিত ধর্ম্মি হ'য়ে যাচ্ছে না? অদ্বৈত মার্গে যেমন তুমি বলছ 'সবই তিনি আমিও তিনি, তিনিও তিনি ও সকল ব্রহ্মাণ্ডও তিনি। সবই হোল কিন্তু এই যে 'ধারণার' দ্বারা তুমি এই কথা বলছ, সেটা কি? সেটাও ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের ধারণারূপ যে গুণ তার অংশ। সুতরাং এটাও ব্রহ্ম। তা হ'লে সেই 'ধারণা' রূপ যে ব্রহ্ম সে 'নির্গুণ' নয় ও 'সগুণ'। আমাকে যদি জ্যোতি বল সেও গুণ; নিরাকার বল সেও গুণ, শক্তি বল সেও গুণ। যদি বল নির্ব্বেদ পরমাত্মা এক 'ঈক্ষণ' ছাড়া আর কোনও কায়িক, বাচনিক, মানসিক ইত্যাদি কোনটাই আমাতে নাই তা হ'লেও এই 'ধারণারূপ একটা কিছু আমাতে আরোপিত করছ সেটা গুণেরই অভিব্যাক্তি। 'আছে' ব'লে যে স্থিতি 'নাই' ব'লে যে 'অস্থিতি' সেটা ধারণারই অংশ। 'আছ' যদি না থাকে তবে 'নাই' এল কোথাথেকে? 'আছ' ছিল বলেই না 'নাই' আছে। 'স্থিতিই' যদি না থাকে তবে 'নাই' থাকে না। তবে বলতে হবে 'ছিল' বা 'আছে'। কিন্তু তোমার ধারণাকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ ক'রে তুমি সেই 'আছ' কে অস্বিকার করে বলছ 'নাই'। যেভাবেই 'নির্গুণের' দিকে যাও না কেন 'সগুণে' তোমাকে আসতেই হবে কারণ তুমি জীবাত্মা। নির্গুণে তোমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। 'অদ্বৈত' রূপ যে নির্গুণ সে 'আমি' সকল ধারণার অতীত। তার সাধনায় জীবাত্মা কখনও যেতে পারে নাই আর পারবেও না। রূপ নির্ব্বিকার গুণ নির্ব্বিকার, নির্ব্বেদ পরম নির্ব্বিকার যে আমার স্বরূপ সে জীবাত্মার কোনও প্রকার ধারণার অতীত। সুতরাং সে

দিকে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। 'সগুণ' যে 'আমি' এই 'আমিই' তোমার ভজনার বস্তু। প্রকৃতির স্বভাবের ভিতরে 'মাতৃভাব' শ্রেষ্ঠতম ভাব। কারণ জীবের জন্ম, লালন, পালন, সবই মাতার দ্বারাই হয়। তাই জীব মাতার অতি নিকট। এই মাতার যে ভাব তাই—সগুণ ভাব। 'প্রকৃতিই' 'সগুণ' 'আমি'। এই প্রকৃতিই এক পরম মাতা যার দ্বারা তোমার সর্ব্বপ্রাপ্তি হ'চ্ছে। এই প্রকৃতি তোমার মাতা। তবে প্রকৃতির যে দান সেটা অত্যন্ত বিস্তৃত ও স্থূল হলেও পরোক্ষ। তাই সহজে হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে না তোমাদের। তোমরা ভাব এত হচ্ছেই, হবেই। কিন্তু এইখানেই মাতৃস্নেহের গভীর উৎস। এ বিস্তৃত প্রকৃতিই একযোগে মাতারূপে—মানব দেহে সন্তান পালন করছেন। এই যে মাতৃ প্রকৃতি এই প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম বিকাশ 'আমি'। আমিই সর্ব্ব-মূলাধার পরাপ্রকৃতি ও মাতৃস্বরূপা সগুণ পরব্রহ্ম। এই মাতৃপ্রকৃতিই পিতৃ-ভাবগত। এই মাতাপিতা প্রকৃতিরই দুই ভাবের একই স্বরূপ। দেখ 'মোক্ষ ভাবই' মোক্ষের সেবা করে। মোক্ষ প্রাপ্তিই তোমার পরম লক্ষ্য। এই মোক্ষ প্রাপ্তির যে ভাব তাই সগুণ সাধন। সুতরাং 'নির্গুণ' সাধন মনে করে যে সাধন হয় সে সাধন 'সগুণই'। 'সগুণ' সাধন অনেক প্রকার যেমন-মাতারূপে, পিতৃরূপে, জায়ারূপে, কন্যারূপে, সখারূপে, পুত্ররূপে, সখীরূপে, প্রেমিকরূপে, ইত্যাদি যতরূপ সাধন আছে সবই 'প্রেম' সাধন। কিন্তু মাতৃরূপে সাধন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এইরূপে যে তোমার সাধন হ'চ্ছে সে আমারই ইচ্ছায়। কারণ তোমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব করে গড়ে তুলব বলে। আমি ইচ্ছাময় নির্ব্বিকার 'হরি'। সকল অভাব 'মাতার' মত হরণ করি বলেই আমি 'হরি'। সুতরাং যে 'হরি' সেই মাতা আর যে মাতা সেই "হরি"। সাধন কর সকল পথের নির্দ্দেশ তোমাকে দেব। একনিষ্ঠ হও।"

জয় মা মহাজ্ঞানদায়িনী জননী আমার। শ্রীহরি আমার।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে আনন্দবাজার পত্রিকায় পড়লাম 'বিজ্ঞানের' তিনটি বিস্ময়।

এটা পড়ে মনে আমার এই ভাব এল তবে কি এমন সময় আসতে পারে যখন মানুষ ঈশ্বরের শক্তিকেও খর্ব্ব করতে সক্ষম হবে। তা হ'লে 'তুমি কে'? এত কিছুই বুঝতে পারছি না। এ এক সমস্যা। মা তৎক্ষণাৎ বললেন 'আমি কে এ প্রশ্নে যেও না। কারণ আমার অনন্তরূপ বৈচিত্র তোমার ধারণার অতীত। আমি মহাবৈচিত্র কল্পনাতীত মহাসত্ত্বা। তোমার সীমিত—বৈচিত্রে আমার অসীম বৈচিত্রকে ধারণা করতে পারবে না। পূর্ব্ব কালের জ্ঞানী সাধকগণ প্রতিটি শক্তিকেই 'আমি' জ্ঞানে ভজনা করে গেছেন। তাতেই তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। কিন্তু প্রতিটি শক্তিই আমারই অনন্ত শক্তির এক কণা মাত্র। সুতরাং সেই সেই শক্তি পূর্ণ 'আমি' নই। আমার অংশ মাত্র। তাই বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ঋষিগণ বলে গেলেন 'এরা কেউ পূর্ণ শক্তি না। শক্তির অংশ মাত্র।' এক ব্রহ্মই পূর্ণ শক্তি ও সকল শক্তির আধার। সকল বৈচিত্রের সকল ভাব অভাবের সকল ইচ্ছা অনিচ্ছার ধারক ও স্রষ্টা যে, তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম ও তাঁরই ভজনা করা মানবের প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম। একটি আম্র বৃক্ষের লক্ষ পল্লব। তার প্রতিটি পল্লব ভিন্ন। একটার থেকে আর একটার কিছু না কিছু প্রভেদ আছেই—। আমলকি বৃক্ষের আর হরিতুকি বৃক্ষের পল্লব এক নয়। এমনি প্রতিটি বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, গুল্ম, বিভিন্ন ও কারুর সঙ্গে কারুর মিল নাই। এই যে প্রকৃতির বৈচিত্র এ কি? এ হ'চ্ছে 'আমি' যে মহান্ বৈচিত্র তারই আভাস মাত্র। তার প্রমাণ এ জগতে প্রকৃতি থেকেই বৈচিত্রের অবতারণা হ'য়েছে। এই প্রকৃতি কি? পিতৃ ভাবের দ্বারা সৃষ্ট হচ্ছে আর মাতৃ ভাবের দ্বারা পালিত হচ্ছে। এই যে দুই ভাব এই দুই ভাবই—সেই আমারই ভাব। আমার ভিতরেই পিতৃ ভাব ও মাতৃ ভাব এই দুই ভাবই বর্ত্তমান। প্রকৃতিতে এই দুই ভাব অতি বিস্তৃতরূপে প্রকট্ বলে হঠাৎ তোমাদের ভিতরে সেই ভাব তেমন সক্রিয় ভাবান্তর সৃষ্টি করে না। কিন্তু তোমার পিতা মাতার ভাবকে তোমাদের ভিতরে একটা ভাবান্তর, এক শিক্ষা, একটি দৃষ্টি এনে দেয়। তোমার শিশু

অবস্থায় তুমি পিতামাতারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। আবার যখন পিতামাতা হও তখন তোমাদের সেই সেই ভাবে তোমাদের সন্তান লালন পালন কর। এই যে বংশ পরম্পরায় পিতৃ মাতৃ ধারা চলে আসছে সেই ভাবধারাই হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠতম ভাবধারা যার দ্বারা আমাকে তুমি উপলব্ধি করতে পারবে। আমাকে ভজনাই শ্রেষ্ঠতম পথ। কারণ যে প্রকৃতির পরিবেশে তুমি লালিত পালিত সেখানেও এই ভাব। আবার সংসারে পরিবারেও এই ভাব। সুতরাং যে ভাব তোমার নিকটতম, যে ভাবের ভিতরে তোমার জন্ম ও অবস্থান সেই ভাব তোমার ভিতরে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে বলেই সেই ভাবে তোমার 'আমাকে' ভজনা সাধ্যমত্ত ও সহজতম। তুমি যদি আমাকে নির্ব্বেদ পরমাত্মা বা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম ভাবে ভজনা কর সে ভজনা তোমার সীমিত বৈচিত্রের দ্বারা সম্ভব নয়। স্বতঃই যখনই আমাকে চাইবে পিতৃ মাতৃ ভাবে চাইবে— কারণ সে ভাব তোমার সাধ্যের ভিতরে। তোমার সাধ্যের বাহিরে যে ভাব তার নির্দ্দেশ ত' তোমার ভিতরে নাই। সে দিকে তুমি যদি যাও তবে তোমার কেবলই মনে হবে 'আমি' কে? তখন তুমি আমার অনন্ত বৈচিত্রে হারিয়ে যাবে। আমার ভজনায় তোমার অভিচার দোষ হবে। যেমন কোনও দেবদেবীর মূর্ত্তি গ'ড়ে আমাকে ভজনা করলে, তোমার পূর্ণ আমাকে ভজনা করা হ'লনা ও অভিচার দোষ হ'ল,। তেমনি নির্ব্বেদ অনন্ত ব্রহ্মভাবে আমাকে ভজনায় ও তোমার অভিচার দোষ হবে। তোমার প্রকৃতিগত, জন্মগত, সংসারগত, ভাবগত, যে পরিবেশ সেই পরিবেশ তোমার সাধ্যায়ত্ত ও সেই পরিবেশের যে প্রকৃষ্টতম নির্ম্মল ভাব সেই ভাবে আমাকে ভজনা করাই শ্রেষ্ঠতম পথ। সে হোল পিতৃ মাতৃ ভাবে আমাকে ভজনা করা। খৃষ্ট পিতৃ ভাবে ভজনা করে গেছেন। শিব পিতৃ ও মাতৃ ভাবে ভজনা করে গেছেন। **যে সব মহাত্মা আমায় পিতৃ মাতৃ ভাবে ভজনা করে গেছেন তাঁরাই প্রকৃত সাধন পথে সাধন করে গেছেন। এটা মহাসত্য বলে জানবে।** আমার ভিতরেই এই দুই ভাব। আমি পিতা হ'য়ে সৃষ্টি করছি

আবার মাতা হ'য়ে পালন করছি। তোমার পিতা মাতার ভাবকে এক যোগ যদি কর তবে বুঝতে পারবে এই দুই ভাব সেই আমারই ভাব ও আমার থেকেই এই দুই ভাবের জন্ম। সুতরাং আমি পিতাও মাতাও। সেই ভাবে আমাকে ভজনা করবে তাতে অভিচার দোষ হবে না ও তোমার সাধনা সার্থক হবে। এগিয়ে চল। সব জ্ঞান আমি দেব। কোনও চিন্তা নাই।"

মা মা মা আমার অপার জ্ঞানদায়িনী।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

ধরণীর শ্রেষ্ঠ অবদান

মর্ত্তের মানুষ যাঁরা নিস্বার্থ পরাণ।
যুগ আসে যুগ যায় লক্ষ বর্ষ ব্যাপী,
কালের গতির কাছে সব ধূলা মাটি।
জেগে আছে তাঁরা সব সকলের তরে,
নিস্বার্থ পরাণ যাঁরা সমুন্নত শিরে—।
কালরূপী নারায়ণ ভিক্ষা মাগি মাগি,
ফিরিছেন দ্বারে দ্বারে মহাকাল জাগি।
যে দিয়েছে ভিক্ষা তাঁরে আপনার প্রাণ,
আপনার বিত্ত সুখ সর্ব্বধন মান,
পেয়েছে অমৃত পাত্র মানব সংসারে,
অমৃতের পুত্র হ'য়ে জাগে ঘরে ঘরে—।
মৃত্যু তার নাই কোনও দিন,
অমৃতের বাণী যেই শোনে নিশি দিন।
নিত্য-বিত্ত-রাখি-লাগি' মানব পরাণ
চাহেনা ছাড়িতে কেহ আপনার স্থান—।
জন্মে জন্মে পিতা পুত্র, পুত্র আর পিতা,
রাজা, রাজ্য, রাজ্য শোক কত অনিত্যতা,

স্বার্থের সজ্মাতে কত শোনিতের ধারা,
রাঙ্গিয়া গিয়াছে এই ধরণীর পারা।
সে রক্ত লিখন আজ মুছিয়া গিয়াছে,
বিস্মৃতি ধাইছে আগে কাল পিছে পিছে।
শ্যামল হইয়া গেছে ধূসর ধূলায়—,
গর্ব্ব আর অহংকার ম্লান হ'য়ে যায়—।
তারে নমি আমি,
মানব দেউল তলে পূজি দিন যামী,
বিন্দু বিন্দু প্রেম কণা সঞ্চিয়া জীবনে—
স্বার্থহীন মধু ভাণ্ড র'চে যেই জনে—।
অন্ধে দেখাইছে পথ খঞ্জে হাত ধরি।
দুর্যোগের কাল রাত্রি দিল পার করি,
অভুক্ত অক্ষমে যারা খাদ্য শক্তি দিয়ে
নিরাশ্রয়ে তুলে নিল আপন আলয়ে,
অজ্ঞানের জ্ঞান দিল শোকীরে সান্ত্বনা,
দুষ্কৃতীরে ক্ষমা করি পেয়েছে লাঞ্ছনা,
মানবের স্মৃতি তীর্থে নিত্য পূজা তাঁর—
শ্রেষ্ঠ প্রতীক তাঁরা মহা-মানবতার—।

২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, মা আমাকে মহাভক্তি, মহাবিশ্বাস, মহাশক্তি, মহাঐশ্বর্য্য দাও। সারা পৃথিবী হরিনাম ও ভক্তির বন্যায় ভাসিয়ে দিই। মা বললেন, "তোমাকে দেবার জন্যেইত আমি এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। এই দেখ। এই মালা আমি তোমার গলায় পড়িয়ে দেবার জন্যেই অপেক্ষা করছি"। দেখি মা এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর গলায় আজানুলম্বিত শ্বেত পুষ্পের মালা। আমি বললাম তোমার গলার মালা ত' নরমুণ্ড মালা আমি পড়ব

না। মা বললেন, 'ওটা তোমাদের ভুল ধারণা। আমার গলায় নরমুণ্ডের মালা থাকতে পারে না। আমার পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড দিয়ে মালা গেঁথে আমি কি পড়তে পারি? মা কি কখনও পুত্রের মুণ্ড মালা পড়তে পারে? ওটা হ'চ্ছে শ্বেত পদ্মের মালা। শ্বেত হচ্ছে আনন্দের প্রতীক, ও আনন্দ হ'চ্ছে শান্তি। আমার রূপ আনন্দ ও আমি মহাকালরূপী হয়ে আনন্দই ধারণ করি তাই আমার ঐ প্রতীক। এই মালা আমি তোমার গলায় পড়িয়ে দেবার জন্যে অপেক্ষা করছি। যে-ক্ষণে তুমি মোহমুক্ত হবে, যে ক্ষণে তুমি লোভ পরিত্যাগ করবে, যে ক্ষণে তুমি আমার একান্ত বাধ্য হবে, যে ক্ষণে তুমি তোমার অন্তরের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করবে সেই ক্ষণে তোমার গলায় আমি আমার গলার এই মালা পড়িয়ে দেব। যখন তুমি আত্মজয় করতে পারবে তখন এই মহাবিজয়-মাল্য তোমার গলায় আমি নিজেই পড়িয়ে দেব। কারণ যখন তুমি আত্মজয় করতে পারবে তখনই তুমি বিশ্বজয়, ব্রহ্মাণ্ডজয় করতে পারবে, তখনই তুমি মহাবিজয়ী ও মহাবিজয় মাল্য তখনই আমি তোমার গলায় পড়িয়ে দেব। মহাধ্বংস এগিয়ে আসছে। যদি তার আগে প্রস্তুত হতে না পার তবে মহাঅনিষ্ট হবে এই পৃথিবীর। ও সেই মহাবিনষ্টিতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও আজ অবধি যে মহাউন্নতির ও মহাজ্ঞানের পথে মানুষ অগ্রসর হয়েছে সে সব ধ্বংস হ'য়ে যাবে। একে রোধ করতে হবে। ভক্তির পথ ভিন্ন অন্য পথ নাই। ভক্তিই সকল মানবকে এক সূত্রে গ্রথিত করবে। আমার একান্ত শরণাপন্ন হও ও কঠিন সাধন কর। তুমিই উপযুক্ত ও তোমার দ্বারাই এই কঠিন কার্য্য সম্পাদিত হবে।'

জয় জয় জয় মা ভক্তি দায়িনী জননী, বিশ্বজননী আমায় মহাভক্তি দে, আত্মজয় করবার শক্তি দে মা।

৯ই মার্চ্চ ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "হৃদয়াকাশে যা দেখতে পাও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাকাশেও তাই আছে। হৃদয়াকাশই ব্রহ্মাণ্ডাকাশ। সমুদ্রে ঘটি ডুবালে যে

জলটুকু ঘটির ভিতরে থাকে সেটুকু সমুদ্রেরই জল। 'অনন্ত সমুদ্রে মগ্ন হ'য়ে ঘটিটি সেই অনন্তেরই একটু অংশ নিজের ভিতরে ধারণ করল। ঘটি যদি বাইরে নিয়ে আস জল সমেত সেই জলও সেই অনন্ত সমুদ্রেরই অংশ। মগ্ন না হ'লে ত' তুমি অনন্তকে ধারণ করতে পারবে না। তবে তুমি অনন্তের কতটুকু ধারণ করতে পার? যতটুকু ধারণ করবার ক্ষমতা তোমার আছে ঠিক ততটুকুই তুমি ধারণ করতে পারবে। তুমি নিজে অনন্তকে ধারণ করেই অনন্তকে দর্শন ও উপলব্ধি করতে পারবে—। বাইরে থেকে অনন্তের দর্শন শুধু দর্শন মাত্র। তাতে বিস্ময় জাগায় কিন্তু অনন্তের সত্ত্বা হৃদয়াকাশে প্রবেশ করে না। তাতে একাত্ম হওয়া যায় না। একাত্ম না হলে অনন্তের মহাস্পর্শে গভীর অনুভূতি আসে না। দৃষ্টি যোগ জাগে না, বিশালতার উপলব্ধি হয় না। রসের পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায় না। তাই বলি হৃদয়াকাশে মগ্ন হও। আত্ম চেতনাকে জাগ্রত কর ও সেই আত্ম-চেতনা আমার রস সম্ভোগ করুক আমার ভিতর মগ্ন হ'য়ে। মগ্নতাই যোগ আর যোগই আমার রস সম্ভোগ। যতই অগ্রসর হবে ততই মগ্ন হবে, ততই গভীর অনুভূতিতে নব নব রস সম্ভোগ হবে। এই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম আনন্দ। এই—আনন্দই শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। এই আনন্দই অন্তর বাহির পূর্ণ ক'রে এক নবতম রসের সঞ্চার করে ও তাই—'অচ্যুদানন্দ প্রাপ্তি। অগ্রসর হও, আমি আছি।"

জয় মা আনন্দময়ী মা গো আমার—।

১৪ই মার্চ্চ, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ লেক থেকে বেড়িয়ে এসে মাকে বললাম তুই কি আমাকে ছেড়ে দিলি মা? অনেক দিন তোর দেখা পাইনা, আর আগে যেমন প্রতিদিন কত কথা বলতি তাও এখন বলিস না। এ তুই কি করলি মা? মা বললেন, "ছিঃ ও কথা বলতে নাই। আমি কি তোমাকে ছাড়তে পারি? আমার স্পর্শ সব সময়েই আছে। আমি কোনও জীবকে

ছাড়ি না। জীবনে, মরণে, ইহকালে, পরকালে, সুখে, দুঃখে, আশায়, নিরাশায়, সর্ব্ব অবস্থায় আমি তোমাদের স্পর্শ করে আছি জানবে। আমি তোমাদের সকলকে ধরে আছি। তোমার হাত ধরে আছি। তোমাকে হাতে ধরে সাধন পথে নিয়ে চলেছি। যারা আমাকে চায় না বা আমাকে স্বীকার করে না জানবে তারাও আমাকে চায় ও তারাও আমাকে পাবে ও তারাও আমার স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় নাই। যারা আমাকে চায়, আমাকে ভালবাসে তাদের প্রতি আমি তৎক্ষণাৎ কৃপা করি ও তাদের হাত ধ'রে আমাকে পাবার উপযুক্ত রাস্তায় সাধনের পথে নিয়ে চলি। আসলে জন্মান্তরের বিভিন্ন আবর্ত্তে না পড়লে কেউ আমাকে চায় না। মহাজীবনের একপক্ষে জন্মান্তরের ধারায় এক সময় আমাকে প্রতি জীব চাইবেই। আমি সেই চাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করি। না চাইলে এগিয়ে যাই না। চাইলে দশ পদ অগ্রসর হ'য়ে তাকে কৃপা করি। জন্মে জন্মে দেহ ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্যই হ'চ্ছে তাকে আমার প্রতি অনুরক্ত করা। তার জীব পরিক্রমায় আমাকে সে চাইবেই একদিন না একদিন। দেহ ধারণের স্থূল বিলাসের বশবর্ত্তি হ'য়ে জীবগণ আমাকে ভুলে থাকে। যদি কোনও মুহূর্ত্তে তার আত্ম-জিজ্ঞাসা জাগে তখনই সে আমার প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়ে ও অমনি আমি এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করি। তারপর থেকে সে আস্তে আস্তে আমার প্রতি গভীর ভাবে একনিষ্ঠ হয় ও সময়ে আমার সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে যায়। তোমার ত' আমার প্রতি উন্মেষ হ'য়েছে চতুর্থ জন্ম পূর্ব্বে। সেই পূর্ব্ব জন্ম সকলের সাধন তোমাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছে। পূর্ব্ব জন্মের যে সাধন ফল তাতেই তুমি অগ্রসর হয়েছ। এ জন্মে এখন নানা ভাবে তোমাকে আমি সাধনের দুরারোহ পথে নিয়ে চলেছি। সাধনের যে ফল লাভের জন্যে কত মহা মহা যোগী ঋষিগণ জীবন ভোর ধ্যান, যোগ সাধন করেও এসব প্রত্যক্ষ করেন নাই তোমার জীবনে এই কয়েক বৎসরেই সে সব লাভ

হ'য়েছে। এসব তোমার গত জীবনের বা গত জন্মের সাধনলব্ধ ফলে হয়েছে ও আরও কত অলৌকিক অবস্থা তোমার হবে। এখন তোমার সবিকল্প সাধন হ'চ্ছে। সবিকল্প সাধন ত' তোমাকে বলেছি যে আত্ম সমাহিত অবস্থা। আত্ম দর্শন, আত্ম মগ্নতা। অর্থাৎ নিজ আত্মার গভীরে প্রবেশ। এই অবস্থায় এক আত্মদর্শন ভিন্ন অন্য সব দর্শন সাধনের বিঘ্ন। এই সাধনে একযোগে একনিষ্ঠ হ'য়ে পূর্ণ একাগ্র হ'য়ে আত্ম মগ্নতা লাভ করতে হবে। নিজ আত্মার ভিতরে সম্পূর্ণ মগ্ন হ'য়ে তাকে দর্শন করতে হবে, জানতে হবে, ও তার সঙ্গে পরিপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। এই আত্ম মগ্নতা বা আত্ম গভীরে প্রবেশ করবার সাধনে যদি অন্য সব দর্শন আসে এমন কি আমার দর্শনও যদি আসে তাও অভিপ্রেত নয়। কারণ তাতে একনিষ্ঠ হওয়া যায় না ও সাধনে বিঘ্ন হয়। দশখানা সিড়িকে উপেক্ষা করে যদি সর্ব্বোচ্চ সিড়িতে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা কর তবে হয়ত চোট্ খাবে বা প'ড়ে গিয়ে হাত, পা ভেঙ্গে যাবে। একটা একটা করে সিড়ি দেখে দেখে ধাপে ধাপে যদি উঠ তবে সর্ব্বোচ্চ সিড়িতে উঠে আনন্দ ও বিশ্রাম পাবে। এখন তোমার আত্মসাধন চলছে তাই তেমন কোনও বাণী শুনবে না বা অন্য কোনও দর্শন পাবে না। শুধু আত্মাকে দেখবে। তার গভীরে প্রবেশ করবে, তাকে উপলব্ধি করবে, তাতে সম্পূর্ণ মগ্ন হবে। একে বলে গভীর সাধন। এই গভীর সাধন পূর্ণ হ'লে ধীরে ধীরে গভীরতম সাধন অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সাধনের দিকে অগ্রসর হবে ওই আত্মার ভিতর দিয়ে। গভীরতমের ভিতরে প্রবেশ করতে হ'লে গভীরের ভিতর দিয়েই প্রবেশ করতে হবে। তুমি যে মনে করছ আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি সেটা ভুল। তোমাকে নানা সাধনায় ও উপযুক্ত পথে নিয়ে যাবার জন্যেই এই ভাবে সাধন পথে নিয়ে চলেছি। তোমার জীবনে যা হ'চ্ছে ও হবে জানবে নিশ্চিত ভাবে যে আমিই তোমাকে সকল সাধন স্তরে শিক্ষা দিয়ে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে নিয়ে চলেছি। আমার উপর সকল সমর্পন কর। আমার হাতে তোমার

সকল ভার আছে। আমার নিজ কার্য্য সিদ্ধির জন্যই তোমাকে প্রয়োজন ও সেই প্রয়োজনের জন্যে যা যা করা দরকার সব আমিই করছি ও করব এই বিশ্বাস দৃঢ়তম কর ও আর কখনও ভুলে যেও না এ কথা। মনে রাখবে তোমার সকল ভার আমার উপর। আমার কার্য্য তোমাকে সফল করতেই হবে। নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে মানব কুলকে রক্ষা করাই আমার একমাত্র কার্য্য এখন ও সে কার্য্য তোমার দ্বারাই সফল হবে বিশ্বাস কর ও আরও তীব্র সাধন কর। অগ্রসর হও, আমার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পন কর। কোনও চিন্তা নাই, অচীরে তুমি সফল হবে ও আমার জয় সুনিশ্চিত জানবে।'

জয় মা জ্ঞানদায়িনী জননী, মা দুর্গা মা আমার।

২৬শে মার্চ্চ, ১৯৫৯ খৃঃ. কলিকাতা।

আজ সকালে অভ্যাস মত প্রায় ৪৷৷০ টায় ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে। উঠে মুখ চোখ ধুয়ে আবার বিছানায় ফিরে এলাম। কেবল মনে হ'চ্ছে কে যেন একজন আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—। আসন নিয়ে ধ্যান-যোগে বসলাম। বসবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি একজন বৃদ্ধ লম্বা, দোহাড়া গড়ণ, চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা, লম্বা দাড়ি, গায়ে একটা ছাই রংয়ের চাদর জড়ানো, পায়ে খড়ম। আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, 'আমি প্রতাপচন্দ্র। সকলের কাছে ত' আসতে পারি না। তোমার কাছে এসেছি দু' একটা কথা বলব বলে। আমার গৃহে আমার স্মৃতিসৌধ উঠছে। এই স্মৃতিসৌধের জন্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে শনিবার। নিমন্ত্রণপত্র সকলকে দেওয়া হয় নাই। নববিধান সমাজের প্রত্যেককে ত' দিতেই হবে। অধিকিন্তু সাধারণ, আদি সমাজের সকলকে, সনাতন সমাজের যাঁরা আমাদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ও যাঁরা আমাদের বিরোধী তাঁদেরকেও দেওয়া প্রয়োজন। নিমন্ত্রণপত্র দিলেই যে সকলে আসবেন তা' নয়। এ হ'ল

নববিধান আদর্শ। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করব একনিষ্ঠ হ'য়ে। নববিধান সাধন বড় সূক্ষ্ম সাধন। আমার নিজস্ব কোনও ব্যক্তিত্ব নাই। আমি নববিধানে অনুপ্রাণিত। নববিধান ছাড়া আমার অস্তিত্ব নাই। নববিধান মানব ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে সামান্যতম ক্ষুদ্রতা থাকলে এ-ধর্ম্ম সাধন হবে না। পৃথিবীতে থাকতে এ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেটুকু বুঝেছি এখানে এসে দেখছি তাঁর সহস্রগুন। সকল সাধু ভক্তগণ এই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত। সকলেই এই ধর্ম্মে ধার্ম্মিক। এই ধর্ম্মের কোনও গণ্ডি নাই। এ পূর্ণ প্রেম-ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে কোনও প্রকার ক্ষুদ্রতা নাই। সতীকে বলবে (শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়) এখনও সময় আছে। সবাইকে যেন পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করা হয়। স্থানের জন্যে কোনও চিন্তা করো না। সকলে আসবে না। কিন্তু নিমন্ত্রণপত্র পাওয়াতে যে অন্তরের যোগ হবে প্রত্যেকের তাতেই নববিধান আদর্শের পূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। অন্তরের যোগই একমাত্র সত্যিকারের যোগ ও এই যোগেই নববিধান আদর্শের উদ্‌যাপন হবে। কাউকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করবে না। তবেই নববিধান সাধন হবে। আজকেই এ কথা সতীকে বলবে। এখন আমি চললাম।'

এ এক আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা। মা যে আমাকে কিভাবে কোন দিক দিয়ে সাধনে অগ্রসর করাচ্ছেন কিছুই বোধগম্য হ'চ্ছে না। জয় মা আনন্দময়ী। জয় নববিধান। জয় নববিধান জননীর জয়। জয় জয় জয় মা মা মা।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কিছু দিন হোল আত্মার গভীরে যোগ হ'চ্ছে। চোখ বুঝলেই ভ্রূ যুগলের মাঝখানে তীব্রভাবে দপ্ দপ্ করে ও আমাকে কোন অজানা উর্দ্ধলোকে নিয়ে যায় একটা আলোকের রাজ্যের ভিতর দিয়ে। গিয়ে একটা আলোক মণ্ডলের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। সামনে প্রভাত সূর্য্যের

মত স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ এক গোলাকার জ্যোতিষ্মান পদার্থ আমার সামনে উদ্‌ভাসিত হয়। মা বলেছেন, 'এই তোমার আত্মা ও এই জীবাত্মা। এর সাধন পূর্ণরূপে করতে হবে। এর সাধন করতে করতে এমন অবস্থা হবে যে ওই গোলাকার পদার্থ একেবারে তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে নিত্য যোগযুক্ত হ'য়ে যাবে। এই ভাবে সাধনে অগ্রসর হও। এখন তোমায় আত্মসাধন অবস্থা। এই সাধন বেশ-কিছুদিন চলবে। সময়মত আমার নির্দ্দেশ পাবে।' আশ্চর্য্য, আগে যেমন নানা অলৌকিক দৃশ্য, স্বর্গের অনেক স্তরে আত্মাদের সঙ্গে আলাপ হ'ত এখন সেগুলো অত্যন্ত কমে গেছে। হয় কিন্তু অতি কম। ধ্যানে মাতৃ দর্শনও হয় না। আগে যে অনেক উচ্চ জ্ঞানের কথা মা বলতেন সে সবও বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। এ যেন এক মহা একাগ্রতায় আমাকে নিয়ে—চলেছেন। এই আত্ম-সাধনের অভিজ্ঞতা অতি বিচিত্র। শঙ্করাচার্য্য বললেন

"মনশ্চক্ষুরাদিবিযুক্ত স্বয়ম যো,
মনশ্চক্ষুরাদে মনশ্চক্ষুরাদি.
মনশ্চক্ষুরাদিরগম্য স্বরূপ—
স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপঃ হমাত্মা॥"

এই শ্লোকের সত্যতা আমি আজ নিত্য উপলব্ধি করছি। নিজেকে স্বরূপাস্থ করতে হবে তবে নিত্য উপলব্ধির দ্বারা আত্মাকে দর্শন করা যায়। এই জীবাত্মা মহাশক্তিধর ও ইঁহারই মাধ্যমে পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। আত্ম সাধন না হ'লে পরমাত্মার সাধন হয় না। এই হোল প্রকৃষ্ট রাস্তা ব্রহ্ম সাধনার—। আত্মাকে উপলব্ধির দ্বারা জানতে হবে। শুধু জানলেই হবে না। তাকে নিত্য দর্শন করতে হবে। তার গভীরে প্রবেশ করে আত্ম সাধনে পূর্ণ সিদ্ধ হ'তে হবে। এ সাধন এমন স্বাভাবিক যে ঠিক ধারা মত স্বভাবের গতিতে অগ্রসর হ'লে সাধক মাতৃ কৃপায় ধীরে ধীরে আত্মদর্শনের ভাগ্য লাভ করেন। আত্মদর্শন হ'লেই বুঝতে হবে তার

জীবনে আত্মার দর্শন সাধন করতে হবে। এই সাধনের গতি অতি ধীর। তাড়াতাড়ি করলে চলবে না। তবে সব সাধনেই জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি না থাকলে অগ্রসর হওয়া যায় না। তারপর আবার প্রত্যেকের বিভিন্ন ভাগ্যচক্র আছে যেটা তার স্বভাব বা তার নিয়তি। এই নিয়তি তাকে অনেক সময় সাহায্যও করে আবার ক্ষতিও করে। প্রত্যেক জীবের জীবন আলেখ্য এত বিচিত্র ও mystic যে সে নিজেই বুঝতে পারে না কোন পথ উপযুক্ত? সেই জন্যে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন সাধনের পথে যেতে গেলে। শিক্ষক যদি উচ্চ মার্গের ও পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞ না হন তবে ছাত্রের সাধন ধারা ঠিক তার স্বভাবের বা নিয়তির পথে না গিয়ে উলটা পথে চালিত হ'য়ে পড়ে। তাতে ছাত্রের জীবজন্ম পরিক্রমা অনেক লম্বিত হয় ও তাকে আবার ঠিক পথে আসতে অনেক জন্ম ও অনেক বেগ পেতে হয়। এ অবস্থায় শিক্ষকও অন্যায় করেন ও তার জন্যে শিক্ষকের সাধন ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে পড়ে ও তিনি ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়েন পরজন্মে। এই ভাবে যে কত গুরু ও কত শিষ্য নিয়তির পাঁকে ঘুরছেন তার কি অন্ত আছে। আগের জন্মে খুব সাধন করেছেন পর জন্মে শুধু ভোগের ভিতরে কাটিয়ে দিলেন। ভোগে থাকায় নানা ত্রুটি হ'ল ও সেই কর্ম্মফল ভোগ করার জন্যে দুস্থ অবস্থায় জন্ম নিতে হ'ল। এই ভাবে যে কত কোটি কোটি মানব আত্মা বিচিত্র ধাঁধাঁয় ঘুরে মরছে তার অন্ত নাই। উপযুক্ত পরিবেশে উপযুক্ত জ্ঞান বা ভক্তি বা দিব্যজ্ঞান যদি পেয়ে গেল তবে বেঁচে গেল ও ঠিক পথ ধরল। না হ'লে বড়ই ঘুরতে হয় যে।

মাগো তুমি আমার গুরু। তুমি আমার সব। জয় মা।

১৩ই মে, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ লেকে বেড়াতে বেড়াতে মা বললেন, 'সাধনে বহিঃপ্রকাশ যত কমবে ততই সাধন গভীর হবে ও সফল হবে—। তোমার নিকটতম ব্যক্তিও যেন না বুঝতে পারে যে তুমি সাধন করছ। সাধারণতঃ

সাধন আরম্ভ হ'লেই সাধকের মনে শ্লাঘার উদয় হয়। সে নিজেকে যেমন সাধক মনে করে তেমনি সে চায় লোকে তাকে চিন্মুক সাধক বা ভক্ত বলে। নানা ভাবে সে প্রকাশ করতে চায়, লোককে জানাতে চায় যে সে সাধক। গৈরীক ধারণ করে, মালা, চন্দন, তিলক, ফোঁটা নামাবলি ইত্যাদি ধারণ করে। সন্ন্যাসী জটা, কমণ্ডুল ধারণ করে। কেউ কেউ শাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ উচ্চরবে পাঠ করে, উচ্চস্বরে জপ করে ও নানা ভাবে সকলকে জানাতে চেষ্টা করে যে সে সাধন করছে। এ সকল হ'চ্ছে সাধন স্তরের প্রথম অবস্থায় মোহ সাধন—। তারপর অতি ধীরে যত সাধনে অগ্রসর হয় ততই মোহ-সাধন ভাঙতে থাকে ও আত্মিক সাধন আরম্ভ হয়। আত্মিক সাধন পূর্ণ হ'লে আন্তর সাধন আরম্ভ হয়। এই মোহ সাধনের স্তরে যদি সাধক নানা প্রকার বহি-প্রকাশের ভিতরে প'ড়ে যায় তবে আর সে গভীর সাধনে (আত্মিক ও আন্তর সাধন) অগ্রসর হ'তে পারে না। কূর্ম্ম যেমন নির্জ্জনে চলবার সময় আপন নিজস্ব ভাবে চলে কিন্তু লোক সংস্পর্শে এলে সে তার আপনার দেহপ্রাকারের ভিতরে প্রবেশ করে, তেমনি সাধক নির্জ্জনে আপনাকে পূর্ণরূপে খুলে দেবে আমার মননে। কিন্তু লোক সংস্পর্শে এলে এমন ভাবে চলবে যেন একটি লোকও বুঝতে বা জানতে না পারে যে তিনি সাধন করছেন। এর কারণ হ'চ্ছে এই যে, বর্হিপ্রকাশে মনে অহঙ্কার আসে ও তাতে সাধনে সমূহ ক্ষতি হয়। সাধন অর্থাৎ প্রথম মোহ সাধন যখন ধীরে ধীরে উর্দ্ধগতি লাভ করবে নিজ গভীরতায় তখন অতি ধীরে আসবে আত্ম-মগ্নতা, আত্ম-বিচার, আত্ম-বিশ্লেষণ, আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-চিন্তা, আত্ম-জিজ্ঞাসা, আত্ম-অনুধাবন, আত্ম-দৃষ্টি, আত্ম-দর্শন, ও আত্ম-সাক্ষাৎকার। এই আত্ম-সাক্ষাৎকারের ভিতরে ক্রমে প্রবেশ করা ও গভীর ভাবে এই সাক্ষাৎকার সাধন জীবনে পূর্ণরূপে রক্ষা করাই আন্তর সাধনের অবস্থা। এ অবস্থায় সাধক নিজেই কূর্ম্মের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তার ভিতরে বাহিরে শান্ত সমাহিত অবস্থা আসে।

কোনওরূপ বহিঃপ্রকাশ সে আকাঙ্খা করে না। **বাহিরে 'সাধারণ ও ভিতরে অসাধারণ'** অবস্থাই-সাধনের সূচনা।'

জয় মা আনন্দময়ী জ্ঞানদায়িনী জননী আমার।

৮ই জুন, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

অনেক দিন পরে আজ মাকে বললাম, আজ কিছু জ্ঞানের কথা বল মা। মা বললেন 'তোমার জীবনে নির্বিশেষ অবস্থার পরিবর্ত্তন হোক্। নির্বিশেষ অবস্থা হ'ল অভেদ অবস্থা। জীব-জীবনে নির্বিশেষ অবস্থা হ'ল, **'জন্ম, যৌন সংস্কার ও মৃত্যু।'** আমি পরাপ্রকৃতি, মাতৃসমা মহামাতৃকা। আমি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম মহত্তম সূক্ষ্ম আবার মহাস্থূল। আমার ইচ্ছামাত্র সবকিছু সঙ্ঘটিত হ'চ্ছে। আমার ইচ্ছায় জীবাত্মার জন্ম সেই জীবের কারণ স্বরূপ আত্মা। এই আত্মা শুধু স্পন্দন ও এই স্পন্দনে উদ্ভূত যে আলোক তাতেই আত্মা সাধকের নিকট দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্পন্দনরূপ আলোকাত্মার কোনও এক আধারে আরোহণ করে ঝঙ্কার তুলবার আকাঙ্খা জাগে। স্থূলদেহ অধিকার না হ'লে ঝঙ্কার উঠে না। তাই জীবদেহ ধারণ। জীবপরিক্রমায় এই ঝঙ্কাররূপ সংস্কার এক জন্ম থেকে অন্য জন্মের ভিতর দিয়ে বহু জন্মান্তরের গণ্ডি পার হ'য়ে ঝঙ্কাররূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে সংস্কার সঞ্চয় ক'রে অগ্রসর হয়। মৎস জীবনের যে ঝঙ্কাররূপ সংস্কার সে ঝঙ্কার মৎসজীবনেই পর্য্যবসিত থাকে। কিন্তু মৎস জন্ম পার হ'য়ে আরও উন্নততর জন্মে জন্ম হলেই মৎসরূপ ঝঙ্কারের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন ক'রে সংস্কার সঞ্চয় করে। এমনি ক'রে জীব প্রত্যেক জন্মের সংস্কাররূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে মহাঅভিজ্ঞ মানব জন্ম লাভ করে। মানব প্রত্যেক জন্মে আবার জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। শিশু থেকে বালক, বালক থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে প্রৌঢ়, প্রৌড থেকে বৃদ্ধ। এ তার জন্মান্তর বা জীবনের ঝঙ্কাররূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে নিয়ত সংস্কার সঞ্চয় করে অগ্রসর হওয়া। এক জীবনের সংস্কার পরবর্ত্তি জীবনের পর্য্যায়কে উন্নততর করে। আত্মার স্পন্দনরূপ আলোককে ক্রমে উদ্ভাসিত করে ও

মানবাত্মা শেষে মহাআলোকের উদ্দেশ্যে ধাবিত হয় ও সেই আলোকের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়।

মৃত্যু হোল দ্বার। প্রত্যেক অবস্থার পর উন্নততর অবস্থায় আসার অর্থই হ'ল আগের অবস্থার মৃত্যু। মৃত্যুই জীবজীবনের মহামঙ্গল স্বরূপ। জীবজীবনে মৃত্যুর চাইতে আর মঙ্গলকর কিছুই নাই। শিশু অবস্থা থেকে বালক অবস্থা শিশুত্বের মৃত্যু। এই শিশুত্বের মৃত্যু হ'লেই শিশুজন্মে ঝঙ্কাররূপ অভিজ্ঞতাই—সংস্কার সঞ্চয় করায়। সেই অভিজ্ঞতা বৃদ্ধের জীবনেও আছে। যদিও বৃদ্ধের শিশুত্ব বিলুপ্ত। কিন্তু তার জীবনে শিশুত্বের অভিজ্ঞতা এক দৃঢ় সংস্কার সৃষ্টি করে রেখেছে। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর আবার শিশু হ'য়ে জন্মগ্রহণ। পূর্ব্ব জন্মের গভীর অভিজ্ঞতারূপ সংস্কার পর জন্মে শিশু অবস্থাতেই প্রকাশমান হয়। তার নিজ সংস্কার নিয়েই সে নিজ জন্মপ্রবাহে বাহিত হয়।

এই দুয়ের মাঝে আছে যৌন সংস্কার। মাতৃ যোনি আর পিতৃ দ্বার—। জীবজন্মে এর গতি অতি স্বাভাবিক। এই যৌন সংস্কার নিজ গতি ছন্দে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে জীবনের ধারাকে লীলায়িত করে। এ এক গভীর আকর্ষণ জীবজীবনে আমি দিয়েছি। এই আকর্ষণ জন্ম দিচ্ছে, জীবনের প্রসারতা দিয়েছে আর স্থূলকায়ীদের নিকট মৃত্যুর ভীষণতাকে শান্ত করছে। জন্মের গতিই যৌন সংস্কারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। এই যৌন সংস্কার নারী পুরুষের সঙ্গম স্পৃহাই নয়। এই যৌন সংস্কার, শিশু অবস্থা থেকে বৃদ্ধ অবস্থা পর্য্যন্ত জীবনকে রক্ষা করবার যে স্পৃহা, দেহকে সুস্থ রাখবার যে আগ্রহ। এককথায় নিজ শরীরের প্রতি প্রখর দৃষ্টি বা নিজ দেহকে প্রিয়তম বলে ভালবাসাই যৌন-সংস্কার। এই যে নিজ দেহের প্রতি অপার দৃষ্টি বা নিজ দেহকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসা এই যৌন-সংস্কার। এই যে এয়ী এরা প্রতি জীবনে অভেদ। মানব জীবনে এরা ক্রমোন্নতি লাভ করে জন্ম, মৃত্যু ও যৌন সংস্কারকে জয় করে আত্মদৃষ্ট বা সংস্কারমুক্ত, অথবা জীবজীবনের সকল সংস্কাররূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে তার ভিত্তিতে আত্ম প্রতিষ্ঠিত ক'রে মহাপ্রকৃতির আলোকের দিকে

অগ্রসর হয়। এ অবস্থায় মানবের দেহ অটুট স্বাস্থ্যযুক্ত, মন অমিতবলশালী ও আত্মা মহাঐশ্বর্য্যবান্ হয়। এই সাধনই তোমাকে এবার শেখাচ্ছি। তোমার এই জীবনের জন্মান্তররূপ সংস্কার, যৌন-অভিজ্ঞতারূপ সংস্কার এবং বিগত জীবনের পরিত্যক্ত বা মৃত অবস্থার সংস্কার এ সবের দ্বারা তোমার যে দৃষ্টির স্ফুরণ হ'য়েছে সেই দৃষ্টির দ্বারা ওই সকল সংস্কারকে অবলোকন কর। উর্দ্ধে উঠলে যেমন নীচের বস্তু সকল ক্ষুদ্র মনে হয়, তোমার জীবনে উর্দ্ধগতিতে এই সকল সংস্কার ক্ষুদ্র বলে প্রতিয়মান হোক্। তোমার গতি এখন কারণরূপ আলোকাত্মার দিকে। এ সাধন তোমাকে দিয়ে করাচ্ছি যাতে তুমি এতে সার্থক হও। তার জন্যেই তোমাকে বললাম তোমার জীবনে নির্ব্বিশেষ অবস্থার পরিবর্ত্তন হোক। এই এয়ী অভেদ কতক্ষণ যতক্ষণ জীবজীবন সংস্কারযুক্ত ও এই সংস্কারযুক্ত জীবজীবন বহু লম্বিত ও গভীরতম জটিলতার আশ্রয়। সংস্কার মুক্ত হওয়া জীবের কঠিন সাধন সাপেক্ষ। উপযুক্ত সাধন ও গভীরতম যোগ ও ধ্যান ব্যতিত কারণরূপ আত্মার দর্শন হয় না। আর কারণরূপ আলোকাত্মার দর্শন না হ'লে প্রকৃত ব্রহ্ম-সাধন বা সংস্কার মুক্ত সাধন হয় না। আত্মদর্শনেই সংস্কার মুক্তি হয় ও সংস্কার মুক্ত হ'লেই ব্রহ্ম-দর্শনের সাধন ও পরমার্থ লাভ। সেই জন্যেই তোমাকে আজ এই কথা বলেছি। তোমার জীবনে যে কঠিন সমস্যার উদয় হ'য়েছে এ তোমার কঠিনতম পরীক্ষা। কোনও চিন্তা নাই। আমার নিজ কার্য্যে তোমাকে নিয়ে চলেছি। তুমি অগ্রসর হও। সকল অভাব আমিই বিদূরিত করব। অর্থ বিত্ত সব পাবে।'

জয় মা মা মা আমার মাগো—আমায় ক্ষমা কর মা।

২১শে জুন, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে ধ্যানে বসে যোগে আত্ম-দর্শন হ'ল। প্রায় তিন চার মাস হ'ল মা আমাকে আত্ম-দর্শনের সাধন শেখাচ্ছেন। আত্ম-দর্শন বা সবিকল্প সাধন বা গভীরের সাধন। এই সাধনে সম্পূর্ণ সিদ্ধ বা একাত্ম না হ'লে আন্তর সাধনা বা ব্রহ্ম-সাধনা বা নির্ব্বিকল্প সাধনা আরম্ভ হবেনা। প্রায় মাস খানেক

হ'ল ধ্যানে বসলেই গভীর যোগ হয় ও কখনও প্রজ্ঞাচক্রের আর কখনও ব্রহ্ম-কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে এক আলেক বর্ত্তিকা ধীরে ধীরে উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে উঠে যায়। বহু উর্দ্ধে মহাআলোকের দর্শন লাভ হয়। কখনও কপালের উর্দ্ধভাগে দুইএকবার তীব্র বিদ্যুতশিখার মত আলোক শিখা ২।১ সেকেণ্ডের মত এসে আবার চলে যায়। মন সমাহিত হয় ও স্থির দৃষ্টি লাভ করে। এক মহা একাগ্রতায় দৃষ্টিকে মহাউর্দ্ধে আলোকের পারাবারে কত অলৌকিক দৃশ্যপট একের পর এক অবলোকন করায়। প্রথমে কিছুদিন পূর্ণ চন্দ্রের মত একটি গোলাকার চন্দ্র প্রতিভাত হত। এ চন্দ্র যেন দূরে বহু দূরে নভোমণ্ডলে স্থির হ'য়ে আছে। এই হ'ল ব্রহ্ম চন্দ্র বা ব্রহ্মলোক বা অখণ্ড মণ্ডলাকারং। এর একটি বৈশিষ্ঠ আছে। এ চন্দ্র যেন সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত ও এর আলোক যেন সকল ব্রহ্মাণ্ডের উপর পতিত হ'চ্ছে। এক মহা অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় এর আলোক। কাল রাত্রে ধ্যানে বসে গভীর যোগ হ'ল। প্রজ্ঞাচক্রে দিব্যদৃষ্টি উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধে উঠে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ চলবার পর হঠাৎ দেখি একটি গোলাকার জলীয় বর্ণের পদার্থ আমার ও সেই চন্দ্রের মাঝখানে একবার আমার দিকে আসছে একবার চন্দ্রের দিকে যাচ্ছে। এ পদার্থটি অনেকটা বুদবুদের মতন দেখতে। আমরা ছোটবেলায় চাঁদা গাছের ডালের রস দিয়ে বুদবুদ ওড়াতাম। বেশ বড় গোলাকার বুদবুদের সমান এই বুদবুদটি। এর আগে প্রথম আত্মদর্শনের দিনে একটি জলীয় পদার্থের মতন দেখেছি। তার পর একটি সূক্ষ্ম গৈরীক দেহের মাথায় আলোক মণ্ডল দেখেছি। কিন্তু কালকে যা দেখলাম সে যেন সেই বুদবুদ বেশ আলোক ধারণ করেছে ও পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় যদিও জলীও বর্ণ। এ এক অভূতপূর্ব্ব দর্শন। এই প্রকৃতরূপে আত্মার দর্শন। মা বললেন, 'এই আত্মাকেই এখন থেকে ক্রমে ক্রমে দর্শন করতে করতে এই আত্মাতেই পূর্ণ নিমগ্ন হ'য়ে যেতে হবে। এই আত্মাতে নিমগ্ন হ'লে ওই যে মণ্ডলাকার চন্দ্র দেখছ ওই দিকে ধাবিত হ'তে হবে ও ওই সাধন ক্রমে ক্রমে করতে হবে।'

একটা জিনিষ এখানে বলে রাখছি। ধ্যানে বসলে' মন নিবিষ্ট হ'লে প্রজ্ঞাচক্র ভীষণ বেগে ঘুর্নিত হ'তে থাকে। Aeroplane এর Propeller যেমন ঘুরতে থাকে ঠিক তেমনি মস্তকের সামনে কি একটি অতি সূক্ষ্ম পদার্থ ভীষণ বেগে ঘুরতে থাকে। সেই পদার্থই আমাকে বহুবেগে উর্দ্ধে নিয়ে যায়। যেন একটা Aeroplane এ তীব্র বেগে চলেছি মহাউর্দ্ধে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি Aeroplane এ উঠি নাই। এই উর্দ্ধ ঠিক Perpendicular নয়। এটা যেন 45° দিয়ে চলেছি। আরও বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। কিন্তু সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে লিখে না রাখলে পরে বিষদভাবে লেখা যায় না। ধ্যান যোগের এ এক অপূর্ব্ব অবস্থা ও অভিজ্ঞতা। আমার প্রকৃত সাধন এখনও আরম্ভ হয় নাই। কারণ আত্মদর্শনে পূর্ণ সিদ্ধ হ'লে, রিপু সমিত হয় ও অতি শান্ত ও স্থিত অবস্থা হয়। আমার এখনও সেটা হয় নাই—। রিপু সব চঞ্চল ও নানা বৈষয়িক চিন্তায় সাধনকে জটিল করে দেয়। তবে মা বলছেন, 'সব আস্তে আস্তে যাবে। জপ—গায়ত্রী জপ যখন সময় পাই অর্থাৎ যখন মনে পড়ে তখনই করি—স্থান অস্থান নাই। চলেছি শুধু মাতৃকৃপা সম্বল করে আর মার হাত ধরে। আমার কোনও যোগ্যতা নাই—। আছে আমার মার শিক্ষা তাঁর যোগ্যতা ও তাঁর করুণা।

আমার মা আমায় করুণা কর—। মা আমায় রক্ষা কর মা। আমার করুণাময়ী জননী। মা মা মাগো।

২২শে জুন, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কিছুদিন হ'ল মাতৃভুমি ও আমার জন্মস্থান টাঙ্গাইল আমাকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করছে। বালক ও কিশোর কালের সকল মনোরম পরিবেশ, পিতা-মাতার, ভ্রাতাভগ্নিদের স্নেহের ধারা, বন্ধু বান্ধবদের আনাবিল সখ্যতা সব যেন আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলছে। এখনকার এই জীবন একেবারে মূল্যহীন হ'য়ে পড়ছে। একটা অধীর আগ্রহে যেন আমাকে সেই পরম প্রিয় অতীতে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। প্রত্যেক জন্মেই বাল্য ও কৈশোরই

হ'চ্ছে প্রিয়তম সময়। আমার মনে হ'চ্ছে কত জন্ম কত গ্রামের পরিবেশে শান্ত স্নিগ্ধ শ্যামলীমায় বিচরণ করেছি। গ্রাম্য পরিবেশে ফিরে যেতে মন প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠছে। কেন হ'য়েছে জানি না। কিছুদিন আগে মা বলছেন, **'পাকিস্থান থাকবে না। একটা ঘোরতর বিপ্লবের ভিতর দিয়ে দ্বিখণ্ডিত ভারত আবার এক হয়ে যাবে। হিন্দুমহাসভা ভারতের রাজনীতিতে আসন গ্রহণ করবে। পরিবেশের আমূল পরিবর্ত্তন হবে।"** আমরা যারা আজ গৃহহারা হ'য়েছি আবার আমরা আমাদের গৃহে যাব। আবার এক শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হবে। টাঙ্গাইলের কালীবাড়ী একটি সিদ্ধপিঠ। এখানে মাকে আমি দুই দুই বার দর্শন করেছি এখান থেকে। পাকিস্তানে মুসলমান ভাইদের মনে একটা মহাপরিবর্ত্তন আসবে। তারা স্বৈরাচারী শাসনকে আর বিবেকের অনুশাসনে মেনে নিতে পারবে না। শাসক ও জনসাধারণের ভিতরে—একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে। এই অবস্থায় জনসাধারণ ভারতের পুনর্মিলনই আকাঙ্খা করবে—।

জয় মা আনন্দময়ী ভারত জননীর জয়—জয় জয় জয়—।

১লা জুলাই, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল চক্র ব'য়ে যায় শূলপাণী ফিরিছে সর্ব্বদা
ত্রিদিবে মন্থন করি' ফুকারিছে আপন বারতা:—
"দাও তব প্রেম মন্ত্র আপনার প্রাণ,
অজ্ঞানেরে জ্ঞান দাও, দুস্থে ধন দান।
প্রীতিরে আশ্রয় কর, মূর্খে দাও ভাষা,
রিক্ত জাতিরে দাও স্বাধীনতা আশা।
বিত্ত সুখ নহে তব, নহ তুমি তার,—
জাগিয়া চাহিয়া দেখ কাল পারাবার,
স্বার্থ, সুখ যাহা কিছু নিয়ে গেছে মুছে
কে তারে আঁকরি এই ধরণীতে আছে?"

জন্মে জন্মে তুমি আমি, আমি আর তুমি,
ফিরিয়াছি ধরণীতে এই ধুলা চুমি,
ধূলারে বেসেছি ভাল, ধূলা হ'য়ে গেছি,
আপনার কথা শুধু আপনি শুনেছি।
চাহি নাই আপনার স্বার্থ দিতে বলি'
আপনারে ছলিয়াছি ছলনাতে ভুলি।
কি পেয়েছি, কি নিয়েছি কোথা মোর স্থান,
কেহ কি চাহে গো মোর ক্ষুদ্র এ পরাণ?
আমি রিক্ত, নিঃস্ব আমি আপনারে করেছি বঞ্চণা,
ফিরেছি নিজের লাগি পেয়েছি লাঞ্ছনা।
হেথা মোর নাই কোনও ঠাঁই,
মোর বাঁশী হেথা নাহি বাজে,
মহামানবের মাঝে তাই মোরে খুঁজে নাহি পাই—।
মিথ্যা তর্ক যুক্তিজালে ভাসায়েছি সত্য নিত্য ধন,
কাঞ্চন ফেলিয়া কাঁচে ভেবেছি রতন।
সেবারে দেখেছি নিত্য দাসত্ব মুকুরে
প্রেম, দয়া ভালবাসা দুর্ব্বলের তরে।
ক্ষমাহীন দুর্ব্বাসার মূর্ত্তি জাল করি'
রুদ্রের বাসনা লয়ে মারিয়াছি অরি':—
তারা কারা?
এই ধরণীর মাঝে যারা সর্ব্বহারা;
যাহাদের গৃহ মাছে উৎসবের শঙ্খ নাহি বাজে,
নৃত্যলাস্যে রমণীর নূপুরের সাজে,
ধ্বনিয়া উঠে না যেথা; স্তব্ধ অভাবের,
ম্লান চক্ষু জ্যোতিহীন দৈন্য স্বভাবের—,

দিবস যামিনী যেথা ছেদ নাহি টানে,
ধাইয়া চলেছে নিত্য লক্ষ্যহীন নিয়তির পানে।
সেথা মোরে দেই নাই আপনারে ঢালি,
ফিরেছি নিভৃতে নিত্য হাতে লয়ে ছলনার থালি।
পূজিয়াছি আপনার ছলনার মায়ার স্বপন,
রিক্ত আমি তাই, নাহি মোর আপনার জন।
তাই মোর হেথা নাহি স্থান,
আপনার বিত্ত ধন মান,
দিয়াছি নিজেরে ঢেলে,
মানবের দেবতারে করিয়াছি নিত্য অসম্মান।

১লা জুলাই, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন, 'আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি কর। আত্ম পরিচর্য্যাই শ্রেয়তর ও শ্রেষ্ঠতর। আত্ম পরিচর্য্যার পরেই ব্রহ্ম পরিচর্য্যা হ'ল শ্রেয়তম ও শ্রেষ্ঠতম। তুমি কি? তুমিই অহং ও অহংই আত্মা। আত্মার বর্ত্তমানতাই অহং। দেহ থাকতেও অহং আর দেহের অবর্ত্তমানেও অহং। এই অহংই অহঙ্কার ও অহঙ্কারই জীব প্রতিপাদ্য। অহঙ্কার না থাকলে জীব পরিক্রমা হয় না। কিন্তু এই অহঙ্কার, সাধনের পথে শুধু 'তুমি' আর 'আমি'। জীব 'আমির' ভাবে বিভোর হ'য়ে 'তুমি' রূপ আমাতে নিবিষ্ট। আমার ও তোমার এই ভাব। 'আমি' জীবাত্মা 'তোমারই' সব এই ভাব ছাড়া আর সব ভাব সাধনকে খর্ব্ব করে। জীবের 'আত্ম-স্বরূপ' এই স্বরূপেই জীব আত্ম পরিচর্য্যা করবে। তুমিই তোমার নিজেকে দর্শন কর, আপন গভীরে প্রবেশ করে আপনার ত্রুটি বিচ্যুতি, জ্ঞান, অজ্ঞান, ভাব অভাব, ন্যায় অন্যায় উপলব্ধি কর। অহংরূপ যে আত্মার ক্রিয়াশীল জাগরণ সেই জাগরণ জ্ঞানমার্গে সঞ্চারিত ক'রে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি কর। আত্মস্বরূপ যে আমার ক্ষুদ্রতম অংশ তোমার ভিতরে ক্রিয়াশীল তাকে না জানলে ত তুমি আমাকে জানতে পারবে না।

তোমার আত্মমগ্নতার ভিতর দিয়ে আত্ম-বিচার চলবে। কি পেয়েছ, কি চাও কোনটা প্রয়োজন, কি তোমার অভাব, তোমার রূপ কি, তোমার শক্তি কি, তুমি কে, ইত্যাদি সকলের ভিতর দিয়ে আত্ম-স্বরূপকে প্রতিনিয়ত আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারা উপলব্ধি করবে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে গভীর আত্ম দৃষ্টি লাভ করবে। নিজেই নিজকে অবলোকন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দেহ যেমন দেখ এও তেমনি নিজের আত্মাকে নিজেই দেখবে ও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি সেটা জানতে চেষ্টা করবে। সূক্ষ্মের উপলব্ধি না হলে সূক্ষ্মতমকে কি করে লাভ করবে? গভীরের ভিতরে প্রবেশ না করলে কি করে গভীরতমের সন্ধান লাভ করবে? আত্ম-সাধনই স্থিরতা ও শান্ত ভাব আনয়ন করে। স্থির ও শান্তভাব না এলে ব্রহ্ম-সাধন হবে না। নিজকে চিনলেই আমাকে চিনতে পারবে। নিজের স্বরূপ জানতে পারলেই আমার স্বরূপ তোমার কাছে আয়াস সাধ্য হ'য়ে যাবে। তোমার বিচারক তুমি ও তুমিই তোমার শ্রেষ্ঠ বিচারক—। নিজেই নিজের বিচার করলে তুমি নিজকে পূর্ণরূপে জানতে পারবে এবং কোথায় তোমার ত্রুটি আছে সেও তোমার কাছে পূর্ণ রূপে ধরা পড়বে। এই শ্রেষ্ঠ পথ। ব্রহ্ম-উপলব্ধি সোজা কখন যখন আত্ম-উপলব্ধি তোমার করতলগত। আত্মোপলব্ধি পূর্ণ না হ'লে ব্রহ্ম উপলব্ধি হয় না। আত্মার গভীরের পথই ব্রহ্মের পথে নিয়ে যায়। কত সাধক কতপ্রকার সাধন মার্গে ব্যস্ত। কিন্তু পূর্ণ আত্ম সাধন ব্যতীত ব্রহ্ম-সাধন ও আমার কৃপা লাভ হয় না। জন্মান্তর ঘূর্ণিত হ'তে হয়। এইজন্যেই তোমাকে বলেছি আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি কর। তোমার সেই সাধনই এখন হ'চ্ছে। অতি ধীরে শান্ত সমাহিত অবস্থায় আত্ম-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি কর ও অতি ধীরে অগ্রসর হও। বাক্য সংযম রিপু সংযম, চিন্তা, জিহ্বা, দৃষ্টি, শ্রবণ ইত্যাদি সংযম করে এদের ক্রমে এক যোগ করে আত্ম-মগ্নতা লাভ কর। যোগধ্যানে আরও নিবিষ্ট হও, জপের মাত্রা আরও বাড়াও। জপের ভিতরে মগ্নতাকে আনয়ণ কর। এমনি করে অগ্রসর হও। আমি তোমাকে নিয়ে চলেছি এই বিশ্বাস দৃঢ়তম কর। কোনও ভয়

নাই। নির্ভয়ে অগ্রসর হও।'

জয় জয় জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার।

৩রা জুলাই ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "প্রসববেদনার যে দুঃখ সে কি জননীর কাছে দুঃখ? সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর তার মুখদর্শন করে জননীর যে আনন্দ হয় সে আনন্দ প্রসব বেদনার দুঃখ ছিল বলেই। তখন জননী প্রসব বেদনার দুঃখকে আশীর্ব্বাদ করেন ও সেই দুঃখকে মহাসুখ বলে গণ্য করেন। সুতরাং আমাকে পাবার জন্যে যে জীব পরিক্রমা রূপ দুঃখ সেকি তুমি দুঃখ বলে মনে করবে? কারণ তুমি আজ জাননা যে আমাকে প্রাপ্ত হ'লে তোমার এই জীব পরিক্রমায় শতকোটি দুঃখ, দুঃখ বলেই মনে হবে না। সব মহাসুখ ও মহাআনন্দের ধারা বলে মনে হবে। সুতরাং জীব জীবনে আপাতদৃষ্ট দুঃখ, দুঃখই নয় পরম সুখের আকর ও আমাকে পাবার শ্রেষ্ঠ পথ। এই তো তোমাদের প্রসব বেদনা। আমার মুখ দেখলেই এ বেদনাকে তোমরাই আশীর্ব্বাদ করবে ও মহাআনন্দ বলে মনে করবে। অগ্রসর হও আমি সকল জ্ঞান দান করব। কোনও ভয় নাই আমি আছি।"

জয় জয় জয় জয় জয় মা দুর্গা।

৩রা জুলাই ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

আজ সকালে লেকে মা বললেন "তোমাকে আমি যখন যা দিই বা তুমি তোমার জীবনে যখন যা পাও বা পাবে বা পেয়েছ সবই আমার দান মনে করে প্রসন্নচিত্তে সব গ্রহণ করে আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। তোমার জীবনের যে সকল প্রয়োজনবোধ বা আকাঙ্খা সকলই তোমার জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অভাবের ফল। কিন্তু সেইসব প্রয়োজন যে তোমার এক জীবনেই প্রাপ্ত হবে তার কোনও অর্থ নাই। তোমার মঙ্গলের জন্যে যে সব তোমার যে জীবনে প্রয়োজন সে সব তুমি সেই সেই জীবনে প্রাপ্ত হবে। এ হ'চ্ছে ক্রমিক গতি। তোমার মোহ সাধনে অগ্রসর হবার জন্যে বা মোহ সাধনে

সফল হবার জন্তে তোমার জন্ম-জন্মান্তরে তুমি তোমার আকাঙ্খিত বস্তু আস্তে আস্তে লাভ করবে। তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্তে যখন যা প্রয়োজন আমিই তোমাকে দেব। সুখ, দুঃখ, ভাব, অভাব, প্রেম, ভালবাসা, বিত্ত, ধন, শোক, সব কিছুই আমার দান তোমার মঙ্গলের জন্যে ও যখন যা তোমার জীবনে আসবে মনে করবে আমিই দিচ্ছি তোমারই অপার কল্যাণের জন্যে। এটা মনে রাখবে যে আমি শুধু মঙ্গলই করে থাকি। আমি তোমার অমঙ্গল কখনও করি না। দুঃখ এলেও কোনও প্রশ্ন করবে না কেন দিলাম। আবার সুখ এলেও কখনও উল্লসিত হ'য়ে আত্মহারা হবে না। জীব জীবন অপার আনন্দময়। কেন অপার আনন্দময়? কারণ আমি একমাত্র আনন্দময়। জীব যা করে সবই আনন্দের জন্যে। অতি ক্ষণিক হ'লেও আনন্দই একমাত্র উদ্দেশ্য। আনন্দ ভিন্ন আর কোনও বস্তু নাই যা জীবজীবনে প্রয়োজন। দুঃখ বলে কোনও বস্তু জীবজীবনে নাই। আজ যেটা দুঃখ বলে মনে করছ কালের গতিতে পরিবর্ত্তি জীবনে সেইটাই তোমার সুখ বলে মনে হবে ও সেই দুঃখের স্মৃতিতে তোমাকে আনন্দ দেবে। তোমার মনে হবে সেই দুঃখ এসেছিল বলেই তোমার আজ এত সুখ। তখন সেই দুঃখকে তুমি কেবল ক্ষমা করবে না অধিকিন্তু সেই দুঃখকে তুমি আশীর্ব্বাদ করবে ও তোমার অন্তরে সুখ হবে। দুঃখ কোথায়? পরিপূর্ণ আলোকে যে জীবাত্মার জন্ম, আনন্দঘন আমার সন্তান যে জীবাত্মা তার দুঃখ কোথায়? সে যে পূর্ণ আনন্দেরই ধারক ও বাহক। তাঁর নিরানন্দ নাই। 'হরিনামে' যে আনন্দ 'দুর্গানামেও সেই আনন্দ''। "গডনামে'' যে আনন্দ "খোদানামেও'' সেই আনন্দ। আনন্দময় আমি তুমিই ত আমার নামকরণ করলে'' হরি, দুর্গা, খোদা জিহোবা ইত্যাদি। কারণ তুমি আনন্দের উৎসের সন্ধানে নাম কণ্ঠে নিয়ে চলেছ। তোমার নিজ নিজ প্রয়োজনে আমার নামকরণ করে সেই আনন্দময় রক্ষা-কবচ গ্রহণ করে নির্ব্বিকার চিত্তে আনন্দের সন্ধানে অগ্রসর হচ্ছ। যে মোহ জাল, সেটা ত' আবরণ। তোমার মঙ্গলের জন্তেই সে

মোহজাল আমার সৃষ্টি। সেই মোহজাল ভেদ করে অ-মোহের দিকেই তোমার গতি। নামে তোমার চিত্ত উৎসাহিত কর, জাগ্রত হোক তোমার চির মঙ্গলময় সত্তা যে সত্তায় তুমি মহা-মঙ্গলময় আমাকে প্রাপ্ত হবার পথ খুঁজে পাবে। সুখ ও দুঃখকে লঘুপদ মনে করবে। দ্রুতপদ তোমার সুখ ও দুঃখের ওপারে। তাই বলি দ্রুতপদে অগ্রসর হও—সুখ ও দুঃখকে আমারই দান বলে জীবনে প্রতি অবস্থায় গ্রহণ কর। আমি তোমার হাত ধরে আছি —কোনও ভাবনা করো না।"

জয় মা আনন্দময়ী জননী।

১২ই অগষ্ট ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ায় দুস্বপ্ন দেখে অতি প্রত্যুষে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মাকে বললাম, আমার দ্বারা কিছু হবে না। নস্যিও ছাড়লাম না আর কুচিন্তাও ছাড়লাম না। এতে আমার সাধন কিছুই অগ্রসর হচ্ছে না। এ আমি মহাসমস্যার ভিতরে পড়লাম। মা বললেন, "রাত্রির অন্ধকারে বন্ধ ঘরের ভিতরে যদি ভয় হয় সে ভয় ঘরের দরজা, জানালা খুলে দিলেও যায় না। কারণ বাহিরে ও ভিতরে অন্ধকার। কিন্তু দিনের বেলায় বন্ধ ঘরের ভিতরে যে অন্ধকার তাতে যদি ভয়ের সঞ্চার হয় তখন ঘরের দরজা জানালা খুলে দিলে ভয়ের ভাব কেটে যায়। কারণ দিনের আলোতে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায় বলে ভয়ের কোনও উপলক্ষ্য থাকে না ও মন সবল হয়। তখন ভয়কে তুমি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পার ও দ্বিধাহীন চিত্ত হও। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পূর্ব্বে মানবের ভিতরে যে সব বিচ্যুতি ও অন্যায় থাকে বা আসে সেগুলো রাত্রির অন্ধকারে বন্ধ ঘরের ভিতর ভয় পাবার মত। সে অবস্থায় মানবের মন ভীত ও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে ও সে নিজেকে সেই ভীতি থেকে মুক্ত করতে পারে না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'লে যদি মানবের অন্তরে বিচ্যুতি ও অন্যায় আসে সে অবস্থা হ'ল দিনের বেলায় বন্ধ অন্ধকার ঘরে ভয়ের মত। ভীতি এলেই তোমার জীবনে অভিজ্ঞতাও নির্দ্দেশের সকল দ্বার খুলে দিলেই ব্রহ্ম

জ্ঞানের আলোতে তোমার সেই সকল বিচ্যুতি ও অন্যায়কে তুমি অতি অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে করবে ও তাকে জয় করবার সাহস তোমার মনে আসবে। সুতরাং তোমার যে সকল অন্যায় সেগুলো অন্যায় যে নয় তা তুমি ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারছ। কারণ অন্যায় ঠিকই অন্যায়। কিন্তু তুমি অন্যায়কে অন্যায় বলে জানার যে ক্ষমতা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আহরণ করেছ তাতেই তুমি অন্যায়কে বন্ধ করবার জন্য চেষ্টা করছ। যদিও অন্যায় করছ তবুও অন্যায় করেই তোমার মনে অনুশোচনা হ'চ্ছে ও যাতে সেই অন্যায় আর তুমি না কর তার জন্যে সদা জাগ্রত থাকছ। এখন হয়ত বুঝেছ। নিজেকে গভীর ভাবে আমাতে মগ্নকর। সব ত্রুটি বিচ্যুতি চলে যাবে, অনেক ঐশ্বর্য্য হবে ও আমাকে লাভ করবে। অগ্রসর হও নির্ভয়ে।"

জয় মা অভয়দায়িনী জননী আমার

১৪ই আগষ্ট ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

আজ মা বললেন, "কোন অন্যায় ক'রে তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না। তোমাকে তার জন্যে শাস্তি পেতেই হবে। অন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জ্জন করে যদি মনে কর খুব দান ধ্যান ও অনেক সৎকার্য্য করে সেই অন্যায়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে, তবে ভুল করবে। অন্যায় যতটুকু করছ তার জন্য শাস্তি তোমার অবধারিত। যতটুকু ন্যায় করলে তার জন্যে পুরস্কার তোমার অবধারিত। মনে রেখ এমন কোনও কাজ বা চিন্তা নাই যার ফল তুমি পাবে না। প্রত্যেক কাজের ও চিন্তার ফল তুমি পাবেই। এ যে আমার স্বভাবের নিয়ম। আমার নিয়মে কোনও ব্যতিক্রম নাই। গভীর অন্যায় ক'রে আমার কাছে কেঁদে কেঁদে অনুশোচনায় ক্ষমা ভিক্ষা করলে। যদি তোমার অনুশোচনা খাঁটি হয় তবে তোমার যতটুকু শাস্তি পাবার কথা তার চাইতে সামান্য কিছু কম শাস্তি পাবে। কিন্তু শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। এর হাত থেকে কোনও ক্রমে তোমার নিস্তার নাই? আমি নিয়মকারী কিন্তু নিয়মভঙ্গকারী কখনও নই এই জানবে। সুতরাং

সাবধান। জীবনের পথে অতি সন্তর্পণে চলবে। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা উপযুক্ত বিচার করে সকল কাজ করবে। তোমার স্বাভাবিক ত্রুটি আমি ক্ষমা করি। কিন্তু তোমার ঔদ্ধত্য দ্বারা বা অহঙ্কার দ্বারা অনুষ্ঠিত ত্রুটি বা অন্যায় কখনও ক্ষমার্হ নয় জানবে। যে পরিবেশে তোমায় জন্ম দিয়েছি, চলতে দিয়েছি সেই পরিবেশকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা বা তাকে উন্নতির পথের অন্তরায় মনে করে তাকে পরিত্যাগ করে আমার সাধনের পথে অগ্রসর হওয়া মহা অন্যায়। সে অবস্থায় সাধন যতটুকু করলে তার উপযুক্ত ফল লাভ হবে। কিন্তু সেই পরিবেশ পরিত্যাগ করে আমার নিয়ম যে ভঙ্গ করলে তার জন্যে এ জন্মেই হোক কি পরজন্মেই হোক তোমার শাস্তি অবশ্য হবে। এর ভিতরে কোনও দ্বিমত নাই। যার যে পরিবেশ বা পারম্পরিক অবস্থায় জন্ম সে কি নিরর্থক? তোমার জীবনের পথে তোমার যাবতীয় প্রয়োজন তোমার জন্য স্থিরীকৃত হ'য়ে রয়েছে। এ কেবল এক জন্মের জন্যেই নয়। তোমার আত্মার জন্ম থেকে তোমার মোক্ষ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তোমার জন্মে জন্মে যা যা প্রয়োজন বা করণীয় সব তোমার জন্মের পূর্ব্ব থেকেই স্থিরীকৃত হ'য়ে আছে। চেষ্টা, শ্রম, উৎসাহ, সব সময়েরই প্রয়োজনে আমার দ্বারাই প্রেরিত হয় ও সে-গুলোও আগে থাকতে স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। যেমন এই কার্য্যে তুমি অকৃতকার্য্য হবে এও যেমন স্থির আবার অকৃতকার্য্য হবার পর তোমার অন্তরে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আসবে যাতে সেটা তুমি সফল করতে পার সেও তোমার আগে থাকতে স্থিরীকৃত হ'য়ে আছে। পর পর যখন যা হবে বা আসবে তার সকল ভার আমার হাতে ও আমি তোমার জীবনের একটি ধারাবাহিক ছক্ কষে রেখেছি। চেষ্টা বা নিচেষ্টা কিছুই নয়। কেউ চেষ্টা করেও পায় না আবার কেউ চেষ্টা না করেই লাভ করে। কেউ আবার অক্লান্ত চেষ্টা করে পায়। সবই বাঁধাধরা ছক্ কষা হয়ে আছে। তোমরা মনে কর তোমরা করছ। কিন্তু তা নয়—। তুমিই করছ বটে কিন্তু যা করছ সে শুধু তোমার প্রতি আমার যে স্থিরীকৃত নিয়ম তাতেই করে যাচ্ছ।

যেমন ধর এইভাবে তোমার জীবনে সাধন হবে, সিদ্ধি হবে, সেই পথে চলতে তোমার এই সকল অন্যায় হবে যা তোমার এই জন্মে অথবা পরজন্মে ভোগ করতে হবে ইত্যাদি যে তোমার গতি পথ যা তোমার উন্নতির বা তোমার জীবনকে পরিপূর্ণ শুদ্ধ করবার জন্যেই প্রয়োজন ছিল বলেই হ'ল। সুতরাং কাউকে উপেক্ষা করো না। কাউকে দোষ দেবে না। কারুর নিন্দা বা সমালোচনা করবে না। জানবে যে যে ভাবে চলেছে সেটা তার স্বাভাবিক গতি ও সে গতি অমোঘভাবে আমার দ্বারা চিহ্নিত ও স্থিরীকৃত ও একান্ত আমার বিধান। এ থেকে সে অন্য রাস্তায় যেতে পারত না বা পারবে না। পর নিন্দা ও পরচর্চা করা আমারই বিধানকে উপেক্ষা করা। আমারই বিধানকে উপেক্ষা করাই হ'ল আমাকে অবিশ্বাস করা ও সেইখানেই তুমি পাপ করলে। এইবার তোমার কাছে সব পরিস্কার হল। অগ্রসর হও। তোমাকে পূর্ণ মুক্ত, মহাযোগী ও মহাশক্তিশালী করব।"

জয় মা জ্ঞানদায়িনী জননী আমার—।

১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন, "দেখ, সাধকের যে ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা হয় সেটা দেহ শুদ্ধ না হ'লে হয় না। দেহ শুদ্ধ করতে হ'লে সাত্ত্বিক আহার প্রয়োজন। সাধকের সর্ব্ব প্রকারে সাত্ত্বিকভাব না হলে ঐশ্বর্য্য হয় না। এর জন্যে অতি অল্প আহার ও সেই আহার সম্পূর্ণ অনুত্তেজক খাদ্য দ্বারা সম্পন্ন করতে হয়, দেহ যাতে উত্তেজিত না হয়। দেহ যাতে অতি সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থায় শান্ত ও সমাহিত থাকে তার জন্যে নিরামিষ আহার অত্যন্ত প্রয়োজন। অতি ভোজন বা গুরুভোজন সর্ব্বদা পরিত্যাগ করবে। দেহকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে। ফল ও দুগ্ধ আহার শ্রেষ্ঠতম। সাধকের পক্ষে এ আহার প্রকৃষ্ট। অন্য আহারে দেহের ও মনের উত্তেজনা ও বিকার হয়। যদি ঐশ্বর্য্য ও শক্তি চাও তবে আহারকে পরিমার্জ্জিত কর ও সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ কর।"

জয় মা আনন্দময়ী আমার মাগো।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

আজ দু'দিন হ'ল শ্রীদিলীপকুমার রায় লিখিত "অঘটন আজও ঘটে" বইখানি পড়ছি। শেষ অধ্যায় "আনন্দগিরি"। আনন্দগিরি অসিতের কাছে তার জীবনের ঘটনা বলছেন। পিতার অসুখের সংবাদ পেয়ে সেখানে গিয়ে সংসার বন্ধনে একেবারে জড়িয়ে যাবার শেষ মুহুর্ত্তে তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ করলেন। গুরুদেব সূক্ষ্ম দেহে এসে তাঁকে নানা উপদেশ দিয়ে মুক্ত করলেন ইত্যাদি। অধ্যায় এখনও শেষ হয় নাই। উঠলাম প্রাতঃকৃত্য সমাধা করতে। মনের ভিতরে মহা গোলমাল চলেছে। তাইত' আমিও সংসার বন্ধনে একেবারে ডুবে গেছি। তবে ত পরমার্থ লাভ আমার সুদূর পরাহত। নানা সাংসারিক জটিলতা, ঋনের বোঝা কাম রিপু অত্যন্ত প্রবল এরা আমাকে একেবারে শেষ করে দিল কিছুই হলো না আর হবেও না—এই ভাবতে ভাবতে দাঁতন করছি। হঠাৎ দেখি মা হেসে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এত হাসছ কেন? তোমার হাসি আর আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। আমি ডুবে যাচ্ছি আর তুমি কেবলই হাসছ আর ঠাট্টা করছ। মা হঠাৎ হাসতে হাসতেই বললেন "কই ডুবছিস কোথায়? ওই যে ফাতনা জেগে আছে ও নড়ছে।" আমি বললাম, কি যে ঠাট্টা কর তার ঠিক নাই। ফাতনা নড়ছে এ আবার কি কথা? মা বললেন, "ওই যে তোর আমার সঙ্গে যোগ ওইত ফাতনা। ওটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কি আর ডুবতে পারিস?" তাত বুঝলাম কামের প্রভাবে যে আমাকে সময় সময় অন্ধ করে দেয় ও আমি আর আমাতে থাকি না— হয়ত একটা অনর্থ করে ফেলব। মা বললেন, "থাক না কাম, তাকে অত করে চিন্তা ও গুরুত্ব দিস্ কেন? ও আপনা থেকেই শান্ত হবে।" আমি বললাম, তাত হবেই, বুড়ো হ'লেই, দেহ আসক্ত হ'লেই ত' ও আর থাকবে না—এতে আর আমার কি লাভ হল? মা বললেন, "দেখ, দেহ

অশক্ত বা বৃদ্ধ হ'লেই কাম যায় না। কর্মেন্দ্রিয় ক্ষমতাহীন হ'তে পারে কিন্তু কাম সারাজীবন থাকবে। তা যদি না থাকে তবে আমার সৃষ্টি যে নিরর্থক হ'য়ে যায়। ওর জন্যে চিন্তা কি? খুব উচ্চ কোটির সাধককে জিজ্ঞাসা করিস তার মনে কখনও কামভাব হয় কিনা। সে অকপটে স্বীকার করবে "হয়"। আমি বললাম সংসারে থেকে, এইসব মোহ জালের ভিতরে থেকে তোমার সঙ্গে তেমন করে যোগযুক্ত হতে পারছি না। সন্ন্যাস নিয়ে যোগে ধ্যানে নিশ্চিন্ত মনে তোমার যোগে যুক্ত থাকব। এইবার মা রেগে গম্ভীর হ'য়ে বললেন, "সন্ন্যাস, সন্ন্যাস, শুন্‌তে শুন্‌তে পাগল হয়ে গেলাম। ধরেই গেরুয়া প'ড়ে মা বাবা ভাই বোন, আত্মিয় স্বজন পরিত্যাগ করে চলল গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে। কেন? না, আমাকে পাওয়া যাবে। ওঃ। আমি বুঝি ওই গুরুর আশ্রমেই থাকি, না? সংসার গ'ড়ে দিয়ে তোমাদের এখানে সংসারের পাঁকে ফেলে দিয়ে আমি বুঝি গিয়ে লুকিয়ে আছি ওই গুরুর আশ্রমে, যে সেখানে না গেলে, গেরুয়া প'ড়ে বৈরাগী না হ'লে আর আমাকে পাওয়া যাবে না। আমি পাগল হ'য়ে গেলাম। কোন্ কালে কোন্ যোগী এই কথা বলেছিলেন, তার ভুল ব্যাখ্যা করে সেই থেকে পট্ পট্ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে যে পারে সেও যে না পারে সেও চলে যাচ্ছে। এ আমার হ'য়েছে মহাবিপদ। যতলোক আজ পর্য্যন্ত সন্ন্যাস নিয়েছে, ও গৃহ সংসার ত্যাগ করে গিয়েছে তারা যদি তাদের সেই নিবৃত্তির ভাব নিয়ে সংসারে থেকে সাধন করত তবে সংসার আজ স্বর্গে পরিণত হ'ত ও আজকের মত এত অন্যায় ও ঘোর দুর্দ্দিন মানবের জীবনে আসত না। তাঁদের শিক্ষাত' সকল সংসারী নিতে পারল না। তাই এরা হ'য়ে গেল অন্য আর এক দল যারা সংসারের লোকের থেকে ভিন্ন। তাদের উপদেশ ও শিক্ষা সাংসারিক লোকের সকল ভাব ও কর্ম্মে ঠিক ঠিক খাপ খেল না। আমার সন্তান ও আমার উদ্দেশ্য ভাগ হ'য়ে গেল। সন্ন্যাসে গৃহসংসার ত্যাগেও একটা মোহ আছে, একটা অসীম সাহসিকতা আছে। যাদের স্বভাবের ভিতরে

গতানুগতিক পথে চলার প্রতি বিরূপ ভাব আছে তারা এই রাস্তায় চলে। আর "উপচার রে উপচার"। আমি বললাম সে আবার কি? মা বললেন, "উপচার বুঝিস্ না? পূজার উপকরণ—ফুল, ফল, বেলপাতা, দুর্ব্বা, ধূপ, ধূনা, বাত্তি, চন্দন, ইত্যাদি এইসব এক একটি উপচার। আর এইসব একসঙ্গে করলে তবে হয় "নৈবেদ্য"। শাস্ত্রমত দেখিস যে পূজায় যে উপচার প্রয়োজন তার একটি না হ'লে পূজা সমাধা হয় না। এই উপচার দিয়ে নৈবেদ্য সাজায় কোথায়? পূজা মণ্ডপে ও প্রতিমার সামনে। তোমরা প্রত্যেকে এক একটি উপচার আর জীব সকল মিলে আমার পূর্ণ নৈবেদ্য। এর একটা অভাব হ'লে বা একটাকে উপেক্ষা করলে আমার পূজা সার্থক হয় না বা সম্পূর্ণ হয় না। তুমি করলে কি, আমার সামনে থেকে ঘিয়ের প্রদীপটি সরিয়ে নিয়ে মণ্ডপের বাইরে এক জায়গায় জ্বালিয়ে রেখে এলে। চাল কলার পাত্রটি নিয়ে আর এক জায়গায় জ্বালিয়ে রেখে এলে। এতে কি হোল? নৈবেদ্য পূর্ণ হ'ল না। সে সকল উপচার এক জায়গায় মণ্ডপে আমার সামনে থাকবে ও যার প্রত্যেকটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে পূজারী আমার উপাসনা করেন ও আমাকে নিবেদন করেন। পৃথক পৃথক জায়গায় নিয়ে গেলে যদিও প্রদীপের আলো আমার মুখে এসে কিছুটা লাগছে, ধূনোর গন্ধও আমার নাকে লাগছে তবুও আমার পূজা একযোগে সকল উপচার দিয়ে হ'চ্ছে না। তুমি জ্ঞানের বাতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলে, আর একজন ভক্তির ধূপ ধুনো নিয়ে সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন। এমনি করে সব ভাগ হয়ে গেল। একযোগে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, বিশ্বাস, বাধ্যতা, প্রেম ইত্যাদি পূর্ণ উপচার নিয়ে মানবগণ সংসারে আমার নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা করল না। তাতে হ'ল কি? বিভিন্ন মতে বিভিন্নতা এসে গেল, উপচার পৃথক হ'য়ে গেল। জ্ঞানী বলল, জ্ঞান পেতে হ'লে সংসারে থেকে নয় সন্ন্যাস নিয়ে নির্জ্জনে সাধন কর তবে শ্রেষ্ঠজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হবে। ভক্ত বলল, সংসারের মোহে জড়িয়ে পড়লে ভক্তি শুকিয়ে যাবে।

সংসার ত্যাগ কর তবে পরাভক্তি লাভ হবে। এমনি করে যাদের আমি কৃপা করলাম যাতে তারা সংসারের সকলকে হাত ধরে টেনে উঠাবে। অথচ তারাই কিনা সবাইকে ছেড়ে আলাদা আলাদা হ'য়ে গেল। আমার কোটি কোটি সন্তানগণ সন্ধিহান হ'য়ে পড়ল, তাইত তবেত সংসারে থেকে "আমাকে" পাওয়া যাবে না। সংসার ছাড়তে পারেনা, সন্ন্যাসীও হ'তে পারে না ও ভাবে "আমাকে" পেল না বা পাবে না। তখন ভাবে যাগকে, এ সব ছেড়ে যখন যেতে পারব না তখন এতেই একেবারে মজে যাই। তাই এরা হ'য়ে পড়ল উপচার বিহীন নৈবেদ্য যার দ্বারা আমার পূজা হয় না। ঘিয়ের প্রদীপ, ধুনোর ভাণ্ডই যদি সরিয়ে নিলে তবে রইল কি? রইল শুধু চাল, কলা, ফুল, বেলপাতা—এরা সব আছে সংসারে। তবে জ্ঞানের প্রদীপ ও ভক্তির ধুনো এদের কাছে নাই। আছে সরলতা সহজভাব, ভয়, আশা, আকাঙ্খা এই সব নিয়ে যতটা পারে আমার পূজা করে। কিন্তু তাতেও এদের পূজা পূর্ণ হ'চ্ছে না। এসো সব একযোগে। যোগী হও সংসারী, সংসারী হও যোগী, জ্ঞানী হও সংসারী, সংসারী হও জ্ঞানী, ভক্ত হও সংসারী, সংসারী-হও ভক্ত হ'য়ে এক যোগে চাল, কলা ফুল ফল বেলপাতা, ইস্তক কলার খোল অবধি কে আলোয় আলোয়, ধুনোর গন্ধে ভ'রে দাও তবে আমার পূজা সার্থক হবে। সংসারে থেকে সংসারকে সার্থক কর, সমর্থ কর—স্বভাবের বিরুদ্ধে যেও না, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেও না; তাতে আমারই বিরুদ্ধে যাওয়া হবে। যা দিয়েছি তার একটিও নিরর্থক নয়। নিজের গর্ব্বে আমার দানকে উপেক্ষা করে আমাকে পাওয়ার আশা করা আমাকেই অপমান করা। যখন তোমার নিকিঞ্চন অবস্থা আসবে যখন তোমার সর্ব্ব রিপু খণ্ডন হবে যখন তোমার সকল লোকাচার, দেশাচার ঘুচে যাবে সেই জন্মে আর তোমার সংসার নয়। তখন তুমিই একমাত্র পূর্ণ নৈবেদ্য হ'য়ে আমার পূজা সার্থক করবে। তখন সকল সংসার তোমার মধ্যে তুমি তখন ব্রহ্মকল্পে বিচরণ করবে—তোমার তখন ভেদাভেদ নাই সকলই তুমি ও তুমিই সকল এই জ্ঞান প্রকট হবে। এখন বুঝেছ?"

মাগো কি যে বললি মা এ যে অমৃত এযে অভাবনীয়।

মাগো আমার মা।

৬ই অক্টোবর, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে ধ্যানে ব'সে গভীরে নিমগ্ন হ'লাম। ধীরে ধীরে এক অতি রমণীয় স্থানে এসে উপস্থিত হ'লাম। স্থানটির উত্তর-পূর্ব্বে একটি মনোরম জলাশয়। তার ওপারে দিগন্ত নীলিমা। জলাশয়টির দক্ষিণ-পশ্চিম ব্যাপিয়া একটি বিস্তৃত বন। জলাশয়টির ধারে বনের মধ্যে একটি যোগী পুরুষ একটি আকশীর সাহায্যে গাছ থেকে ফল পাড়ছেন। যোগী পুরুষটির দীর্ঘ ঋজু দেহ, মাথায় ঘণ কৃষ্ণ কেশ, ঘণ কৃষ্ণ শ্মশ্রু ও গুম্ফে বিরাট্ মুখ খানা মণ্ডিত, গাত্রে একটি শ্বেত চাদর ও পরিধানে শ্বেত বস্ত্র। ফল পাড়তে পাড়তে আমার দিকে দু'একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মুখ মণ্ডল বিরাট্ অথচ কমনীয়। এই ভাবে অনেকক্ষণ চলছে হঠাৎ দেখি সেই বন ভূমির পশ্চিম ভাগটি এক তীব্র শ্বেত আলোকে আলোকিত হ'য়ে গেল—যেন সেটি আর বন ভূমি নয়। একটি অতি মনোরম আলোকের রাজ্যে পরিণত হ'ল। বিস্তৃত আলোকের ধারা দূর থেকে দূরান্তর পর্য্যন্ত প্লাবিত ক'রে দিল। একটি মহা-জ্যোতির পিণ্ড যেন পশ্চিম দিগন্তে উদ্‌ভাসিত হ'য়েছে ও তাই থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হ'চ্ছে। এই আলোকের মহাধারার ভিতরে একটি আবক্ষ মূর্ত্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি একাগ্র। মূর্ত্তিটির জ্যোতির্ম্ময় মানবদেহ মুণ্ডিত মস্তক, অনাবৃত দেহ, অতি উজ্জ্বল ও সুন্দর গঠন। আমার এত কাছে দাঁড়ালেন যেন মাত্র ২।৪ হাত দূরে। এই মূর্ত্তির অবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্ণকুহরে কে যেন বলে দিলেন **"মহাপ্রভু চৈতন্যদেব"**। আমি গভীর বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে সেই মূর্ত্তি অবলোকন করছি। তাঁর সেই একাগ্র দৃষ্টিতে আমি সম্পূর্ণ সম্মোহিত হ'য়ে পড়েছি। তিনি সেইরূপ নিস্পলক নেত্রে আমার দিকে একাগ্রে তাকিয়ে আমাকে বললেন, **"হরিনাম ও ভক্তির প্লাবনে সারা দেশ প্লাবিত করে দাও।"** এই কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আমার

সকল শরীর রোমাঞ্চিত, আমি মুগ্ধ, বিস্মিত ও নির্ব্বাক। আমি একটি কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। তিনি হঠাৎ যেমন এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন। আজ সারাদিন আমার হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দ ও এক গভীর ভাব ধারা নিয়ত প্রাণে আনন্দ হিল্লোল জাগিয়ে রেখেছে।

আমার মার অপার কৃপা। আমার মা আনন্দময়ী জননী।

৭ই অক্টোবর, ১৯৭৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে ধ্যানে বসে আস্তে আস্তে অনন্ত আকাশে মহা আলোকের রাজ্যে চলে গিয়েছি। শুধু আলো আর আলো। মধুর আলোতে চারিদিক উদ্ভাসিত। পশ্চিম দিগন্ত থেকে যেন এই আলোক আসছে। অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটছে। ধীরে ধীরে একটি নগ্নগাত্র, মুণ্ডিত মস্তক মনুষ্য দেহের আবক্ষ আমার চক্ষের সামনে ভেসে উঠল। দেখি মহাত্মা গান্ধি। আশ্চর্য্য জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি। মুখে অপরূপ নির্ব্বিকার আনন্দময় ভাব। আমার দিকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ নয়নে তাকিয়ে আছেন। তাঁর এই মৌন দৃষ্টিতে যেন আমাকে বলে দিচ্ছে, "অগ্রসর হও নির্ভয়ে।" যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি হঠাৎ চলে গেলেন। এঁরা সকলেই আমাকে সাহায্য করছেন। মহাত্মা গান্ধিকে অনেকেই রাজ-নীতির একজন শ্রেষ্ঠ নায়ক বলে গণ্য করেন। কিন্তু আমি দেখছি তিনি একজন ঋষি কল্প মহাভক্ত ছিলেন। তিনি স্বর্গের অতি উচ্চস্তরে অবস্থান করছেন। তিনি একজন সিদ্ধ আত্মা। তিনি আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিচ্ছেন।

আমার মার করুণা ভরসা।

১০ই অক্টোবর, ১৯৫৯ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল থেকে আমার এক আশ্চর্য্য অবস্থা হ'য়েছে। জপ করলেই মা আমাকে আমার পূর্ব্ব জন্ম সকল দর্শন করান। এ এক মহা বিস্ময়কর অবস্থা। পরব্রহ্ম থেকে আমার আত্মার জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার যতগুলো জন্ম

হ'য়েছে প্রত্যেকটি জন্মের এক একটি স্মরণীয় ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে জন্মান্তরের ধারা আমাকে দর্শন করাচ্ছেন।

আত্মার জন্ম—এক মহা বিস্ময়কর শ্বেত আলোকের রাজ্য। এই রাজ্যের পূর্ব্বদিকে একটি অতি উচ্চ তরল ও তীব্র আলোকের পর্ব্বত। সেই পর্ব্বত গাত্র বেয়ে মহা আলোকের অফুরন্ত প্রস্রবন চলেছে অনন্ত দিগন্তে ও মহা আলোকের অসীম সমুদ্র সৃষ্টি করেছে। সমস্তটাই একটি বিরাট্ গোলাকার আলোক মণ্ডল। এ আলোকের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এ যে কি বর্ণের আলো সেটা বলতে পারছি না—শ্বেত নয় অথচ শ্বেত, নীলাভ নয় অথচ নীলাভ এ আলোক এক অপূর্ব্ব আলোক মিশ্রন অতিশয় মনোরম। এখানে এলেই এক অনীর্ব্বচনীয় ও অনাস্বাদিত অনুভূতিতে প্রাণ মন এমন আকৃষ্ট করে যে আর সংসারে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না। মনে হয় এই থানেই জন্ম জন্ম বাস করি। এ এক অপূর্ব্ব চেতনা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এই যে আলোকের প্রস্রবণ এ থেকে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকনার মত আলোর কণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এই কণা থেকে একটি কণা যেন উল্কার মত আলোক পুচ্ছ নিয়ে অসীম নভোমণ্ডলে ধাবিত হ'ল। এই "আমি" বা আমার আত্মার জন্ম হ'ল পরব্রহ্মের মহা আলোকের ধারা থেকে।

কীট জন্মের ধারা—এই জন্মের ধারাবাহিক প্রগতি বড়ই জটিল ও অস্পষ্ট নানা জটিল অবস্থার ভিতরে বহু জন্ম, জন্মান্তর আমার কেটেছে। কখনও সমুদ্রের ভিতরে কখনও বা বিষ্ঠার ভিতরে, কখনও বা গলিত পত্র পল্লবের ভিতরে এমনি করে বহুকাল পরে আমি একটি কৃষ্ণভ্রমর হ'য়ে জন্ম নিলাম। এই জন্ম থেকে স্মৃতি ক্রমেই স্পষ্ট হ'তে লাগল।

ভ্রমর ও পক্ষীজন্ম—আমি এক ভ্রমর হ'য়ে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষে ফুলের মধু আহরণ করে মহানন্দে আমার মধুর জীবন অতিবাহিত করছিলাম। একদিন এক রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে আমি আনন্দে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষে মধু আহরণ করে বেড়াচ্ছি একটি পক্ষী আমার প্রাণনাশ করল। যে পক্ষীটি আমার প্রাণনাশ

করল সে একটি পাপীয়া জাতীয় পাখী। এরপর আমি পাপীয়া জাতীয় পাখী হয়ে জন্ম নিলাম এক সুন্দর বনে। বনের অপূর্ব্ব পরিবেশে আমার দিনগুলি কূজনে ও আহার অন্বেষণে আনন্দে কেটে যাচ্ছে। একদিন এক সর্প আমার প্রাণনাশ করল। অজগর জাতীয় সর্প আমাকে মুখে করে দ্রুত গতিতে বৃক্ষ থেকে নেমে গেল। আমার আকুল ক্রন্দনে সকল বন আকুল হ'ল। আমার পিতা মাতা ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে বসে রইলেন—কোনই সাহায্য করতে পারলেন না। এ ঘটনা হ'ল রাত্রে।

সর্পজন্ম—এরপর আমার সর্পজন্ম আরম্ভ হয় ও নানা জাতীয় সর্পের ভিতরে আমার জীবন ও জন্ম অতিবাহিত হয়। একদিন এক ব্যাঘ্রের হস্তে আমি নিহত হই।

পশুজন্ম—পশু জন্মের প্রথমে আমার ব্যাঘ্র জন্ম আরম্ভ হয়। অরণ্যে মহাবিক্রমশালী ব্যাঘ্র বলে আমার অতুল প্রতাপ। আমি মহাবিক্রমে যথা ইচ্ছা চলাফেরা করি ও অন্য পশু বধ করে আমার ক্ষুধার ও লালসার চরিতার্থ করি। ক্রমে আমি বৃদ্ধ হই ও এত বৃদ্ধ হই যে আমার খাদ্য সংগ্রহের সামর্থ-টুকুও চলে যায়। সেই সময় বনজ লতা গুল্মের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয় ও তাতে আমার অতিসার হ'য়ে মৃত্যু হয়। এর পর বলিবর্দ্দ বৃষরূপে আমার জন্ম হয়। এই জন্মে আমি হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হই ও হস্তী জন্ম লাভ করি। বিরাট দেহ নরহস্তী হ'য়ে আমার নিজের দলে আমি দলপতি। আমার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটি দন্ত। আমার দেহের উপরিভাগ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু পেট গলা ইত্যাদি তামাটে। আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি একলা একটি খরস্রোতা পর্ব্বতীয় ঝরণার স্রোতে এসে শুয়ে পড়ি। ঝড়ণার স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে বহু নিম্নে পর্ব্বতের তলদেশে নিক্ষেপ করে ও তাতেই আমার মৃত্যু হয়। এই ছিল আমাদের মৃত্যুর পদ্ধতি।

এর পরে আমি বানর জন্মলাভ করি। এই বানর জন্ম আমার অতি শান্তিপ্রদ হয়। অতি মনোরম বনের পরিবেশে পল্লব কুঞ্জে আমার অন্যান্য

সমবয়সীদের সঙ্গে শৈশব, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয়। যৌবনে কোনও এক ব্যাধের শরে আমার জীবন শেষ হয়।

মানব জন্ম—এরপরে আমার মানব জন্মলাভ। মহাভূমিখণ্ডের কোনও একটি বনে এক ব্যাধের পরিবারে আমার জন্ম হয়। পিতামাতার একমাত্র পুত্র আমি। শৈশব থেকেই আমার সুগঠিত তনু অতি সুন্দর আকৃতি। ধনু-র্বিদ্যায় আমি পারঙ্গম। আমি উদাসী বনচারী। পশুপক্ষীর আমার শরের কাছে কারও নিস্তার নাই। গভীর বনের মধ্যে বিচরণকালে অন্তর মন্থন করে কার যেন ডাক নিরন্তর শুনতে পাই। বিশ্লেষণ করি না, যৌবনের উদ্দামগতিতে নিষ্ঠুর হত্যায় লিপ্ত থাকি। এইরূপে চলতে থাকে আমার জীবন। হঠাৎ এক বিষধর সর্পাঘাতে বনের মধ্যেই আমার মৃত্যু আসন্ন হয়।

মৃত্যুকালে আমি জ্যোতির্ময় মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করি।

এর পরে শঙ্করের ঔরসে ও দুর্গার গর্ভে কার্ত্তিকেয় হ'য়ে আমার জন্মলাভ হয়।

এর পরে সাত্যকি হ'য়ে আমার জন্মলাভ হয়। এই জন্মে আমি হিমালয়ের কোন গভীর অরণ্যে মহা সাধনা করি। সাধনায় মাতৃচরণ প্রাপ্তি হয় ও মহাযোগশক্তি-লাভ করে শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও সারথিরূপে লোক সমাজে পরিচিত হই। কুরুক্ষেত্রের বহু যুদ্ধ স্মৃতি ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার বহু স্মৃতি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। এরপর বহুকাল স্বর্গে অবস্থান করি ও হালী সহরে (পশ্চিমবঙ্গ) চট্টোপাধ্যায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। বৈষ্ণবমতে দেবার্চ্চনা করি। নিঃসন্তান অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়।

তারপর আমার এই জন্ম। যা লিখলাম সবই মা আমাকে দর্শন করিয়েছেন। এ এক মহাপ্রহেলীকা। জীবন আলেখ্য এক অতি অদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ব্যাপার।

আমার মা সহায়। আমার যদি এতে কোন ত্রুটি থাকে মা আমাকে ক্ষমা করো।

২৫শে অক্টোবর ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

প্রেম-ভক্তির সাত্ত্বিক লক্ষণ:—

নর্ত্তন, ক্রন্দন আর মূর্চ্ছা শিহরণ,
উদ্‌ভ্রান্তি উন্মত্তভাব বিরহ কম্পন;
স্বপ্রেম প্রেমের ভাবে পরকিয়া চায়,
পরকিয়া প্রেমজ্বরে করে হায় হায়।
বাসনার বিনিলয়ে পরিপূর্ত্তি নিয়া
গভীরে গমন করে তার প্রেম হিয়া;
সকল আবর্ত্ত মাঝে আর্ত্ত নাহি হয়,
আর্ত্তের দীনতা তার হইবে নিশ্চয়।
ভক্তি প্রেমের শাস্ত্র কল্পিতে না পারি,
কৃপা যারে হোল, সেই শুদ্ধ ত্রিপুরারী।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবে ভুঞ্জে কৃষ্ণ প্রেমে রাই,
বিরহ দহনে সদা বলে নাই নাই;
মিলনে বিরহ চায় বিরহ মিলনে,
অবিরত অশ্রু ঝরে কমল লোচনে।
কৃষ্ণই বিরহ তার কৃষ্ণই মিলন,
অশ্রুর মাঝারে কৃষ্ণে করেন দর্শন;
বিরহের মহাভাবে কৃষ্ণে তাই চায়,
মিলনের মহাপ্রেমে রাই গলে যায়।

২৫শে অক্টোবর ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

আজ মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, শ্রীচৈতন্যদেব যে মহাভাব পেয়েছিলেন সেই মহাভাব দর্শনে তাঁর অনুগত ভক্তবৃন্দ তাঁকে তোমার "অবতার" বলে প্রচার করেছেন। একি সত্যি? মা বললেন, "দেখ আমি পরমাত্মা জীবদেহ ধারণ করি না। আমার কোনও অনুগমনও নাই, নির্গমনও নাই। আমি জীবদেহ

ধারণ না করেই যদি আমার কণামাত্র ইচ্ছার দ্বারা আমার অভিপ্সিত কার্য্য কোনও জীবদ্বারা সম্পন্ন করিয়ে নিতে পারি তবে আমার প্রতি আরোপিত জীবজন্ম সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আমি বৃহৎ ধৃতি, তাই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অনুপরমানুতেও আমার সত্ত্বা ওতপ্রোত। এর একটাও আমি নই। আবার এর প্রত্যেকটিতে আমি প্রকট। এর তাৎপর্য্য বড় জটিল। তোমাকে খুব সোজা করে বুঝিয়ে দিই। ধর পিতা আর পুত্র। পিতারই সত্ত্বা থেকে পুত্রের জন্ম। পুত্র পিতারই স্বরূপগত—কারণ পুত্রই পিতৃ স্বভাব পুষ্ট ও পিতৃ-স্বরূপ গত না হ'লে ত' সে পিতা হ'তে পারবে না। পিতা পুত্র ও পৌত্র এই তিনজন যখন এক পরিবারে অবস্থান করেন তখন পিতামহ তার পুত্রের প্রতি, ও পুত্র তার পিতার প্রতি এক পারস্পরিক পিতা পুত্ররূপ প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। তেমনি পৌত্র তার পিতার প্রতি ও পিতা তার পুত্রের প্রতি একই পিতা পুত্র প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ। অথচ তিনজনের কেউই এক নয়। প্রত্যেকেই বিভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু স্বরূপগত ভাব তিনজনের মধ্যে একই ধর্ম্মি। পুত্র কালে পিতা হয়। কিন্তু সে ও তার পিতা এক ব্যক্তি নয়। দুই-জনেই পৃথক পৃথক ব্যক্তি। এই যে দুই জনের পৃথক অভিব্যক্তি এ হ'ল কায়িক ও আত্মিক উভয়তঃ। কিন্তু স্বরূপে এক, কারণ পুত্র পিতৃ স্বরূপগত হ'য়ে পুত্রের জন্মের কারণ হন। এই স্বরূপগত যে ভাব সেটার মূলে আমি, কারণ সব পিতারই একই স্বরূপগত ভাব পুত্রের প্রতি। কিন্তু পিতৃ-স্বরূপ প্রাপ্ত বলেই পুত্রকে তার পিতা বলা যায় না। কারণ গুণাবলির তার-তম্যে পিতা ও তার পুত্রের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ যোগ্য। এইবার ভাব তুমি পুত্র ও আমি পিতা। তুমি যদি আমার পূর্ণ আচরণ কর তবে আমার স্বরূপগত হওয়া অর্থাৎ আমার স্বভাব তোমার ভিতরে কিছুটা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে "তুমি" কি "আমি" হ'য়ে যেতে পারি? জীবাত্মা জীবাত্মাই সে পরমাত্মা হ'তে পারে না—সে শুধু অনেকাংশে আমার স্বরূপ বা আমার স্বভাব প্রাপ্ত হ'তে পারে। কিন্তু কতটা? আমার

স্বরূপের বা স্বভাবের এককণা যেটুকু তাহার পক্ষে ধারণ করবার ক্ষমতা আছে ততটুকুই পারে। যাঁদের লোক সমাজে অবতার বলে খ্যাতি আছে তাঁদের কাছে কি কেউ কখনও জিজ্ঞাসা করেছিলো যে এই ব্রহ্মাণ্ডে কত গ্রহ নক্ষত্র আছে ও সেই সব গ্রহ নক্ষত্রে কত জীব আছে? তাঁদের যতটুকু শক্তি আমি প্রদান করেছি সে সব জীব কল্যাণেই। সেই সব আত্মা অপ্রাকৃত লীলা লোক সমাজে প্রদর্শন করে গেছেন—সে সব আমারই সত্ত্বায় পূর্ণ নিমগ্ন হওয়াতেই স্বভাবতই সেগুলো প্রকাশমান হয়েছে লোক চক্ষে। এই গুহ্যাতিগুহ্য ভগবত যোগ সেই যোগে গভীর ভাবে যুক্ত থাকাতে তাঁরা জানতেন, যে সকল ঐশ্বর্য্য তাঁদের মাধ্যমে প্রকাশমান সে সব "আমারই" ঐশ্বর্য্য। তাঁরা জানতেন তাঁরা অবতার নন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে তোমাদের ভক্তির আতিশয্যে জনগণ তাঁদের আমার আসনে বসিয়েছে। যে আমি লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি জীবের বিধাতা তার কতটুকু তোমাদের অবতারদের কাছে ব্যক্ত হ'য়েছে? অবতার বাদেই এই পৃথিবীর জনগণের এমন দুর্দ্দশা। আমি চাই আমাকে সকলে স্বীকার করে। সেই জন্যেই আমি মুক্ত জীবাত্মাদিগকে প্রেরণ করি আমার প্রেম ভক্তি জ্ঞান দিয়ে আমার প্রতি জীবাত্মার আকর্ষণ উপজাত করবার জন্যে। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে গেছে। আমি যে একা সেই একাই রয়ে গেলাম। এই অবতার-বাদ তুমি খণ্ডন কর। তোমায় অমিত শক্তি দেব। তুমি আরও সাধন কর ও একনিষ্ঠ হও। তোমার জয় সুনিশ্চিত।'

জয় মা আনন্দময়ী জ্ঞানদায়িনী জননী আমার।

২৭শে অক্টোবর ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

(গতকল্য আমার বন্ধু, কনিষ্ঠ ভগ্নিপতি ও শ্যালক শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি State-Bus-এর তলায় পিষ্ট হ'য়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন)।

আজ সকালে মাকে খুব অনুযোগ দিয়ে বললাম, এ তোমার কি লীলা? এভাবে এমন সরল প্রাণ, সৎ স্বভাবের এক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে মৃত্যু দিলে ও

সকল সংসারকে ছারখার করে দিলে। মাকেও দেখলাম খুব বিমর্ষ। মা বিষণ্ণ মুখে বললেন, "তোমাদের শোকে ও দুঃখে আমিও যে দুঃখ পাই।" আমি বললাম, তবে এ অঘটন কেন ঘটালে? মা বললেন, "আমার কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাক্তন থাকে পূর্ব্বজন্মের। সেই প্রাক্তন যখন শেষ হ'য়ে যায় তখন তার দেহত্যাগ অনিবার্য্য আরও উন্নত জন্মের জন্যে। এ কর্ত্তব্য আমাকে করতেই হবে প্রত্যেকের মহা ক্রমোন্নতির জন্যে। এ কর্ত্তব্য পালন করতে আমাকে বাধ্য হ'য়ে তোমাদের অন্তরে শোক দিতে হয় ও তাতে আমার শোক কম হয় না।" আমি বললাম, তুমিত নির্ব্বিকার তোমার আবার শোক কি? মা বললেন, "ভুল করো না— নির্ব্বিকার অর্থে সকল প্রকার বিকার রহিত। বিকার অর্থে মোহ-বিকার। কিন্তু হাসি কান্নায় বা শোকে আনন্দে বিকার থাকে না সেখানে অন্তরের সহজতম সরলতার প্রকাশ ও আমার স্পর্শ সেখানে ধরা পড়ে। তোমাদের হাসি কান্নায় আমিও হাসি কাঁদি। কিন্তু আমার হাসি কান্নার স্বরূপ ভিন্ন। সে শুধু আমারই স্বরূপগত অপরূপ স্বরূপেই বিবৃত। জীবই যে আমার একমাত্র লীলা সখা। সে সখার হাসিতে ও কান্নাতে আমার যোগাযোগ স্বাভাবিক। তোমরা কাঁদলে আমি কাঁদি ও তোমরা হাসলে আমি হাসি। কিন্তু তোমার হাসি কান্নার অভিব্যক্তি আছে ও জীব-স্বরূপের নিরূপেয় অবস্থা। আর আমার হাসি কান্নার অভিব্যক্তি নাই সে "নিরূপাধেয় চিন্ময়।" শোকেই তাই—কঠিন কর্ত্তব্য আমাকে পালন করতেই হয় ও সেটা তোমারই মঙ্গলের জন্যে। আজ যেটা তোমার কাছে বীভৎস ব'লে মনে হল, আমার কাছে সেইটাই স্বাভাবিক। তার ব্রহ্মতালু ভেদ হ'য়ে যে আত্মার নিক্রমন হ'ল সে যে কত, মহৎ আত্মা সে দিক দিয়া তোমরা বিচার করলে না। এ তার প্রাক্তন ও তার জীব পরিক্রমায় অতি স্বাভাবিক ধারাবাহিক স্তর যা তারই মহা উন্নতির সোপান। দুঃখ করো না। এ আত্মা একটি মহান আত্মা। সামান্য যা তার পূর্ব্ব জন্মাকৃত প্রাক্তন ছিল তার সদ্গুণে এবার তার বিলোপ

হ'ল। এর পরজন্মে সে মহাসাধু হ'য়ে পৃথিবীর মহাকল্যাণে নিয়োজিত হবে। শোক করো না।" জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার।

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫৯ খৃঃ কলিকাতা।

আজ সকালে ধ্যানে বসে মাকে বললাম, একি হ'চ্ছে আমার সঙ্গে? দর্শনও দিস না কথাও বলিস্ না এ অবস্থা যে আমার অসহ্য হ'য়ে পড়ছে আর যে পারি না। মা বললেন, "তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছি সে রাস্তা এখন তুমি পেয়ে গেছ। এই রাস্তা ধরে চল ধৈর্য্য ধরে—মহা আকুলতা আসবে ও আমার প্রতি ক্রমে আরও নিবিষ্ট হ'য়ে মহা লোককল্যাণে নিয়োজিত হবে।" আমি বললাম, অবনীদা বললেন, লক্ষ্মী প্রতিমা দেখে, তাঁর দিকে একান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখলেন যে প্রতিমার চক্ষু দুটি বারে বারে উর্দ্ধনেত্র হ'চ্ছে। যতবার সেখানে গেছেন এই দৃশ্য দেখেছেন। আমাকে বললেন, "মাকে জিজ্ঞাসা করো এ কি ব্যাপার? তবে কি মৃন্ময়ীই চিন্ময়ী?" মা বললেন, "জগত সংসারের রূপই যে চিন্ময়রূপ। মৃন্ময় যা সকলইত চিন্ময়। এত অনেকবার তুমি দেখেছ—আবার দেখ"—

দেখলাম মহা আলোকের পারাবারে সব একাকার হ'য়ে রয়েছে। আমার দেহ নাই—আমিও অনন্তে একাকার হ'য়ে গেছি। মা বললেন, "উর্দ্ধই গতি ও সেই গতিই একমাত্র লক্ষ্য ও অবলম্বন। তাই সাধনে উর্দ্ধগতি লাভ কর। ওই যে মূর্ত্তি ও ত' আমি—আবার আমি চিন্ময় হ'য়ে মৃন্ময়ের রূপে বিরাজমানা। মৃন্ময় যে সে কি চিন্ময় হ'তে পারে? কিন্তু চিন্ময় যে তার মৃন্ময় হওয়া ইচ্ছাধীন। আমি অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত আবার ঘটস্থ হ'য়ে রূপ পরিগ্রহ করে মৃন্ময়ী হয়ে সাধকের স্থুল দৃষ্টিকে পরিপূর্ণ ও সার্থক করি। কোনও প্রভেদ নাই। দৃষ্টি থাকলে আমাকে সর্ব্বরূপে সর্ব্ব অবস্থায় সাধক দেখতে পান। আমি জীবন সর্ব্বস্ব, প্রাণারাম, প্রাণবল্লভ, মৃৎরূপী প্রাণাধার। অবনীর সঙ্গে আরও গভীরভাবে যুক্ত হও। দুইজনে সাধন অনুশীলন কর। ঘন ঘন মিলিত হও। সে তড়িৎ গতিতে অগ্রসর হ'চ্ছে। তোমার ও তার

সাধন আরও একনিষ্ঠ হোক ও যুক্ত সাধন জয়যুক্ত হোক্। তা হ'লে মহা-কল্যাণে তোমরা নিয়োজিত হ'তে পারবে। আরও গভীর সাধন কর। আমি আছি কোনও ভয় করো না।"

জয় মা অভয়দায়িনী জননী আমার।

১২ই জানুয়ারী ১৯৬০ খৃঃ কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, একেবারেই যে দেখা দিচ্ছিস্ না এর কারণ কি? মা বললেন, "দেখা দিচ্ছি না, কিন্তু এই ত সব সময় তোমাকে স্পর্শ করে আছি। আমি ত' নিরবিচ্ছিন্নভাবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। স্থূলতা ও দেহাত্ম সংস্কার থাকলেই আমার কায়িক দর্শন হবে। জন্মান্তরের সংস্কারগত অভিলাষে সাধক আমার কায়িক দর্শন পায়। অতি উচ্চ সাধন অবস্থায়ও সাধক যখন অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ে আমার কায়িক দর্শনের জন্যে তখন তার আমার কায়িক দর্শনই হয়। স্থূলতা ও দেহাত্ম-সংস্কার মুক্ত যারা তাদের আর আমার কায়িক দর্শনের প্রয়োজন হয় না। আমি নিরাকার কিন্তু সর্ব্বভূতময় ও নিত্য সচলমান। বায়ু যেমন জীবের প্রাণধারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান অথচ অদৃশ্য আমিও তেমনি জীব ও জীবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র মুখ্য অবলম্বন ও ধারক কিন্তু নিরাকার। তোমাকে একদিন বলেছিলাম যে দেহীর পক্ষে আমাকে দেহের রূপে ছাড়া দেখা সম্ভব নয়। তার অর্থ যতদিন তার দেহাত্ম সংস্কার থাকবে তত দিনই সে সাধন করলে আমার কায়িকরূপ দর্শন করে। দেহাত্ম সংস্কার খণ্ডন হ'লে সে আমাকে সর্ব্বভূতময় অচ্যুদানন্দ নিরাকার ও নিরাধার ও মহা আনন্দের জ্যোতিতে দেখতে পায়। তার অনুভূতি আমার সমগ্র সত্তায় নিমগ্ন থাকে। সে আমার অমৃতানন্দ সুধার সাগরে নিত্য অবগাহন করে থাকে। তাতে আর আমাতে কোনও পার্থক্য থাকে না। আমি তখন হয়ে যাই সাধক গ্রাহী ও সাধক তখন হয়ে যায় আমা-গ্রাহ্য একাকার। আমি ও সাধক তখন একাকার হ'য়ে নিত্য নবলীলায় নব নব ভাবে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়ে থাকি। তখন আর সাধক আমাকে কায়িকরূপে দেখতে অভিলাষ

করে না। তুমি আত্ম নিষ্ট হও। আত্মা নির্ব্বিকার ও নিরাকার অর্থাৎ আত্মা বিকার রহিত ও আকার রহিত। আত্মনিষ্ঠ হ'লে দেহাত্ম-বিকার চলে যায় ও সাধক সংস্কার মুক্ত হয়। এই জ্ঞান দেবার জন্তেই তোমাকে আর দর্শন দিচ্ছি না। তুমি ত এখন আমার মহাসত্তায় নিমগ্ন হয়েছ। তোমার ত এখন প্রয়োজন নাই আমার কায়িকরূপ দর্শন করবার। আবার যদি দেহাত্ম-সংস্কার কিছু আসে তখন সেই সময়কার অত্যন্ত আকুলতায় আবার দর্শন দিতে পারি। এখন যে ভাবে সাধন করছ করে যাও। যা পাবার তা সময়ে পাবে। কোনও চিন্তা নাই। মহান্ কার্য্যের জন্তে প্রস্তুত হও। ভয় নাই আমি আছি।"

মা মা মা মাগো আমার মা

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "যোগই সমত্ব আর সমত্বই যোগ। যার সঙ্গে তুমি যোগে যুক্ত হও তার সঙ্গে সেই ক্ষণের জন্তে তোমার ও তার মানসিক একতা বা সমতা না হ'লে তার সঙ্গে যোগ হয় না। আর যার সঙ্গে তোমার মানসিক ভাবের একতা হয় তারই সঙ্গে তোমার যোগ হয়। মহাপ্রকৃতির বিধৃতি প্রত্যেক প্রাণীর সঙ্গে প্রত্যেক প্রাণীর একটা অব্যক্ত যোগ বা আকর্ষণ সৃষ্টি করে রেখেছে। এ আকর্ষণ ভাষায় ব্যক্ত না হ'লেও ভাবের আদান প্রদানে বা আকারে ইঙ্গিতে একে অন্তের সঙ্গে মানসিক একতা বা সমতা রক্ষা করে যোগে যুক্ত হয়। গভীর বনে হরিণ শিশুর কাতর ক্রন্দন কঠিন হৃদয় শিকারীর প্রাণে করুণা জাগ্রত করে যদিও হরিণের ভাষা শিকারীর কাছে অবোধ্য। এই ভাবেই জীব চৈতন্য সকল প্রকার প্রাণীর ভিতরে একে অন্তের প্রতি সমতায় যোগ রক্ষা করে ও তার সঙ্গে যোগ হ'লে আত্মপর্য্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমত্ব রক্ষা করে। এ অতি সূক্ষ্মজ্ঞানের কথা। যোগী যখন যোগে ব্রহ্মদৃষ্ট হয় তখন আমার আর যোগীর একতা হয়। আমি তখন যোগীর অন্তর নিহিত যোগ পর্য্যায়ের গণ্ডির ভিতরে এসে তার ভাবের সহায়তা করি। তখন জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার এক সমত্ব পরিলক্ষিত হয় ও সেই সমত্বে আমার সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে

যোগপূর্ণ হয়। আর আমার সঙ্গে যোগে যুক্ত হ'লেই আমার আর জীবাত্মার সঙ্গে সমন্ধ হয়। আমার মহান বিধৃতি বা পরমাত্মার স্বরূপত অংশ জীবাত্মার মহান বিধৃতি একে অন্যের সঙ্গে যোগে একই গ্রহণীর সমন্ধ রক্ষা ক'রে চলে। ভাব অভাব বোধ যখন সকল জীবেরই ভিতরে এক পদবাচ্য তখন জাতি বা ধর্ম্মের বিভিন্নতায় বৈরীতা উৎপন্ন হওয়া অস্বাভাবিক। বিভিন্ন পুষ্পের দ্বারা সূত্রের অংশে যা সংযোজিত হ'ল সেটাকে আর পুষ্প বল না। সেটাকে মালাই বলা হয়। তখন তোমাদের দৃষ্টি বা বিচার প্রত্যেকটি ফুলের প্রতি না হ'য়ে একটি অতি সুন্দর মাল্যের প্রতি স্থাপিত হয়। তখন বল বাঃ মালাটি ত' বড় সুন্দর। এই যে সুন্দর মাল্য এর সংযোজনা হয় সূত্রের সাহায্যে। কিন্তু সূত্র তখন অপ্রকট। সূত্রের প্রশংসা কেউ করে না। অথচ সূত্রই একমাত্র প্রতিপাদ্য বা ধারক যে প্রত্যেকটি পুষ্পকে সংযোজিত করে একটি সুন্দর মাল্যে রূপান্তরিত করেছে। একটি জায়গায় খুব সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'য়ে আছে। তোমরা পুষ্পের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা কর। কিন্তু যে মৃত্তিকায় সেই পুষ্প প্রস্ফুটিত হ'য়েছে সেটা তোমার প্রশংসার বাইরে বা তোমার মনোযোগের বাইরে। কিন্তু আসলে বৃক্ষের সঞ্জীবতা ও পুষ্পের বিকাশ ও সৌরভ সেই মৃত্তিকার দ্বারাই সম্ভব হ'য়েছে। তেমনি প্রাণীগণ বা জীবগণ একই মহান প্রকৃতিতে গ্রথিত। ধর্ম্ম, জাতি বিভিন্ন রূপ নিয়েই তারা মানব বলে পরিচিত। তখন তারা আর কোনও দেশের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তখন যোগ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের। কারণ তখন মহা মানবতারূপ মাল্যে তারা পরিণত অর্থাৎ তারা সমত্ব রক্ষা করছে কারণ একে অন্যের সঙ্গে যোগে যুক্ত হ'য়েছে আর যুক্ত হ'য়েছে বলেই মহা সমত্বে পরিণত হ'য়েছে। আমি যখন সূত্র বা মৃত্তিকা তখন আমার বিধৃত শক্তিতে বা রস সঞ্চারের ক্ষমতায় তোমরা বর্দ্ধিত ও পুষ্ট। সুতরাং একের প্রতি অন্যের যোগ প্রকৃতিগত কারণে সত্য ও যোগ যদি থাকে তবে সকলে একই সমত্বের অধিকারী—। আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। যখন ব্রহ্মভজনায় ব্রহ্মআরাধনায় মানবগণ আপন

আপন আত্মাকে মহাবিধৃত সর্ব্ব পরিব্যাপ্ত সকল জীবের ভিতরে দর্শন করবে তখন সে সকলের সঙ্গে এক যোগে যুক্ত হবে ও মহাসমত্বের অধিকারী হবে। এ ছাড়া ক্ষণভঙ্গুর জড় বাদের চর্চ্চার দ্বারা জগতে সমত্ব রক্ষা হবে না। এ মহান্ কর্ত্তব্য তোমার উপরে আমি দিয়েছি। সময়ে নির্দ্দেশ পাবে। সাধন কর উপযুক্ত হও।"

মা আমায় আবার অনেকদিন পরে জ্ঞান দান করলি মা। তুই মা আমার অপার জ্ঞানদায়িণী জননী আমার।

৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন, "দেখ মানব জীবনের সকল দুঃখের মূল একমাত্র "হিংসা"। আমি বললাম সেত আমি জানি। কারণ এ কথা তুমি আমাকে অনেকবার বলেছ। মা বললেন, "যা জান তার চাইতে আরও জানবার আছে ও যা বলেছি আরও বলবার আছে। বলছি, ধীর ভাবে শোন। যুগ যুগ ধরে অল্প অল্প ক'রে হিংসার ধারা মানব সমাজে এমন ভাবে স্বাভাবিক জীবনগত হ'য়ে প'ড়েছে যে আজ আর তাকে তোমরা হিংসা বলে মনেই কর না। কেবল যে কর না তাই নয় সে গুলো তোমাদের সামাজিক জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হ'য়ে গিয়েছে যেমন ধর চামড়ার জুতা, হাতের দস্তানা, গায়ের জামা, মাথার টুপী ইত্যাদি। এ গুলো না হ'লে আজকাল তোমাদের চলেই না। এ তোমাদের সামাজিক জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ হ'য়েছে। যদি কাউকে ছাড়তে বল লোকে হাসবে ও তোমাকে পাগল বলবে। যেমন ধর 'ডিম'। ডিম হ'চ্ছে "ভ্রূন"। এই ভ্রূন হত্যা মহা অন্যায়। কিন্তু আজ কি কেউ সেটা চিন্তা করে? ডিম না হ'লে আজ কাল তোমাদের চলেই না এও তোমাদের জীবনে অতি স্বাভাবিক অচ্ছেদ্য অংশ হ'য়ে গিয়েছে। মৎস ও মাংস আহার এও তোমাদের জীবনের এক অচ্ছেদ্য অংশ। কেবল তাই নয় মুণ্ডহীন মৃত পশু ও পক্ষীর দেহ সকল যখন বাজারে বিক্রেতার দোকানে সাজানো থাকে তখন কি তোমার অন্তরে সামান্যতম দুঃখ বা সহানুভূতি উপলব্ধি কর? কেন

কর না। কারণ তুমি শিশু অবস্থা থেকে এই সব দেখে অভ্যস্থ। এ তোমার মনে হয় অন্য খাবার দ্রব্যের মধ্যে এও আর একটি। তোমাকে গত বছর আবার রেঙ্গুনে পাঠিয়েছিলাম এক মহান্ উদ্দেশ্যে। সে উদ্দেশ্য হ'চ্ছে তোমার অন্তরে এক নব উপলব্ধির সূচনা করবার জন্যে। উপলব্ধি হ'চ্ছে যে তুমি দেখ যে, যে দেশ একদিকে অহিংসার শ্রেষ্ঠতম পূজারীকে পূজা করছে ও তাঁকে দেবতাজ্ঞানে সংসারের সকল দুঃখ নিবেদন করছে, সেই দেশ অন্যদিকে জীব মাংস ভিন্ন অন্য কিছু ভক্ষণ করে না। যেখানে প্রভাতে পক্ষির মধুর কূজন ও পশুর মধুর স্বর শোনবার কথা সেখানে প্রভাতে পশু, পক্ষির আসন্ন মৃত্যু-ভয়-চকিত আর্ত্তনাদে আকাশ বাতাস ভীত সন্ত্রস্থ হ'য়ে পড়ে। কেবল ব্রহ্ম দেশে নয় সারা পৃথিবী ব্যাপী এই হত্যার লীলা, রক্তের স্রোত অত্যন্ত নগ্ন ভাবে নিত্য নিত্য ভাবে প্রতিদিন অফুরন্ত ধারায় প্রবাহিত হ'চ্ছে। যে খৃষ্ট অন্যের সামান্যতম দুঃখ নিরসন করবার জন্যে স্বেচ্ছায় নিজ জীবন বিসর্জ্জন করলেন সেই মহা মানবের একদিকে পূজা চলছে আর একদিকে তাঁর জীবনের একমাত্র ও শ্রেষ্ঠতম আদর্শের পরিপন্থি কার্য্য সম্পাদন করছে' তাঁরই অনুগামীগণ। দেখ ইসলাম ধর্ম্ম সমাজে পশু পক্ষী হত্যাকেই ধর্ম্ম অর্জ্জনের একটি প্রকৃষ্ঠতম পথ বলে বিবেচনা করে। অথচ ভক্ত মোহম্মদ জীবনে কখনও জীব হত্যা করেন নাই বা করতে বলেন নাই। সমসাময়ীক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্মের আচরণ ও পদ্ধতির বিরুদ্ধেই তিনি তাঁর পবিত্র ধর্ম্ম "একেশ্বরবাদ" প্রচার করেন। "একেশ্বরবাদ ও পশু হত্যা সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী। এই কি সভ্যতা? এই যদি তোমাদের সভ্যতা হয় তবে নগ্নতা বা অসভ্যতা কি? এই যদি তোমাদের ধর্ম্ম হয়, এই যদি তোমাদের সমাজ জীবন হয় তবে তোমাদের ধ্বংস রোধ করবার ক্ষমতা কারুর নাই। মনে রেখ প্রত্যেকটি কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী ও প্রকৃতির নিয়মে অমোঘ। এর ব্যতিক্রম নাই। তবে কালের গতিতে কোনও কার্য্যের ফল অল্প সময়ে ফলে আবার কোনও কার্য্যের ফল বহুদিন পরে ফলে। তুমি যে অন্যায় করলে ও সে অন্যায় হয়ত তুমি জেনে শুনে করলে ও সেই অন্যায় করলে

বলে তোমার সন্তানগণের নিকট সেই অন্যায় স্বাভাবিক সমাজ নিয়মে পরিণত হ'ল। এমনি করে ধারাবাহিকরূপে একের পর এক অন্যায় এক জীবন থেকে অন্য জীবনে, এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে, এক পুরুষ থেকে পুরুষ পরম্পরায় সঞ্চারিত হ'য়ে অতি ধীরে ধীরে সকল মানব সমাজকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ, বিবেক বিরুদ্ধ অধর্ম্মপরায়ণ করে তুলেছে। আজ যে অবস্থায় মানব সমাজ এসে দাঁড়িয়েছে সে এক ভীষণ অবস্থা। জ্ঞান ও বিজ্ঞানে মহা উন্নত হ'য়ে আমাকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে, স্বভাবকে ভুলে গিয়ে নিজেকেই মহাশক্তিমান বলে মনে করছে ও সমাজে মানব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ অনাচার করে সেই অনাচারকেই সমাজের স্বাভাবিক আচার বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছে। জীব জগতে হিংস্র ও অহিংস্র প্রাণী আছে। হিংস্র প্রাণীর খাদ্য অহিংস্র প্রাণী। কিন্তু অহিংস্রকে এমন শক্তি প্রদান করেছি যে সে প্রকৃতির নিয়মে হিংস্র প্রাণীর হাত থেকে নিজের জীবন রক্ষার উপায় জানবে। কিন্তু তুমি ত' তাকেও ছলে বলে কৌশলে লুকিয়ে হত্যা করছ। তার স্বাভাবিক পরিবেশের ভিতরে যে বিজ্ঞতার প্রয়োজন সে বিজ্ঞতা তার থাকা সত্ত্বেও তুমি কৌশলে অত্যন্ত হীনতম ভাবে তাকে হত্যা করছ। তোমাকে ত জীব মাংস ভক্ষণ করবার জন্যে প্রস্তুত করি নাই। তোমার প্রয়োজন তুমি উৎপাদন করবে এমন শক্তি তোমাকে দিয়েছি যা অন্য জীবকে দেই নাই। কিন্তু তোমার সে স্বাভাব সত্ত্বেও জীব মাংস ভক্ষণ করছ। এ মানব ধর্ম্ম নয়। শীর্ষ সম্মিলন হোক্, পঞ্চশীল হোক্ আর অহিংসার কথা বা নিরস্ত্রিকরণের কথা যতই হোক্ সমাজের ভিতরে এই হিংসার প্লাবন যদি রোধ না হয় তবে অচীরে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। হাজার দু হাজার দশ হাজার বৎসর একটা পৃথিবীর পক্ষে বা কালের মহাগতির কাছে কিছুই নয়। আজ হয়ত ধ্বংস নাও আসতে পারে যদি ধরে নাও, কিন্তু এ অবস্থা যদি চলতে থাকে তবে মানব জাতির ধ্বংস অবধারিত। বহুবার আমি বহু মহাপুরুষের মাধ্যমে মানব জাতিকে সচেতন করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু সকলে গ্রহণ করে নাই ও যদি বা কেউ গ্রহণ করছে দু'দিন বাদেই আবার ভুলে

গেছে। আপন আপন লালসার বশবর্ত্তী হ'য়ে বিবেক ধর্ম্ম ধ্বংস করেছে। এই হিংসা সম্পূর্ণ নিবারণ করা আশু ও অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাণী হত্যা জীব হত্যা সকল দেশ থেকে সমূলে উচ্ছেদ প্রয়োজন। এতে মানব বিবেককে, মানব ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ও রাহুগ্রস্থ করে রেখেছে। সর্ব্বতোভাবে জীব হিংসা পরিত্যাগ করলেই মানব সমাজ এক মহা প্রেম পরিবারে পরিণত হবে ও বহুদিন সুখে, সমৃদ্ধিতে, জ্ঞান, বিজ্ঞানের মহা উৎকর্ষে-ধাবিত হবে ও আমাকে উপলব্ধি করতে পারবে। পরে সময়ে আরও বলব।"

জয় মা আনন্দময়ী জ্ঞান দায়িনী জননী আমার।

২৭শে মার্চ্চ, ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম যে আমাকে অনেকেই, বোকা, ইডিয়ট্, অপরিণামদর্শী ইত্যাদি ব'লে যে গাল দেয় তাতে আমার মন অনেক সময় ভেঙে যায়। এর কি উপায় মা? মা বললেন, "প্রকৃতি গত ব্যর্থতা অনেক সময় জীবনের স্বরূপকে গ্রহণ করে বা অধিকার করে বা গ্রাস করে।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, প্রকৃতিগত ব্যর্থতাই বা কি আর জীবনের স্বরূপই বা কি? মা বললেন, "প্রকৃতি গত ব্যর্থতা হ'চ্ছে প্রাক্তন কর্ম্মের ফল, এ জীবনে কর্ম্মের ফল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবেশ, বিষয় ভোগ লিপ্সা ইত্যাদি। আর জীবনের স্বরূপ হ'ল আমার প্রতি উন্মুখতা ও আমার তোমার উপর কৃপা বা করুণা সম্পাত।" আমি বললাম এর প্রকৃত তাৎপর্য্য ভাল করে বুঝিয়ে দাও, তেমন বুঝতে পারলাম না। মা বললেন, "শোন, দিনের বেলায় সারা আকাশ যখন ঘন কালো মেঘে আচ্ছাদিত থাকে তখন সূর্য্যের কিরণ সেই মেঘের আস্তরণ ভেদ করে উন্মুখ পৃথিবীর উপর পতিত হবার চেষ্টা করে। একটু মেঘ যেই সরে গেল, অমনি একটু আলোক এল ও অমনি পৃথিবী হাসল। একটু পরে মেঘ এসে সে আলোক আচ্ছাদিত করে দিল ও পৃথিবী বিমর্ষ হ'য়ে পড়ল। এমনি করে মেঘ ও সূর্য্যের কিরণের ভিতরে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যদি মেঘ তার গভীর

ঘন আস্তরণ আকাশে বিছিয়ে দিতে পারে তবে আর সূর্য্য পৃথিবীকে তার কিরণ দিতে পারে না ও পৃথিবী বিষাদ মলিন দেখায়। কিন্তু যদি কিরণ মেঘের আস্তরণ আস্তে আস্তে ভেদ করে পৃথিবীতে আসতে পারে ও মেঘকে তার শক্তির তেজে সরিয়ে দিতে পারে তবে ধীরে ধীরে মেঘ মুক্ত আকাশে সূর্য্যের নির্ম্মল কিরণ সারা পৃথিবীকে পূর্ণরূপে আলোকিত করে ও পৃথিবী সেই আলোকে মহানন্দ লাভ করে— সকল জীব, তরুলতা যেন আনন্দে নৃত্য করতে থাকে। তোমাকে পৃথিবী মনে কর, মেঘকে প্রাক্তন কর্ম্মফল ইত্যাদি বা প্রকৃতিগত ব্যর্থতা মনে কর আর সূর্য্যের কিরণ আমার কৃপা প্রবাহ মনে কর। পৃথিবীতে আমার প্রতি উন্মুখ অনেকেই কিন্তু তাদের প্রাক্তন কর্ম্মফল, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্ভূত কার্য্য কারণের ফল, বিষয়-ভোগ-লিপ্সা ইত্যাদিতে আমার কৃপা কিরণ সম্পাত তাদের প্রতি পতিত হ'তে ব্যাহত করে। আমার কৃপা কিরণ প্রত্যেকের প্রতি বর্ষিত হবার জন্যে অহর্নিশি ধাবিত হ'চ্ছে। কিন্তু যদি প্রকৃতিগত ব্যর্থতা তার জীবনের স্বরূপকে অর্থাৎ আমার প্রতি উন্মুখতাকে গ্রাস করে তখন তার বিমর্ষ অবস্থা, মোহগ্রস্থ অবস্থা ও সে হীনতম অবস্থার ভিতরে পতিত হয়। সূর্য্যের কিরণ যেমন সকল অন্ধকার বিদূরিত করে, আমার কৃপা কিরণও তেমনি সকল মোহ, সকল জড়তা ও সকল অজ্ঞানতা বিদূরিত করে। এই কৃপা কিরণের প্রতি তোমার উন্মুখতাই তোমার অর্থাৎ মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম স্বরূপ। তোমার উন্মুখতা যতই আমার প্রতি গভীর হবে ততই ধীরে ধীরে আমার কৃপা কিরণ তোমার জীবনকে আলোকিত করবে ও ধীরে ধীরে প্রকৃতিগত ব্যর্থতার অপনোদন হবে। তোমার প্রাক্তন কর্ম্মফল গত জীবনের, অনেক পূর্ব্বেই শেষ হ'য়ে গেছে। এই জন্মের তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ সম্ভূত ও তোমার অনেক অন্যায় কার্য্যের ফল তোমার জীবনের স্বরূপকে এখনও বাধা দান করছে। আমার প্রতি বিমুখতাই হীন কর্ম্ম করায় ও হীন কর্ম্মের সকল ফল মানবকে হীন বৃত্তিভোগী করায় ও হীন বৃত্তিভোগীগণ গ্রহ প্রভাবে অচিরাৎ দুঃখে পতিত হয়। আমার প্রতি

উন্মুখতা হীন কর্ম থেকে জীবকে রক্ষা করে, হীন কর্ম থেকে রক্ষা পেলে আমার সঙ্গে মানবের সাক্ষাৎ যোগাযোগ হয় ও সাক্ষাৎ যোগাযোগ হ'লে সকল কর্মফল খণ্ডন হয় ও কোনও গ্রহ প্রভাব আর তার উপর কার্য্যকরী হয় না। তুমি অযথা ওই সব উক্তিতে বিচলিত হ'য়ো না। তুমি তোমার জীবন পঞ্জির গ্রহ প্রভাবের বিষয় চিন্তা করো না। কারণ তোমার যে টুকু উন্মুখতা আমার প্রতি হ'য়েছে ও যে টুকু আমার কৃপা কিরণ তোমার প্রতি বর্ষিত হ'চ্ছে তাতে সকল কর্ম ফলের প্রভাব ও গ্রহের প্রভাব তোমার প্রতি বৈরীতা করলেও তোমাকে আর তারা ক্লিষ্ট করতে পারবে না। তারা এখন থেকে ধীরে ধীরে তোমার উন্মুখতার পথ থেকে ও আমার কিরণ সম্পাতের ধারা থেকে সরে যাবে। এখন থেকে যত তুমি আমার প্রতি গভীর ভাবে উন্মুখ হবে তত তোমার সর্ব্ব বিষয়ে মহা উন্নতি হবে। আমার প্রতি একাগ্র উন্মুখতাই সর্ব্ব দুঃখ হরণ করে। সে দুঃখ শারীরিক, মানসিক, বাচনিক, আত্মিক যে কোনও কর্মফল সম্ভূত হোক না কেন। তুমি নির্ব্বিকার মনে একান্তে আমার প্রতি উন্মুখ হ'য়ে থাক। নিজ জীবন পরিচর্য্যায় জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বরূপকে আপন শ্রেষ্ঠ মার্গে স্থাপন কর। কারুর কোনও উক্তিতে ক্লিষ্ট হ'য়ো না। নির্ব্বিকার মনে সকলকে মহা ক্ষমায় উপেক্ষা করে যাও। জীবনের স্বরূপ যার নিকট উন্মুক্ত হ'য়েছে আমার কৃপা কিরণ যার জীবনে প্রতিফলিত হ'য়েছে তার জীবনের সকল উন্নতির ভার আমার হস্তে। পৃথিবীর এমন কোনও শক্তি নাই যে শক্তি আর তোমাকে তোমার জীবন পথে বাধা উৎপাদন করতে পারে। নির্ভয় হও, আমাগত হও, আত্মগত হও, আত্ম চিন্তায় মগ্ন থাক। গৃহ, বিত্ত ও সকল সাংসারিক কর্ত্তব্য তুমি সম্পাদন করতে পারবে অচিরে। সাধন কর, আমি আছি, কি তোমার ভয়?"

জয় জয় জয় মা মা মা আনন্দময়ী জননী আমার।

রবিবার ৩রা এপ্রিল, ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্মমন্দিরে শ্রবণীদার উপাসনা ও বিভূতিদার সঙ্গীত ছিল।

উপাসনায় বসে আরাধনায় গভীর ভাবে নিমগ্ন হলাম। ধীরে ধীরে অনন্ত ব্যোম মণ্ডলে এসে পড়লাম। আরাধনার সঙ্গে আমার এই যাত্রা পর পর এক এক করে মিলে যাচ্ছে। অনন্ত মহাভূমায় মহা আলোকের লোকে এসেছি। চারিদিকে মহা জ্যোতির্ময় লোক, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ স্বরূপ। আমি মহানন্দে বিচরণ করছি। ক্রমে আমার দেহের ভিতরে সেই জ্যোতি প্রবেশ করতে লাগল। মস্তকের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে সেই জ্যোতি আমার সকল দেহ পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় করে দিল। আমি দেখছি যে আমি অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় লোকে বসে আছি ও আমার দেহ জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ হ'য়ে গেছে। আমার সকল দেহ, মন ও আত্মা পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে গেছে—। মহানন্দ পারাবারে জ্যোতির অফুরন্ত প্রস্রবণে আমি একেবারে আপ্লুত হ'য়ে গিয়েছি। হঠাৎ অবনীদার একটা কথা কানে এল, "এইবার দেখা দাও"। অমনি একটি মুখ মণ্ডল (মাতৃ মুখমণ্ডল) ক্ষণিক উদ্‌ভাসিত হ'য়ে মিলিয়ে গেল। মা বললেন, "মনে রেখ, আজ মহাদিন, ৩রা এপ্রিল, ২২শে চৈত্র, এই ক্ষণে তোমার জীবনে এক মহা পরিবর্ত্তন সূচিত হ'ল। তুমি এক স্তর থেকে আর এক স্তরে এলে। সাধন স্তর থেকে পরিপূর্ত্তির স্তরে এলে। আজ থেকে তোমার জীবনে সকল দিক থেকে পরিপূর্ণতা আসবে। ধর্ম্মে. অর্থে, কামে, বিত্তে গৃহে সম্পদে, সাধনায়, সকল দিকে তোমার পরিপূর্ণতা আসবে। আর কোনও বিপদে, সঙ্কটে তোমাকে ক্লিষ্ট করতে পারবে না। কোনও গ্রহের প্রভাব তোমার উপর আজ থেকে আর বর্ত্তাবে না। ধীরে ধীরে তোমার দেহ পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ও অগ্নিময় হয়ে যাবে। তুমি সময়ে অন্ধকারে জোনাকির মত জ্যোতি উৎপাদন করবে। আজ থেকে তোমার মহাজয় ঘোষিত হল। ঐ দেখ স্বর্গে সকল সাধু মহাপুরুষগণ তোমার এই মহাপরিবর্ত্তন ও উন্নতি আনন্দ মনে নিরিক্ষণ করছেন"। দেখলাম অগণিত আলোক বর্তিকার মত শত শত জ্যোতির খণ্ড মহা মণ্ডলে সমাবেশিত হ'য়ে আছে। মা বললেন, "আর তোমার দেহাধিকারে দর্শন নয়। তোমার এবার আত্মিক দর্শন হ'ল।

আত্মাদের তাঁদের নিজ নিজ স্বরূপে দর্শন করলে।" সঙ্গীত হ'ল যেন এই মহা পরিবর্ত্তনের লগ্নকে আবাহন করে। "কি নিবেদিব আমি হে, গভীর তোমার প্রেম সাগরে নিমগন কর তুমি"—রবীন্দ্রনাথ রচিত।

মার আমার অপার লীলা। আমার মা, আমার মা। জয় জয় মা জগত জননী দয়াময়ী। মাকে বললাম, আজত ২০শে চৈত্র। কিন্তু তুমি বলছ ২২শে চৈত্র। মা বললেন গননায় তোমাদের ভুল আছে। আজই ২২শে চৈত্র। বহু কল্প ধরে এই ভুল হ'য়ে আসছে। আমি যা বললাম তাই ঠিক।"

এ মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমার অন্তর এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেছে। আমি সত্যই এক নব জন্ম লাভ করলাম। কিছুই বুঝতে পারছিনা কেন এমন হল আজ। মার কাছে অনেক কিছু প্রার্থনা করলাম। গৃহ বিত্ত, অর্থ, ভক্তি, বিশ্বাস, দয়া, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য, মহাশক্তি ও আমার উপর যে গুরু কর্ত্তব্য দিয়েছেন সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করবার শক্তি ও বিশ্বাস। মা মুক্ত হস্তে আজ সব আমাকে দিলেন। এ এক অপার করুণা। আমি মার ছেলে, মার সঙ্গে যোগ যুক্ত হ'লাম।

জয় জয় মা সর্ব্বশক্তি দায়িনী জগত জননী আমার মা।

২৭শে এপ্রিল, বুধবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

মা বললেন "সবইত আমার। তোমাদের কি আছে? তোমাদের থাকার মধ্যে আছে অহঙ্কার। এই অহঙ্কার নিয়ে তোমরা আমাকে অস্বীকার ক'রছ। তোমরা কত জিনিষ তৈরী করছ ও ভাবছ তুমি কত বড় বৈজ্ঞানিক, যেমন ইচ্ছা তেমনি কত তৈরী করছ। মোটর গাড়ী, উড়ো জাহাজ, রেল ইঞ্জিন, বেতার যন্ত্র, বিদ্যুতের কত রকমারী যন্ত্র যা দিয়ে তোমরা প্রতিদিন কত আরাম আনন্দ পাচ্ছ ও নানা কাজ কর্ম্ম করছ। কিন্তু গোড়ার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে সবই তুমি করতে পার ও করছ এই ভাব নিয়ে আমাকে তোমাদের প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় সম্পূর্ণ অস্বীকার করছ। ভেবে দেখ বায়ু দিয়েছি বলে পাখা চালিয়ে হাওয়া পাও, অগ্নি দিয়েছি বলেই

রেল, উড়ো জাহাজ, কল, কব্জা, যান বাহন ইত্যাদি কার্য্য সম্ভব হ'চ্ছে। আজ যদি বায়ু বন্ধ করে দেই তবে কি তোমাদের জীবন ধারণ সম্ভব হবে? বিদ্যুতের পাখায় হাওয়া পাবে? অগ্নি যদি প্রজ্জ্বলিত না করি তবে কি তোমাদের কোনও কল, কব্জা, যন্ত্রপাতি, যান বাহন চালানো সম্ভব হবে বা তোমার জীবন ধারণ সম্ভব হবে? আমার সম্পদ তোমাদের দিয়েছি। সেই সম্পদের সাহায্যে বুদ্ধির দ্বারা তোমার প্রয়োজনীয় সব কিছু প্রস্তুত করবার মত উদ্‌ভাবনী শক্তিও আমারই দান। যে দেহ সৃষ্টি করেছি তার বিচিত্র প্রণালী এমন ভাবে সংযোজিত করেছি যে আপাত দৃষ্টিতে তুমি মনে কর যে সব কিছু তুমিই করছ। কিন্তু আসলে তা নয়। তোমার যা কিছু সৃষ্টি সে আমার সৃষ্ট প্রণালীর দ্বারা সম্ভব হ'চ্ছে। তুমি যদি গভীর ভাবে তোমার অন্তরে প্রবেশ কর তবে বুঝতে পারবে প্রতিটি জিনিষ আমারই দেওয়া সম্পদ থেকে ও আমারই দেওয়া উদ্‌ভাবনী শক্তির দ্বারা সৃষ্ট। তোমাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তুমি অত্যন্ত গর্ব্বিত। কিন্তু গর্ব্ব করবার তোমাদের নিজস্ব কিছুই নাই। আমার সম্পদ আছে বলেই ও সেই সম্পদ তোমার উদ্‌ভাবনী শক্তির কাছে সহজ লভ্য বলেই তোমাদের বিজ্ঞান অনেক কিছু সৃষ্টি করছে। তোমার ক্ষমতা কিছুই নাই। আমার দেওয়া শক্তিকেই আহরণ করে তোমরা সব কিছু করছ। এই ভাব যদি মনে থাকে তবে তোমরা আমাকে স্বীকার করবে। আর যদি সে ভাব তোমাদের অন্তরে না থাকে তবে তোমার মনে অহঙ্কার আসবে। এই অহঙ্কার তোমাদের অন্তরকে শুষ্ক করে দেবে ও আমাকে অস্বীকার করবার মত মনোভাব তোমার অন্তরে জাগ্রত করবে। তুমি আরও আমার প্রতি একাগ্র হও ও সাধন কর। তোমার কোনও ভয় নাই। আমি আছি।"

জয় মা আনন্দময়ী জননী।

২৭শে এপ্রিল, বুধবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "দেখ, বিশ্বাস, নির্ভর ভক্তি প্রেম এ সব হ'ল

আমার কাছে আসবার পথ। আমার কাছে আসতে হ'লে এই সব পথ গ্রহণ করতে হয়। একবার আমার সঙ্গে মিলিত হ'লে বা তোমার অন্তরে আমার উপস্থিতির অনুভূতি যদি প্রতি নিয়ত হয় ও তুমি ও আমি যদি নিত্য যোগে যুক্ত হই তবে আর এ সবের প্রয়োজন কি? একবার তুমি আমাকে পেলে তোমার ত' আর রাস্তার প্রয়োজন নাই। নিয়ত তুমি যদি আমার একান্ত থাক তবে ভক্তি, বিশ্বাস নির্ভরের আর তোমার কি প্রয়োজন? তবে যতদিন তোমার অন্তরে আমার উপস্থিতি সম্পূর্ণ সহজ, সরল ও জীবন্ত না হবে ততদিন তোমার ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরের পথ নিতান্ত প্রয়োজন। আমাকেই যখন পেলে তখন আমি আছি কিনা তার জন্যে তোমার বিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে যখন তুমি নিত্য যুক্ত তখন আমার প্রতি ত' আর নির্ভর ও ভক্তির প্রয়োজন নাই। কারণ আমি তোমার মাতা। তুমি আমাকে পেয়ে সহজ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত হ'লে তুমি আমার প্রতি নিয়ত নির্ভর শীল থাকবেই।''

আমার মা চির আনন্দময়ী।

৬ই মে, শুক্রবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ লেকে বেড়িয়ে মাকে বললাম, তুমি আমাকে কি ছেড়ে দিলে? যে সব অলৌকিক দৃশ্য, বিদেহী আত্মা ও তোমার দর্শন কিছুদিন আগেও আমাকে দেখাতে এখন ত' আর সে সব দেখাও না। মনে হ'চ্ছে যেন আমার সাধনায় অবনতি হ'চ্ছে। অথচ আমি আমার বিশেষ কোনও গুরুতর ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি না। একমাত্র ত্রুটি নস্যি নেওয়া ও আমিষ ভক্ষণ। তার জন্যেত' তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে আমাকে বল দাও যাতে নস্য আর আমিষের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা হয়। তবে এমন হ'চ্ছে কেন? মা বললেন, "নস্য তোমার ছাড়া নিতান্ত দরকার। সে হবে ও তোমার নস্য ও আমিষের প্রতি বিতৃষ্ণাও আসবে। আস্তে আস্তে হবে। এখনও যখন এ-দুটোর প্রতি তোমার ভোগের আকাঙ্ক্ষা আছে তখন কিছুদিন আরও চলবে। সময়ে সব

ঠিক হ'য়ে যাবে। তবে ওরা যে অন্যায় সে বিষয় সতর্ক থাকবে ও যত তাড়াতাড়ি পার ছেড়ে দেবে। আমি তোমাকে ছাড়ব কেন? সে কখনও হবে না। আমার মহান্ উদ্দেশ্য সাধন ও উদ্‌যাপন করবার একমাত্র দায়িত্ব তোমার উপর। তোমাকে আমি নানা ভাবে সাধন শেখাচ্ছি যাতে তুমি সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হ'তে পার। সাধনের প্রত্যেকটি দ্বারে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। সেই সেই সাধনের পদ্ধতি ও তার ফল তোমাকে দিচ্ছি। তুমি এর কতটুকু বুঝবে? তোমাকে অনেকবার বলেছি যে তোমার চিন্তা করবার কিছুই নাই। আমার কার্য্যের জন্যেই আমিই তোমাকে উপযুক্ত করে নিচ্ছি। যা করছ মনে রেখ সবই আমার ইচ্ছায় হ'চ্ছে ও সেই তোমার সাধন। প্রত্যেকটি দিনে, প্রত্যেকটি কাজে, প্রতি নিশ্বাস, প্রশ্বাসে তোমার সাধন চলছে বিভিন্ন দ্বারে। এই সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় তোমার জীবনকে মহা সম্ভাবনায় নিয়ে যাবে ও শুধু আমারই কর্ত্তব্য এই পৃথিবীতে সম্পাদন করবার জন্যে। আমি চুপ করে বসে নাই। যে সব হ'য়েছে সেই সবই কি বার বার হবে? তা' হ'লে বিভিন্ন অবস্থায় ও নানা দ্বারে সাধনের অভিজ্ঞতা কি করে তোমার লাভ হবে? মনে রাখবে জীবনের বৈচিত্রের ভিতরে বিচিত্র সাধন ব্যবস্থা আমারই যোজনা। যাকে আমি চিহ্নিত করেছি আমার মহান্ কার্য্যের জন্যে সেত' আর নিজ ভাবে চলতে পারে না। পূর্ণভাবে আমি তাকে নিয়ে চলেছি। অপরিণত জীবনে সাধনের বিভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। তাই তোমার জীবনকে পরিণত করছি। তোমাকে বলেছি এই বৎসর থেকে তোমার জীবনে পরিপূর্ত্তি আরম্ভ হ'ল। পরিপূর্ত্তি চলবে তারপর বিকাশ। এখন তোমার নিকট-সম্বন্ধ যোগ সাধন হ'চ্ছে। একে নৈকট্য-যোগ-সাধনও বলতে পার। এ যোগ সাধন হ'ল সর্ব্ব সময় আমি তোমার নিকটে আছি, আমি তোমার সকল কার্য্য অবলোকন করছি, তুমি ও আমি সর্ব্বসময় মুখোমুখি হ'য়ে আছি। এ যোগ সাধনে বিশ্বাসের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে। জীবন্ত বিশ্বাস বা অচল বিশ্বাস জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আর কোনও সময় তোমার

জীবনে আমার অস্তিত্বের প্রতি তোমার মনে সংশয় আসবে না। এই নৈকট্য-যোগ-সাধন অতি উচ্চ সাধন। এই সাধনে মানব মহা-সাধক ও আত্মাগত হয়। সে মহাব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয় ও সর্ব্বশক্তি লাভ করে। এ সব তুমি যে না জান তাত নয়। তোমাকে ত' আমি যে সাধনে নিয়ে যাচ্ছি সেই সাধনের কথাই ত তোমাকে জানিয়ে করছি। তুমি জান কিন্তু তোমার মনে এখনও সংশয় আছে। তাই তুমি আজ আমাকে এই প্রশ্ন করলে। মানবের জীবন এক অমূল্য সম্পদ। এই সংসারে তার বিভিন্ন সাধনা হ'চ্ছে। জানবে সে সাধক। কারণ তার পরিণতি এক মহান্ সাধক রূপে। জন্মান্তরের ভিতর দিয়ে স্বাভাবিক গতিতে মানব নিজ পথ গ্রহণ করে আমার ইচ্ছায়। পাপ, পুণ্য কিছুই এই সাধনের পথকে ব্যহত করতে পারে না। যা কিছু অন্যায় করে সেও তারই পরবর্ত্তী উন্নতির জন্য। মনে সংশয় রেখো না। আমি সর্ব্বসময় তোমার হাত ধরে আছি ও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি এটা সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে জীবনে উপলব্ধি কর ও বিশ্বাস কর। তোমার কিছু করবার নাই আমিই সব করছি। তোমাকে আমিই প্রস্তুত করে নিচ্ছি। জীবনের গতিকে সংশয় দিয়ে ব্যহত করো না। তোমার নৈকট্য-যোগ-সাধন হ'চ্ছে এখন। যা পেয়েছ সে সব যখন আবার চাইবে তখনই পাবে কারণ তাতে তুমি সিদ্ধ হ'য়েছ। তবে সে সব নিয়ে আর চঞ্চল হয়ো না। যে সাধন এখন হ'চ্ছে সেই দিকেই একাগ্র হও—। তোমার ভয় কি? আমি যার সব দিক রক্ষা করছি তার কি আর ভাবনা কিছু আছে? আমিই তোমার মহাদুর্গা সারৎসারা ব্রহ্মময়ী শ্রীহরি।"

মা গো আর কিছু তোকে বলবনা মা।
আমায় ক্ষমা কর মা। জননী আমার।

১১ই মে, বুধবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে লেক থেকে বেড়িয়ে ফিরে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যে সেদিন বলেছিলে যে আত্মাও কাল গর্ভে পতিত হয় সে বিষয় বিশদভাবে

আমাকে বুঝিয়ে দাও না। মা বললেন, "শোন, জীবাত্মা দেহ ধারণের পর স্থূল বিষয়ে যদি সম্পূর্ণ নিমগ্ন হ'য়ে আত্ম-স্বরূপ ভুলে যায় তবে সে পূর্ণ মোহগ্রস্থ হয় ও সেই তার কাল গর্ভ বা মোহ-আবর্ত্ত। এ অবস্থায় দেহপাত হ'লে সে নিজ অবস্থা বা দেহান্তররূপ পরিবর্ত্তন বুঝতে পারে না। বিদেহী হ'য়েও তার স্থূল বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রকট থাকে ও তার গত জীবনের স্থূল পরিবেশেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখে। এ অবস্থায় উচ্চ সাধক আত্মার সংস্পর্শে এলে আর তার মোহ থাকে না। এই কাল গর্ভ বা মোহ-আবর্ত্ত এত ভীষণ যে তার স্থূল আশা আকাঙ্ক্ষাও তৃপ্ত হয় না অথচ ভীষণ স্থূলতা তাকে গ্রাস করার দরুণ সে অপার মনোবেদনা পেতে থাকে। বিষয়ে একেবারে মগ্ন থেকে অনেক অন্যায় অনুষ্ঠান করার জন্যে ও আমাকে অবিশ্বাস বা উপেক্ষা করার জন্যে এই অবস্থা আত্মা প্রাপ্ত হয়। আত্মার জন্ম আমার থেকে হওয়ার পরে সে নিজেকে অত্যন্ত স্বাধীন ও শক্তিশালী মনে ক'রে আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। আমি যে তার জন্মদাতা সেটাই সে অস্বীকার করে। ফলে তার জন্মান্তর পরিক্রমা আরম্ভ হয়। কীটানুকীট্ থেকে এই পরিক্রমা আরম্ভ হয়। কারণ প্রতি জীবনের অভিজ্ঞতা তার প্রয়োজন যাতে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। এই জন্মান্তরের ক্রমবিকাশে ক্রমে সে উন্নত পশু জন্মে নীত হয়। তার বুদ্ধি বৃত্তি বা জ্ঞান বিকাশ ক্রমে পরিপক্ক ও আত্ম-সম্বন্ধ হ'তে থাকে। এই যে তার জীবজন্ম পরিক্রমা এও তার কাল গর্ভ বা মোহ আবর্ত্ত। কারণ মানব জন্ম পরিগ্রহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবাত্মার আপন আত্মার বিষয় কোনও উপলব্ধি থাকে না। সে পর পর দেহ ধারণ ক'রেও পূর্ণ দেহ সম্বন্ধই থেকে যায়। তবে একটুকু কার্য্য আমি করি সেটা হ'চ্ছে তার ভিতরে মৃত্যুভয় দেওয়া। এই মৃত্যুভয় টুকুই তার সম্বল ও ওইটাই একমাত্র নিশানা যে সে সময়ে আত্ম সম্বন্ধ হবে। তারপর মানব জন্ম লাভ করবার পরেও যদি সে দেহ সম্বন্ধ থাকে তখন তাকে উদ্ধার করা সম্ভব। কারণ তার বুদ্ধি বৃত্তি বা জ্ঞান বিকাশ এত স্বচ্ছ হয় যে তার ভুল বুঝিয়ে দিলে সে তখন নিজেকে কালগর্ভ বা মোহ-

আবর্ত্ত থেকে মুক্ত করবার জন্যে চেষ্টা করে। এই চেষ্টার উন্মেষ হ'লেই আমি এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করি নানা ভাবে। একবার সে যদি আমাকে স্বীকার করে বা আমার অখণ্ড ক্ষমতার নিকট আত্ম-সমর্পন করে তখন ত' সে আর উদ্ধত নয়। তখন সঙ্গে সঙ্গে আমি এগিয়ে এসে তাকে গ্রহণ করি ও বলি এবার বুঝেছ যে তুমি কেউ নও, ও তোমার কোনও ক্ষমতাই নাই, আমিই সব ও আমারই ক্ষমতায় তুমি ক্ষমতাবান্। এইত আমার লীলা বা খেলা! সৃষ্টি করছি ও সেই সৃষ্টকে আমাগত করে আমার লীলা সহচর করছি। এবার বুঝেছ?" হঁ্যা মা এবার অতি পরিষ্কার ভাবে বুঝেছি।

জয় জয় মা আনন্দময়ী জননীর জয়।

১২ই মে, বৃহস্পতিবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে প্রায় ৪টার সময় ঘুম থেকে জেগেই দেখি মা দাঁড়িয়ে হাসছেন। আমাকে বললেন, "আজ লেকে গিয়ে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ দেখে অবাক হবে।" প্রায় ৫টা নাগাদ রওনা হ'লাম। বড় রাস্তা থেকে লেকে ঢুকবার যে ছোট দরজা আছে তার একটু পূর্ব্বে রেলিং ঘেসে ওপারে একটা গাছের নীচে একটি প্রতিমা। মাতৃমূর্ত্তি গর্দ্দভের পিঠে উপবেশন করে আছেন। গলায় একটি সাদা ও লাল ফুল দিয়ে তৈরী বড় ফুলের মালা। প্রতিমাটিকে এমন ভাবে রাখা হ'য়েছে যে আমি যে রাস্তা দিয়ে বরাবর গিয়ে রেলিং এর যে ধারে উঠি ঠিক সেই দিকে। যেন আমার সঙ্গে মুখো মুখি হ'তে পারে সেই জন্যেই ওই ভাবে রাখা হ'য়েছে। মা বললেন, "গর্দ্দভ হ'চ্ছে সরলতার প্রতীক। আমি সরলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সরলতার বহু দিক আছে। এই সরলতার অর্থ নির্ব্বিরোধ জীবন, যে জীবনের দ্বারা অন্য কোনও জীবের প্রতি বৈরীতা না হয়। তোমার জীবন ধারণের জন্যে অন্যের ক্ষতি করা সরলতার অভাব। এই ভাবকে সাত্ত্বিক ভাব বলে। এই সাত্ত্বিক ভাব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত কঠিন। তোমাকে আগেও বলেছি যে তোমাদের জীবনে এমন

অনেক অন্যায় জীবনগত, অভ্যাসগত ও প্রকৃতিগত হ'য়ে গেছে যে সে সব অন্যায় আর তোমাদের কাছে অন্যায়ত নয়ই বরং সেগুলো তোমাদের জীবনে অপরিহার্য্য হ'য়ে গেছে। সমাজগত বস্তুতান্ত্রিক জীবনে এই সব বিশেষ অন্যায় বিশেষ মর্য্যাদা লাভ করে আসছে। সুতরাং যারা পূর্ণ বিষয় মুখিন্ ও সাংসারিক স্থূল কর্ম্ম প্রবাহে লিপ্ত তাদের পক্ষে এই সব অন্যায়কে অন্যায় বলে মেনে নেওয়া কঠিন ও এক কথায় অসম্ভব। কিন্তু যারা আমার প্রতি অনুরক্ত, প্রজ্ঞার বিচারে চলে বা ধর্ম্ম-চর্চ্চা করে তাদের পক্ষে এই সব অন্যায় অসাত্ত্বিক কার্য্যরূপে পরিগণিত হয়। তাদের ধর্ম্ম-সাধনে বা আমার নাম কীর্ত্তনে এই সব অন্যায় গভীর বাধা স্বরূপ হ'য়ে পড়ে। যাদের এ বিষয়ে জ্ঞান নাই তারা এই অন্যায়ের ফলস্বরূপ ফল ভোগের বা আমার বিচারের হাত থেকে রক্ষা পায় না। যেমন ধর হরিনাম কীর্ত্তন হয় খোল কর্ত্তাল সহযোগে। খোলের দুই দিকে জীব চৈতন্যের দেহের চর্ম্ম দিয়ে ঢাকা হয়। খোলের উপরেও বাঁধন থাকে চর্ম্মের। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ চর্ম্মের মৃদঙ্গ ও ঐরূপ বাদ্যের সাহায্যে শ্রীবুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। আমার নানা পূজায় বাদ্য, মৃদঙ্গ ইত্যাদি চর্ম্মের দ্বারা প্রস্তুত। অনেক যোগী চর্ম্মের আসনে যোগাভ্যাস করেন। এই যে জীব-চৈতন্যের দেহের চর্ম্ম তার উপরে আঘাতে যে শব্দ উঠে সে শব্দ কি কখনও সাত্ত্বিক শব্দ হ'তে পারে? যোগী জীবচৈতন্যের দেহের চর্ম্মের আসনে সাধন করে আমার করুণা কি লাভ করতে পারেন? অথচ এ কথা যাকে বলবে সেই তোমাকে পাগল বলবে। এই অন্যায় যুগ যুগ ধরে অতি ধীরে ধীরে তোমাদের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে ও অন্যায় বলে মনেই হয় না। এখানেই তোমার সরলতার অভাব। আমাকে ডাক সঙ্গে তোমার আনু-সঙ্গিক বাদ্য ইত্যাদির কোনও প্রয়োজন নাই। আমি কি বাদ্য মৃদঙ্গ নিয়ে আমার নাম করতে বলেছি? অথচ এই বাদ্য মৃদঙ্গ সহযোগে তুমি আমার নাম কীর্ত্তন করবে বলে আর একটি জীবের দেহের চর্ম্ম দিয়ে মৃদঙ্গ তৈরী করছ। এ জীবহত্যা ত' তোমার অসাত্ত্বিক রুচির পরিচয়, সরলতার অভাব ও

হিংসার প্রবৃত্তি। এতে ত' আমার পূজা পূর্ণ হয় না। আমার কৃপা পাওয়া যায় না। এ জ্ঞান যাতে সকল ধর্ম্ম সমাজের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্যে তুমি প্রস্তুত হও। জীবনে নূন্যতম অবস্থায় অর্থাৎ যেমন আছ তেমনি আমাকে সরল অন্তরে ডাক। তাতে এমন কোনও বাদ্য যন্ত্র ব্যবহার করবে না যা জীবচৈতন্যের গাত্র চর্ম্ম দিয়ে তৈরী হয়। খোলের-বোল **"হরিবোল"** বলে না সে বলে **"মারিবোল"**। তুমিত' মারছ আর একটি জীবকে ভবেত' একটা খোল হ'চ্ছে। এর প্রতিবাদ তোমার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হোক্। তুমি বিদ্রোহী. আমার উপযুক্ত সেনাপতি। তুমি যুদ্ধ কর—সংগ্রামসিংহ তুমি —জয়ী তুমি হবেই। অগ্রসর হও নির্ভয়ে"। মা তোমার একি অপার লীলা। আমিত' জীবনে কখনও এ সব কথা ভাবিনি। তবে কি খোল ইত্যাদি কীর্ত্তন থেকে বাদ দিতে হবে? এ তোমার কি বিচার কিছুই বুঝতে পারলাম না মা। এ যে এক মহা সমস্যায় আমাকে ফেললে মা।

মা তোমার চরণ একমাত্র ভরসা।

বুধবার ১৮ই মে, ১৯৬০ খৃঃ কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে শীর্ষ সম্মিলন ব্যর্থ হ'য়ে গেল এতে ত' আবার বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। তবে কি আবার একটা বিশ্বযুদ্ধ আসবে? মা বললেন, "ধ্বংস একটা আসছেই। তবে তোমরা বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে যে ধারণা পোষণ কর এ ধ্বংস সে ধরণের নয়। এ ধ্বংস সারা বিশ্বব্যাপী হ'লেও সকল দেশ ও সকল জাতি এতে জড়িত হ'য়ে পড়বে না। তবে এর ফল বিশ্বের সকল জাতির উপরেই কিছু না কিছু বর্ত্তাবেই। ধর্ম্মের জয় হবে ও অধর্ম্মের পরাজয় হবে। **ধর্ম্ম** অর্থে **আমার প্রতি বিশ্বাস** ও তাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম—এ ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম নাই জানবে। এই বিশ্বাস থেকেই আর সকল মহা সম্পদ আসে যেমন, ভক্তি, প্রেম, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, ক্ষমা, নির্ভর ইত্যাদি। যে সকল জাতি আমাকে অবিশ্বাস করছে ও আমাকে জাতীয় জীবন থেকে নির্ব্বাসন দিয়েছে তারা অধর্ম্ম করছে। তারা

জানে না, যে প্রাণ ক্রিয়ার দ্বারা দেহ সচলমান, যার দ্বারা দেহের সকল কার্য্য সাধন হ'চ্ছে, আমাকে অবিশ্বাস করে তারা সেই প্রাণক্রিয়ার শক্তিকেই উপেক্ষা করছে। আমি তোমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করি। কিন্তু তোমাদের **"অবিশ্বাস"** আমি কখনও ক্ষমা করি না। তা' যদি করি তবে আমার জীব সৃষ্টি ও তার পরাগতির যে উদ্দেশ্য, যে উদ্দেশ্যে তার দেহদান করছি সেই উদ্দেশ্যেই আমার ব্যর্থ হ'য়ে যায়। মানব সমাজকে এমন এক সমাজে পরিণত করতে হবে যে সমাজ হবে সম্পূর্ণ **"সম-বিশ্বাসী"**। সাম্যই পথ। কিন্তু স্থূল সাম্যের পথে মানব সমাজ সমবিশ্বাসী হ'য়ে এক প্রেম পরিবারে মিলিত হ'তে পারবে না"। মাগো, এখন যে পৃথিবীর সকল জাতিই অধর্ম্মের পথে চলেছে। তবে কে জিতবে কে হারবে? মা বললেন, "তা' নয়, পৃথিবীর সকল জাতি অধর্ম্মের পথে চলছে না। জলে ডুবন্ত লোকের এক গাছি চুল ভেসে থাকলেও তাকে সেই চুল ধরে বাঁচানো যায়। চুল ধরে টেনে তোলাতে যে কষ্ট তার হয় বা যে রূঢ়তা প্রকাশ পায় সেটা তার প্রাণ রক্ষার কাছে অতি নগন্য। কিন্তু যে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে তাকে জল থেকে উঠালেও তার প্রাণ রক্ষা হয় না। আজ পৃথিবীতে কোনও কোনও জাতি আছে যারা সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। তারা আমাকে জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। দেহের মান,স্থূলতার স্বরূপকে জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরা মৃত ও এদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যারা সারা দিন স্থূলতার পিছনে দৌড়াচ্ছে, চারিদিকে দেহের বিন্যাসকে বহু আকারে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করছে অথচ একবার আমাকে স্মরণ করছে ও আমাকে স্বীকার করছে তাদের এখনও এক গাছি 'চুল' ভেসে আছে। এদের কষ্ট হবে, দুঃখ হবে, যেমন জলমগ্ন মানুষের হয়, কিন্তু এরা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা পাবে। না হ'লে যে আমার সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যায়। তোমার-জীবনে, সময় সমাগত। মহা-আলোড়নের ভিতরেই তোমার কর্ত্তব্য। তুমি প্রস্তুত হও। মহা-আলোড়ন ও মহা ধ্বংস এগিয়ে আসছে—। এ থেকে মানব জাতিকে একমাত্র তুমিই রক্ষা করতে পারবে। বিশ্বাসই

একমাত্র প্রতিপাদ্য ও সেই বিশ্বাসেই সকল প্রকার স্থূলতাকে তুমি অবলীলায় জয় করতে পারবে। সাধন কর অগ্রসর হও ও আমার বাধ্য হও।"

জয় জয় জয় মা দয়াময়ী জননী।

২২শে মে, রবিবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা আমাকে বললেন, "তুমিত' বহু।" আমি বললাম, সে কি? আমি আবার বহু হলাম কি করে? আমিত' একটি মাত্র মানুষ, বহু হলাম কি করে? মা বললেন, "শোন, বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি পুত্র রূপে তোমার মাতার কাছে পরিচিত, ভ্রাতারূপে তোমার ভ্রাতা-ভগ্নিদের কাছে, জামাতা রূপে শ্বশুর, শ্বাশুরীর কাছে, ভগ্নিপতিরূপে শ্যালকদের কাছে, বন্ধুরূপে বন্ধুদের কাছে, ব্যবসায়ীরূপে ব্যবসা ক্ষেত্রে, পিতা রূপে পুত্র কন্যার কাছে, স্বামীরূপে তোমার পত্নীর কাছে, এই ভাবে যার সঙ্গে বা যে ক্ষেত্রে তোমার নিজের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, তার কাছে বা সেই ক্ষেত্রে তুমি সেই ভাবে পরিচিত। পিতার স্বরূপ তোমার বন্ধুগণ বা অন্য কেউ জানে না, তেমনি তোমার বন্ধু ভাব তোমার বন্ধুগণ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। এর ভিতরেও তোমার বন্ধুত্বের নানা প্রকার ভাব আছে যেমন কেউ বাল্যবন্ধু, কেউ স্কুল, কলেজ বন্ধু, কেউ ধর্ম্ম বন্ধু, কেউ ব্যবসায় বন্ধু, কেউ সুখ দুঃখের বন্ধু ইত্যাদি। এখন ভেবে দেখ তুমি এক হ'য়ে এক এক জনের কাছে এক এক ভাবে বা বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপে পরিচিত। এই যে তোমার জীবনে ভাবরূপ যে স্বরূপ এ এক এক জনের কাছে এক এক রূপে ব্যক্ত। সুতরাং তুমি এক হ'য়ে বহু। কিন্তু তোমার বহুরূপ থাকা সত্ত্বেও তুমি যে এক সেই একই আছ। ধান অনেক কিন্তু তার নাম এক। ধানের বীজ লক্ষ লক্ষ ছড়িয়ে দেওয়া হয় ক্ষেত্রে। এক একটা বীজ থেকে এক একটা গাছ হয়। আবার এক একটি গাছে হাজার হাজার ধান ফলে। সবমিলে যদিও লক্ষ লক্ষ তবুও এক ধানই। নাম এক কিন্তু বহুধা বিভক্ত ও বহুরূপে তার ব্যবহার। এই গেল আর এক দিক। এখন ভাব তুমি যদি এক হ'য়ে বহু হ'তে পার, ধান বহু হ'য়ে যদি এক হ'তে

পারে তবে আমি কেন বহু হ'য়ে এক হব না বা এক হ'য়ে বহু হব না? আমি সর্ব্ব শক্তিময়ী, আমাকে যে যে ভাবে ভাবছে বা ডাকছে আমি সেই ভাবেই তার কাছে ব্যক্ত। আমাকে স্বামীরূপে ভাবলে আমি তার কাছে স্বামীই অন্য রূপে নয়। নানা নামে, নানা ভাবে আমিই একমাত্র সত্যবস্তু। কিন্তু তুমি যদি আমাকে আমার কোন সৃষ্ট মানবের আকৃতি বা প্রকৃতি আমার প্রতি আরোপ করে সেই ভাবে আমাকে ভজনা কর তবে তোমার অভিচার দোষ হবে। যেমন তুমি যদি ধানকে গম মনে কর তবে তোমার অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। এর মধ্যে কথা আছে। যে ব্যক্তি অজ্ঞ ও যে কখনও জানে না কোনটা ধান ও কোনটা গম, সে ধানকে গম ও গমকে ধান মনে করতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি জেনেও ধানকে গম ও গমকে ধান বলে সে মিথ্যাচারী বা অভিচারী। সুতরাং আমাকে যে নামে খুসী, সে ভাবে খুসী ডাকতে পার বা ভজনা করতে পার। কিন্তু অন্য এক সৃষ্ট মানবকে আমার স্থানে বসিয়ে তাকে "আমি" বলে ভজনা করায় অভিচার বা মিথ্যাচার দোষ বার্ত্তায়। এতে সাধকের উপকার থেকে অপকার হয় বেশী। সে বিপথে চলে যায় ও তার জন্মান্তর পরিক্রমা অনেক বেড়ে যায়। দেখ ব্রহ্ম বীর্যই স্থূল পথ দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে আধারে উপ্ত হয়। যে শুক্রকীট সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় না সে এত মহাশক্তি পরিগ্রহ ক'রে সূক্ষ্মদেহ ধারণ ক'রে জীবরূপে জন্মগ্রহণ করে যে সে শক্তির বিকাশ কোনও কোনও মানবের ভিতরে দেখা যায়। শক্তি এক কিন্তু তার অভিব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার। এই শক্তি নানা আধার ধারণ করে নানা রূপে জগতে ব্যক্ত হয়। আবার সকল অভিব্যক্তির একই আধার ও একই শক্তি। সুতরাং তুমি এক হ'য়ে তোমার অভিব্যক্তি যেমন বিভিন্ন তেমনি আমি এক কিন্তু আমার অভিব্যক্তি বিভিন্ন। তোমাকে যেমন কেউ সম্পূর্ণ জানতে পারে নাই কারণ তোমার এক এক অভিব্যক্তি এক এক জন জানে তোমার সম্পূর্ণটা কেউ জানে না তেমনি আমার এক এক অভিব্যক্তির কিছুটা তোমরা জান ও

আমাকে সম্পূর্ণরূপে কেউ জানতে পারে নাই বা পারে না বা পারবে না। কিন্তু আমার সেই অভিব্যক্তির সূত্রধ'রে আমার শক্তিকেই তোমার ভজনা করা প্রয়োজন। কিন্তু আমার অভিব্যক্তিকে নয়। এই হ'ল সাধনা। অগ্রসর হও। তোমার মনের সকল প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে পাবে। যখন যেটা জানতে চাও আমাকে অকপটে বলবে তবেই তোমার সেই সমস্যার সমাধান আমি করে দেব। মনে সংশয় রেখোনা। নৈকট্য-যোগ আরও গভীর ভাবে সাধন কর। বিমুক্ত চিত্ত হও। তোমার মহাশক্তি আহরণ হচ্ছে। খুব সাবধান। রাগ বা দ্বেষ মনে আসতে দেবে না। সব হবে। অর্থ, বিত্ত, সম্পদ ও মহাধনে ধনী হবে। শুধু ব্রহ্মজ্ঞানে নয়, অর্থে ও পরমার্থে তোমার জীবন পরিপূর্ণ হবে। আমার একান্ত শরনাপন্ন হও।"

জয় জয় জয় মা দয়াময়ী জননী আমার।

৬ই জুন, সোমবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

কাল রাত্রে ধ্যানে এক অপূর্ব্ব দর্শন হ'ল। ধ্যানে বসে অনেকক্ষণ ধরে জপ চলছে। ক্রমে উর্দ্ধে থেকে উর্দ্ধে চলেছি কত মনোরম স্থান, পাহাড়, পর্ব্বত, নদনদী, বনরাজি, দিগন্ত বিস্তৃত শ্বেত বেলাভূমি ইত্যাদি পার হ'য়ে চলেছি উর্দ্ধে। আমার গতি তীব্র, মূহুর্ত্তে যোজন যোজন পার হ'য়ে চলেছি। হঠাৎ দেখি দূরে অতি উর্দ্ধে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি বিরাট্ পর্ব্বত। সেই পর্ব্বত গাত্রে একটি সমতল ক্ষেত্র। সেই পর্ব্বতের উপরিভাগ শ্বেত বরফে ঢাকা, শ্বেত মেঘ খণ্ড দ্রুত গতিতে সেই পর্ব্বত গাত্র ভেদ করে তীব্র বেগে ছুটে চলে যাচ্ছে। পর্ব্বতের নিম্ন ও মধ্যভাগের পশ্চিম ও পূর্ব্ব কোন কালো পাথরে ঢাকা ও তার উপর দিয়ে শ্বেত মেঘ ভেসে চলেছে। চারিদিকে মেঘের আবরণ। এর ভিতরে সেই পর্ব্বতের সমতল ক্ষেত্র তীব্র অথচ অতি মনোরম আলোকে উদ্ভাসিত। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন একজন ঋষি। তাঁর দেহ লম্বা ও ঋজু, দাঁড়ি সম্পূর্ণ পক্ক, মাথার কেশ সম্পূর্ণ পক্ক ও স্কন্ধ পর্যান্ত লম্বিত। তাঁর দেহের গঠন অনেকটা শ্রীরবীন্দ্রনাথের মতন। এঁর গাত্রে কোনও আবরণ

নাই। শুধু একটি বস্ত্র পরিধানে সেটিও গৈরীক নয়—। অতিশয় উজ্জ্বল দেহ। মনে হ'ল তাঁর তপস্যার ফলেই সেই স্থানটি অপূর্ব্ব আলোকে উদ্‌ভাসিত হ'য়ে আছে। আমি কিন্তু তীব্র গতিতে 90° angleএ তাঁর দিকে চলেছি। তিনি উর্দ্ধে আমার দিকে দুই বাহু প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আমাকে আহ্বান করছেন। আমি নিম্ন থেকে তীব্র গতিতে তাঁর দিকে চলেছি। আমি শেষে তাঁর কাছে এসে পৌঁছলাম তিনি আমাকে স্মিত হাস্যে দুই বাহু দ্বারা পরম স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। আমি তখন আমাকে দেখতে পাচ্ছি একটি ১০।১২ বৎসরের বালক তাঁর স্নেহ আলিঙ্গনে আবদ্ধ। তিনি সস্নেহে আমাকে বললেন, "ধন্য তুমি, আমার প্রবর্ত্তিত পথে তুমি সাধন করছ; মহাবাধা অতিক্রম ক'রে পুরুষকারের সাহায্যে সংসারে থেকে ভগবৎ সাধন আমারই প্রবর্ত্তিত। জয় হোক্ তোমার। আমার এই শুভ আশীর্ব্বাদ তোমার সাধনে সাহায্য করুক। ভগবৎ কৃপা তুমি লাভ করেছ। তোমার জয় সুনিশ্চিত। আমি বিশ্বামিত্র।" তারপর আমি আর জানি না কি ভাবে ও কেমন ক'রে সেখান থেকে এলাম। আমার মাতৃ কৃপা একমাত্র সহায়। মার কৃপা ভিন্ন আমার আর কিছুই নাই।

জয় মা দয়াময়ী জগত জননী।

২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

গত কাল রাত্রে ধ্যানে বসে মহামুনি দুর্ব্বাশার দর্শন হ'ল। ধ্যানে বসে মহা আলোক মণ্ডলে এসে গিয়েছি। অতি শান্ত ও স্থির মণ্ডল। মহা আনন্দ ঘন পরিবেশ চারিদিকে। হঠাৎ দেখি পূর্ব্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে চলেছেন একজন মুনি। জায়গাটি অনেক উর্দ্ধে উত্তর দিকে একটা পর্ব্বত গাত্রে অবস্থিত। চারিদিকে বনরাজি মাঝ খানে আশ্রম। আশ্রমের কোনও গৃহ নাই। একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও তার শিকর গুলো মাটির বাইরে সম্পূর্ণ বের হ'য়ে গেছে। এই বৃক্ষটি দেখে মনে হল অতি পুরাতন। এই বৃক্ষের চারিদিকে অনেকটা জায়গা আঙ্গিনার মতন করা আছে। সেই আঙ্গিনাটি মাটির ও

অতি সুন্দর করে মাটি দিয়ে লেপা। আমি যেন সেই অঙ্গনের মাঝে বসে আছি উত্তর দিকে মুখ করে। আর মহা মুনি দুর্ব্বাশা চলেছেন পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম দিকে। আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। অতিশয় গম্ভীর মুখ। প্রকাণ্ড মুখ মণ্ডল ও প্রকাণ্ড মাথা। মাথার চুল ঠিক পাটের আঁশের মত মস্ত মস্ত ঘন ও ঝাঁকড়া। চুল সব অবিন্যস্ত। চুল গুলো মাথার উপর উচু হ'য়ে আছে ও কতকটা সারা মুখ ও স্কন্ধকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে। প্রকাণ্ড উন্নত গ্রীবা নাকও খুব বড়। মুখের বর্ণ গভীর তাম্রবর্ণ। চোখ দুটি বৃহৎ ও স্থির। আমার দিকে দাঁড়িয়ে অতি গম্ভীর ও নিস্পৃহ ভাবে বললেন, যেন বলছেন, সংস্কৃতই আমার ভাষা। এ দেবভাষা ছাড়া অন্য ভাষা আমি জানি না। আমার ভাবে তুমি আমার কথা তোমার ভাষায় বোধ গম্য কর। তোমার সিদ্ধি নিকটবর্ত্তী ও তোমার অভিষ্ট সিদ্ধি হবে। তোমাকে আমরা সকলেই সাহায্য করব।" মনে হ'ল যেন তাঁর আশ্রমটি সর্প সঙ্কুল। নানা জাতীয় সর্প ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পরিবেশের ভিতরে আছেন। যেন মনে হ'ল যাতে অন্য কেউ এখানে এসে তাঁর সাধনার বিঘ্ন না সৃষ্টি করতে পারে সেই জন্যে এই পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। ধন্য দয়াময় তোমার অপার কৃপা। এ অধমকে তুমি কত না দর্শন দিচ্ছ ও কত না উৎসাহ দিচ্ছ। আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার প্রেম-ধর্ম্মে সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করে দিতে পারি। সকল বৈরীতা, সকল হিংসা দূর করে মহাপ্রেমে সকল মানব সমাজকে এক মহা প্রেম ধর্ম্মে একাকার করে দিতে পারি। তোমার এই মহাকার্য্য যেন আমি সিদ্ধ করতে পারি।

জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার।

১২ই আগষ্ট, শুক্রবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে বললাম, আমাকে একটু দিয়ে কি আবার ফিরিয়ে নিলি? মা বললেন, "আমি দিয়ে কখনও ফিরিয়ে নিই না। আমার স্বভাব দেওয়া ফিরিয়ে নেওয়া আমার স্বভাব নয়। তোমার যা আছে তা' তোমারই

থাকবে। যা তোমরা হারাও তা তোমাদের নয় বলেই হারাও। তোমার নিজের অজ্ঞাতে আমি তোমাকে উর্দ্ধে নিয়ে চলেছি, সফলতার দিকে, সিদ্ধির দিকে। যে টুকু জীবনে পাও তার পরিচর্য্যা কর তবেই সে বৃহৎ হবে। তোমার ভিতরে হরিনামের অগ্নি লেগেছে। এই অগ্নিকে গভীর সাধন, নির্ভর ক্ষমা, দয়া, দীনতা, বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়ে বাতাস কর। দেখবে সে অগ্নি ধীরে ধীরে তোমার সকল দেহ, মন, আত্মা ও তোমার সর্ব্ব সত্বাকে পূর্ণ অগ্নিময় করে দেবে ও তখন তুমি পূর্ণতম হবে। টিকাতে একটু আগুন লাগিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করতে হয় বা ফুঁ দিতে হয়। এই ফুঁ দিতে দিতে আগুন যখন টিকাকে সম্পূর্ণ অগ্নিময় করে দেয় তখন কল্কেতে তামাক দিয়ে সেই টিকা দিতে হয়। হুঁকোর টানের সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুনে তামাক পুড়তে থাকে ও তামাকের ধূমপান করে লোকে। যদি টিকায় সম্পূর্ণ আগুন না ধরে তবে সেটা তামাকে দিলে নিভে যায়। তেমনি এখন তোমার ভিতরে একটু আগুন লেগেছে। এ আগুন কে বাতাস করে আস্তে আস্তে পূর্ণ কর। তোমার অগ্নিতে জগতের সকল জনগনের সকল মোহান্ধকার ভস্মিভূত হ'য়ে যাবে। সাধন কর আমার কৃপা তোমার উপর সর্ব্বসময় বর্ষিত হ'চ্ছে জানবে। নিরহঙ্কারী হও, পরোপকারী হও ও বিশুদ্ধ চিত্ত হও। অনর্থক বাক্যালাপ করবে না। চিন্তা ও বাক্য সংযম কর। জীবনের মুহুর্ত্ত তোমার নিকটবর্ত্তী। জনগণের কল্যানই তোমার লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য। আমার নির্দ্দেশ সময়ে পাবে। আমিই তোমাকে চালিত করছি। তোমার সর্ব্বসময় সাধন হ'চ্ছে। তুমি জাননা আমি জানি। আমার কার্য্য আমিই করছি তোমাকে শুধু উপলক্ষ্য রেখে। তোমার জয় সুনিশ্চিত, মনে সংশয় রেখো না।"

জয় জয় জয় মা আনন্দময়ী জননী আমার।

২৮শে আগষ্ট, রবিবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন, "ভোগের জন্যেই মানব দেহ ধারণ। সর্ব্বভোগ, ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভোগই মানব ভাগ্য। জীবজন্মের শ্রেষ্ঠতম জন্ম মানব জন্ম।

সকল কর্ম্মই ফল উৎপাদন করে ও সেই কর্ম্ম-ফল ভোগই মানব নিয়তি। এই নিয়তি অর্থ—কর্ম্মফল ও তার ভোগ অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। এর আগেও তোমাকে বলেছি যে প্রতিটি সামান্যতম চিন্তা ও কার্য্যও ফল উৎপাদন করে ও তার ভোগও তোমাদের জীবনে অপরিহার্য্য। তোমাদের ভিতরে আমার ইন্দ্রিয় দানের অর্থই হ'চ্ছে ফল ভোগ তোমার প্রকৃতি। তোমার জীবনে চরম অবনতি বা মহাদুঃখও যেমন এই ভোগ-প্রকৃতি-গত তেমনি মোক্ষলাভ বা মহাসুখও এই ভোগ-প্রকৃতি-গত। সকলই কর্ম্ম-ফল সঞ্জাত। স্থূল দেহের দুঃখ ও আনন্দই তোমার জীবনে অতিশয় সক্রিয়। তোমার জীবনে স্থূল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এই বোধ তোমার মহা-আকর্ষণ। এই আকর্ষণে তুমি তোমার জীবনের ধারাকে অব্যাহত গতিতে জন্মের পর জন্মে অতি যত্নে লালন, পালন ক'রে চলেছ। ভোগ স্পৃহা থেকে তোমার মুক্ত হওয়া অসম্ভব। স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভোগের ভিতর দিয়েই ধীরে ধীরে তুমি তোমার শ্রেষ্ঠতম ও আনন্দতম ভোগের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছ। এই তোমার নিয়তি। নিজ দেহকে হত্যা যেমন মহা অন্যায় পর-দেহকে হত্যাও তেমনি মহা অন্যায়। নিজের চিন্তা, ইচ্ছা, দৃষ্টি ইত্যাদিকে অসংযত ক'রে নিজ মনের উদ্বেগ ও অশান্তি সৃষ্টি করা যতটা অন্যায় অন্য লোকের মনেও উদ্বেগ ও অশান্তি সৃষ্টি করাও ততোধিক অন্যায়। নিজেকে প্রলোভিত করা যেমন অন্যায় অন্যকে প্রলোভিত করা ততোধিক অন্যায়। প্রলোভিত ব্যক্তি ধীরে ধীরে এক প্রলোভন থেকে শত প্রলোভনের ভিতরে পতিত হ'য়ে অশেষ দুঃখ ভোগ করে ও তার জন্যে যে ব্যক্তি তাকে প্রথম প্রলোভিত করেছিল সে অংশত দায়ী। কাম ভোগের ইচ্ছা হ'লে নিজ পত্নীর সাহচর্য্য কর। যদি বিবাহিত না হও তবে যে তোমার প্রতি আশক্ত ও তুমি যার প্রতি আশক্ত তার সাহচর্য্য করাই তোমার বিধেয়। কিন্তু নিজ নিজ সমাজ শৃঙ্খলা ভগ্ন করে এই সাহচর্য্য করা অন্যায়। কারণ তোমাদের সমাজ শৃঙ্খলাও আমারই প্রকৃতিগত শৃঙ্খলা থেকেই উদ্ভূত। সেখানে তোমার নিজ সমাজ শৃঙ্খলাই তোমার বিধান। সেখানে তোমার

ভোগের দ্বারা সামাজিক বিধান যদি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, দশজনের মন যদি বিক্ষুব্ধ হয়, সমাজে যদি সমষ্টির জীবন ব্যাহত হয়, তবে তোমার সংযম অতি আবশ্যক। তোমার নিজ ভোগ স্পৃহা দমনে যে ক্ষতি তোমার হয় তার থেকে বহুগুণ কল্যাণ হয় সমাজের ও ভবিষ্যতের উত্তর পুরুষদিগের জীবনে। জানবে সমাজে একটা অন্যায় অনুষ্ঠিত হ'লে সেই অন্যায়ের প্রভাব অন্য দশ জনকে প্রলোভিত করে ও সেই প্রলোভনে সমাজ দেহে মহাক্ষতি হয় যা' সুদূর প্রসারী ও অপূরনীয়। ভোগে ভোগের তৃষ্ণা সঞ্জাত হয় সত্য কিন্তু ভোগ তোমার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। এই ভোগের তৃষ্ণাকে সংযত করাই মানব ধর্ম্ম। ভোগ তুমি করবে সত্য কিন্তু ভোগে উদ্দামতা থাকবে না। সংসারে তোমার নানা ভোগের প্রকরণ আছে। কিন্তু তুমি পূর্ণ সংযত হ'য়ে ভোগ করবে। তা না করলে কেবল তোমার নিজ ক্ষতিই হবে না অধিকিন্তু সমাজ ও দেশের মহাক্ষতি হবে। ঈশ্বর সাধনের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাই ভোগ তৃষ্ণাকে সংযত করার একমাত্র পথ। কোনটা কর্ম্ম ও কোনটা অকর্ম্ম সে বিষয় জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই নিজ অন্তরে প্রতিভাত হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানই কর্ত্তব্য বোধ জাগ্রত করে। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে বিচার শক্তি মূলত: ভ্রমাত্মক ও সে বিচারে সমাজ ও দেশের অশেষ অকল্যাণ হয়। সাধারণ মানুষ দেহ-সর্ব্বস্ব ও তাদের আত্ম-চেতনা জাগ্রত করা অসাধারণ মানুষের কর্ত্তব্য। অসাধারণ মানুষ অর্থে ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি। এঁরাই জনসাধারণের কর্ণধার। যদি সাধারণ কোনও মানুষ বা কোনও সমষ্টি রাজ শক্তি অধিকার ক'রে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা গ্রহণ করে তবে দেশের ও জনসাধারণের মহাক্ষতি হয়। ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান দ্বারা যেমন আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনি সমাজ ও দেশও সেই ব্রহ্মজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানীর দ্বারাই পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। তোমাদের ইতিহাসে এর প্রচুর প্রমাণ আছে। গতজীবনের ধারাই শিক্ষা ও গত জীবনের ধারা দিয়েই ভবিষ্যৎ জীবনের গতি পথ নির্নিত হয়। সুতরাং ভোগ তোমার জীবনে যেমন বিধান, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে সংযত

ভোগও তোমার জীবনের তেমনি বিধান। প্রতিদিন খাদ্য যেমন তোমার জীবনে অতি প্রয়োজনীয় প্রতিদিন আত্মজ্ঞান অনুশীলনও তোমার জীবনে ততোধিক প্রয়োজনীয়। তুমি তোমার জীবনে এই পন্থাই অধিকার ক'রে চলবে। এই পন্থাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম পন্থা, যার দ্বারা জীবনের গতি অব্যাহত থাকে ও মানব জীবন পূর্ণতা লাভ করে। জীবনের গতিই জীবনের পথ ও সেই পথ সংযমের পথ। না হ'লে উদ্দামতায় সমাজদেহ মহাদোষ দুষ্ট হয়। মানবগণ চরম দুঃখে পতিত হয়। জীবনকে পরিচর্য্যা কর ও ঈশ্বর বিশ্বাস জীবনে জীবনে প্রতিফলিত কর। এই মানব জীবনের একমাত্র নীতি ও বিধান বলে জানবে।"

জয় মা আনন্দময়ী জ্ঞানদায়িনী জননী আমার।

৪ঠা অক্টোবর, মঙ্গলবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? এই যে সব সময় আমার কাছে নানা ভাবে আসছ ও আমার সঙ্গে নানা কথা বলছ, নানা নির্দেশ দিচ্ছ সে তুমি কে? মা বললেন, "আমি তোমার আত্মার আত্মা পরমাত্মা, তোমার ভিতরে যে মহা শক্তিরূপ আত্মা আছে সেই মহাশক্তির যে শক্তি সেই আমি পরমা-শক্তি। আত্ম-স্বরূপ অবগত না হ'লে আমাকে অবগত হওয়া যায় না। আগে আত্ম দর্শন তারপরে পরমাত্মা দর্শন। আত্মাকে আগে জানতে হবে। আত্মাকে আগে দর্শন করতে হবে। আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে, আত্ম-চিন্ত হ'তে হবে তবে তুমি আমাকে জানতে পারবে। নিগূঢ় শক্তির ভিতর দিয়েই নিগূঢ়তম শক্তির সাক্ষাৎ লাভ হয়। জীবনের উপলব্ধি না হ'লে আত্ম-উপলব্ধি হয় না। আর আত্ম-উপলব্ধি না হ'লে আমার উপলব্ধি হয় না। দর্শন তোমার কি? আত্মা। দর্শন আমার কি? আত্মা। আত্মা মাধ্যম। আত্মার ভিতর দিয়ে তুমি যেমন আমারূপ পরমাত্মা দর্শন কর আমিও তেমনি আত্মার ভিতর দিয়ে বিশ্ব-সংসার দর্শন ও পালন করি। তাই জানবে আমি পরমা শক্তি পরমাত্মা। আমিই তোমাকে

সকল নির্দ্দেশ দিচ্ছি। অগ্রসর হও।"

মা আমার নিত্যানন্দময়ী সর্ব্বজ্ঞানদায়িনী জননী।

৯ই অক্টোবর, রবিবার ১৯৬০ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ ব্রহ্মমন্দিরে ভাই মণি সেন মহাশয়ের উপাসনা ছিল। প্রথম দিকে মনটা একটু চঞ্চল ছিল। কিন্তু আরাধনা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ক্রমেই গভীর হ'তে লাগল। হঠাৎ দেখি আমি শূন্যে উত্থিত হ'য়ে তীব্র গতিতে যোজন যোজন নিমেষে পার হ'য়ে যাচ্ছি। উড়ো জাহাজে উঠলে যেমন অনুভূতি হয় ঠিক তেমনি। কেবল তাই নয় আমি যেন নিজেই একটি উড়ো জাহাজ হ'য়ে গিয়েছি। মা বললেন, "আজ একটা মজার জিনিষ তোকে দেখাব।" এই বাণী শুনবার পরেই আমি তীব্র গতিতে উর্দ্ধদিকে উঠতে আরম্ভ করলাম। মহা আলোকের মণ্ডলে এসে পড়লাম। পরদার পর পরদা কেটে কেটে চলছি যেমন যায় একটি উড়ো জাহাজ মেঘের স্তর পর পর পার হ'য়ে ঠিক তেমনি। এমনি ভাবে চলেছি মহা অনন্তে মহানন্দে। নীচে কত মনোরম দৃশ্যাবলী অতি ক্ষুদ্র আকারে দেখতে পাচ্ছি, কত গিরি, কত অত্যুচ্চ দুই পর্ব্বতের মাঝখান দিয়ে, আলো আঁধারের ভিতর দিয়ে আমি চলেছি উড়ে। এ চলা যেন নিজ শক্তিতে চলছি না। আমি যেন একটা machine হ'য়ে গিয়েছি। কত যে দৃশ্য সবই কিন্তু অনন্ত আলোকের রাজ্যের ভিতরে এখন। নীচে এখন কোথায়ও পৃথিবীর কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। অসীম অনন্ত; কখনও সামনে আসছে আঁধার আবার অল্পক্ষণ পরে আলোক, আবার আবছায়া মেঘের মত ঘন আস্তরণ লাগছে, এই সব ভেদ করে তীব্র গতিতে চলেছি। **এটি একটি মানব-উড়ো জাহাজ।** হঠাৎ সামনে দেখি একটি তুষার ধবল পর্ব্বত গাত্র। হয়ত বা উড়ো জাহাজের সামনে যখন এমনি উচ্চ পর্ব্বত এসে পড়ে সে তখন Perpendicularly উর্দ্ধদিকে উঠতে থাকে ও তার শীর্ষ দেশে এসে তাকে অতিক্রম করে ঠিক তেমনি ক'রেই আমিও সেই বৃহদ্ ও অতি উচ্চ পর্ব্বতকে অতিক্রম করলাম। এই:পর্ব্বতের শীর্ষের উপরে গিয়েই

আবার তীব্র গতিতে নিম্নগামী হ'তে লাগলাম। আস্তে আস্তে একটি অতি মনোরম সহরে এসে অবতরণ করলাম। এই সহরটি একটি পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত, ছোট, নূতন সহর। চার দিকে ছোট ছোট অথচ অতি সুন্দর সুন্দর শ্বেত Concrete এর বাংলো বাড়ী। অতি সুন্দর সুন্দর বাগান, Square রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি সব অতি সুন্দর ও অত্যন্ত আধুনিক। পশ্চিম দিকে একটি কালো পর্ব্বত দক্ষিণ দিক পর্য্যন্ত সহরটিকে ঘিরে রেখেছে। একটি সুন্দর সমতল ক্ষেত্রে আমি অবতরণ করেছি। এই সহরটির একটা মস্ত বড় চওড়া রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে চললাম। আমার গন্তব্যস্থল ওই পশ্চিম দক্ষিণ কোণের পর্ব্বতের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে সেই পর্ব্বতের পাদদেশে এলাম। একটি সুন্দর রাস্তা সেই পর্ব্বতের গাত্র বেয়ে এঁকে বেঁকে উঠে গিয়েছে। আমি সেই রাস্তা ধ'রে পর্ব্বতে উঠতে লাগলাম। চলতে চলতে বহু চড়াই, উৎড়াই পার হ'য়ে পর্ব্বতের ওপারে গিয়ে পৌছলাম। ওপারে গিয়ে দেখি একটি হ্রদ। প্রকাণ্ড তার বিস্তৃতি, চারিদিকে অনেক বৃক্ষ-রাজি নত হ'য়ে হ্রদের কাকচক্ষু জলকে স্পর্শ ক'রছে। আমি হ্রদের পূর্ব্ব প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। হ্রদের পশ্চিম প্রান্তে একটি শ্বেত একতলা Concrete এর বাড়ী আছে। এই হ্রদের মাঝখানে একটি ভাসমান গুল্ম-গুচ্ছ সমম্বিত সচল মৃত্তিকা খণ্ড দেখতে পেলাম। একটা অব্যক্ত ও অলৌকিক শক্তির সাহায্যে বা আকর্ষণে আমি সেই সচল মৃত্তিকা খণ্ডের উপরে এসে গেলাম। এসে দেখি সেই সচল মৃত্তিকা খণ্ড বলে যা এতক্ষণ ধারণা করেছিলাম সেটা তা নয়। সেটা একটি অতিকায় কূর্ম্ম। তার পিঠের উপরে প্রায় ৪৷৫ ফুট উচু হ'য়ে সব লতা গুল্মের একটি সুন্দর আবরণ সৃষ্টি হ'য়েছে। এই আবরণের মধ্যস্থলে একটি যোগী ধ্যানস্থ হ'য়ে বসে আছেন। মস্তকের কেশ দাম সম্পূর্ণ পক্ক ও অতি সুবিন্যস্ত ভাবে মস্তকের উপরি ভাগে খোপার মত বাঁধা। গুম্ফ ও শশ্রু পক্ক। পরিধানে একটি গেরুয়া বস্ত্র। গাত্রাবরণ নাই। সর্ব্বদেহ অগ্নিবর্ণ। ধীরে ধীরে যোগী নেত্র উন্মীলন করলেন। আমাকে দেখে অত্যন্ত প্রীত হ'লেন। স্মিত হাস্যে আমাকে

বললেন, "তোমার জন্যেই অমি এতদিন অপেক্ষা ক'রে বসে আছি। আজ আমার সাধনা ও মনস্কামনা ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করলেন। আমার তপশ্চর্য্যার সকল ফল তোমাকে দান করছি। তুমি সিদ্ধ হও ও তোমার মহান্ কর্ত্তব্য উদ্‌যাপিত হোক্। মাতৃ-রূপা সম্বল কর। আমার তপশ্চর্য্যার সকল ফলের প্রতীক এই একমাত্র সম্বল আমার রুদ্রাক্ষের মালা তোমার গলায় পড়িয়ে দিলাম।" রুদ্রাক্ষের মালা যখন আমার গলায় পরিয়ে দিলেন তখন সত্যই আমার মনে হ'ল আমার গলায় একটি মালার স্পর্শ অনুভব করছি। এই মালাটি পরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "আমার মরলীলা সম্বরণ করবার আজ শ্রেষ্ঠ দিন। আমি এই হ্রদেই দেহ বিসর্জ্জন করব।" এই বলবার সঙ্গে সঙ্গে কুর্ম্মটি ন'ড়ে উঠল ও আমি শূন্যে উত্থিত হলাম। শূন্য থেকে দেখি কুর্ম্মটি চিৎ হ'য়ে গেল ও সেই মহিমাময় যোগী হ্রদের জলে চির বিদায় গ্রহণ করলেন। কুর্ম্মের পেটের শ্বেত ভাগ আমার দৃষ্টি গোচর হ'চ্ছে। কিছুক্ষণের ভিতর কুর্ম্মটিও মৃত বলে মনে হ'ল ও হ্রদের অতল তলে ডুবে গেল। এই দৃশ্য দেখে যখন মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হ'ল তখন দেখি পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে প্রায় নিম্ন থেকে 40° angle উঁচুতে একটি অপরূপ নীলাভ আলোকের মণ্ডল। আমাকে কে যেন সেইখানে নিয়ে এল। এসে দেখি একটি অপরূপ দেবীমূর্ত্তি অপরূপ বেশে সজ্জিতা। তাঁর গলায় পুষ্প হার, হাতে, কানে, নাকে, মাথায় সর্ব্বত্র বহু মূল্যবান মণি রত্নে খচিত অপরূপ সব অলঙ্কার। গাত্রে নীল জামা, পরিধানে নীল বসন। অতি মধুর রূপ। তিনি আমাকে সস্নেহে, আমার মস্তকে গাত্রে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বললেন, "আমার নির্দ্দেশে, এই মহা-সাধক, মহা-যোগী ও মহা ভক্ত তাঁর তপশ্চর্য্যার ফল তোমাকে দান করে গেলেন। তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।" আমি কিন্তু এখন একটি ১০।১৫ বৎসরের বালকে পরিণত হ'য়েছি। যতক্ষণ যোগীর নিকটে ছিলাম ততক্ষণ পাঞ্জাবী পরা মধ্য বয়েসী পুরুষ ছিলাম। আর যেই মার কাছে এলাম অমনি একটি শান্ত শিষ্ট বালকে রূপান্তরিত হ'য়ে গেলাম। মা আমাকে আদর করে চুমু খেলেন

ও হাত ধ'রে আদর ক'রে বললেন, "এই বার স্বস্থানে ফিরে যাও।" আমি মাকে প্রণাম করলাম। পদ যুগল যে কি অপূর্ব্ব সুন্দর তার বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। তারপর ধীরে ধীরে আবার উর্দ্ধে উঠতে আরম্ভ করলাম ও কি ভাবে যে সেখান থেকে এলাম তার কিছুই আর জানিনা। সাধারণ প্রার্থনার সময় দাঁড়াবার নির্দ্দেশ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এখনও গলায় রুদ্রাক্ষের মালার স্পর্শ অনুভব করছি। এ এক মহা আলৌকিক দর্শন।

আমার মা, অপার করুণাময়ী ক্ষমাশীলা আনন্দময়ী জননী।

১০ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার ১৯৬১ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দ্বৈত ও অদ্বৈত' সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান হয় নাই। কেমন যেন একটা কিন্তু কিন্তু মনে র'য়েছে। এ বিষয় আমাকে সরল করে বুঝিয়ে দাও না। মা বললেন "জ্ঞানই অদ্বৈত আর অদ্বৈতই জ্ঞান। কারণ জ্ঞান অসীম ও অফুরন্ত। এই সংসারের ভিতরেই দেখ প্রত্যেক জীবের স্বীয় দেহময় যে সত্ত্বা তাতে তার জ্ঞান অন্যের থেকে পৃথক। এই যে জ্ঞানের বিভিন্নতা এতেই প্রত্যেকের আচার নিষ্ঠা পৃথক পৃথক ভাবান্তর স্বরূপ। একজনের আচার অন্যের থেকে পৃথক আবার যদি বলি "মানব" তবে এই উপলব্ধি হবে যে বহু মানবের বহু বহু বিভিন্ন জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও জীবরূপী মানব একরূপধর্ম্মী অর্থাৎ মনুষ্য-ধর্ম্মী। মানবের এই যে বিভিন্ন জ্ঞান এই সকল বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয় একজনের ভিতরে হয় না। কিন্তু এই বিভিন্ন জ্ঞানের সমন্বয়ের যে পরিণতি অথবা ফল তাই "মানব" রূপাত্মক জীব। সুতরাং অসীম, অগম্য যে জ্ঞান সমুদ্র যা মহা বিভিন্নতার সমষ্টি তাই "অদ্বৈত" যার ধারণা জীবের অগম্য। কিন্তু তুমি যদি বল, "ব্রহ্ম" বা 'মা' বা 'ঈশ্বর' বা 'জিহোবা' তাতে কি বোঝায়? এই যে অপার অগম্য অদ্বৈত জ্ঞান সমুদ্র তার যে ধারক সেই "ব্রহ্ম" "মা" "ঈশ্বর" "জিহোবা" 'আল্লা"। তোমার জ্ঞান অপূর্ণ বিধায় সেই পূর্ণ "অদ্বৈত"—জ্ঞানের ধারণা তোমার অন্তরে উপজাত হ'তে পারে না। এক জ্ঞানের দ্বারা তুমি যদি বল, আমাকে

তুমি জেনেছ, তবে অন্ত জ্ঞানে আমাকে জ্ঞান নাই। জ্ঞানে তোমার প্রশ্নই থেকে যায়—তাই ত' তাঁকে ত' জানলাম না, তিনি যে অগম্য, অপার মহা অব্যয়। সুতরাং তোমার আত্মোপম্যের উপলব্ধিতে আসাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ অগম্য ধারণাতীত বস্তু তোমার জ্ঞানোপলব্ধির বাহিরের জিনিষ। তুমি তখন এই ভাববে, আমি কে? আমি আমাকে বলছি "আমি"। ও লোকটি ও নিজেকে বলছে "আমি"। সেও যদি "আমি' হয় আর আমিও যদি "আমি" হয় তবে সকলেই আমি ও সংসারে সকলেই নিজেকে আমি বলছে। এই যে আমির প্রকাশ এতেই "আত্মোপম্যের" অনুভূতিতে "সর্ব্বভূতাত্মৈক্য" উপলব্ধি এবং এই উপলব্ধিতে তোমার এই জ্ঞান হয় যে তোমার "আমি" সর্ব্বভূতে "আমি" রূপে ব্যক্ত। তখন তোমার একাত্ম উপলব্ধি হয় সর্ব্বভূতে। সর্ব্বভূতে যখন তোমার একাত্ম উপলব্ধি হয় তখন তোমার ভিতরে প্রশ্ন আসে "আমিই যদি সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত বা সর্ব্বস্বরূপান্তর্গত তবে আমার স্বরূপের পরিণাম কি? যদি আমার আত্মস্বরূপই এই স্থূল জগতে সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত হ'তে পারে তবেত "আমির" বিকাশের পূর্ণতা আর একটা মহাপূর্ণতার অবলম্বন। আমার জ্ঞান সীমিত হওয়া সত্ত্বেও যখন আমি আমাকে সর্ব্বভূতান্তর্গত দেখতে পাচ্ছি তবেত আমার-সীমিত জ্ঞানে সর্ব্বভূতান্তর্গত "আমি" স্বরূপতঃ আর এক মহা অসীম অগম্য জ্ঞান সত্তার এক ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। তখন তোমার মনের জিজ্ঞাসায় তুমি "ব্রহ্মাত্মৈক্য" এই উপলব্ধিতে এসে পড়লে। একে বলে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এ আসে আগের "আত্মজিজ্ঞাসার" পরে। যখন "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" তোমার মনে আসে তখন তোমার অন্তরে স্বভাবত একটা শ্রদ্ধার ভাব আসে। কারণ তুমি জ্ঞান-খণ্ড আর ব্রহ্ম অপার জ্ঞান-সমুদ্র। স্বতই তুমি ক্ষুদ্র ও ব্রহ্ম বড় এই ভাবে তোমার অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব আসে। এই শ্রদ্ধাই "ভক্তি"। তখনই তুমি "বিভক্তির" দ্বারা আচ্ছাদিত জ্ঞানের দীপ শিখায় একটি পরম রমনীয় আধারের উপলব্ধিতে এসে পড়। এই উপলব্ধিই তোমার অন্তরে "অব্যক্ত চৈতন্যের চরম অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত চৈতন্যের মহা

নিগূঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে। তখন তুমি পুত্র আর আমি মাতা, তুমি ক্ষুদ্র ও আমি 'মহান্' তুমি শিশু আমি বৃদ্ধ। এইখানে "পূজা" "উপাসনার" আশ্রয় হয়। শিশু অক্ষর পরিচয়ের পূর্ব্বেই নিজ মাতাকে "মা" বলে ডাকে। তাকে কেউ "মা' ডাক শেখায় না। মা ডাক শিখে বড় হয়ে তবেত' সে 'ম'য়ে আকার দিলে যে "মা" হয় তাই শেখে। তাহ'লে তোমার স্বভাবে যে জ্ঞান আছে তাতে তুমি, আমি যে 'অদ্বৈত' তা জানতে পার। আমি "অদ্বৈত জানলে তবেত তুমি তোমার জ্ঞানে আমার "অক্ষর" জ্ঞানের পরিচয় পাও। তখন তোমার মা নামে শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয়। একে যদি বল, জ্ঞানোত্তর ভক্তি তবে একে "অদ্বৈতে দ্বৈত" আর ভক্তি যদি অর্থাৎ উল্টো দিক থেকে যদি সমন্বয় কর তবে একে "দ্বৈতে অদ্বৈত" হয়। ভক্তি যদি উপজাত হয় অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তরের প্রারব্ধ কর্ম্ম ফলের বা সুকৃতির ফলে "ভক্তি" মানব অন্তরে উপজাত হয় তবে তাতেই তোমার অদ্বৈত জ্ঞান উপজাত হবে ও আমার নিগূঢ় সত্ত্বার লীলায় তুমি অবগাহণ করে থাকবে। জীবনের পরম মুহূর্ত্ত যদি আসে সেখানে এই মিমাংসা বিশুদ্ধ চৈতন্যে পরিসমাপ্তি ঘটে অর্থাৎ আমার নিত্য লীলায় জীব অবগাহন করে। পরে আরও বলব।"

জয় মা জ্ঞানদায়িনী জননী আমার।

১৬ই জানুয়ারী, সোমবার ১৯৬১ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ সকালে মা বললেন "ভগবৎ অস্তিত্বের প্রতি যে ব্যক্তি বা জাতি একাগ্র, ভগবৎ অস্তিত্বও সেই ব্যক্তি বা জাতির প্রতি একাগ্র। যে নির্য্যাতিত বিচারের ভার আমার উপরে ছেড়ে দেয়, সেই নির্য্যাতিতের প্রতি অন্যায়কারীর বিচার সময়ে আমি করিই। যে আমার নির্দ্দেশ প্রার্থনা করে তাকেই আমি নির্দ্দেশ দেই। শরণাপন্নতাই জীবের গতি ও জীবের জীবনের গতি। এ গতি আমামুখিন্। সমগ্র জীবনের মূল মন্ত্র বাধ্যতা। প্রকৃতির প্রতি বাধ্যতা, কর্ত্তব্যের প্রতি বাধ্যতা, সংসারের প্রতি বাধ্যতা ও আমার প্রতি বাধ্যতা জীবনকে মহাজ্ঞানের আধারে পূর্ণ করে। বাধ্যতাই জ্ঞানের প্রকাশক।"

জয় মা জ্ঞান দায়িনী জননী আমার।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৬১ খৃঃ, কলিকাতা।

আজ রাত্রে প্রায় ১১-৩০ মিনিটের সময় এক অলৌকিক পরিবেশের সৃষ্টি করলেন মা। রাত্রি প্রায় ৬॥০ টা থেকে "নবজীবনোপনিষদের" মূল পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপাখানার উদ্দেশ্যে আলাদা খাতায় লেখাগুলো ওঠাচ্ছি। ক্লান্তি বশতঃ প্রায় ১১-৩০ মিনিটের সময় লেখা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে গায়ত্রী জপ করছি। আমার সামনে পূর্ব্বদিকে একখানি খালি চেয়ার ছিল। হঠাৎ দেখি মহাত্মা গান্ধি সেখানে বসে আছেন। একখানা সাদা কাপড় মাত্র পরিধানে ও সেই বস্ত্রের অর্দ্ধেকটা পিঠের উপরে দিয়েছেন। বুক খোলা, চোখে চশমা নাই। আমি অত্যন্ত অবাক হ'য়ে তাঁকে দেখছি। তিনি দাঁড়িয়ে স্মিত হাস্যে আমাকে নমস্কার করে বললেন, "**প্রেমদ্বারা ভারতের সকল বিভেদ দূর ক'রে দাও। প্রেমের-ভারতই পৃথিবীর সকল বিভেদ দূর ক'রে পৃথিবীতে মহা সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করবে।**" এই বলে সামনের খোলা দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সেই খানে দেখি শ্রীঅরবিন্দ বসে আছেন। পরিধানে সাদা ধুতি, খালি গা'। আমার দিকে চেয়ে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বললেন "**ভগবৎ যোগে মানব যোগ সাধন কর। যোগই প্রেম। বিশ্বমৈত্রী প্রেম যোগেই সম্ভব।**" এই বলে তিনিও সামনের খোলা দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখি সেই আসনে ব'সে আছেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ। ঢিলে আলখাল্লা প'রে আছেন। সে কি দৃষ্টি, যেন শরীর মন সুশীতল হ'য়ে গেল। তিনি বললেন,"

"হৃদয় তোমার বাহিরে ভিতরে হৃদয়ে হৃদয়ে ধন্য হোক্!
প্রেমের মন্ত্রে ঘুচুক আঁধার বিগত হোক্ সকল শোক॥"

তিনি ও ধীরে ধীরে সামনের খোলা দরজা দিয়ে চলে গেলেন।

এবার দেখি সেইখানে বসে আছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব। খালি গা'। পরিধানে

একখানা সাদা ধুতি। আমাকে বললেন, **"মাকে হৃদয়ে গ্রহণ কর। মাই ভারত, মাই বিশ্বজগত। ডুবে যাও মাতৃমন্ত্রে।"** তিনিও ধীরে ধীরে সামনের খোলা দরজা দিয়ে চলে গেলেন।

এবার দেখি সেখানে শ্রীচৈতন্যদেব বসে আছেন। শুধু একটা গরদের ধুতি পরিধানে। গায়ে কিছু নাই। কপালে বিরাট্ তিলক কাটা। দৃষ্টি শিবনেত্রে। আমাকে বললেন।

"হরিভক্তিই জীবের শ্রেষ্ঠ গতি। এতেই বিশ্বের সকল সঙ্কট বিদূরিত হবে।" তিনিও ধীরে ধীরে সামনের খোলা দরজা দিয়ে চলে গেলেন।

এবার দেখি শ্রীনিত্যানন্দদেব সেইখানে বসে আছেন। তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল। সদা হাস্যময়। কি সুন্দর দেহ। খালি গা' শুধু একখানি সাদা ধুতি পরিধানে। তিনি আমাকে বললেন।

'বিনা ভক্তি জীবের নাই অন্য গতি,'

ভজ হরি, ভজভক্তি পাইবে সদ্‌গতি" তিনিও ধীরে ধীরে সামনের খোলা দরজা দিয়ে চলে গেলেন।

এবার যাঁকে দেখছি তিনি, "মহাজ্ঞানী কন্‌ফিউসিয়াস্। এসে বসেছেন। মস্তক মুণ্ডিত সর্ব্ব দেহ জ্যোতির্ম্ময়। মুখ খানা গোলাকার ও বিরাট্। আগের দেখা চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য। অনেক কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন, **"একাকার হ'য়ে যাও ঈশ্বরের সঙ্গে, দেখবে সকল বিশ্ব তোমাতে একাকার হ'য়ে গেছে। কেউ তোমার শত্রু নয়"**। তিনিও ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

এবার যাঁকে দেখছি তিনি মুশা। কি আশ্চর্য্য রূপ যেন আগুনের গোলা। পরিধানে একখানা সাদা বুকখোলা আলখাল্লা। মস্ত দাঁড়ি, মাথার চুল সোণালী। আমাকে বললেন।

"Live in God and God lives in You' তিনিও ধীরে ধীর চলে গেলেন।

এবার যাঁকে দেখছি তিনি মহাভক্ত যিশুখৃষ্টদেব। পরিধানে একটি সাদা আলখাল্লা। বুক খোলা নয়। গলায় একটা মস্ত বড় কালো সুতো আছে। জ্যোতির্ম্ময় পরিবেশ। যেন সকল ঘর ধূপ ধূনায় আমোদিত হ'য়ে গেল। আমিও মধুর গন্ধে সম্মোহিত হয়ে গিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, **"Love and piety is the Salt of the Earth. Living Faith in God will bring the Salt. The Salt will bring back the harmony to Humanity,"** তিনি অতি ধীরে ধীরে খোলা দরজা দিয়ে চলে গেলেন।

এবার দেখছি শ্রীবুদ্ধদেব বসে আছেন। যোগাবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত। ধীরে ধীরে আমার দিকে চক্ষু উন্মিলন করলেন। মধুর হাসিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। আমাকে বললেন, **"প্রেম ও মৈত্রী জীবনে জাগ্রত কর। এক জীবন জাগ্রত হলে বিশ্ব জাগ্রত হয়। তুমি কৃতকার্য্য হও।"** তিনি চলে গেলেন।

এবার দেখি ঋষি টলস্টয়। যেন বালকের মত চঞ্চল। বৃদ্ধ, গায়ে একটা কালো মতন কোট্। একটা আধময়লা ছেড়া পেণ্ট পরিধানে, পায়ে জুতা নাই। এসে যেন মহানন্দ। বললেন,

"Greatest Rejoice to this Earth, The Lord's grace is bestowed on you. Live in mankind and you live in the Lord.— Rejoice." তিনি চলে গেলেন।

এবার দেখি ঋষি অষ্টাবক্র বসে আছেন। বললেন,

"দেহদৃষ্টি পরম দৃষ্টিতে সঞ্চারিত কর। জাগ্রত হোক তোমার দেবভাব। দেহের উর্দ্ধে ওঠ।" তিনিও ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

এবার দেখছি ঋষি জামদগ্নি। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বিরাট্ চুল দাঁড়ি, মিশ কালো। গলায় বিরট্ রুদ্রাক্ষের মালা। দেহ ও মুখ মণ্ডল বিরাট্। চোখ দুটি জলন্ত। কিন্তু কি কমনীয়তা ও অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা তাঁর মুখে। বললেন,

"আশীর্ব্বাদ করি জগতে তোমার প্রেমধর্ম্ম জয়যুক্ত হোক। ভগবৎ বিশ্বাসই শ্রেষ্ঠ অস্ত্র"। এবার যাঁকে দেখছি তিনি মহাভক্ত মোহম্মদ। অপূর্ব্ব সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হ'ল। পরিধানে একটি সাদা আলখাল্লা। মুখে কাঁচা পাকা দাঁড়ি। চক্ষু যোগে উর্দ্ধগতি। আমাকে নমস্কার করে বললেন **"আল্লার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হোক্। সকল বৈরীতা দূর হোক্। জগতের সকল জাতি এক হোক্। আল্লার প্রেমই পরশ পাথর। ধর্ম্মান্ধতা আল্লার নামে ধূলিস্যাৎ হোক্"**। তিনিও ধীরে ধীরে চলে গেলেন। আমার মনে হ'ল ওই খোলা দরজার বাইরে আরও বহু বিদেহী ভক্তদের আগমন হ'য়েছে। মহাভক্ত শিব, শঙ্করাচার্য্য, কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আরও অনেকে এসেছেন। এ পরিবেশ যেন মহাভক্ত শিবই মাতৃ আজ্ঞায় ব্যবস্থা করেছেন। কারণ তাঁকে দেখলাম ঠিক দরজার নিকটে দাঁড়িয়ে স্মিত হাস্যে সর্ব্ব সময় এই পরিবেশ উপভোগ করছেন।

এর পরে মা এলেন। অতি সুন্দর একটি শাড়ী প'রে স্মিত হাস্যে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আমার পাশে এসে বসে আমার মাথায় হাত দিলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার এই গভীর ধ্যান ভেঙ্গে গেল। ঘড়িতে দেখি রাত তখন ১২টা। উঠে মার নাম করতে লাগলাম। আমার মা আমাকে দিয়ে কি করাবেন বুঝতে পারছি না। মহা করুণা দিয়ে আমার জীবনটাকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দিচ্ছেন।

জয় মা জয় মা জয় মা।

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত।